ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক-পত্র

অষ্টম বর্ষ

মাঘ, ১৩৪১—পৌষ, ১৩৪২

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এল্‌

রামধনু কার্য্যালয়

১৬নং টাউনসেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর

কলিকাতা

রামধনু

(মাঘ, ১৩৪১—পৌষ, ১৩৪২)

বিষয়-সূচী

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিবুদ্ধি (গল্প)	শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	৫৫২
অথ শ্রীভিক্ষুকদর্শন (ঐ)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪০৭
অনুপান (ঐ)	শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	৫৪৬
"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, বি,এস্,সি	৫৮৮
অভিমত		৪৭২
আকিয়াবের পথে (ভ্রমণ)	কুমারী জ্যোৎস্না নাহা	৫৭১
আজকে ছুটী চাই (কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	২৪৪
আদিকালের পৃথিবী (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্,এস্,সি	১৬৬
আমার বাড়ী (কবিতা)	জসীমউদ্দীন,	৩০৫
আমি চাইনে এমন সুখ (ঐ)	শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৮
আর একটু হ'লেই (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়কুমার বড়াল	৪৮৪
আল্ট্রাভাঁয়োলেট্ আলোর কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	২২৬
ইঁদুর চরিতামৃত (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৩৬
একখানি বিখ্যাত ছবি		৩১১
একটি অদ্ভুত ত্যাগের কাহিনী	শেখ ফজলল করিম, সাহিত্যবিশারদ, কাব্যরত্নাকর নীতিভূষণ	৪২৮
একালকার চিকিৎসা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	৫৫৪
[illegible] জামিনের প্রান্তে (কবিতা)	কুমারী সুজাতা গুপ্ত	২৪৮
[illegible]পারে ও ওপারে (কবিতা)	শ্রীভারতী দেবী	৬০০
ওপারের ঢেউ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন ও শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্	২৮৬
কমলাদের জামাইবাবু (গল্প)	শ্রীহেমলতা দেবী	৯৩
কল্‌কাতার হালচাল (ঐ)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৪
ক্ষতিপূরণের দাবী (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়কুমার বড়াল	৩০৭
কাচের কথা (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি	১১৬
কান্তিকুমারের শেষ পরীক্ষা (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	২১৮
কাব্য লোকে ([illegible])		২১১
কি খাওয়া উচিত (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, বি,এস্,সি	৩২৬
কুসংস্কার (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়কুমার বড়াল	১০৫
খেলাধূলা (প্রবন্ধ)		৩৪৮
খোকন্ মণি (কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	২৫৫
খোকা-প্রশস্তি (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি,টি	১০৩
ঘণ্টু দাদার ঘণ্টারাব (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	৯
চিঠি-পত্র		৫০, ১৪৮, ১৯৮, ৩০১, ৩৫১, ৪০০, ৬[illegible]২
চিত্রশালা		৩৪২, ৬[illegible]৫
ছিন্ন মেঘে করিয়া ভর ঐ যে ঝড় আসে (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০৫
ছেলেদের গান (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৭৭
ছেলেবেলার গান (ঐ)	শ্রীরামপ্রসাদ সিং	৫৭০
ছোটদের চিত্রশালা		১৯৯, ২৫০, ৩০০, ৪০১, ৪৬৯, ৫২৩
জন্মদিনে (গল্প)	শ্রীসুধীর মজুমদার	৪৭১
জামরুল বন ডাকে আমায় (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫২৭
জীবন্ত দেবতা (গল্প)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩১১
জেনে রাখ		৩৮১
টাকা পয়সার গল্প (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	৩৬৯
ট্যারা চোখের সুবিধা-অসুবিধা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১৫৫
ডাকাতের হাতে (ঐ)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়	৩৭৬
ডাঃ চিরঞ্জীবের এড্‌ভেঞ্চার (ঐ)	সত্যগোপাল	৪৩৮
তুরস্কের বিদুষী নারী মাদাম্ খালেদা আদিব খানম (সচিত্র প্রবন্ধ)		১৪২
দরদী ভৃত্যের কাহিনী (গল্প)	শ্রীশকুন্তলা দেবী	[illegible]২৫
দি আঙ্গোরাক্যাট্ (গল্প)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি	[illegible]৩
দিন-মাহাত্ম্য (গল্প)	শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪[illegible]৪
দিনের মত দিন (ভ্রমণ)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৯৮
দি হিমাচালিয়ান আর্ট গ্যালারী (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, বি,এল্	৬০৩
দেহাতী গান (প্রবন্ধ)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	৬৩
ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৫২, ১০১, ১৫১, ২০[illegible], ২৫৩, ৩০২, ৩৫৩, ৪০২, [illegible], ৫২৫, ৫৭৪, ৬২৭

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
নরবলি	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫৯১
নানা কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ-বি-এল্	৪৪৯
নাম-বিভ্রাট্ (গল্প)	শ্রীশেফালিকা সেন	৪১৫
নিঝুম নিশুত রাতে (কবিতা)	শ্রীসত্যগোপাল সরকার	৫১১
নিয়তির খেলা (গল্প)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ	৪৭৯
নির্ভর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	১
নির্লজ্জ (রঙ্গ)	...	১৬৫
নূতন ধাঁধা		৫২, ১০২, ১৫২, ২০৪, ২৫৪, ৩০৪, ৩৫৪, ৪০৪, ৪৭৬, ৫২৬, ৫৭৬, ৬২৮
পউষ-সাঁঝে	কুমারী সুজাতা গুপ্ত	৬২৩
পরবাসী (কবিতা)	শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস	৩৫০
পরিশ্রমের পুরস্কার	...	২৭৬
পিঁপড়ের বুদ্ধি	কুমারী রুবী চাটার্জ্জি	৬২৪
পুরস্কার প্রতিযোগিতা	...	৪৬৩
পুস্তক-পরিচয়		৯৮, ৪৭৩
পূজার আদর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪০৬
পূজোর শিকার (গল্প)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্,এ, বি,টি	৪৯০
পৃথিবীর উদর রহস্য (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্,এস্,সি	১৭
পেটে খেলে পিঠে সয়	...	২৭৭
প্রকাণ্ড প্রমাদ (গল্প)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	৪২৩
প্রফেসার ভড়ের উপাখ্যান (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	৭৩
প্রাপ্তি-স্বীকার		২৯১, ৩৫৩
বড়দের স্মরণশক্তি (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	৫১৩
বয় হিমবায় (কবিতা)	কুমারী সুজাতা গুপ্ত	৪৯
বর্ষা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৫৫
বসন্তের আবির্ভাব (কবিতা)	শ্রীমতী ভারতী দেবী	১০০
বাক্যবাগীশ (কবিতা)	শ্রীবিকাশ দত্ত	৩২৩
[illegible] ছবি (প্রবন্ধ)	শ্রীচারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৯
বাঙ্গালী বীর বঙ্কিমবিহারী (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু	৬৯
বাদল রাণী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলবর্ম্মণ	৩৯৯
বালকের বীরত্ব	শ্রীশশাঙ্কশেখর বসু	১৪৪
বিক্রমপুরের ছেলে ভুলান ছড়া (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৬৩
বিজ্ঞাপন (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	২৫৮
বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ	শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ	৬১২

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বীরেন বাবুর বিমানবার্ত্তা	...	৫২৩
বেণু (কবিতা)	শ্রীনলিনী গুপ্ত, এম্,এ, বি,টি	৩৮২
বে-দস্তবাগীশের খিবরে	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৫৭৮
বেবুনের হাতে (শিকারের গল্প)	শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে	৮৩
ব্যঞ্জন (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৫৫১
ভগবান্ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	১৮৮
ভুঁড়িকম্প (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি	১১০
মধ্য এসিয়ার মরু-প্রান্তরে (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	৪৩০
মহেঞ্জোদাড়ো (ইতিহাসের কথা)	শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ,	৪৯৬
মহুয়াতলায় মেঠোছেলে বাজায় মিঠে তান (কবিতা)	কুমারী সুজাতা গুপ্তা	১৪৬
মাটন্ (ভ্রমণ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি	১৮০
মামার বাড়ী (কবিতা)	জসীমউদ্দীন	৪২২
মায়ালোকে (বড় গল্প)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	২৩,৫৪
মা-হারা (কবিতা)	শ্রীনলিনী দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি	৩২
মোটরের হর্ণ	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী	৫৭৮
মোদের গাঁয়ের নদী (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩
যূথপতি (গল্প)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	৩৫৬
য়্যাবিসিনিয়া (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্,এ, বি,এল্	৩৯০
রংতামাসা (রঙ্গ)	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৫৬৯
রঙ্গকণা (রঙ্গ)	শ্রীপাচুগোপাল ঘোষ	২৫০
রজত-জুবিলী (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	২৪৫
রতনের রগড় (গল্প)	শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	১৩০
রবীন্দ্র বন্দনা (কবিতা)	শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত	১৪৪
রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	...	৪৬৩
লালুর বরাতি (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৯
লোহালক্কড়ের মুল্লুকে (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি,এস্,সি	৫৪০
শরৎ আজি এলে (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]
শিমাচলম্	শ্রীজ্ঞানশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	[illegible]
শীতের পোষাক	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	৫৯৬
শুশুকের স্যাঙাৎ (গল্প)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	২১২
শেষ পাঠ (গল্প)	শ্রীনিখিল সেন	১৯৫
সত্যবাদী সুকু (গল্প)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	৪৫৫
সন্দেশ		৫০, ৯৬, ১৪৯, ২০০, ২৫১, ৩০১, ৩৫২, ৪০১, ৪৭৪, ৫২৪, ৫৭২, ৬২৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক		পৃষ্ঠা
সব চাইতে চালাক কে (গল্প)	...	শ্রীরুক্মি চট্টোপাধ্যায়	...	৫২২
সবুজ পাতার পরী (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২০৫
সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক	...	...	...	৫১
সম্রাট্ ও মন্ত্রী (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি,এ, এম্,আর,এ,এস্		১৫৩
সাপের গল্প (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি,এস্,সি	...	৪১১
সাহারার বুকে (,,)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	...	২
সিংহের খপ্পরে (শিকারের গল্প)	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে	...	২০৭
সূর্য্যমুখী ফুলের জন্ম (গল্প)	...	শ্রীমতী শেফালিকা রায় চৌধুরী	...	১৪৫
সেয়ানে সেয়ানে (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি,এস্,সি	...	২৭৭
সোনার ঘড়ি (গল্প)	...	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্,এ	...	১২২
সোনার হরিণ (ধারাবাহিক গল্প)	অধ্যাপক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্,এ, বি,এল্	...	
	...	৪২, ৮৮, ১৩৫, ১৮[illegible], ৩৪২, ৩৯৪, ৫০৫, ৫৬২, ৬১৫		
স্বপ্ন না সত্য (বিজ্ঞানের কথা)	...	শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি,এস্,সি	...	৩১৮
হঠাৎ আজি নাম্‌ল বাদল (কবিতা)	...	শ্রীভারতী দেবী	...	৩৯৩
হরদাসের জ্যাঠা (গল্প)	...	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্,এ, বি,টি	...	১৭২
হরিমোহনদার অনাথ-আশ্রম (গল্প)		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্,এস্,সি	...	৩২৯
হর্ষবর্দ্ধনের সমুদ্রলঙ্ঘন (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	২৬৫
হাতেহাতে (গল্প)	...	শ্রীনলিনী গুপ্ত, এম্,এ, বি,টি	...	৪৪৫
হারানদার সঙ্গে এক সন্ধ্যা (গল্প)	...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	...	৩৮৩
হাসির গল্প (গল্প)	...	শ্রীমনোতোষ রায়	...	৩৫১
হাস্য কৌতুক (রঙ্গ)	...	শ্রীমতী আরতী দাশগুপ্তা	...	১৪৭
হোলি (কবিতা)	...	শ্রীঅনিমা গুহ, শ্রীসুবর্ণ গুহ, শ্রীনিরুপমা সেন		১৪৩

এরোপ্লেন একেবারে এক বাড়ীর ছাদেই নামল।

(২০ পৃষ্ঠা দেখ।)

রামধনু

৮ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪১ | ১ম সংখ্যা

নির্ভর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

উঠে ঘন কালো মেঘ, দেয় নাক' জল ;
চাতক-ঠকানে মেঘ কে বা চায় বল ?
মুকুলেতে যেই তরু ভরে উঠে ভাই,
ধরে নাক গুটী, তার গৌরব নাই।
যে দীঘিতে পাতা শুধু আটকায় ঢেউ,
ফোটে না কমল, তারে চায় নাক' কেউ।
যেথা শুধু অকারণে ফাৎনা ডুবায়,
উঠে নাক' মাছ, সেথা কেহ নাহি যায়।

দেখিতে আপেল, আর খাইতে মাকাল,
সে ফল পাড়িতে যাওয়া কেবলি নাকাল।
আশা দেয়, ভাষা দেয়, করে নাক' কিছু,
ছুটিও না সে সজীব মরীচিকা পিছু।
জনমের জনমের যে চির আশ্রয়,
যে শরণ, যে সুহৃদ্ টলিবার নয়,
সম্পদে আনন্দ যিনি, নিরাশে সাহস,
বিপদভঞ্জন যিনি, বিশ্ব যাঁর বশ,
যিনি সবাকার বন্ধু, নাহি যাঁর পর
তাঁহারি উপর রাখো অনন্ত নির্ভর।
বৃক্ষফলে রুটী-জল, ফুলে রাখে মধু,
হে পিপাসী, হে ভুখারী, তাঁরে ডাক শুধু।
ছলনারও মাঝে যাঁর করুণা কেবল,
সেই কাম্য, তাঁরে বিনা জীবন বিফল।

সাহারার বুকে

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আফ্রিকার মানচিত্র খুলিলে প্রায় প্রথমেই চোখে পড়ে উপরের দিকে অনেকখানি জায়গা যুড়িয়া এক বিরাট্ মরুভূমির রাজ্য। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় মরুভূমি আর নাই। নামও এর তেমনি —সা—হা—রা। পড়িলেই ঐ ধরণের আর একটা শব্দ মনে আসে—হা—হা—কা—র।

বাস্তবিক, সাহারার নাম করিতেই মনে যেন কেমন একটা আতঙ্ক আসিয়া পড়ে। কী অদ্ভুত রাজ্য! চারি দিকে শুধু বালি আর বালি আর বালি। সমুদ্রের

মতই তার কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাওয়া মুশ্‌কিল। বছরের পর বছর কাটিয়া যায়, এক ফোঁটা বৃষ্টির জল সেখানে পড়ে না। রস না পাইয়া গাছপালা কিছুই জন্মাইতে পারে না—শুধু কচিৎ দু'-এক জায়গায় দু'-একটা মনসা গাছ কোন রকমে মাথা খাড়া করিয়া থাকে। এই গাছগুলির শিকড় খুব লম্বা, আর পাতাগুলি হয় খুব

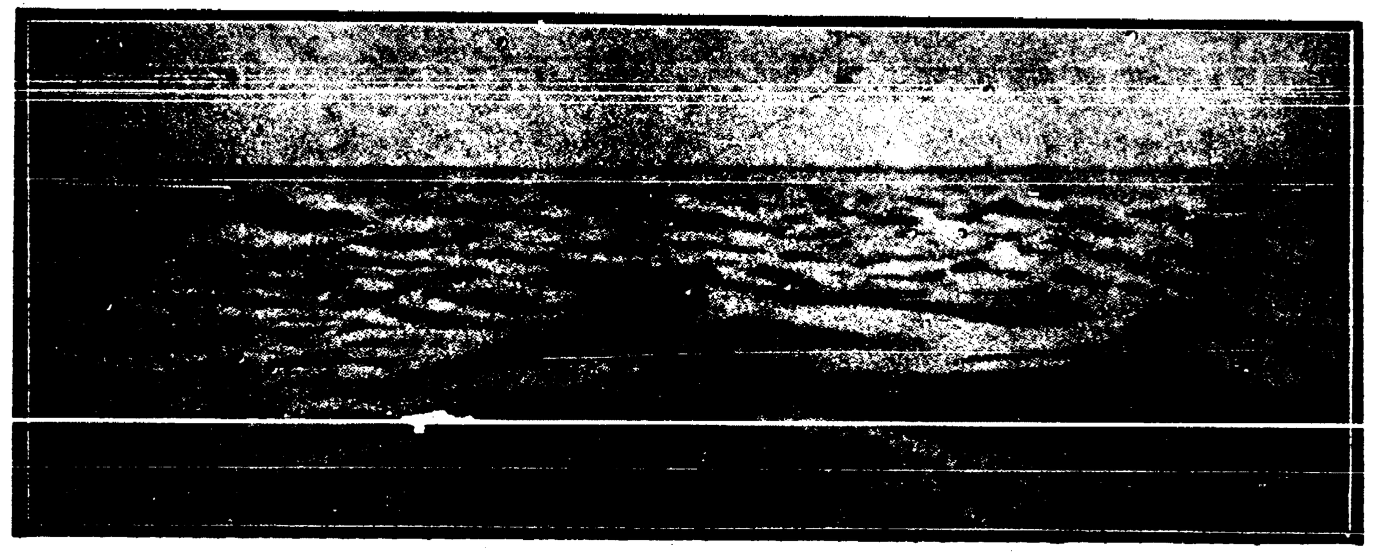

সাহারার সাধারণ দৃশ্য

পুরু ও চ্যাটাল। বালির অনেকখানি নীচে নামিয়া গিয়া সে শিকড় একটু-আধটু রস সংগ্রহ করে, আর পাতাগুলিও তা সহজে বাহির হইতে দেয় না।

যেখানে জল নাই, গাছপালা নাই, সেখানে জনপ্রাণীও থাকিতে পারে না; কচিৎ দু'-একটা পোকা-মাকড়, সাপ, বিছা বা গিরগিটি হয়ত খুঁজিলে ধারে ধারে পাওয়া যায় কিন্তু একটু ভিতরে গেলে একেবারে চিরনিস্তব্ধতার দেশ।

এমন দেশেও কি কেউ কখনও সখ করিয়া বেড়াইতে যায়—বিশেষতঃ পৃথিবীর অন্যান্য সুজলা সুফলা দেশের বাসিন্দারা? যে যায় তাকে নেহাৎ হতভাগা বলিতে হইবে।

কিন্তু আমি যাঁর কথা বলিতেছি ইনি মোটেই হতভাগা নন, যদিও ইনি একবার নয়—দুই-দুইবার সাহারা মরুভূমিতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার অর্দ্ধেকটা গিয়া ফিরিয়া আসেন, দ্বিতীয়বার সাহারার এপার ওপার পার হইয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। কেন গিয়াছিলেন জান? মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইতে —প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া সাহারা সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার

করিতে। ইহার নাম ক্যাপ্‌টেন বুকানন্‌। ফিরিয়া আসিয়া ইনি তাঁর ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়াছেন তা' বাস্তবিকই বড় বিস্ময়কর।

বুকাননের দ্বিতীয় অভিযান সুরু হয় ১৯২২ সনে। এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছাড়া ছিল একটি অতিরিক্ত সিনেমা-ক্যামেরা—যা দিয়া বায়স্কোপের ছবি তোলা যায়। আর তাঁর সঙ্গী হইয়াছিলেন গ্লোভার সাহেব। ইহার কাজ ছিল শুধু ছবি তোলা।

এই অভিযানের জন্য যে সব আয়োজন করিতে হইয়াছিল, সঙ্গে লইবার জন্য যে সব সরঞ্জাম লইতে হইয়াছিল তার জন্য বড় কম হিসাব করিতে হয় নাই। প্রথমতঃ খাবার। সেই ভয়ানক দেশে কোন রকম খাবারই জুটিবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই ষোল মাসের উপযুক্ত খাবার তাঁদের সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। শুধু নিজেদের খাবার নয়—তাঁদের সঙ্গে যে সব দেশী অনুচর লইতে হইবে তাদেরও খাবার—এবং সে খাবার তাঁদের খাবার হইতে একেবারে বিভিন্ন। তা' ছাড়া মালপত্র লইয়া সঙ্গে যে সব উট যাইবে তাদেরও খাবার চাই। (উটের সঙ্গে আবার এক জন করিয়া উটের সহিসও থাকিবে)। খাবারের পরে জল। মরুভূমির রাজ্যে এইটাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ। তার পর ওষুধ-বিষুধ, অন্যান্য খুঁটিনাটী জিনিষ—এ সব তো আছেই। সাহারার আবহাওয়াও ভারী অদ্ভুত। মাটী সেখানে যেমন তাড়াতাড়ি তাতে, ঠাণ্ডাও হয় তেমনি তাড়াতাড়ি। কাজেই দিনের বেলা উত্তাপ যেমন ১১০° ডিগ্রীর নীচে নামিতে চায় না, রাত্রে সুরু হয় তেমনি ঠাণ্ডা হাওয়া আর শীত। এ সবের সঙ্গে যুঝিবার উপযুক্ত সরঞ্জামও রাখা দরকার। কিন্তু গলদ আবার গোড়ায়। বেশী মালপত্র সঙ্গে করিয়া ঘোরা অসম্ভব। যত হাল্কা, যত কম আসবাব-পত্র থাকিবে মরু-ভ্রমণ ততই সহজ হইবে। বুকানন্‌ ও তাঁর সঙ্গী ষোল জন দেশী অনুচর সংগ্রহ করিয়া এক পাল শিক্ষিত উট সহ নাইজেরিয়ার ল্যাগোস্‌ হইতে আসল যাত্রা সুরু করিলেন। মরুর দেশে যে উট ছাড়া এক পাও আগানো যায় না তা' বোধ হয় তোমরা জান।

এইখানে তোমাদের একটা ভুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। সাহারার বুকে শত শত মাইল যুড়িয়া সমুদ্রের মত অফুরন্ত বালির রাজ্য থাকিলেও মাঝে মাঝে

তার একটু ব্যতিক্রমও আছে। কোথাও বা বেলে-পাথরের পাহাড় জমিয়া আছে—আবার কোথাও বা গভীর খাদ। মাটীর নীচে আগাগোড়াই বালির-স্তর থাকিতে পারে না—অনেক নীচে, তা সে যত নীচেই হউক্‌ না কেন, জলাশয় বা ঝরণা থাকিবেই। যেখানে বালি কম, সেখানে অনেক সময় এই সব সঞ্চিত জলের রাশি বালির উপরেও উঠিয়া আসে। ফলে বালিও উর্ব্বর হইয়া পড়ে এবং খেজুর গাছ প্রভৃতি জন্মাইয়া জায়গাটিকে একটি ছোটখাট স্নিগ্ধ-গ্রামের মত করিয়া তোলে। এগুলিকে ইংরাজীতে বলে ওয়েসিস্ (oasis), আমরা 'মরু-গ্রাম' বলিব।

সাহারার উপর দিয়া চলিতে চলিতে কখনও বা বহু শত শত মাইল্‌ পর পর আবার কখনও বা আরও কাছাকাছি এই ধরণের মরু-গ্রাম দেখা যায়, এবং এগুলি আছে বলিয়াই মরুভূমির রাজ্যেও মানুষের বাস একেবারে অসম্ভব হয় নাই। যে সব লোকে এই অঞ্চলে বাস করে তারাও মরুভূমির মতই দুর্দ্দান্ত। দল বাঁধিয়া ছাগল-উট লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানই তাদের কাজ। আজ এ গ্রামে, কয়েক সপ্তাহ পরে আবার দল বাঁধিয়া অনেক দূরে আর এক গ্রামে—এমনি করিয়া ইহাদের জীবন কাটে। এক গ্রামে বেশী দিন থাকিলে খাবার-দাবার (নিজেদের এবং সঙ্গের ছাগল-উট প্রভৃতির) দুর্ঘট হইয়া পড়ে; কাজেই বাধ্য হইয়াই ইহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

সাহারার আর একটি দৃশ্য—মরুবাসীরা প্রার্থনা করিতেছে।

এই সব মরুবাসীদের জীবনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা কি জান? লুটপাট করা। অবসর সময়ে এই-ই তাদের চিন্তা। হয়ত একদল ভ্রাম্যমাণ পথিক মরুভূমি পার হইয়া চলিয়াছে, হঠাৎ অতর্কিতে আর এক দল আসিয়া তাদের আক্রমণ করিল; তাদের মালপত্র, বিশেষ করিয়া উটগুলি, কাড়িয়া নিয়া চলিয়া

গেল। এ রকম হামেশাই হয়। শুধু পথিকদের উপরই আক্রমণ চলে না, অনেক সময় দল বাঁধিয়া অপরের দখল-করা মরু-গ্রামও আক্রমণ করা হয়। যাদের আক্রমণ করা হইল তারাও যে নেহাৎ সাধুপুরুষ তা' মনে করিও না; ফাঁক পাইলে তারাও আবার অন্য দলের উপর আক্রমণ চালাইতে কসুর করে না। বুকানন্ সাহেব এই ধরণের এক দল মরু-দস্যুর লুটপাটের ভারী সুন্দর এক বিবরণ দিয়াছেন।

দল বাঁধিয়া তাঁরা চলিয়াছেন, হঠাৎ সঙ্গের দেশী অনুচরদের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। পর মুহূর্ত্তেই সম্মুখের নানা চিহ্ন দেখিয়া বুঝা গেল অল্প একটু আগে সেখান দিয়া এক দল ভ্রাম্যমাণ দস্যু চলিয়া গিয়াছে। মরুভূমির বালিতে পায়ের দাগ দেখিয়া কে কোথায় গেল বাহির করা খুবই সহজ। বুকানন্ ঠিক করিলেন, তিনি ঐ দস্যুদলের অনুসরণ করিবেন। বালিতে পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল উটের পায়ের দাগ হঠাৎ কেমন এলোমেলো, এবড়ো-খেবড়ো হইয়া গিয়াছে—যেন উটগুলি হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ ধূলা উড়াইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু পরেই বালির উপর একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন পাওয়া গেল এবং তার পরেই দস্যুদলের পদচিহ্নের সঙ্গে এক পাল ছাগলের পদচিহ্ন যোগ হইয়াছে দেখা গেল—সেই সঙ্গে একটি নতুন মেয়েলী জুতার চিহ্নও পাওয়া গেল। বেশ বুঝা গেল—কাছাকাছি কোথাও একটা মরু-গ্রাম আছে। ঐ স্ত্রীলোকটি ছাগল লইয়া সেখানে ফিরিতেছিল, পথিমধ্যে দস্যুরা তাকে বন্দী করিয়া ছাগলগুলি দখল করিয়াছে। খানিক পরেই আবার পায়ের দাগ দেখিয়া জানা গেল কয়েক জন দস্যু ছাগলগুলি লইয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে।

বুকানন্ দস্যুদলের অনুসরণ ছাড়িলেন না। একটু পরেই তিনি আবার টের পাইলেন ছাগলের মত তারা এক পাল গাধাও সংগ্রহ করিয়াছে। তার পর সন্ধ্যার দিকে তাঁরা সেই গ্রামে পৌঁছিলেন।

বুকানন্ ভাবিয়াছিলেন সুবিধা পাইলে বেচারা গ্রামবাসীদের একটু সাহায্য করিবেন কিন্তু তাঁরা গ্রামে ঢুকিবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। গ্রামবাসীরা

আগেই সংবাদ পাইয়া তাদের উটগুলি অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়াছিল কিন্তু দস্যুদের হাত হইতে রেহাই পাইল না। তারা গ্রামের মোড়লকে বাঁধিয়া কোথায় উট লুকাইয়াছে বাহির করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিল—এবং শেষ পর্য্যন্ত উটের পাল আদায় করিয়া সেগুলি লইয়া চলিয়া গেল। অন্য কোনও জিনিষ তারা স্পর্শ করিল না।

বুকানন্ সঙ্গীদের লইয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ-পাশের চলচ্চিত্র তুলিতে তুলিতে চলিলেন; যেখানে জন্তু-জানোয়ারের সাক্ষাৎ পাইলেন, সংগ্রহ করিলেন,—পোকা, মাকড়, বিছা, গিরগিটি কিছুই বাদ দিলেন না।

ক্রমে পথ দুর্গম হইতে লাগিল। প্রচণ্ড রোদে তাঁদের সর্ব্বশরীর ঝলসাইতে

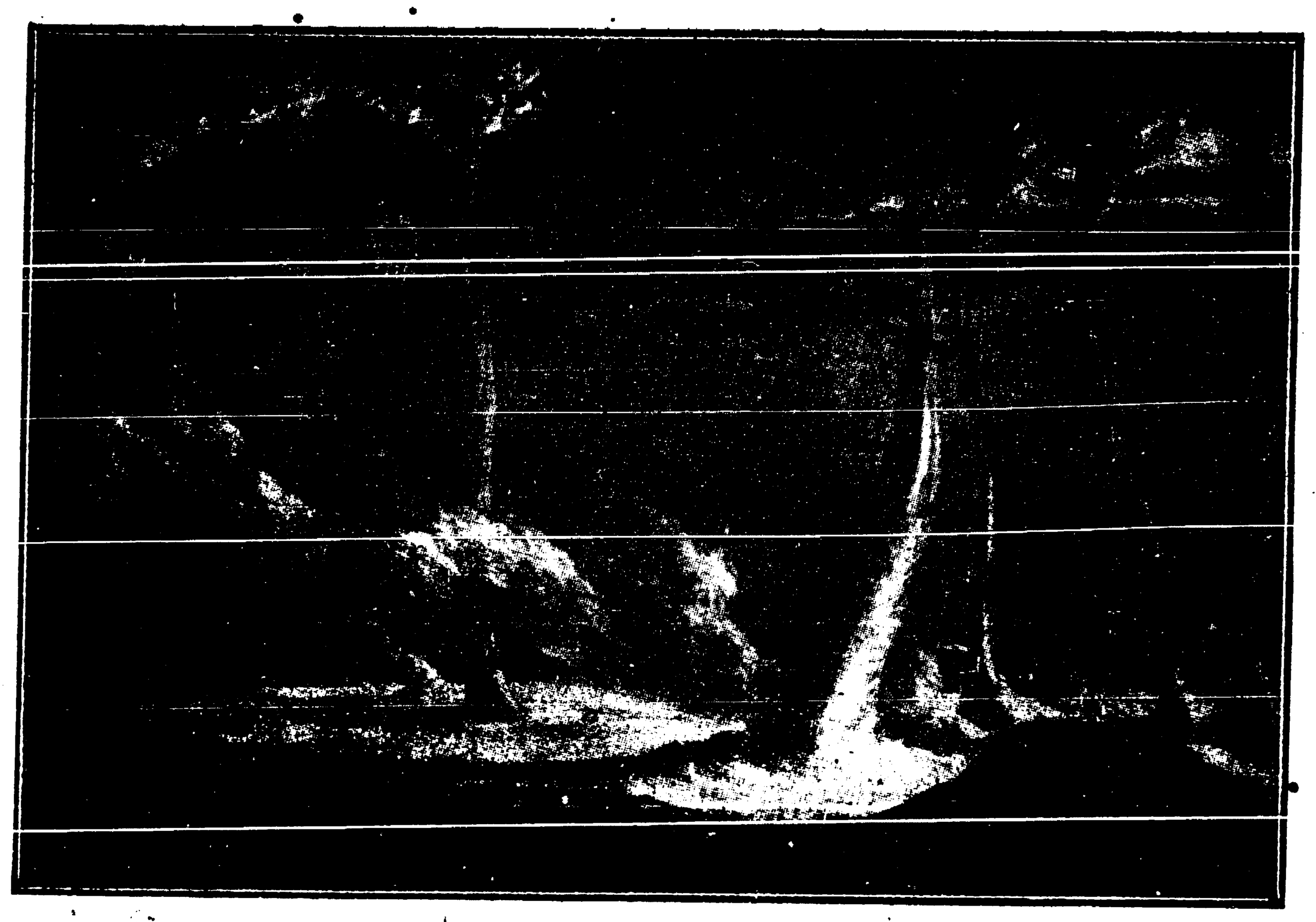

সাহারায় ঘূর্ণিবায়ু

লাগিল, আর সুরু হইল দারুণ ঝড়। মরুভূমিতে ঝড় বড় ভয়ানক জিনিষ, কিন্তু বড় সহজেই হয়। রাত্রে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে, কিন্তু দিনের বেলাই আবার দারুণ গরম সুরু হয়। ফলে হঠাৎ গরম বাতাস হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, আর যত

রাজ্যের ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করিয়া তার জায়গা দখল করিতে ছুটিয়া আসে। বাতাস একা আসে না, তার সঙ্গে বালির রাশিও ভীমবেগে ছুটিতে থাকে। সেই বিরাট্ উড়ন্ত বালির রাশিতে চোখ অন্ধ হইয়া যায়, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, আর গরম বালির ঘষায় ঘষায় সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে। আবার, এই ঝড় যখন বড় বড় ঘূর্ণিবায়ুরূপে দেখা দেয় তখন তো আরও ভীষণ ব্যাপার! বালির রাশি পাক খাইয়া খাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের মত উঁচু হইয়া পড়ে, তার পর ভীমবেগে —কখনও কখনও ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল্ বেগে ছুটিতে থাকে। তার ভিতর একবার পড়িলে কারও বাঁচিবার আশা নাই। বুকানন্ সম্ভবতঃ ঘূর্ণিবায়ুর মুখে পড়েন নাই, কিন্তু ঝড়েই তাঁর প্রাণান্ত উপস্থিত হইল। দেশী অনুচরগুলি গতিক দেখিয়া একে একে পালাইতে লাগিল—উটগুলিও দারুণ পরিশ্রমে কাতর হইয়া একে একে মরিতে লাগিল, কিন্তু বুকানন্ তাঁর অভিযান বন্ধ করিলেন না।

আর এক আপদ্ জুটিল মরুভূমির মরীচিকা। মরীচিকার কথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। বহু দূর-দূরান্তরে হয়ত কোথাও মরু-গ্রাম আছে, কিন্তু মরুর বাতাসের গুণে হঠাৎ মনে হইবে সামনে এই মাইল খানেক দূরেই বুঝি একটা মরু-গ্রাম দেখা যাইতেছে! কেন এমনটা হয় তা' তোমরা যখন বড় হইয়া বিজ্ঞান পড়িবে তখন বুঝিবে। বুকানন্ এ সব কথা জানিতেন, কিন্তু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ সামনে ঐ রকম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিলে কেউ মতি স্থির রাখিতে পারে কি? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটিয়াও যখন সে গ্রামের চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং সে ছায়াও যখন আস্তে আস্তে সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যায় তখন মনের অবস্থা কেমন হয় বল তো?

কিন্তু বুকানন্ তবুও ঘাবড়াইলেন না। যে কাজের ভার লইয়াছেন—মরু-অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইয়া যাইবেন ঠিক করিয়া আসিয়াছেন অদম্য সঙ্কল্প লইয়া অবিচলিত ভাবে তিনি সে কাজ করিয়া চলিলেন।

শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোদ, ঝড়ই পথে বাধা তুলিল না—কত বার পঙ্গপালের হাতে মরিতে মরিতে তাঁরা রেহাই পাইলেন, চোরা-বালির মধ্যে ডুবিয়া যাইতে

যাইতে রক্ষা পাইলেন, ধ্বসিয়া-পড়া বালির চাপ হইতে অদ্ভুত ভাবে আত্মরক্ষা করিলেন, মরু-দস্যুর নিষ্ঠুর আক্রমণ অপরূপ কৌশলে এড়াইয়া গেলেন—তার আর হিসাব নাই। অবশেষে ৩৫০০ মাইল্ পথ অতিক্রম করিয়া একদিন তাঁর সাহারা জয় শেষ হইল। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র দু'জন অনুচর ও একটি মাত্র উট।

মরুভূমির মরীচিকা

সাহারা সম্বন্ধে প্রচুর নূতন নূতন তথ্য ও বহু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগ্রহ সঙ্গে করিয়া বিজয়ী বীর দেশে ফিরিলেন।

ঘণ্টুদাদার ঘণ্টারাব

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

ঘণ্টুদাদা আমাদের সকলের সরকারি দাদা, আমরা তো বলিই, আমাদের কাকা-দাদা বলেন, আবার আমাদের পুঁচকে ভাগ্নে-ভাগ্নীর দল পর্য্যন্ত ঐ নামেই তাঁকে ডাকে।

দাদার নামের একটু ছোটখাটো ইতিহাস আছে; তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন বাংলা দেশে সতীশ, হরিপদ, কালীচরণ প্রভৃতি নামের খুব ছড়াছড়ি। ঘণ্টুদাদার ছোট মামা ছিলেন সাহিত্যিক—সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য।

তিনি তাঁর দিদিকে আশ্বাস দিলেন, এবার ছেলের নাম তিনি রাখিবেন—একেবারে সংস্কৃত-সাহিত্য মন্থন করিয়া বাছা নাম। ভাল ভাল নামের একটা লিষ্টি হইল—যেমন, শারদ্বত, শার্ঙ্গরব, অগ্নিমিত্র, বিশাখদত্ত।

ঘণ্টুদাদার মন্বর কিন্তু এ গুলির একটিও পছন্দ হইল না, বলিলেন "ঠাকুর-দেবতার গন্ধটুকুও নেই, এ সব কী নাম কর্‌ছিস্ রে?"

ছোট মামা বলিলেন "ওঃ রামায়ণ মহাভারতের নাম চাই?"

তার পর মুখ বিটকেল করিয়া কড়িকাঠের দিকে মিনিট খানেক তাকাইয়া হঠাৎ সোল্লাসে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, পৌরাণিক নাম, অথচ বীরত্বব্যঞ্জক, পুরুষোচিত! তোমার ছেলের নাম রাখলাম ঘটোৎকচ। শ্রীঘটোৎকচ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

প্রবল আপত্তি, ঘনঘন মাথানাড়া; আপত্তিকারিণী এবং মস্তকনাড়িণী অবশ্য দাদার মাতাঠাকুরাণী। কিন্তু সমস্তই চাপা পড়িয়া গেল বাড়ীর অপর সকলের প্রবল উৎসাহে। ছোট মামা তিন বার শাঁখে ফুঁ দিয়া দাদার নূতন নাম বাড়ীময় প্রচার করিয়া দিলেন। প্রথমে সকলে ঘটোৎকচ এবং পরে সংক্ষেপ করিয়া ডাকিতে সুরু করিল ঘটু।

তার পর নাম-পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়। দাদার বয়স যখন দেড় বছর, অর্থাৎ যখন তাঁর দন্তোদ্গম এবং দন্ত ব্যবহারের ক্ষমতা লাভ হইয়াছে হঠাৎ তখন হইতে বাড়ীতে দিব্যি এক রহস্যের সৃষ্টি হইল, রোজই রান্নাঘরের হেঁসেল হইতে মাছভাজা কমিয়া যায়। রহস্যের সমাধান হইতেও বেশী দেরী হইল না, দাদার মাতাঠাকুরাণী দাদাকে স্নানের আগে তেল মাখাইতে গিয়া প্রত্যহই তাঁর মুখে ভাজা মাছের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; দাদার নামে মাছ চুরীর চার্জ্জ গঠন হইল, কিন্তু সে অপরাধ কবুল করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ। তার পর সে এক স্মরণীয় দিন—বাড়ীতে নানা জিনিষের সঙ্গে বাঁধা কপির ঘণ্ট রান্না হইতেছে, গন্ধে পাড়া মাতোয়ারা। বাড়ীর কুট্টি কাকা আগের দিন হইতে জোলাপ নিয়া বসিয়া আছেন, ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি সতেরো বার রান্নাঘরের পাশ দিয়া বিনা কারণেই হাঁটিয়া আসিলেন, স্রেফ্ শুধু গন্ধটুকু উপভোগ করিবার জন্য। আঠার বারের বার তিনি

জানালা-পথে উঁকি মারিয়া সভয়ে দেখিলেন, বাড়ীর রসুয়ে বামুন তিখটলাল তেওয়ারি সেই দেবদুর্ল্লভ কপিঘণ্টের এক বাটী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিঃশেষ করিয়া তলানে ঝোলটুকু ঘটুদাদার দুই ঠোঁটে বেশ করিয়া মাখিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। এই ব্যাপারের পর বাড়ীতে পর পর তিনটি কাণ্ড অতি সত্বর ঘটিয়া গেল—প্রথম তিখটলাল তেওয়ারি নগদ পাঁচ টাকা সাড়ে গ্যারা হানা দিয়া হাওড়া ষ্টেশনে একখানা 'টিকট' খরিদ করিলেন, দ্বিতীয়, ঘটুদাদার একটা বড় রকমের দুর্ণাম দূর হইল, তৃতীয়তঃ, কপির ঘণ্ট তাঁকে বদ্‌নামের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে বলিয়া কুট্টি কাকা তিন বার ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁর নাম ঘটু হইতে ঘণ্টুতে পরিণত করিলেন।

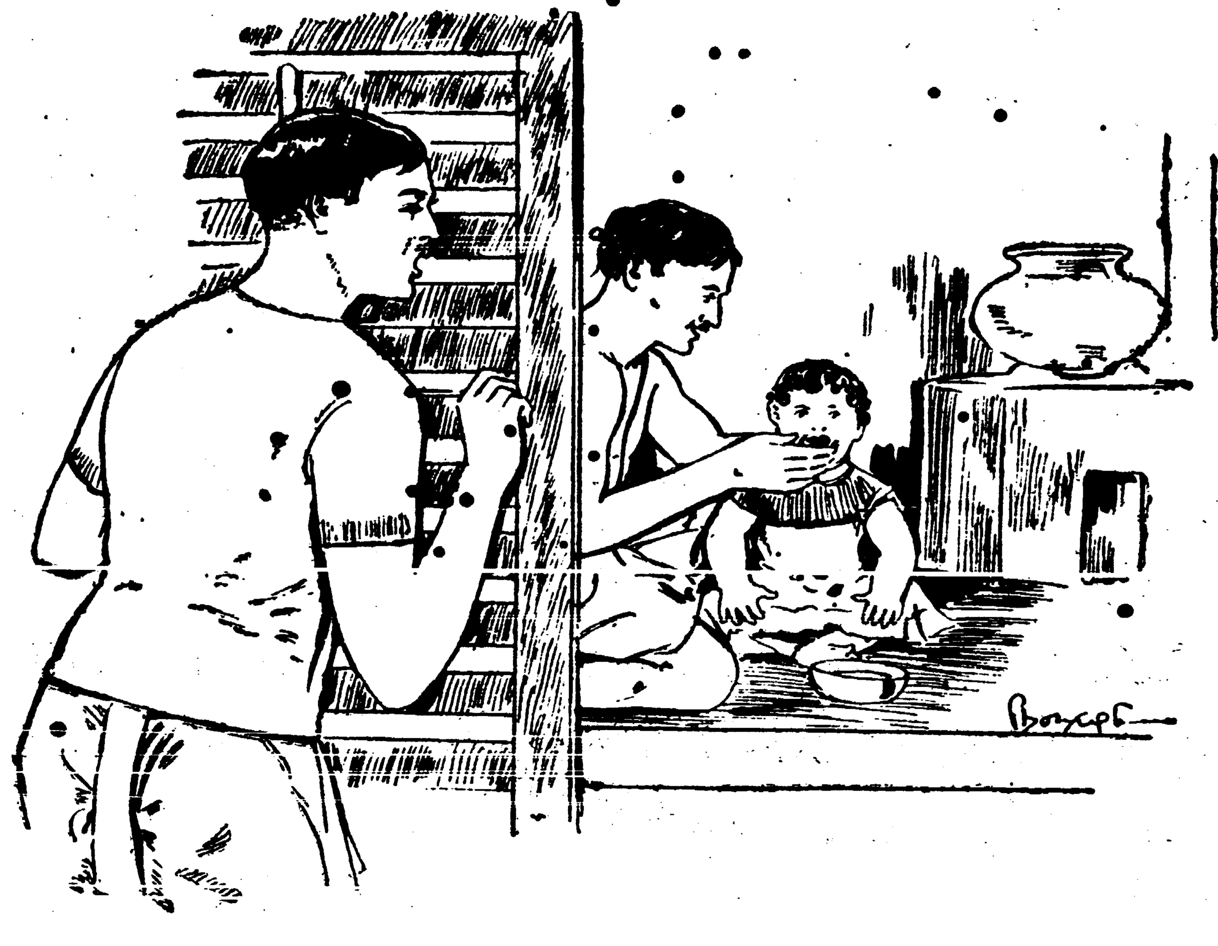

সভয়ে দেখিলেন···

এ সব ঘটনা যখন ঘটে তখন আমরা বোধ হয় আশী বছরের বৃদ্ধ, ভারত-বর্ষেই বাস করিতাম, না অন্য কোন দেশে, তাও জানিবার এখন উপায় নাই। তোমরা মনে করিতেছ আমি বুঝি হেঁয়ালি করিতেছি—মোটেই তা নয় বৎসগণ, মোটেই তা নয়। আসল কথা আমরা তখন এ জন্ম লাভই করি নাই, আর জন্মের মানুষই রহিয়া গেছি, তবে বোধ করি খুবই বুড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম। তার কিছু পরে মারা যাই এবং নতুন জন্মে আবার ছোট্টটি হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তার অনেক আগেই ঘণ্টুদাদা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আর এ সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঠাকুমার মুখেই কেবল এ সমস্ত গল্প আমরা শুনিয়াছি।

পণ্ডিত লোকেরা বলেন, নামের সঙ্গে নাকি আসল মানুষের বেশীর ভাগ সময়ই কোন মিল থাকে না। কথাটা মিথ্যা নয়; আমাদের বাড়ীর পাশের জমিদার বাবুর সহিসের নাম রাজেন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজা; কিন্তু আমরা জানি, জমিদার বাবুর কোচম্যানের হুকুমও তাকে তামিল করিতে হয়। কাজেই রাজার রাজা দাঁড়াইয়াছে আসিয়া চাকরের চাকরে। ঘণ্টুদাদার কিন্তু দু'টি নামের সঙ্গেই তাঁর স্বভাবের আশ্চর্য্য রকম মিল দেখা যায়। তাঁর মা বলেন, কি কুক্ষণেই তাঁর ছেলের উপর সকলে ঘটোৎকচ নাম চাপাইয়াছে, মুখের আর কামাই নাই, সর্ব্বক্ষণই খাই খাই। তাও নাকি আবার ডাল ভাত চচ্চড়িতে শানায় না, যত সব হিন্দুর অখাদ্য মুর্গী, চপ্-কাট্‌লেট। (এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার—বাড়ীর চাকরদের উপর ঘণ্টুদাদার কড়া হুকুম আছে, কেউ তাঁকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিতে পারিবে না, 'সাহেব' বলিতে হইবে। তারা আড়ালে বলে 'ঘণ্টা সাহেব'।)

কিন্তু ঢের ঢের বেশী মিল ছিল তাঁর স্বভাবের সঙ্গে দ্বিতীয় নামটির। দাদার কণ্ঠ-ঘণ্টা দিনরাতই শব্দ করিতেছে,—অষ্টপ্রহর, চব্বিশ ঘণ্টা—বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর, এই পোড়া বাংলা দেশে ভগবান্ তাঁকে পাঠাইয়াছেন, নতুবা এমেরিকা কিংবা বিলাতে জন্মিলে ইতিহাসে নির্ঘাৎ তাঁর নাম থাকিয়া যাইত। সেখানে কত রকমের এন্‌ডিওরেন্স্ কম্পিটিসন্—ড্যান্সিং, স্কিপিং, লাফিং, টকিং। সে সব দেশে কথা বলিয়া ঘণ্টুদাদাকে কেউই পরাস্ত করিতে পারিত না, দাদা টকিং চ্যাম্পিয়ান্ অব্ দি ওয়ার্ল্ড্ (Talking Champion of the World) হইতেন। আওয়াজটিও তাঁর জয়ঢাকের মত ভারী গলার, কাজেই হেভি ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ানই (Heavy weight champion) হইতেন, লাইট্ ওয়েট নয়।

ঘণ্টুদাদা বাড়ীতে ঢুকিলেই আমরা তন্ময় হইয়া তাঁর অপূর্ব্ব গল্প, অনর্গল বক্তৃতা শুনিয়া যাইতাম। সে কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী—কোথাকার কোন্ আম গাছে কত বড় বড় কাঁঠাল ফলিত, কোন্ সাহেব চালিয়াৎকে তিনি ক'গ্লাস ঘোল খাওয়াইয়াছিলেন—এই সব কথা। রসভঙ্গ হইত কেবল মেজদা ঘরে ঢুকিলেই। তিনি কলেজের ছাত্র, আর ভারী ঠোঁটকাটা। ঘরে ঢুকিয়াই ঘণ্টুদাদাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি ঘণ্টুদা, সকাল থেকে সুরু করে আজ কতটি হল?"

ঘণ্টুদা ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বলিতেন, "কি হল?"

"এই তোমার অতি-বাজে সব মনগড়া গল্প, যার তুমি অফুরন্ত খনি?"

ঘণ্টুদা রাগে ফাটিয়া পড়িতেন, "তুই বল্‌তে চাস্ আমার সব কথাই বাজে?"

"উঁহু, বাজে তো বলি নি, বলেছি অতি-বাজে, বাজেএষ্ট অব্ দি বাজে।"

তার পর প্রায়ই একটা ছোটখাটো ঝড় বহিয়া যাইত। ছোট কাকা আসিয়া দু'জনকে দু'দিকে সরাইয়া দিতেন।

সেদিন রবিবার, বেলা তিনটার সময় ঘণ্টুদা আসর জমাইয়া তাঁর গল্প সুরু করিয়াছেন, "বুঝ্‌লি, কাল সবে ভাত খেয়ে উঠেছি এমনি সময় ডিসুজা সাহেব এসে উপস্থিত।"

"ভাত খেয়ে কি হে, সাহেব-লোক কখনো ভাত খায়? পাঁউরুটী খেয়ে উঠেছি বল!"

মেজদার কণ্ঠস্বর! ঘণ্টুদা রোষ-কষায়িতলোচনে বার বার ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেজদা ছিলেন জানালার ও পাশে, ঘণ্টুদার নজরে আসিলেন না। ঘণ্টুদা তখন ফের গল্প আরম্ভ করিলেন "কোন্ ডিসুজা সাহেবের কথা বল্‌ছি বুঝতে পেরেছিস্ তো তোরা? সেই যে সেবার চীন-জাপান যুদ্ধে বিশ লাখ ফড়িং বেচে নগদ একটি লাখ টাকা লাভ কর্‌লে। জাপানের চারদিকেই সমুদ্র কিনা, চীনারা জাহাজ পাঠিয়ে গোটা দেশটা ঘিরে ফেল্লে ওরা খাবার পাবে কোথা? চালাক জাত, কাজেই আগে হতেই রাশি রাশি ফড়িং মজুত করে রেখেছিল। আমিও হাজার চল্লিশেক ফড়িংএর বন্দোবস্ত করেছিলাম, ঝাড়া দু'টী হাজার টাকা লাভ হত, কিন্তু..."

বাধা দিয়া ভোম্বল বলিল "দু হা-জা-র? ইঃ, অনেক টাকা তো!"

ঘণ্টুদা ধমক দিয়া বলিলেন, "তা নয় তো কি? বিশ লাখ ফড়িংএ যদি এক লাখ টাকা হয়, তবে চল্লিশ হাজার ফড়িংএ কত টাকা হবে—দু' হাজার নয়? রুল্ অব্ থ্রি কষে দেখ্ দেখি।"

চটপট্ রুল অব্-থ্রি কষিয়া দেখিলাম দু'হাজারই হয় বটে; ইউনিটারি

মেথডে কষিয়া দেখিলাম তাতেও একই ফল দাঁড়াইল। ঘণ্টুদার কথায় তখন আর অবিশ্বাস করারই উপায় থাকিল না; বলিলাম, "টাকাটা পেলে না? হাত ছাড়া হল কি করে?"

"চল্লিশ হাজার ফড়িং এর জোগাড় করে এসেছি হঠাৎ এমনি সময়..."

"রাশি রাশি ফড়িং..."

"ভোর হয়ে গেল। ঘণ্টুদাদা জেগে দেখেন সাধের স্বপ্ন ঠুং করে ভেঙ্গে গেছে।"

আবার মেজদার গলার আওয়াজ। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে তো, ঘণ্টুদা কত সহ্য করিবেন? রাগে মুখ কালো করিয়া গট্ গট্ করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন, মেজদা পেছন হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ও, ঘণ্টদা, তোমার সে সার্কাসের ঠিকানাটা একবার দিলে না, ওই যে যেখানে ঘোড়ায় সেতার বাজিয়েছিল—আমরা একবার সে সার্কাসে যাব যে! ও ঘণ্টুদা, বলি চট্‌লে নাকি?"

মেজদা গুরুজন না হইলে আমাদের সঙ্গে বোধ করি সেদিন একটা হাতাহাতিই হইয়া যাইত।

মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, কালই সকালে ঘণ্টুদাদাকে তোয়াজ করিয়া ফিরাইয়া আনিব। পৃথিবীর সমস্ত খবর দাদার কণ্ঠে, আধ ঘণ্টা বসিয়া আলাপ করিলেও পাঁচখানা খবরের কাগজ পড়ার কাজ হয়। কিন্তু পর দিন বাড়ীর ছেলে-মহলে এমনি একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হইল যে দিন কতকের জন্য ঘণ্টুদাদার কথা আমাদের মনের শ্লেট্ হইতে একদম্ মুছিয়া গেল। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

আমরা একখানা হাতে-লেখা মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিতাম্, তার নাম ছিল জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং মেজদা। ইস্কুল হইতে কলেজে প্রমোশন পাওয়ার পর হইতেই মেজদার বরাবর সখ ছিল, জ্যোৎস্নাকেও হাতে লেখা হইতে ছাপার লেখায় প্রমোশন দিবেন। কিন্তু ছাপার হরফে প্রমোশন দিতে ঝঞ্ঝাট্ অনেক; হাতের লেখা মাসিক-পত্রিকায় মাস মাস খরচ—এক দিস্তা কাগজের দাম তিন আনা, নিব-সমেত একটি কলমের দাম চার পয়সা এবং একটি কালীর পিলের দরুণ এক পয়সা; সর্ব্বসাকল্যে সওয়া চার আনা। কলম হারাইয়া না ফেলিলে এবং কালীতে একবার খরচ করিলে অনেক মাস পর্য্যন্ত চলিবারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেই তুমি ছাপার ব্যাপারে গেলে, অমনি মাসান্তে অন্ততঃ ১০০৲।১৫০টী মুদ্রার দরকার—ছবিটবি দিলে তো খরচের হিসাবই নাই। মেজদার মাথায় নানা রকমের প্ল্যান্ সর্ব্বদাই ঘুরিত, একে একে তিনি সেগুলিকে ছাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সব কটা প্ল্যান্‌ই ফেল মারিয়া কালো মুখে ঘুরিয়া আসিল। শেষে তিনি ছাড়িলেন একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র—অর্থাৎ জ্যাঠামশায় এবং বাবার কাছে দক্ষিণ হাত পাতিতে হইবে। তাঁরা দু'জনে দু'শ টাকা দিলে মেজদা কাজ আরম্ভ করিতে পারেন, আর একবার কাগজ বাজারে বাহির করিতে পারিলে টাকার জন্য কিছুই ঠেকিয়া থাকিবে না, অন্ততঃ এই রকমই মেজদার ধারণা। আমাদের দলের মধ্যে অরুণ ছিল সব চাইতে ফরওয়ার্ড্, অনেক বলা-কওয়ায় জ্যাঠামশায়ের কাছে সে গিয়া আর্জ্জি পেশ করিল। অরুণ ফিরিয়া আসিলে ভোম্বলকে বাবার কাছে পাঠান হইবে। মিনিট্ পাঁচেক পরে অরুণ যখন জ্যাঠামশায়ের ঘর হইতে বাহির হইল তখন তার মুখখানা এক ইঞ্চি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সুগৌর মুখখানা তুঁতের মত নীল

হইয়া গেছে। রুদ্ধকণ্ঠে মেজদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অরুণ, জ্যাঠামশাই কি বল্লেন ?"

"য়্যালজেব্রার বই নিয়ে আস্তে বল্লেন ; গোটা কুড়ি ইকুয়েশানের আঁক কষতে দেবেন।"

ফিরিয়া দেখি ভোম্বল গুটি-গুটি স্থান পরিত্যাগ করিতেছে।

ব্রহ্মাস্ত্র বিফলে গেল, মেজদা টলিতে টলিতে কোন মতে নিজের ঘরে গিয়া খিল লাগাইলেন, সারাদিন তাঁকে আর দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যার কিছু আগে অনেকটা যেন প্রফুল্ল মুখেই মেজদা দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "কাল নিউ ইয়ার্স্‌ডে, নাঃ রে ? দেখি কালকের দিনে শেষ চেষ্টা— একেবারে পাশুপত অস্ত্র ছেড়ে।" মেজদা তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। পাশুপত অস্ত্র ছাড়িবার পক্ষে ইংরাজী নিউ ইয়ার্স্‌ ডে টাই যে সব চেয়ে প্রশস্ত এ খবর জানিতাম না, ইংরাজী পঞ্জিকা থাকিলে দেখিয়া নিতে পারিতাম।

পয়লা জানুয়ারি, ক্রমে ২রা জানুয়ারিও চলিয়া গেল। ৩রা তারিখে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি ডাক-পিয়ন মূর্ত্তির আবির্ভাব, "উনিল বাবু বাড়ী আছেন ? তিনার নামে ওনেক মোণিওডার আছে।"

প্রায় সেই সঙ্গে-সঙ্গেই চটিজুতা ফট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অনিল বাবু অর্থাৎ মেজদা নামিয়া আসিলেন, উপর হইতে ডাক-পিওনের অবির্ভাব তিনিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমি সাগ্রহে মণি-অর্ডারের কুপনগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম—প্রায় শ'খানেক ফর্ম্ম, আর প্রত্যেক খানাতেই লেখা প্রায় এক কথা— "আপনার বঙ্গবিখ্যাত মাসিক-পত্র জ্যোৎস্নার, বার্ষিক মূল্য পাঠাইলাম। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এক বৎসর পত্রিকা সরবরাহ করিয়া বাধিত করিবেন।"

ডাক পিওন টাকা গুণিয়া দিয়া বিদায় লইল, আমি আমার বাঁ হাতে ক্রমাগত চিমটি কাটিতে লাগিলাম, উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা—সত্যিই জাগিয়া আছি, নাকি স্বপ্ন দেখিতেছি। মেজদা এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি পাশুপত অস্ত্রের মহিমা ?............ভাগ্যিস সেদিন বিকালের দিকে প্ল্যান্‌টা চট্‌ করে মাথায় এসে

গেল ? ভাব্‌লাম, ভগবান্‌ যখন সেকেণ্ডে পাঁচটি করে কথা উচ্চারণের অলৌকিক ক্ষমতা ঘণ্টু দাদাকে দিয়েছেন, একটি তিলকে যখন চ'ক্ষের নিমেষে তিনি তাল করে দিতে পারেন, তখন বৈঠকখানায় বসে এই দেবদুর্ল্লভ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেওয়া কেন ? আমাদের জ্যোৎস্নার কাজে একটু লাগালেই তো চলে ? নিউইয়ার্স্‌ ডে-তে অন্ততঃ শ'দেড়েক বাড়ীতে নিশ্চয়ই তিনি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে যাবেন, সেই সঙ্গে জ্যোৎস্নার কল্যাণে খানিকটা ঘণ্টা বাজিয়ে এলে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের কাজ হবে। ঘণ্টুদার অধিকাংশ শ্রোতাই তো তোদের দলের ? সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে চুং চাং রেস্তোরাঁতে প্রণ্‌ চাউ খাইয়ে দাদাকে খুব এক চোট তোয়াজ করা গেল। তার ফলে জ্যোৎস্নাকে বাড়িয়ে কী ঘণ্টাটাই তিনি বাজিয়ে এসেছেন দেখ্‌লি তো! এক দিনের ফলেই এক শো মণি অর্ডার ; আর দিন কতক পাঠাতে পারলে রোজ কত ভিঃ পিঃর অর্ডার আসে দেখে নিস্‌।"

ঘণ্টুদার ঘণ্টারাবের ফলে যথা সময়ে আমাদের জ্যোৎস্না ছাপার হরফে নতুন জন্ম লাভ করিল। তোমরা শুনিয়া খুসী হইবে, কাগজখানা এখনও চলিতেছে।

পৃথিবীর উদর-রহস্য

(শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্‌-এস্‌-সি)

হনূমান্‌ যখন ছোট্ট মর্কটটি সাজিয়া অশোকবনে সীতার সন্ধানে গিয়াছিল, লঙ্কার রাক্ষসকুল তখন জানিতে পারে নাই তার স্বরূপটি কি। তার পর অশোকবন ধ্বংস করিয়া সারা লঙ্কা তছ্‌নছ্‌ করিয়া যখন সে সসম্মানে ফিরিয়া আসিল তখন হইতে একটু একটু করিয়া রাক্ষসেরা তাকে চিনিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিল যে আসল হনূমানটি কি চীজ্‌!

মানুষ জন্মিয়া যেদিন প্রথম পৃথিবীকে দেখিয়াছিল সেদিন তাকে গোবেচারা, নিরুপদ্রব 'মাটির মানুষ' বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল মানুষের মতও বদ্‌লাইতে লাগিল। ক্রমশঃ দেখা গেল যে পৃথিবীটি নেহাৎ

শান্তশিষ্ট নন্, সময়ে সময়ে তিনি ক্ষেপিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যে মানুষের একেবারে প্রাণান্ত। এই ত সেদিন উত্তর বিহারের উপর দিয়া কী দারুণ দুর্দ্দিনই না গিয়াছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ মা বসুন্ধরা এমন গা নাড়া দিলেন যে বেচারা মানুষ ধনে-প্রাণে একেবারে মারা গেল। পৃথিবীর এখানে ওখানে কত জায়গায় আগ্নেয়গিরির উৎপাত ও আনুষঙ্গিক ছোটখাট ভূমিকম্প ত লাগিয়াই আছে। তার পর আরও কত ভয়ানক উলটপালট এই পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া যে চলিয়া গিয়াছে তা মনে করিতেও গা' শিহরিয়া ওঠে। ঐ যে পাহাড়ের রাজা বিরাট্ অভ্রভেদী হিমালয়,—ও নাকি সমুদ্রের তলা হইতে ঠেলিয়া অত উঁচু হইয়াছে। একবারে ভাবিয়া দেখ তাহা হইলে ওর জন্য পৃথিবীতে এক সময়ে কি হুলস্থূল কাণ্ডটাই না হইয়া গিয়াছে। একেবারে তুলমাটি উপর! কি ভাগ্যি মানুষ তখনও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। করিলে কি মুশ্‌কিলেই না পড়িত!

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ও ভাবুকেরা অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তাই তো, পৃথিবীর পেটে এমন কি রহস্য আছে যার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া এই সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া আসিতেছে। এর কি কিছু কিনারা করা যায় না?" ধন্য তাঁদের উৎসাহ, ধন্য তাঁদের জিদ্, আর সাবাস্ তাঁদের বুদ্ধি! আজ তাঁরা এক রকম ফাঁস করিয়াই দিয়াছেন পৃথিবীর উদরে কি রহস্য লুকান আছে।

কিন্তু এর জন্য খাটিতে হইয়াছে কি রকমটা একবার দেখ। পৃথিবীর ভিতরে আর কতটুকুই বা ঢোকা যায়,—এক মাইল, কি জোর দেড় মাইল, তাও মাত্র দু-একটা খনির মধ্যে। তাই পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে, দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ঠিক করিলেন পৃথিবীর উপরে মাটির ভাগ অতি সামান্য, প্রায় তুচ্ছ, আর ওটা তো পাথর ক্ষইয়াই হয়; এ ছাড়া নানা রকমের পাথরও আছে বটে, কিন্তু তাও যৎকিঞ্চিৎ। আসলে পৃথিবীর উপরের জমীটা—যেখানে আমরা বাস করি—তার সবটাই প্রায় গ্র্যানাইট্ পাথর আর তারই নানা রকম রূপান্তর দিয়া তৈরী। এই গ্র্যানাইট্ পাথরের নাম তোমরা আগে নিশ্চয়ই শুনিয়াছ—সাদাটে কি লাল্চে রং, মাঝে মাঝে কাল ফুট্‌কি দেওয়া, আর বেশী ভারী নয়। সমান মাপের

জলের চেয়ে এর ওজন আড়াই গুণের কিছু বেশী। এই গ্র্যানাইট্‌ই প্রধানতঃ যত ডাঙ্গার উপাদান।

তার পর ডাঙ্গা ছাড়িয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌রা নামিলেন জলে। সমুদ্রের তলায় কি থাকা সম্ভব তা লইয়া অনেক গবেষণা চলিল; শেষে সিদ্ধান্ত হইল, সেখানে আর গ্র্যানাইটের রাজত্ব নয়, সেখানকার রাজা ব্যাসল্ট্। এই ব্যাসল্টের পরিচয় তোমাদের একটু দেওয়া দরকার। এ গুলি জমাট কাল, মিহি দানা, গ্র্যানাইটের চেয়ে কিছু বেশী ভারী, শক্ত এবং নীরেট। পৃথিবীর যেখানে যত আগ্নেয়গিরি আছে, তাদের ভিতর হইতে যত গলিত পাথর বাহির হয়, সেই সব জমিয়াই এই ব্যাসল্ট্ জন্মায়। শুধু তাই নয়, যুগযুগান্তর আগে পৃথিবীতে আরও বিরাট্ বিরাট্ যে সব আগ্নেয়গিরি ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তারাও প্রায় সকলেই চিরকাল ঐ ব্যাসল্ট্‌ই উদ্গীরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিলেন শুধু সমুদ্রের তলেই নয়, ডাঙ্গার গ্র্যানাইট্-স্তরেরও নীচে পৃথিবীর সমস্তটাকে ঘিরিয়া নিশ্চয়ই একটা ব্যাসল্টের স্তর আছে, আর সেইটাই লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া গলিত পাথরের ডিপোর কাজ করিয়া আসিতেছে।

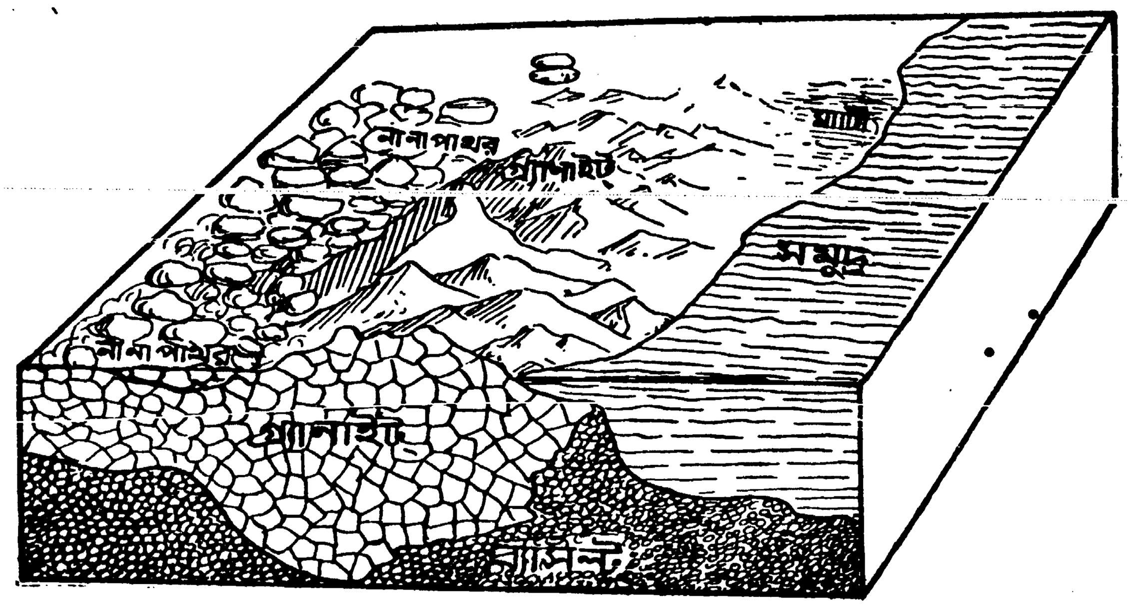

উপরের গ্রানাইটের খোলা, আর সমুদ্রের তলায় ব্যাসল্ট

এই পর্য্যন্ত ধরা-ছোঁওয়া করিবার মত বৈজ্ঞানিকেরা তবু কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যাসল্ট্-স্তরের নীচে যে কি আছে তা আবিষ্কার করিতে গিয়া বিষম গোল বাধিল।

কিন্তু তাঁরা তো আর সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নন্। তাঁরা শুনিলেন আর এক দল বৈজ্ঞানিক নাকি পৃথিবীটাকে ওজন করিয়া ফেলিয়াছেন, অবশ্য দাঁড়িপাল্লায়

ফেলিয়া নয়। অদ্ভুত সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তাঁদের মতে সমান মাপের জলের চেয়ে পৃথিবীটা নাকি প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী। শুনিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌দের আর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। তাই যদি হয়, তবে পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে যা আছে তা নিশ্চয়ই জলের প্রায় ৮।১০ গুণ ভারী কোনও জিনিষ। কেননা একটা নীরেট কাঠের বল্ আর একটা লোহা-ভরা কাঠের বল্, এ দু'টাকে শুধু হাতে ওজন করিয়াই যে বলিয়া দেওয়া যায় যে দ্বিতীয় বল্‌টা সমস্তটা কাঠের নয়, ওর ভিতরে যা আছে তা কাঠের চেয়ে অনেক ভারী।

কিন্তু ওই জলের চেয়ে আট-দশ গুণ ভারী জিনিষটা কি? তাই ত!' এবারেও তাঁরা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত জোগাড় করিলেন কয়েক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের মত। তাঁরা নাকি বলেন যে পৃথিবী আর উল্কাপিণ্ড— এদের জন্ম প্রায় একই মূল হইতে। উল্কার কথা তোমাদের আর বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। "তারা" খসিতে কে না দেখিয়াছ, আর তাদের কথা পড়িয়াছও বোধ হয় অনেকেই। এই সব উল্কাপিণ্ড নাকি তিন জাতের দেখা যায়। কতকগুলি পাথুরে, কতকগুলি একবারে ধাতব—লোহা-নিকেল আর এটা ওটা সেটা দিয়া তৈরী, আর কতকগুলি পাথর আর ধাতু মিশান। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অমনি তর্ক তুলিলেন পৃথিবীটা যদি উল্কারই জাতের হয়, এবং উল্কার মাল-মশলা যদি এই রকমই হয়—তাহা হইলে পৃথিবীর মাল-মশলাও নিশ্চয় ঐ রকমই হইবে। আর পৃথিবী যখন শুধু পাথর দিয়া তৈরীও নয় (কেননা জলের ৮।১০ গুণ ভারী পাথরের কথা কোন জন্মে কেহ শুনে নাই), কিংবা শুধু লোহা কি অন্য ধাতু দিয়াও তৈরী নয়, তখন পৃথিবীর ভিতরটা নিশ্চয়ই শুধু ধাতুর। ব্যাসল্টের খোলার নীচে পৃথিবীর মাঝখানে যে কেবল লোহা আর নিকেল আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর সত্যি, তাই হইবারই তো কথা। যখন খনি হইতে সব পাথুরে জিনিষ তুলিয়া আনিয়া সেগুলিকে কয়লা প্রভৃতি পাঁচ রকম মশলার সঙ্গে মিশাইয়া গলাইয়া ফেলা হয়, তখন তার ভিতরের লোহাটুকু নীচে গলিয়া থাকে, আর পাথুরে অংশটি সেই তরল লোহার উপর ভাসিয়া ওঠে, ঠিক দুধের উপরকার সরের মত।

বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীও নাকি এক সময়ে এই রকম তরলই ছিল।

সুতরাং ঠাণ্ডা হইয়া শক্ত হইবার সময়ে তার লোহার অংশটা যে নীচে মাঝখানে গিয়া জমিবে, আর পাথুরে অংশটা খোলস হইয়া উপরে রহিয়া যাইবে এইটাই তো স্বাভাবিক।

তাই ভূতত্ত্ববিদ্‌রা আজ বলিতেছেন পৃথিবীর ঐ বিরাট্ পেটটির মধ্যে কি আছে জান? ওর একেবারে মাঝখানে আছে শুধু লোহা আর নিকেল, সেটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ভারী পাথরে আসিয়া মিশিয়াছে। সেই ভারী পাথর আবার ক্রমশঃ হাল্কা হইতে হইতে অমনি করিয়া ব্যাসল্টে আসিয়া পরিণত হইয়াছে; আর শেষকালে ব্যাসল্টের উপর পৃথিবীর একেবারে বাহিরে আছে প্রধানতঃ গ্র্যানাইট্ পাথর। এই সব স্তরের কোন্‌টা কত পুরু তারও একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া আজ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভিতরের কি রকম একটা চেহারা খাড়া করিয়াছেন নীচের ছবিটায় তা' দেখ।

পণ্ডিতেরা এর উপর আরও কি বলিতেছেন জান? পৃথিবীর ঐ গোলগাল নাদুসনুদুস ভুঁড়িটির ভিতর যদি জোরে এক খোঁচা মারিয়া—বেশী না, এই ৭০।৮০ মাইল নীচে পর্য্যন্ত একটি ছেঁদা করিয়া দেওয়া যায়, তবে এখনি ভুড় ভুড় করিয়া রাশি রাশি গলিত পাথর বাহির হইয়া আসিতে থাকিবে। কথাটা বোধ হয় তোমাদের কাছে একেবারে গাঁজাখুরি বলিয়া মনে হইতেছে? কিন্তু মোটেই তা নয়!

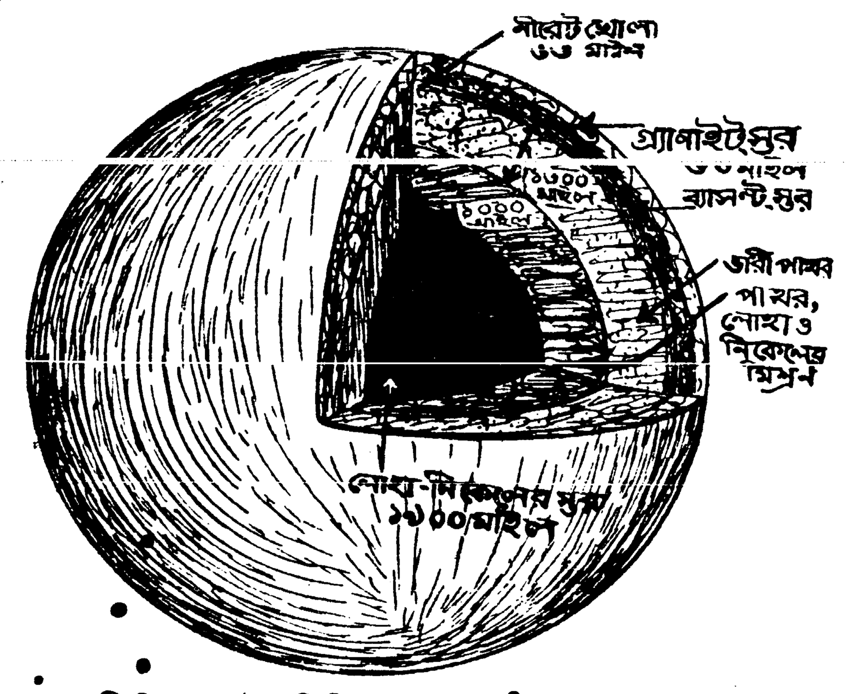

পৃথিবীর পেট চিরিয়া খানিকটা অংশ বাহির করিয়া লইতে পারিলে ভিতরটা কতকটা এই রকম দেখিতে হইত।

পৃথিবীর উপর ৩০।৪০ মাইল গ্র্যানাইটের খোলাটা একেবারে নীরেট, সত্যি সত্যি একেবারে পাথর বটে। কিন্তু উপর হইতে যতই নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর পেটের ভিতর নামিয়া যাওয়া যায় ততই অল্পে অল্পে গরম বাড়িতে থাকে, আর উপরের পাথরের ভারে নীচের জিনিষের উপর ক্রমশঃ বেশী বেশী চাপ পড়িতে

থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বেশী দূর যাইতে হইবে না, গ্র্যানাইট্-খোলার নীচে ব্যাসল্টের ভিতর ২০।২৫ মাইল দূরেই যে গরম তাতে সেখানকার ব্যাসল্টের গলিয়া যাইবার কথা। আর পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে, সেখানে লোহা-নিকেল তো বটেই, আমাদের জানাশুনা সব জিনিষই গলিয়া একেবারে ভূত হইয়া যাইবে। কাজে কাজেই পৃথিবীর ভিতরটা তরল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এদিকে যে নীচের দিকে ক্রমশঃ দেখিতে দেখিতে চাপ বাড়িয়া যাইতেছে! সে চাপে ভিতরের পাথর বল, লোহা-নিকেল বল, সমস্তকে এমন করিয়া পিষিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদের সাধ্য কি যে তাহারা তরল হইয়া যায়? মোট কথা ব্যাসল্টের ভিতর ২০।২৫ মাইল নীচু হইতে ভিতরের সমস্তটার এমন অবস্থা যে তাহা না তরল, না শক্ত। সেখানকার ভারী পাথর পাথর হইয়াও পাথরের মত কঠিন নয়, সেখানকার ধাতুও ধাতু হইয়াও ধাতুর মত কঠিন নয়। উপরের পেষণে তারা নেহাৎ নিরুপায় হইয়াই কেবল জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, তা না হইলে, একবার খোঁচাইয়া ফুটা করিয়া দিতে পারিলে আর কি রক্ষা আছে? সেই ফুটা দিয়া ভিতরের পাথর, লোহা-নিকেল সব ভুড় ভুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। তাই উপরের গ্র্যানাইটের শক্ত খোলাটা এই "হ'তে-পারতাম" তরল নীচের স্তরের উপর যেন এক রকম ভাসিয়াই আছে। আর ঠিক এই কারণেই নাকি পৃথিবীর মাঝে মাঝে মাথার ঠিক থাকে না। সে অস্থির হইয়া উঠিয়া গা নাড়া দেয়, ঠেলা দিয়া পাহাড় গড়িয়া তোলে, আগ্নেয়গিরি দিয়া ব্যাসল্ট বমি করে, ভূমিকম্পে বা (ভূঁড়িকম্পে?) মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

সুশীল—আজ সকালে উঠে কোন্ হতভাগার যে মুখ দেখেছিলুম, কামাতে গিয়ে অনেকখানি কেটে ফেল্লুম।

সুবোধ—আজ সকালে উঠে তুমি তো আর্শিতে নিজেরই মুখ দেখেছিলে!

শ্রীনবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়া লোকে

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

মানুষ কত রকমে প্রকৃতিকে জয় ক'রে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড করতে যাচ্ছে—যেমন, টেলিভিষণ, কলের মানুষ, বেতারে ছবি-পাঠান, হাউই-জাহাজ, মূর্ত্তি-ফটো, প্রভৃতি—প্রফেসার তিলকধারী সিং সে সম্বন্ধেই এক চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ ক'রে বক্তৃতা শুনছিলেন;—শেষ হ'লে অনেকেই মনে ভাবলেন, "আরো খানিকক্ষণ চল্‌লে হ'তো ভাল।"

আমিও সেই বক্তৃতা শুন্‌বার জন্য মণ্টুর সঙ্গে এডওয়ার্ড্ হলে গিয়েছিলাম। বক্তৃতা শেষ হ'লে মণ্টু বল্‌লে, "কি হে! তুমি যে একেবারে জ'মে গেলে দেখ্‌ছি। বাড়ী-টাড়ী আর যাবে না নাকি?"

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম; মণ্টুর তাড়া খেয়ে চম্‌কে বল্‌লাম, "হ্যাঁ, যা'ব বৈকি!"

ছুটিতে মণ্টুদের বাড়ীতে থাক্‌বার জন্য ক'দিন হ'লো এসেছি। আজ ৩১শে ডিসেম্বর। নিউ-ইয়ারের মজাটা দেখে দেশে ফিরে যাব। মণ্টুর সায়েন্স্ পড়ার সখ খুব বেশী;—ভাল ভাল বই আছে, বিলাতী ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক মাসিকও আছে। আমিও সেগুলো রোজ পড়ি।

প্রফেসার সিং বক্তৃতা দেবেন শুনে মণ্টু আগে থেকে আমাকে ব'লে রেখেছে, "বিজ্ঞানের যাদুর কথা যদি শুন্‌তে চাও, ভবিষ্যতের অবাক্-করা ব্যাপারের বিষয় যদি জান্‌তে চাও—সে দিনের বক্তৃতা শুন্‌তে যেতেই হবে।" বাস্তবিকই বক্তৃতা চমৎকার হ'লো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মণ্টু বল্‌ল, "আজ ভাই রাত বারোটা অবধি জেগে নিউ-ইয়ারের ব্যাপার দেখ্‌ব। শুনেছি, ঠিক ঐ সময়ে কিছু 'উইশ' কর্‌লে নাকি ইচ্ছাপূরণ হয়। দেখা যাক্ হয় কিনা। তা' ছাড়া, বারোটার সময় জাহাজের

আর কলের সিটি, পট্‌কার শব্দ, এ সব মিলে যে বিকট আওয়াজের সৃষ্টি হয়, সেও এক শোন্‌বার জিনিষ।"

আমরা দু'জনেই বিছানায় শুয়ে গল্প কর্‌ছি—রাত্ তখন প্রায় এগারটা। মণ্টু বল্‌ল, "সত্যি ভাই, প্রফেসার সিং যা' ব'লেছেন সবই সত্যি হবে এককালে।"

আমি বল্‌লাম, "এক কালে!—সবই তো সত্যি হয়ে গেছে একালেই। তবে, সে সব এখনও পরীক্ষার অবস্থায়। সে সব আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে এখনও দেরী আছে। কলের মানুষ বা 'রোবট'-এর কথা কাগজে পড় নি? তীরে ব'সে বেতারের সাহায্যে জাহাজ চালাবার কথা কাগজে পড় নি? লুথার বারব্যাঙ্কের আশ্চর্য্য আবিষ্কার—অতিকায় ফল, বীচি-হীন ফল—এ সবের কথা পড় নি? 'ঠাণ্ডা আলো'র কথা পড় নি? বাকি আর রইল কি?"

মণ্টু বল্‌ল, "কিন্তু ভাই, পাশের বাড়ীতে প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষ যে সব পরীক্ষা কর্‌ছেন সেগুলো মোটেই সুবিধার মনে হয় না। উনি নাকি অদ্ভুত রকমের সব 'পয়জন্ গ্যাস্' নিয়ে পরীক্ষা কর্‌ছেন। কুকুর, শিম্পাঞ্জি, হনুমান, এ সবের উপর নানা রকমের এক্স্‌পেরিমেণ্ট চালাচ্ছেন আর চুপিচাপি নোট লিখ্‌ছেন—কেউ সে সবের ভেতরের খবর জানে না;—বাদে তাঁর য়্যাসিষ্ট্যান্ট্ শমনদমন সিংহ। তিনিও যা' হাঁড়িমুখো! ভুলেও কা'রো সঙ্গে মেশেন না;—ও সব বিষয়ে কথা বলা তো দূরের কথা। লোকের মুখে শোনা যায়, ঐ সব গ্যাস্ নাকি মোটেই তেমন বিষাক্ত নয়; এর নাকি আশ্চর্য্য ফল আছে। কোনও গ্যাস্ শুঁক্‌লে খালি পেটেও পোলাও, মাংসের ঢেঁকুর ওঠে, কোন গ্যাস্ শুঁক্‌লে বোকারা মুহূর্ত্তের মধ্যে চালাক হয়ে যাবে, কোন গ্যাস্ শুঁক্‌লে ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখা যাবে—ইত্যাদি। সব শুদ্ধ নাকি ২৭ রকম গ্যাস্ তিনি আবিষ্কার ক'রেছেন। তার ৮।৯টা মানুষের উপর পরীক্ষা করেছেন; বাকিগুলো জন্তুর উপর পরীক্ষা করেছেন। লোকটির রকম-সকম আমার মোটে ভাল লাগে না। তার চাহনিটাও যেন কেমন-কেমন ধূর্ত্ত গোছের; মাঝে মাঝে আবার আমার জানালার দিকে লম্বা নল বাড়িয়ে দেন্—বোধ হয় গ্যাস্ ছাড়্‌বার উদ্দেশ্যে। আবার শুনেছি, ওঁর বাড়ীর পিছন দিকে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড—মাঠের মত। সেখানে তিনি নিজের তৈরী কলের মানুষ নিয়ে

নানা রকম এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ করেন। তাঁর একটা এরোপ্লেনও আছে;—তা'তে নাকি অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি লাগান আছে;—ঘণ্টায় ২০০ মাইল চলে সে এরোপ্লেন। লোকটাকে মোটেই সুবিধার মনে হয় না।"

এ কথা বল্‌তে বল্‌তে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ১২টা বাজ্‌ল আর মণ্টুও 'ঐ-ঐ' ব'লে বিছানায় উঠে বস্‌ল। তখনই শুন্‌লাম, দূরে জাহাজের সিটি, পট্‌কার আওয়াজ আর কলের 'ভঁ-অঁ-অঁ' মিলে এক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঠিক এই সময়েই পাশের বাড়ীর জানালার দিকে চোখ পড়ায় দেখলাম, একটি মোটা-গোছের লোক একটা লম্বা নল আকাশের দিকে তুলে ধরেছে আর তা'র ভিতর থেকে সুন্দর লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ আলোর ফুল্‌কি বেরিয়ে আস্‌ছে।

মণ্টু বল্‌লে, "দেখ্‌তে সুন্দর বটে কিন্তু, আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা প্রফেসার ঘোষের কোন চালাকি হবে।"

"দেখাই যাক্" ব'লে আমরা দু'জনেই উঠে জানালার দিকে গেলাম; কিন্তু আমার মাথায় যেন একটা কিসের আঘাত লাগ্‌ল আর আমি মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলাম।

মুহূর্ত্ত কাল যেন চারি দিকে সব ধোঁয়াটে মনে হ'লো।

তা'র পরেই দেখি দুটো অদ্ভুত বর্ম্মধারী লোক আমাকে কোলে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে রওয়ানা হয়েছে। দুই বাড়ীর মাঝখানে যে ফাঁক ছিল, একটা লোহার মই সেই ফাঁকে লাগান হয়েছে। বর্ম্মধারী লোক দুটি গম্ভীর চালে মইএর উপর দিয়ে আমাকে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী নিয়ে গেল। যাবার সময়ে শুধু মণ্টুদের দেওয়ালে 1935 লেখা ক্যালেণ্ডারটা একবার দেখ্‌তে পেলাম।

প্রফেসার ঘোষ তাঁর কামরায় বসেছিলেন; সেখানে লোক দুটি আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির কর্‌ল। চোখের চশমা নামিয়ে তিনি একবার আমাকে দেখে নিয়ে লোক দুটিকে ইসারা ক'রে কি যেন দেখিয়ে দিলেন; তা'রা আমাকে সোজা বাড়ীর ছাদে নিয়ে চল্‌ল। যাবার সময় কত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি, কত কল-কারখানা যে দেখ্‌লাম তা' আর কি বল্‌ব! সে সবের অর্থ আমি কিছুই বুঝ্‌লাম না।

উপরে উঠ্‌ছি তো উঠ্‌ছিই। প্রায় ৮।১০ তলা আন্দাজ উঠে ছাদে পৌঁছালাম। সেখানে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড ছাদে একটা অদ্ভুত এরোপ্লেন রয়েছে। তা'র মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিয়ে উপরে একটা কাচের ঢাক্‌নি ঢেকে দিল। আমাকে একটা অদ্ভুত পোষাক দিয়ে, একজন ধাতুর বর্ম্মধারী মেঘের মত গম্ভীর গলায় বল্‌ল, "এই পোষাক পরে নাও, তা'র পর এরোপ্লেন চালান হবে।"

লোকটির গলা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ঠিক যেন কলের মধ্যে থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে;—না আছে তা'র সরু-মোটা, না আছে তা'র কোন রকম ভাব। যা' হোক্‌, তা'র কথা মতন সেই অদ্ভুত পোষাক (অনেকটা কোট-প্যান্ট গোছের) তো প'রে নিয়ে এরোপ্লেনে বসা গেল। তখনই আরও ক'জন বর্ম্মধারী এসে আমাকে চামড়া দিয়ে শক্ত ক'রে বস্‌বার বেঞ্চের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গেল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এরোপ্লেন আকাশ-পথে বোঁ বোঁ শব্দে উড়ে চল্‌ল। আকাশে ক্রমাগতঃ উঁচু উঠ্‌তে উঠ্‌তে শেষটায় নীচের পৃথিবী আর দেখাই গেল না। এই ভাবে কতক্ষণ চ'লেছিলাম ঠিক মনে নেই—হয় তো ৪।৫ ঘণ্টা হবে—হঠাৎ দেখি এরোপ্লেন নাম্‌ছে। একেবারে এক বাড়ীর ছাদেই নাম্‌ল। সেখানে পাশাপাশি অনেক এরোপ্লেন রয়েছে। পাশেই আর একটি উঁচু ছাদ থেকে কয়েকটি লোক ইসারা ক'রে অন্য কয়েকটি এরোপ্লেনকে বিদায় দিচ্ছে। একজন এরোপ্লেনের কর্ম্মচারী এসে আমাকে বল্‌ল, "এখন আমরা শ্যামরাজ্যে এসেছি। এটি হচ্ছে আমেরিকা যাবার এরোপ্লেনের আড্ডা। কাল আমরা আমেরিকায় পৌঁছাব। ঐ লোকগুলি আমেরিকা-যাত্রীদের বিদায় দিতে এসেছে। এখানে কিছু জলযোগ ক'রে নিন্‌।"

আমি লোকটির কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না। ৪।৫ ঘণ্টায় শ্যামরাজ্যে পৌঁছেছি বল্‌লেই কি মেনে নেবো? কর্ম্মচারী লোকটি আমার দিকে চেয়ে বল্‌ল, "বিশ্বাস কর্‌ছেন না তা জানি। এরোপ্লেন চ'লেছিল ঘণ্টায় গড়ে ৫০০ মাইল—৫ ঘণ্টায় শ্যামরাজ্যে আসাটা আর আশ্চর্য্য কি? আচ্ছা, এবার খাওয়াটা সেরে নিন্‌"—ব'লেই সে ২।৩টা বাটি আর গ্লাসের জলের মধ্যে টপ্‌ টপ্‌ ২।৪টা ক'রে বড়ি ফেলে দিল;—অম্‌নি কোনটাতে 'সূপ' (Soup) হ'য়ে গেল, কোনটাতে

ঝোলের মত জিনিষ হ'য়ে গেল, কোনটাতে মণ্ডের মত জিনিষ হয়ে গেল। প্রত্যেকটির গন্ধ চমৎকার,—শুঁক্‌লেই খেতে ইচ্ছা করে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে নিতেই এক বর্ম্মধারী বাসন-পত্র একটা চোঙার মধ্যে ফেলে দিল আর সুড়ুৎ ক'রে সেগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "বাসন ওরকম ক'রে ফেলা হ'লো কেন? ভেঙে যাবে না?" সে বল্‌ল, "এ বাসন ভাঙে না"—ব'লেই একটা প্লেট হাতে নিয়ে আছ্‌ড়ে মাটিতে ফেলে দেখাল সেটাও ভাঙে না। তার পর আমার বস্‌বার বেঞ্চিটা ধরে এক টান দিতেই সেটা একটা বিছানা হয়ে গেল। বিছানার গদিটার এক কোণে একটা ছোট পাম্প্‌ লাগিয়ে দু'-চারবার পাম্প্‌ কর্‌তেই বাতাস-ভরা গদি ফুলে উঠে খুব নরম বিছানা হ'য়ে গেল। তার পর বাতাস-ভরা লম্বা লম্বা নল দিয়ে হাল্কা ক'রে আমাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে দিল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এরোপ্লেন চালা'বে কে?" কর্ম্মচারী বল্‌ল, "আমিই চালা'ব।" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আপনার বস্‌বার জায়গা কই?" কর্ম্মচারী বল্‌ল, "আমি এখানে বসেই চালা'ব—রেডিওর কল্যাণে চালকের আর সঙ্গে যেতে হয় না।" শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির। পথে কোন দুর্ঘটনা হ'লেই তো গেছি! কর্ম্মচারী কিন্তু আমার মুখ দেখেই বুঝে নিল কি ভাব্‌ছি। সে বল্‌ল, "ভয় কি? আমি তো টেলিভিষণে সবই দেখ্‌তে পাব।

এরোপ্লেনে কলের মানুষের লড়াই

টেলিফোন রয়েছে আপনার মুখের কাছেই; ইচ্ছামত আমাকে বা আমেরিকার ষ্টেশনে ফোন্ কর্‌তে পারেন; খাবার-দাবার সব পাশের ছোট্ট বাক্সে আছে। কয়েক ঘণ্টার মামলা বই তো আর নয়! তা' ছাড়া, যদি নিতান্তই কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা মনে করেন, ডান পাশের এই চাবিটা টিপ্‌লেই আপনার বেঞ্চি প্রকাণ্ড প্যারাশুটের নীচে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে মাটিতে নাম্‌বে। তখন ইচ্ছামত ফোন্ ক'রে নীচে খবর দিতেও পারেন; কাছে দশ মাইলের মধ্যে যে কোন ষ্টেশন থাকে, আপনাকে নিরাপদে নামিয়ে নেমে। সমুদ্রেও ষ্টেশন আছে। আপনার কোন ভয়ই নাই।"--কথা শেষ হ'তে না হ'তেই উপরের কাচের ঢাক্‌নি আবার বন্ধ হয়ে গেল। শুধু শুন্‌তে পেলাম কর্ম্মচারী বল্‌ল, "ঘুমিয়ে পড়ুন—আর কেন বৃথা জাগ্‌বেন?"—তার পর বোঁ বোঁ শব্দে এরোপ্লেন আবার আকাশ-পথে চল্‌ল।"

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নাই—হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আর একটা এরোপ্লেনে দুই বর্ম্মধারী কলের মানুষ ব'সে ছোট কামান ছাড়্‌ছে; ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। হঠাৎ পাশে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। আমি কানে রিসিভার লাগাতেই শুন্‌তে পেলাম, "ভয় পাবেন না; ওরা আপনাকে কিছু বল্‌বে না। দু'জনে লড়াই চলেছে। ওরা কলের মানুষ, হুকুম তামিল ছাড়া আর কিছু করে না। ঐ দূরের এরোপ্লেনকে ওরা কামানের গোলা মেরে ধ্বংস ক'রে ছাড়্‌বে।" —আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম।

এই ঘটনার আধ ঘণ্টা পরেই আমেরিকায় পৌঁছালাম। এরোপ্লেন বিরাট্ বাড়ীর ছাদে নাম্‌তেই এক কলের মানুষ এসে টক্ ক'রে কাচের ঢাক্‌নি খুলে দিল; আমিও ছাদের উপর নেমে পড়্‌লাম। তখনই সে আমাকে পাশের লিফ্‌ট্ দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল। বাড়ীর দেয়াল সব কাচের তৈরী; আলোর অভাব মোটে নাই। ১০।১২ তলা নীচে নেমে দেখ্‌লাম বিরাট্ মোটর দাঁড়িয়ে। তখনও ১৫।১৬ তলা নাম্‌তে বাকি; তাই অত উঁচুতে মোটর দেখে আমি ঘাব্‌ড়ে গেলাম। কলের মানুষ একঘেঁয়ে গলায় আমাকে বল্‌ল, "উঠ্‌তে আজ্ঞা হয়।" আমিও উঠে পড়্‌লাম।

ও মা! মোটরে ব'সে কলের মানুষ মোটর চালাচ্ছে। আমি তো ভয়ে অস্থির! কিন্তু, কে কা'র কথা শোনে? একটি বার আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই মুহূর্ত্তের মধ্যে মোটর ছেড়ে দিল আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে শত শত বিশ-ত্রিশ-তলা বাড়ী ছাড়িয়ে গিয়ে এক বিরাট্ হোটেলের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লো। সেখানে দরজা খুল্‌তেই একটি বাঙালী ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই তিনি নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, "আত্মন্তরী আমাকে ফোন্ ক'রে বল্‌ল, আপনাকে হোটেলে 'রিসীভ' কর্‌তে। ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। চলুন ঘরে।" তখনই লিফ্‌ট্-এ চড়িয়ে সন্ সন্ শব্দে আমায় ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে আমি তো অবাক্। এত বড় নামজাদা হোটেল, তার ঘর কিনা এ রকম! ঘরে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই নাই;—আছে শুধু দু' চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল। কোথায় তা'র শোবার ব্যবস্থা, কোথায় বা জিনিষপত্র রাখ্‌ব, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। একটু বাদেই দেখি, দেয়ালে ছোট ছোট অক্ষরে কি সব লেখা রয়েছে—প্রত্যেকটা লেখার নীচে একটা সুইচ্। সেগুলো একটু দেখেই সব ব্যবস্থা বুঝে নিলাম। দেয়ালের মধ্যে সব ব্যবস্থাই লুকান আছে—সুইচ্ টিপ্‌লেই হয়। একটা সুইচ্ টিপ্‌তেই চমৎকার খাট বেরিয়ে এল; একটা টিপ্‌তে কোট, টুপি রাখার আল্‌না দেখা দিল, একটা টিপ্‌তে খবরের কাগজ বেরিয়ে এল; একটা টিপ্‌তে টেলিফোন্ হাতের কাছে এসে উপস্থিত হ'লো—কত আর বল্‌ব!

খাবার জিনিষের জন্যও সুইচ্ টিপ্‌লেই হয়। ইচ্ছামত খাবার টেবিলে আনিয়ে নিয়ে খাওয়া শেষ ক'রে সুইচ্ টিপ্‌লে বাসনপত্র আপনা থেকে মিলিয়ে যায়। শীতকালে আমেরিকায় ব'সে ল্যাংড়া আম খাওয়া চলে—তা'ও যে-সে আম নয়, একটা খেলেই পেট ভরে যায়। তা'র স্বাদ যেমন সুন্দর, আঁঠিও তেমনি ছোট—আঁশের লেশমাত্র নাই। ওগুলো নাকি ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা হয়; আবশ্যকমত ঠাণ্ডা-করা-কল থেকে বের ক'রে খেতে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ থেকে রান্না খাবার রোজ আসে—পৃথিবীর চারিদিক্ থেকেই আসে; কারণ, একদিনেই সব দেশ থেকে জিনিষ আনান যায়।

সেই বাঙালী ভদ্রলোক এতক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলেন ; খেলেনও আমার সঙ্গে ব'সে। আমি এত অবাক্ হয়ে গেছি যে কথা আর সরেই না মুখে। খাবার পর একটু কথা বলার অবসর পেলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কতগুলো বর্ম্মধারী লোক দেখ্‌লাম ; অস্বাভাবিক মোটা-গলায় কথা বলে ; আপন মনে কাজকর্ম্ম ক'রে যায় ; নাক-চোখ সব ধাতুর তৈরী ; অদ্ভুত ভাবে চলা-ফিরা করে ;—এরা কি বলুন তো ?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আপনি 'নর-কল'-এর কথাও জানেন না ? এরা তো সকলেই 'নর-কল' — ইংরাজীতে যা'কে আমরা Robot (রোবট) বলি। এরাই তো এখন ঘরের কাজকর্ম্ম করে, সোল্‌জার, পুলিশ, ইত্যাদি এরাই হয়েছে আজকাল। যুদ্ধে মানুষ মরে না—এরাই মানুষের হ'য়ে যুদ্ধ করে। এরা হুকুম তামিল কর্‌তেও ওস্তাদ্।"

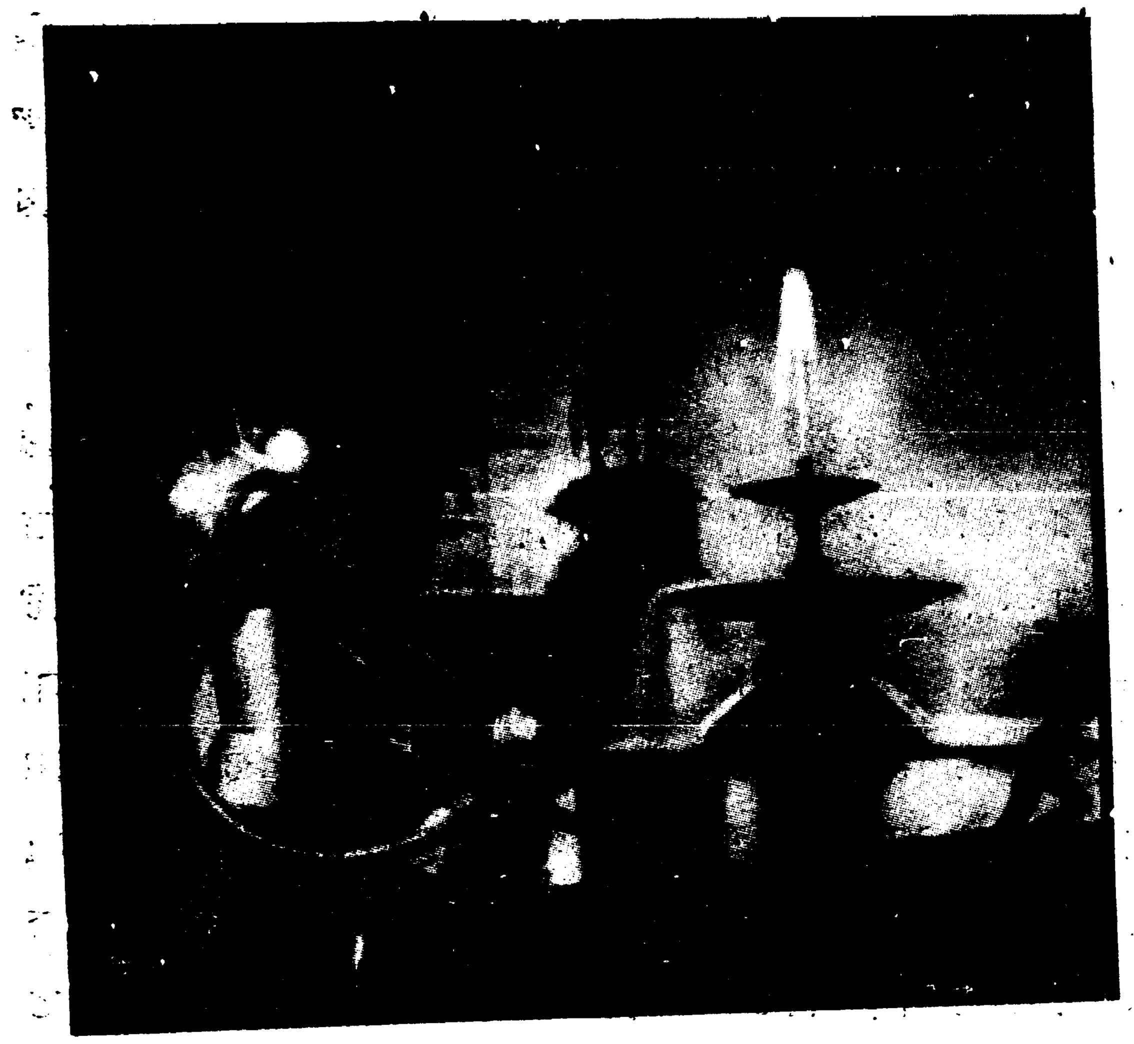

চোর 'নর-কল' ধরা পড়েছে

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "'নর-কল' তো আজকাল মোটরও চালায় দেখি ! কোন লোকজন চাপা পড়ে না বা দুর্ঘটনা হয় না এর দরুণ ?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "'নর-কল' কি কখনও ভুল কর্‌তে পারে ? এদের দ্বারা কখনও কোন য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ হয় নি, লোক চাপা পড়া তো অসম্ভব। যে রাস্তায় লোক চলাফিরা করে সে রাস্তায় কোনও গাড়ী চলে না। দশ-তলায় মোটর চলে, এগার-তলায় লোক চলে। ঐ রাস্তাই ঘুরে নীচে গেছে ; লিফ্‌ট্ দিয়েও নীচে নামা

যায়—আবার সোজা দশ বা এগার-তলা দিয়েও যাওয়া যায়। ছয়-তলার সমান উঁচুতে 'বাস্' (Bus) চলে। দোতালার রাস্তায় ভারী লরি চলে। সব বাড়ীরই এক-তলা খালি—কোনটার দোতালাও খালি। বাড়ীর একতলায় বেড়াবার আর খেল্‌বার জায়গা ; দোতালায় মোটর ইত্যাদি থাক্‌বার জায়গা। এই ব্যবস্থা হয়ে বাড়ীগুলো খুব বেশী দূর অন্তর তৈরী হ'তে পেরেছে ; খেল্‌বার জায়গারও কোন অভাব নাই। বাড়ীর মাঝের জায়গা রোদ-পোহাবার জন্য রাখা হয়েছে। তেতালায় সব রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি ; চার-তলা, পাঁচ-তলা, ছয়-তলায় আপিস, দোকান-পাট ;—তা'র উপরের তলা-গুলিতে মানুষ থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "রান্নার ধোঁয়া উপরে আসে না ?"

পুলিশ 'নর-কল' ভিড় সামলাচ্ছে।

ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে বল্‌লেন, "ধোঁয়া ! একি আগুন জ্বালিয়ে রান্না পেয়েছেন যে ধোঁয়া হবে ? কোথাও একটুও ধোঁয়া দেখ্‌তে পান্ ? রান্না তো সবই বিদ্যুতের সাহায্যে হয় !"

আমি বল্‌লাম, "দারুণ শীতে কেউ কি আগুন পোহায় না ?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আগুন পোহান তো কোন্ কালে উঠে গেছে। আপনি যে জানুয়ারীর দুরন্ত শীতে ব'সে আছেন এই ঘরের মধ্যে একটুও কি শীত বোধ হয়েছে আপনার? এরোপ্লেনে যে এলেন, একটুও কি শীত বোধ হয়েছিল? আজকাল হচ্ছে 'বাতাস গরম-ঠাণ্ডা রাখা'র যুগ—ইংরাজীতে বলে 'এয়ার্ কণ্ডিশনিং'। গরমের দিনে পাখার দরকার হয় না—শীতের দিনে আগুন জ্বালার দরকার হয় না; —সব সময়েই আরামে থাকা চলে। দারুণ শীতেও এখন রোদ পোহাবার ব্যবস্থা আছে—বেশ গরমে ব'সে পোহাবেন। সূর্য্য না থাক্‌লে নকল সূর্য্য—অর্থাৎ আলো দিয়ে সূর্য্যের নকল—আপনার গায়ে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট আলো ফেলে স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থা ক'রে দেবে।"

ভদ্রলোক আরও কত অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা বল্‌লেন—সব আমার মনেও নাই। তা'র পর বল্‌লেন, "আপনি তো আর বেশী দিন এখানে থাক্‌বেন না যে সব ব্যাপার আপনাকে দেখিয়ে আন্‌ব; আবার ফির্‌তি পথে বিলাতও তো ঘুরে আস্‌তে হবে; কাজেই, ঘরে ব'সে টেলিভিষণ যন্ত্র দিয়ে এখানকার ব্যাপার কিছু কিছু দেখিয়ে দিই।"

এ কথা বলেই ভদ্রলোক একটা সুইচ্ টিপ্‌লেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ভিতর থেকে একটি টেলিভিষণ যন্ত্র বেরিয়ে এল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যন্ত্রটি প্রস্তুত হয়ে, দেখান সুরু হ'য়ে গেল। (আগামী বারে সমাপ্য)

মা-হারা

(শ্রীনলিনী দাশগুপ্ত, এম্-এ)

মা-হারা দুইটি ভাই আর বড় বোন্
তা'দেরি হইতেছিল কথোপকথন—
"মা কোথায়?"
"ঐ খানে—"

"নীল আকাশে?"
"দূর বোকা! ঐ হোথা, চাঁদের পাশে
পাশাপাশি দু'টি তারা—ওরি ভিতরে
মা'তে আর দিদিমা'তে বসতি করে।
জানিস্?—"
"যাাঃ! তাই বুঝি? বাবা যে বলে
৺গঙ্গার কোলে চ'ড়ে মা গেছে চ'লে
কোথা যেন—কোথা যেন—"
"গোলোক-ধামে।"
"হ্যাঁ হ্যাঁ তাই! আর নাকি দেখিতে নামে
রোজ রাতে আমাদের—"
"আচ্ছা দিদি—
মা'তে আর দিদিমা'তে আকাশে যদি
থাকে তবে, 'রবারের' মই লাগিয়ে
চল্ মোরা তিনজনে দেখি না গিয়ে!"
"দূর বোকা! তা কি হয়?"
"কেন হবে না?
কত দিন দেখি নি যে!"
"যাঃ, তবে যা,
তোর মত অজবুক্ দেখি নি কভু—
'হয় না তা' বারবার বলি, তা না তবু!"

ছোট ভাই তরুণের মুখ্‌টি ভারী—
বড় ব'লে দিদি খালি বক্‌বে—ভারি!
"কত দিন দেখে নি তো! তাই তো বলে
আমারও তো—" তাপসের চোখ ছলছলে।

"আমিও তো"—বুলু কয়, "মারা গেলে আর
ফেরে না যে!—ঐ দেখ্ মা'র দিদিমা'র
পাশাপাশি দু'টি তারা আমাদেরি দিক্
চোখ মেলে হাসি হাসি চেয়ে আছে ঠিক।
নমো কর্—" তিন জনে করি' মিনতি
সে দু'টি তারার পানে করে প্রণতি।
চারি দিকে সাঁঝ নামে—নদে নামে ঢল্,
ভাইবোন্ তিনটির চোখে নামে জল।

কল্‌কাতার হাল্‌চাল্

[দ্বিতীয় ধাক্কা]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

হর্ষবর্দ্ধন এবং গোবর্দ্ধন দুই ভাই—আসামে কাঠের ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁরা কখনও কল্‌কাতা দেখেন নি। তাই দুই ভাই এসেছেন কলকাতায় বেড়াতে। কলকাতায় নেমে তাঁরা মোটরে করে শেয়ালদ' থেকে কি ভাবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছিলেন তার কথা যারা কার্ত্তিকের 'রামধনু' পড়েছ তারা জান।

সেদিনই বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয় এবার কি করা যায়? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখ্‌বার; শোন্‌বার, খাবার এবং চাপ্‌বার বস্তু রয়েছে কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কি করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হাল্‌চাল্ যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েই দুই ভাইয়ের আলোচনা চল্‌ছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন্। আসামের বিখ্যাত বর্দ্ধন এণ্ড্ বর্দ্ধন কোম্পানীর বড় দুই অংশীদার। কল্‌কাতায় এসেছেন স্ফূর্ত্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্য্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন এই ওঁদের দৃঢ়

প্রতিজ্ঞা। এজন্য কল্‌কাতার যা-কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখ্‌বেন, শুন্‌বেন, যাবেন এবং চাপ্‌বেন—সেজন্য যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওঁদের স্থির সংকল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার যো কি! টাকা এমন চীজ্ই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্দ্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখ্‌তে টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে উড়ে যায় কিনা—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারী কঠিন, হর্ষবর্দ্ধন তাঁর ভাইকে এই কথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন। "দেখ্‌লি না সকালে, আমরা দশ টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া ক'রে অম্‌নি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে প'ড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?"

গোবর্দ্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—"হুঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখ্‌ছি কঠিন!"

"বিশেষতঃ কলকাতার মত জায়গায়! এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে বেশ দু' পয়সা করা যায়। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাৎ মিথ্যে নয়।"

"ঠিক বলেছ! কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়!"

"হুঁ, হঠাৎ কোনগতিকে গরীব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে আর কি গরীব হওয়া সম্ভব?" হর্ষবর্দ্ধন উৎসুক-চিত্তে গোবর্দ্ধনকে প্রশ্ন করে।

ছোট ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বলে—"এ জন্মে তো নয়।"

হতাশ হয়ে বড় ভাই চুপ করে থাকে, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে—"তা বলে কি এম্‌নি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাক্‌তে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? কিন্তু আজ কলকাতায় এসেছি—সমস্ত দিনে মোটে দশ টাকা খরচ, সেই মোটর বাবদে! এত কম খরচ হ'লে চল্‌বে কেন? এই জন্যেই কি কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় কর্‌তে হবে না টাকা ওড়াবার? মনিব্যাগ্‌টায় দু-পাঁচ শ' যা ধরে নিয়ে নে, চল্ বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এম্‌নি নষ্ট হবে?"

হর্ষবর্দ্ধন বাবু ভ্রাতা এবং মনিব্যাগ্ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দী বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশী মাইনে দিয়ে রাখ্‌তেও তিনি প্রস্তুত, হ্যাঁ, এই মুহূর্ত্তেই। এক হাজার—দু হাজার—যা বেতন চায় নিক্।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখ্‌লেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ীর দেওয়ালে প্রকাণ্ড

বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনূমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নীচে, জাম্বুবানের বগলের মধ্যে—"কিঙ্ কঙ্—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনক্-মহলে।"

"হুঁ, যা বলেছে, এটি যে চমকপ্রদ জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই।"

গোবর্দ্ধন সায় দেয়—"খুব রোমাঞ্চকরও, কি বল দাদা?"

হর্ষবর্দ্ধন লোকটিকে ডাকে—"ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।" মই আর ময়দার বাল্‌তি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। "বেশ, বেশ ছবি তোমার। ভারী খুসী হলাম। একটা আমাদের বাড়ীর ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।"

লোকটি জানায় এ সব বায়স্কোপের পোষ্টার্, বাড়ীর ভেতরে লাগিয়ে বর্‌বাদ্ করা তার সাধ্য নয়।

হর্ষবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনকে ফিস্ ফিস্ করে বলে—"না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হোল—কি বলিস্? বেশ ছবিখানা! কত বড় হাঁ করেছে দেখ্! একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব।"

গোবর্দ্ধনও কানে কানে জবাব দেয়—"হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশী খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড় কাচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখু নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম্ বানাতে কতক্ষণ!"

হর্ষবর্দ্ধন দিল্‌দরিয়া হয়ে ওঠে—"না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক্ না কত টাকা লাগ্‌বে। কোথায় বৈঠকখানা লেন্ জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রী করে দেখাই যাক্! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে। তার পরে গোঁফ্ মুচ্‌ড়ে নেয়—"আরে হাঁদা, আসল কথাটা কি জানিস্? তোর বৌদি আস্‌বার সময় বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি নে ত, এই বিরাট্ সহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানা বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুসী হবে না কি?"

গোবর্দ্ধন গম্ভীর ভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ্ কঙের দিকে তাকায়, তুলনা ক'রে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তার পরে ঘাড় নেড়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্দ্ধন লোকটিকে ডাকে—"আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম্ কি না! তার দরকারও নেই বড়—গোব্‌রা হতভাগা তো বিয়েই করে নি। কিন্তু

কি জান, আমরা বড়লোক কি না, চিত্রকলার সমঝ্‌দার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝ্‌লে হে? যাক্, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা, যে ছবিখানা আমাদের বাড়ী লাগিয়েছ তার জন্য কত দিতে হবে তোমায়? যা চাও বল, লজ্জা কোরো না—কোন দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা"। চাপা গলায় গোবর্দ্ধনের মত নেন্—"এক শ' টাকার একখানা নোট্ ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো দেখ্? কলকাতা সহরে এসে মান-মর্য্যাদা খোয়ানো চল্‌বে না তো।"

গোবর্দ্ধন 'সেফ্ সাইডে' থাকে, বলে, "তা হলে দুখানাই দাও।"

পোষ্টার্‌ওয়ালা বোধ হয় ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—"টাকা নিতে পার্‌ব না বাবু, এই হোল আমাদের কাজ।"

দুই ভাই যে মর্ম্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—"আচ্ছা, আস্‌ছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্ছা গোছের—সান্ অব্ কঙ্।"

হর্ষবর্দ্ধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে—"বেশ বেশ। সেই ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ব্রাদার্ অব্ কঙ্-ও আন্‌তে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয় নি তো, তবে শ্রীমান্…" গোবর্দ্ধনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরে নিতে চান্।

হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য কর্‌তে অপারগ। তিনি কিঙ্ কঙ্ নিয়ে অম্লানবদনে বাড়ী ফিরবেন আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণবদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে, "আচ্ছা পুছ্‌ব কর্ত্তাদের। বোধ হয় ব্রাদার্ অব্ কঙ্‌ও বেরিয়েছে য়্যাদ্দিন।"

হর্ষবর্দ্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—"সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু।"

গোবর্দ্ধনও মনে করিয়ে দেয়—"হ্যাঁ, সেদিন আর 'না' বল্‌লে শুন্‌ছি না।"

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসু হয়—"ছবিটার মধ্যে কি সব লিখেছে পড়ে দেখ্ তো—ব্যাপারখানা কি বলে!"

গোবর্দ্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—"ধর্ম্মতলায় রাওনাক-মহলে একটা বাইশকোপ্ হচ্ছে, সেইখানে যেতে ডাক্‌ছে সবাইকে।"

"চল্ যাই সেখানে। অম্‌নি নাকি?"

"উঁহু। ঐ যে লিখেছে 'বিলম্বে আসিলে টিকিট্ পাইবেন না'। টিকিট্ লাগ্‌বে।"

"লাগুক্ না। টাকা খরচ হবে তো। বলছে যখন তখন আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই, চল্।"

"হনূমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড় নি দাদা? তাঁরই সব কীর্ত্তি-কলাপ, বুঝেছ?"

"অনেকক্ষণ। সমলৃক্ত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস্ না? কিং কং, কঙ্কং, তঙঃ কিম্—এ সবই হচ্ছে সমঁস্কৃত।"

গোবর্দ্ধন উৎসাহিত: হয়ে ওঠে—"রামায়ণ দেখ্তে আমার খুব ভালো লাগে। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হোল গিয়ে রামবাইশকোপ্! তার চেয়ে ভালো নিশ্চয়।"

"মনে আছে বই কি। সে ছিল হনূমানের লঙ্কাকাণ্ড, এ বোধ হয় জাম্বুবানের কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড-টাণ্ড হবে। ধর্ম্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর্ না কাউকে।"

"জিজ্ঞাসা করে কি হবে, ভাব্বে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক্।" গোবর্দ্ধনের মোটরে চাপার সখ কম নয়। "সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাক্ব একটাকে?"

"উঁহু, মোটরে হুস্ করে নিয়ে যায়, সহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখ্লাম তো কলকাতায় এসে করলাম কি? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখ্বি তিনতালা, কাল বিকালে আবার চারতালা—কত কি দেখ্বি, দুদিন থাক্ না, আস্তে আস্তে সব বেরুবে। ভাড়াও হবে তেমনি নিশ্চয় ডবল, তিনগুণ, চারগুণ—তা চল্লিশ কেন একশ' টাকা হোক্ না, আমরা বাপু পিছ-পা নই।"

সগর্ব্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্দ্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার্ অব্ হর্ষবর্দ্ধনকেও মোটর না চাপ্তে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হোল।

চল্তে চল্তে হর্ষবর্দ্ধনের দৈবাৎ কিসে যেন পা পড়্ল, তিনি সহসা পিছ্লে দুশ' হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছ্লে সাধারণতঃ লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীরবেগে অগ্রসর হবার সময় তাঁর ধারণা হয়েছিল হয়ত কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘট্ছে, কিন্তু অবশেষে যখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই থাক্লেন তখন তাঁর মনে হোল, এ তো বেশ মজা!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখ্তে গোবর্দ্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হোল। হর্ষবর্দ্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে একটা সামান্য কলার খোসা! এরই পিঠে চেপে তিনি একমুহূর্ত্তে এতখানি পথ অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চাপ্তব্য ব্যাপার তা হ'লে!

হর্ষবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন। "ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস্? চল্বার সুবিধার জন্য। দেখ্লি না—না-হেঁটে, না-দৌড়ে, না লাফিয়ে দুশ' হাত এগিয়ে এলাম। এক লহমায় দুশ' হাত আগানো কম কথা নয়!"

গোবর্দ্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মোটরে যেতে পারে না তাদের জন্যই বোধ হয় রেখেছে। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও! কলকাতার হাল্-চাল্ই অদ্ভুত!"

"আমার ভারী চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসা চেপেই যাব, কি বলিস্? কেন অনর্থক হেঁটে মরি? দেরিও হয় তাতে।"

"না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ!" গোবর্দ্ধন আপত্তি জানায়।

"পাগল, আমি পড়ি কখনও? কখনও পড়তে দেখেছিস্ আমায়? কোনও জন্মে?"

"আমি তা ব'লে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে।"

"সেই কথা বল্।" হর্ষবর্দ্ধন হাসতে থাকেন।

এস্প্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্দ্ধন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—"এবার কোন্ দিকে যাব? চারদিকেই তো রাস্তা!"

গোবর্দ্ধন সংশোধন করে দেয়—"উঁহু, পাঁচদিকে।"

সাম্নেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়েছিল, হর্ষবর্দ্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—"এবার একটু রকমফের করা যাক্। ঐটায় চেপে যাই খানিক।" ব'লে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হর্ষবর্দ্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারিদিক্ তাকিয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েন নি এমনি ভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—"জায়গাটার নাম কি মশাই?"

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—"ধরম্তল্লা—জান্তা নেহি?"

"ধড়াম্তলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিক হয়েছে তবে।" গোবর্দ্ধনের কৌতুহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে। "সবাই এখানে ধড়াম্ করে পড়ে যায় তাই জায়গাটার নাম ধড়াম্তলা হয়েছে, বুঝছিস্ না? পড়তেই হবে যে এখানে।"

"আর কদ্দূর বাপু তোমার জাম্বুবানের বাইশকোপ! হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল!" গোবর্দ্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে। হর্ষবর্দ্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—"আবার এদিকে খোসায় চাপাও নিরাপদ নয়।"

"এখানে এত ভিড় কিসের দাদা?"

"আরে এই যে রাওনাক-মহল! দেখ্‌ছিস্‌ না লেখা রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড় রকমের রঙ-চঙে সেঁটেছে!"

গোবর্দ্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে প্রশ্ন ক'রে বসে—"ওই ঘুল্‌ঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?"

"এখুনি টিকিট কাঁটা সুরু হবে কিনা"—লোকটি উত্তর দেয়।

"ক' টাকার টিকিট কাট্‌বে?" গোবর্দ্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

"একেবারে সব চেয়ে সামনের সীট্‌, তা য-টাকাই লাগুক্‌।" হর্ষবর্দ্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করেন। "সেবার সনাতন খুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফির্‌ল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা 'ঠ্যাটরের' সুব-আগের সীটের দাম সব চেয়ে বেশী—পাঁচ টাকা ক'রে। 'ঠ্যাটর' কি বুঝেছিস্‌?"

"না তো।"

"ঠ্যাটর হচ্ছে ঠিয়েটার—বুঝলি? খুড়ো কি মুখ্যু দেখ্‌! তবে খুড়োরই বা দোষ দেব কি? ইংরেজি উচ্চারণ কি সোজা রে দাদা!"

গোবর্দ্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—"মশাই, সব-সাম্‌নের টিকিট কোথায় দিচ্ছে?"

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—"দেখছেন না?" ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে—"ঐতো ফোর্থ্‌ ক্লাসের টিকিট-ঘর।"

হর্ষবর্দ্ধন দু'খানা দশ টাকার নোট বের ক'রে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মনিব্যাগ দেয়—"ধর্‌ এটা। টিকিট কেটে আনি। ঠিয়েটারের পাঁচ টাকা হ'লে বাইশকোপের না হয় দশ টাকাই হোক্‌! এর বেশী আর কি হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুই গে, উপায় কি? সব থেকে দামী সীটের জন্য সব চেয়ে বেশী ভিড় হবে জানা কথা।"

গোবর্দ্ধন বলে—"হুঁ। কলকাতার লোকের টাকার অভাব!"

নোট দুখানা দাঁতে চেপে দু হাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্দ্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্ত্ত পরেই টিকিট-ঘরের ঘুল্‌ঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কাণ্ড! কথা নেই, বার্ত্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠ্‌ল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন সুরু হয়ে গেল! হঠাৎ হর্ষবর্দ্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন ক'রে কুটোকে আশ্রয় করে, তেমনি ক'রে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্দ্ধন নোট দুখানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কি জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দুবার শূন্যে উঠ্‌লেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার

ঘুরপাক্‌ খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটুকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর খেয়াল হল নোট দুখানা গোলমালে কখন গিলে ফেলেছেন!

"দেখছিস্‌ গোবরা, আমার দশা! একেবারে ফর্দ্দা ফাঁই! আরো দুখানা নোট দে ত—ও দুখানা হজম হয়ে গেছে।"

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না! এই দুর্য্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে পড়েছে, কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—"একি, তোমার কাপড় কি হ'ল দাদা?"

তাই ত! এ কার কাপড় পরে আছে হর্ষবর্দ্ধন? তার ছিল লালপেড়ে ধোপ-দুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুলপাড় কাপড় তার পরনে! বিস্ময়বিমূঢ় হর্ষবর্দ্ধনের মুখ থেকে বেরয়—"ভিড়ে কখন বদ্‌লে গেছে কে জানে!"

"তবে আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা! কাপড় বদ্‌লেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদ্‌লে যায়।"

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্দ্ধন বলে—"তবে চল্‌, বাড়ী ফিরি। কি আর করব, বেশী খরচ করা গেল না আজ! সমস্ত দিনে মোটে ত্রিশ টাকা ওড়াতে পেরেছি—এই কুড়ি ধ'রে।" তার কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজে।

গোবর্দ্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে রাস্তার কোণে আর একটা কার মনিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগ্‌টা বেশ ভারী, নোটে-টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু, যাক্‌, ভগবান্‌ বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসাব করে, পাঁচ শ' যদি গিয়েই থাকে তবে সাত শ' নির্ঘাৎ ফিরে এসেছে। টাকা-কড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে, সত্যিই তবে এ কথা! গোবর্দ্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

বাড়ী ফিরে হর্ষবর্দ্ধন চায়—"দে ত ব্যাগ্‌টা।"

প্রসন্নমুখে গোবর্দ্ধন জবাব দেয়—"সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে!...দেখ্‌ছ কেমন পেট মোটা ব্যাগ্‌!...এ কি, ব্যাগের আবার হাত-পা কেন? কলকাতার হাল-চালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মনিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখ্‌ছি মোটর-চাপা-পড়া আস্ত কোলা ব্যাঙ্‌!"

হর্ষবর্দ্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—"যাক্‌, বেশ হয়েছে! পাঁচ শ' টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ।"

সোনার হরিণ

[ছোটদের ধারাবাহিক উপন্যাস]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

১

দু'খানা চিঠি

কলিকাতার কিছু দূরে গঙ্গার উপর একখানি গণ্ডগ্রাম, নাম শ্রীপুর; গ্রামখানাকে কেন্দ্র করিয়া রেলওয়ে কোম্পানী নানা দিকে অনেকগুলি শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া দিয়াছে, ষ্টিমার কোম্পানীও অনেক পয়সা খরচ করিয়া সেখানে একটা পোক্ত রকমের আড্ডা গাড়িয়াছে। এত আড়ম্বরের কারণ, বড় দরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলিয়া শ্রীপুরের প্রচুর খ্যাতি আছে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ীর বাস এই শ্রীপুর গ্রামে। এই ধনীদের মধ্যেই আবার 'ধনকুবের' বলিয়া যিনি পরিচিত তাঁর নাম দ্বারকানাথ বসু। শ্রীপুরের প্রকাণ্ড চিনির কলের তিনিই মালিক, তা ছাড়া বাংলা দেশের বহু জায়গায় বহু কারবারে তাঁর অজস্র টাকা খাটিতেছে। দ্বারকানাথের ধনদৌলৎ ও অঞ্চলে প্রবাদ-বাক্যের মত।

গঙ্গার উপর অনেকখানি জায়গা যুড়িয়া নানা রকম ফল-ফুলের বাগান, পুকুর, আর তারই মাঝখানে দ্বারকানাথের বিরাট্‌ অট্টালিকা। এই অট্টালিকারই নদীর দিক্‌কার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রৌঢ় দ্বারকানাথ খবরের কাগজ উল্টাইতেছিলেন। প্রথম জীবনে বড় বেশী পরিশ্রম করার ফলে এরই মধ্যে তাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নিত্যি নতুন অসুখের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তারদের তাই নির্দ্দেশ, তিনি যত দূর সম্ভব মানসিক পরিশ্রম, লেখাপড়া প্রভৃতি কমাইয়া গঙ্গার মুক্ত বাতাস সেবন করিবেন।

এই বয়সেও দ্বারকানাথের গায়ের রং চাঁপা ফুলের মত উজ্জ্বল, কপালটা এতখানি চওড়া যে সচরাচর সে রকম চোখে পড়ে না; মুখে কিন্তু তাঁর কোমলতার

আভাস বড় বেশী নাই, বরং একটা কঠোর—পরুষ ভাব। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়া দুই চোখের রুক্ষ দৃষ্টি যেন মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

যে বারান্দাটির উপর ইজিচেয়ারে দেহভার এলাইয়া দিয়া দ্বারকানাথ গঙ্গার শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছিলেন তারই অপর দিকে একটি একুশ-বাইশ বছরের যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। তার উপর নজর পড়িতেই দ্বারকানাথ বলিলেন, "ওহে সলিল, অহিভূষণের খবর জান?"

অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু যুবকটি কেন যেন সামান্য একটু চম্‌কাইয়া উঠিল। কোন মতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে, কি বল্‌ছেন?"

"কাল অহিভূষণ বাড়ী ফের্‌বার সময় তাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, আজ সকাল করে বেলা আটটার ট্রেণে সে যেন অবশ্য এসে পৌঁছায়, অনেকগুলো জরুরী কাজকর্ম্ম পড়ে আছে। সে এসে পৌঁছেছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। এ গাড়ীতে না এলে দশটার আগে আস্‌বার তো আর উপায় নেই!"

সামান্য একটু চাঞ্চল্য যুবকের যা দেখা দিয়াছিল, তা কাটিয়া গেল; কণ্ঠস্বরে খুব খানিকটা ঔৎসুক্য মাখাইয়া সে বলিল, "আজ্ঞে তা তো জানি না। তার অপিস্‌-ঘরে গিয়ে দেখে আস্‌ব?"

"দরকার নেই; সন্তোষকে জান্‌তে পাঠিয়েছি—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। বোধ হয় আসে নি, এলে নিশ্চয়ই খবর পেতাম।"

এখানে সামান্য একটু টীকার প্রয়োজন। ইদানীং দ্বারকানাথের শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়ায় কাজকর্ম্মের সাহায্যের জন্য মাস তিনেক হইল তিনি একজন সেক্রেটারী রাখিয়াছেন, তারই নাম অহিভূষণ। লোকটী যেম্‌নি পরিশ্রমী, তেম্‌নি বিনয়ী ও বিশ্বাসী। এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে সে দ্বারকানাথের প্রধান সহায়, ধরিতে গেলে এক রকম ডান হাতের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। তার বাড়ী কলিকাতায়, সেখান হইতেই রোজ আসা-যাওয়া করে।

সলিল চলিয়া গেল এবং তার একটু কাল পরেই সন্তোষ ফিরিয়া আসিল, বেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন মুখেই। দ্বারকানাথকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, "অহিভূষণ বাবুকে তাঁর আপিস ঘরে বা বাড়ীর অন্য কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না; তবে তিনি যে এসেছেন তা নিঃসন্দেহ, কেননা রোজই বাড়ী যাবার সময় সমস্ত খাতা-পত্তর তিনি তাঁর টেবিলের টানার ভেতর তালাবন্ধ করে রেখে যান, কাজে এসে সেগুলোকে ফের বার করেন। তাঁর অপিস-ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর অনেকগুলি খাতা খোলা অবস্থায় পড়ে—যেন কাজ সুরু করেই কোথাও উঠে গেছেন।" তার পর গলার স্বর খাটো করিয়া বলিল, "ওঁর ঘর ঝাঁট দিয়ে চাকরেরা জঞ্জালগুলো বাইরে বারান্দার এক পাশে জড় করে রেখেছিল, পরে বাইরে ফেলে দেবে বলে। হঠাৎ সেই আবর্জ্জনাস্তূপের ভেতর একখানা মুখ-খোলা খাম দেখ্‌তে পেয়ে সেটা তুলে নিয়েছিলাম। খাম খুলে দেখি ভেতরে এক অদ্ভুত চিঠি। তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝ্‌তে না পেরে চিঠিখানা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।"

দ্বারকানাথ সন্তোষের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "কই, দেখি কি চিঠি?" তার পর চশমার খুব সম্মুখে আনিয়া মনে মনে সেখানা পড়িতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন এতক্ষণ শুইয়া, চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ উত্তেজনার ঝোঁকে ইজিচেয়ারের উপর মাটান ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। অহিভূষণকে উদ্দেশ করিয়া কোন অজানা লোক পত্রখানা লিখিয়াছে, ভাষাটা এইরূপ—

"অহিভূষণ,

"এই তোমাকে শেষ সুযোগ দিতেছি। আজ দিনের মধ্যে যদি আমাদের আদেশ পালন না কর তবে, চোখ ভরিয়া পৃথিবীর আলো দেখিয়া নাও, সে আলোর সঙ্গে আজই তোমার শেষ সাক্ষাৎ। ন্যায়-অন্যায়ের বক্তৃতা অনেক দিন ধরিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু আর না। তোমার কর্ত্তব্য স্থির করার আজই শেষ দিন। ইতি—হ

"পুনশ্চ—আমাদের চিঠি-পত্র পুলিশ কিম্বা দ্বারকা বাবুর নিকট প্রকাশ না করিয়া তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। আমাদের সতর্ক চক্ষু সর্ব্বদাই তোমার উপর খরদৃষ্টি রাখিতেছে। রহস্য ব্যক্ত হইলে তোমার অদৃষ্টে কি আছে তা' তুমি ভাল করিয়াই জান, তাই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া তার আর উল্লেখ করিলাম না।" চিঠিতে ঠিক আগের দিনকার তারিখ।

দ্বারকানাথকে ঝড়-ঝাপ্‌টা জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, কোন ব্যাপারেই হঠাৎ তিনি বড় একটা আকুল হইয়া পড়েন না। কিন্তু চিঠিখানার ভাষায় এম্‌নি একটা রহস্যময় আতঙ্ক লুকানো আছে যে সেখানা পড়ার পর যে কোন লোকের পক্ষেই বোধ করি ঠিক থাকা শুধু কঠিন নয়, সুকঠিন। দ্বারকানাথ যেন অকূল সমুদ্রের মধ্যে পড়িলেন, অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

সন্তোষকে নানা ভাবে জেরা করা হইল; সে দ্বারকানাথের দুর সম্পর্কের আত্মীয়, তাঁরই চিনির কলে কাজ করে এবং ছোটবেলা হইতে তাঁরই কাছে এ বাড়ীতে মানুষ। বিশেষ কোন খবরই সে দিতে পারিল না, অহিভূষণের কাছে ইদানীং বাহিরের কোন লোক আনাগোনা করিতেছে কিনা সে খবরও সে রাখে না দেখা গেল। তবে আজ সকালে অহিভূষণ যে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেলা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে দুপুর হইল তখনও অহিভূষণের খোঁজ নাই। দ্বারকানাথ এইবার দস্তুরমত ভয় পাইয়া গেলেন,—ভীষণ একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই, নতুবা এ বাড়ীতে ঢুকিয়াও অহিভূষণ ইচ্ছা করিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেছে না, এ অসম্ভব।

অধীর দ্বারকানাথ কি করিবেন তাহাই যখন ভাবিতেছেন এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, "কল্‌কাত্তাসে অবিনাশ বাবু আয়েঁহেঁ।"

অবিনাশ বাবু দ্বারকানাথের এটর্ণী, সকল রকম বিষয়কর্ম্মে তিনিই তাঁকে পরামর্শ দেন। হঠাৎ কোন রকম খবর না দিয়া এই অসময়ে শ্রীপুরে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন খুবই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন স্বস্তির ভাবও অনুভব করিলেন,—যাক্ পরামর্শের জন্য একজন বন্ধু তো পাওয়া গেল! চাকরকে হুকুম দিলেন, "যাও, হিঁয়া পর লে আও।"

দ্বারকানাথের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কথা কহিলেন অবিনাশ বাবু,

বলিলেন, "আপনার চিঠি পেয়ে সেই সঙ্গেসঙ্গেই অহিভূষণ বাবুর কাছ থেকে রসিদ রেখে আপনার সোনার হরিণ তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি দ্বারিক বাবু।" তার পর গলার স্বর একটু নীচু করিয়া বলিলেন, "জানি অহিভূষণ বাবু আপনার পরম বিশ্বাসী, তবু হাজার হোক্ অত টাকা দামের জিনিষটা তো, দেবার পরই মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগ্ল। শেষে আর থাকতে না পেরে সটান আপনার কাছেই চলে এলাম— পেয়েছেন তো আপনার জিনিষ ঠিকমত? ও কি, আপনি অমন বিহ্বলের মত তাকাচ্ছেন কেন?"

দারুণ বিস্ময়ে দ্বারকানাথ স্তম্ভিত, অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তিনি বিহ্বলের মত বলিয়া উঠিলেন, "আমার চিঠি? অহিভূষণকে সোনার হরিণ দিতে লিখেছি! আপনি এ কি বল্ছেন অবিনাশ বাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না।"

ততোধিক বিস্মিত হইলেন অবিনাশ বাবু, বলিলেন "সে কি?" তার পর পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, "এ চিঠি কি আপনার নয়? কিন্তু নাম-সই তো স্পষ্ট আপনার?"

স্বপ্নাবিষ্টের মত দ্বারকানাথ চিঠিখানা বার তিনেক পড়িয়া দেখিলেন, তার পর বলিলেন, "আমি তো এ চিঠির বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানি না অবিনাশ বাবু। হয় আমি ঘুমের ঘোরে চিঠিতে সই দিয়েছি, আর নয় তো এ সই জাল। কিন্তু…কিন্তু জাল সই বলে তো মনে হচ্ছে না, এ সই যেন আমারই। এ কী রহস্য অবিনাশ বাবু?"

দুই হতবুদ্ধি প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিরিবিলিতে বসিয়া যখন এই ধরণের আলাপে ব্যস্ত তখন তাঁদেরই পেছনে আর একটি লোক দুই কান খাড়া করিয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গোপন রাখিয়া দু'জনার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। মুখ তার মড়ার মত বিবর্ণ, পাণ্ডুর। সে আমাদেরই পূর্ব্বপরিচিত—সলিল।* (ক্রমশঃ)

* রামধনু'র বিস্তর পাঠক-পাঠিকা আর একটি 'হুকা-কাশি'র গল্প লিখিবার জন্য রামধনু-সম্পাদককে অনুরোধ জানাইয়াছেন; তাঁদেরই অভিপ্রায়ানুযায়ী নূতন বর্ষ হইতে 'সোনার হরিণ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করার বন্দোবস্ত হইল।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(এই বিভাগে রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা বাহির হয়। লেখা যতটা সম্ভব ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।)

শিমাচলম্

(শ্রীজ্ঞানশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়)

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিয়েই খেয়াল হ'ল একটু বেড়িয়ে আসি। বাবা বল্লেন পুরী যেতে। পুরীতে দিন চার-পাঁচ কাটিয়ে ওয়ালটেয়ার যাব ঠিক ক'রলাম। ওয়ালটেয়ারের ঠিক আগেকার ষ্টেশন শিমাচলম্, জায়গাটা শুন্‌লাম বেশ ভাল। বেলা ১২টার ট্রেনে পুরী থেকে রওনা হ'লাম। পথে বালগাঁও ষ্টেশন থেকে চিল্কা হ্রদ দেখা গেল। প্রথমে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন সমুদ্র। চিল্কার ওধারে কি আছে তা প্রায় দেখা যায় না। তবে সব জায়গায় সমান চওড়া নয়। চিল্কার উপরে ছোট, বড়, মাঝারি সব রকম পাহাড় উঠেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। সেই সময়কার দৃশ্যটী দেখতে বেশ। চিল্কার পাড়েও পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে। জলের উপর পড়েছে শেষ বেলাকার রঙ্গিন্ আলো; নীল আকাশের কোলে ছোট ছোট পাখীগুলো কিচির-মিচির শব্দে উড়ে চলেছে ওপারের দেশে; ডিঙ্গিগুলো মাছ ধরা শেষ ক'রে ফিরে চলেছে বাড়ীর দিকে। কেমন সুন্দর, বুঝতেই পার্‌ছ।

রাত ৪টার সময় এসে পড়লাম শিমাচলম্। ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে জান্‌লাম, শিমাচল জায়গাটা পাহাড়ের উপরে এবং সেখানে যেতে হলে ৪ হাজার সিঁড়ি উঠে তবে যাওয়া যায়। পাহাড়টা ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে।

সকাল হ'লে দেখ্‌লাম চারিদিকে পাহাড়। সঞ্জীব বাবুর 'পালামৌ'তে পড়েছিলাম, "পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।" সেটা পড়েছিলাম বইএর পাতায়, আর এখানে এসে দেখলাম স্বচক্ষে।

শিমাচলের নীচে একটা গ্রাম আছে, সেখানে একটা দোভাষী যোগাড় ক'রলাম। কারণ তেলেগু ভাষা বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সেই লোকটা আমাকে সমস্ত হিন্দী বা ইংরাজী ক'রে বল্‌ত। তার পর অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে তবে উপরে উঠলাম। ছোট গ্রাম। সব তালপাতার ঘর, পাকা বাড়ীর মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির ও মন্দিরের দুই-একটা বাড়ী-ঘর। একটা ঝরণাকে দেখলাম বেশ কাজে লাগিয়েছে। সেই ঝরণা থেকে পাইপে ক'রে জল নিয়ে এসে কল করেছে। এই কলের জলই এখানকার লোকেরা ব্যবহার করে। ঝরণার উৎপত্তি-স্থানে স্নান ক'রে মন্দিরে ঢুক্‌লাম। শিমাচলের এই মন্দিরটী বিখ্যাত মন্দির। অনেক দূর দেশ থেকে লোকে নরসিংহদেব দর্শন ক'রতে আসে। মন্দিরটী পাথরের এবং মন্দিরের মধ্যে কারুকার্য্যও বেশ আছে। মূর্ত্তিটি রূপোয় মোড়া।

পাহাড়ের উপরে কলা ও নারিকেলের বন। ছয় ফুট গাছে আম ধরেছে অজস্র। এখানকার লোকগুলি বেশ সাদাসিধে। বাঙ্গালী এখানে মোটেই নাই, সব তেলেঙ্গি। তারা আমায় তেলেগু ভাষায় যা প্রশ্ন ক'রত তার উত্তর ছিল 'সম্‌জা নেহি।' ঐ 'সমজা নেহি'র জন্যই কয়েক দিন পরে আবার পুরী ফিরে এলাম।

শিল্পী :—শ্রীজগদানন্দ সরকার
(গ্রাঃ নং ১৫১৮)

গঙ্গার একটি দৃশ্য

বয় হিম-বায়

(কুমারী সুজাতা গুপ্তা)

ঐ ফের আজ দেখ বয় হিম-বায়,
ওগো খোকাবাবু, খুকুমণি,
তোমরা কোথায় ?

দেখ বয় হিম-বায়।
হ'তে হিমের পাহাড়
তারা এসেছে আবার
তাই কন্‌কনে বাতাসেতে
প্রাণ কেঁপে যায় ;

ওই বয় হিম-বায়।
পাখীদের নীড়ে আজ ঘুম নাহি রে,
তারা নিদ্‌-ভরা চোখ মেলে আছে চাহি রে !
আর ঘুম নাহি রে !

তারা ছেড়ে এই বাস
যাবে কোথা ? লাগে ত্রাস,
চারি দিক্ ঢেকে গেছে
ঘন কুয়াশায় ;

ওই বয় হিম-বায়।
দল বেঁধে ছেলেমেয়ে জটলা করে,
বলে, 'বড় শীত বাহিরেতে যাস্‌ না ওরে !'
তারা জটলা করে।

বয় উত্তুরে বায়,
বড় কন্‌কনে হায়,
তারা দ্বারে এসে গান গায়
পউষ-উষায় ;

ওই বয় হিম-বায়।

ঝর ঝর ঝরে ফুল ফুল-বাগিচায়,
দেখ পলকে পলকে তারা তুষারেতে নায়,
দেখ ঝুমকো-তলায়।
তাহে নাই দৃক্‌-পাত
ঘরে চারি দিক্‌ মাত,
তারা এলোমেলো ভাবে এসে
কাঁপন ধরায়;
এল হিম-ভরা বায়।

চিঠি-পত্র

এই মাঘে 'রামধনু' আট বছরে পা দিল। রামধনুর এই জন্মতিথিতে পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। —রাঃ সঃ

"গল্প-প্রতিযোগিতায় আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প পাঠিয়েছেন শ্রীবিনয়চন্দ্র গুপ্ত (গ্রাঃ নং ১৪১৮। গল্পের নাম "বিদায়"।) কাজেই তাঁকেই পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া শ্রীমতী অমিয়া রায়ের "অভাগিনী" এবং শ্রীরামপ্রসাদ সিং-এর "অভিশাপ"—এই গল্প দু'টিও বেশ ভাল হয়েছে।"

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

"আমি গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময়ে ভ্রাতৃমঙ্গল ফোঁটা পরিয়ে শ্রীঅনন্তকুমার ওহদেদারকে (গ্রাঃ ১০৫০) চিঠি দিয়েছিলাম। তিনিও আমাকে তাঁর বোন বলে চিঠি দিয়েছেন। এতে আমি খুব সুখী হয়েছি।"

—কুমারী সুজাতা গুপ্তা
(৯, গালিফ্‌ ষ্ট্রীট্‌, 'ক্যানাল ভিলা',
বাগবাজার, কলিকাতা)

"কবি শ্রীযুক্ত কাদের নওয়াজের ঠিকানা কি?"

—শ্রীশঙ্করশেখর মুখোপাধ্যায়

(ঠিকানা—সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুল্‌স্—
রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান) —রাঃ সঃ

সন্দেশ

এবার বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গেল। যে সব বাঙ্গালী বাংলা দেশের বাহিরে থাকেন এই সাহিত্য-সম্মেলন তাঁদেরই মধ্যে হয়। এবার এই সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রবাসী সাহিত্যিকেরা বঙ্গবাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনে সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও আরও অনেক উৎসব

হইয়াছিল। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

*

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম রুল পেন্সিলের চলন হয়। এ বিষয়ে সুইজারল্যাণ্ডই পথ দেখাইয়াছে।

*

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় বাঁধ হইতেছে—আমাদেরই ভারতবর্ষে সিন্ধুপ্রদেশের "সুক্কুর" বাঁধ।

*

আসামের পাহাড়ে অঞ্চলে জেলেদের মধ্যে মাছ ধরার এক রকম অদ্ভুত রীতি আছে। তারা করে কি জান? কোনও হ্রদে জল কম থাকিলে তার ধারে গিয়া শুইয়া শুইয়া অদ্ভুত এক রকম শিষ দিতে থাকে। শিষের শব্দে মুগ্ধ হইয়া এক জাতের পাহাড়ে মাছ একেবারে হ্রদের কিনারায় চলিয়া আসে, জেলেরা তখন তাদের টানিয়া তোলে।

কালিফোর্ণিয়া দেশে এক ভদ্রলোকের ব্যাঙ পোষার বাতিক আছে। তাঁর এলাকায় বড় বড় পুকুর ভর্ত্তি ব্যাঙ কিল্‌বিল্‌ করে। অবশ্য, এই ব্যাঙ পোষায় ভদ্রলোকের যথেষ্ট স্বার্থ আছে—তিনি এই ব্যাঙের ব্যবসা করেন। ফরাসীরা ব্যাঙ খায় তোমরা জান; আমেরিকায়ও আজকাল অনেকে এই সুখাদ্য জিনিষটি খাইতে সুরু করিয়াছে। কাজেই সেখানে এখন ব্যাঙের বেশ চাহিদা। —রাঃ সঃ

*

আজকাল কাঠবিড়ালীর ব্যবসা বিলাতে একটা বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরে গড়ে কাঠবিড়ালীর চামড়া আর লেজই বিক্রী হচ্ছে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ। শিয়ালের ব্যবসাও কম যায় না—প্রতি বছর অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ শিয়ালের চামড়া বিক্রী হয়।

*

কুমারী এভেলিন্‌ একজন বড় কীটতত্ত্ববিদ্‌। তিনি বলেন তিনি এক জাতের ফড়িং দেখেছেন তাদের গলা এত লম্বা যে তারা ঘাড় বেঁকিয়ে পেছন দিকে তাকাতে পারে।

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

(১) খেয়াল—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত
(২) আজব দেশে অমলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
(৩) অর্ঘ্য (হাতে লেখা মাসিক) শ্রীঅনাদিকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শীঘ্রই ইহাদের সমালোচনা বাহির হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বাতাস যাতে ফুলগুলির গন্ধ উড়িয়ে না নিতে পারে সে জন্য বাতাসকে ভয় দেখাবার জন্য মেয়েটি সাপ এঁকেছিল—কারণ সাপ বায়ুভুক্। সূর্য্য যাতে ফুলগুলি তার তেজে না শুকিয়ে ফেলতে পারে তাই সূর্য্যকে ভয় দেখাবার জন্য হনুমান আঁকা হয়েছিল—কারণ হনুমান্ একবার সূর্য্যকে বগলদাবা করে জব্দ করেছিল। মদন যাতে তাঁর ফুলের ধনুকের জন্য ঐ ফুল চুরি করতে না পারেন তাই তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য মহাদেব আঁকা হয়েছিল—কারণ মহাদেব একবার মদনকে ভস্ম করেছিলেন। (ধাঁধার উত্তর কেউই দিতে পারেন নি।)

নুতন ধাঁধা

শব্দ চৌকী (তিন অক্ষরের)

তিন অক্ষরের তিনটি শব্দকে এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যে পাশাপাশি পড়িলে যা হয় উপর নীচে পড়িলেও তাহাই হইবে। যেমন ধর, ধাঁধা আছে—

তিন অক্ষরের চৌকী	(১) ফল বিশেষ	ইহার উত্তর হইবে	ক	ম	লা
	(২) রাজহাঁস		ম	রা	ল
	(৩) লোভ		লা	ল	সা

এই ভাবে চেষ্টা কর তো :—

ক

(১) ফুলের রেণু
(২) একজন পৃথিবীবিখ্যাত লোকের পুত্র
(৩) ভুল

খ

(১) অচল
(২) একজন বিখ্যাত মুনি
(৩) স্ত্রীলোক

গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
(১) মনোহর	(১) আগুন	(১) ব্যোম	(১) কাঁঠাল	(১) সর্ব্বদা
(২) নানা	(২) বোনা	(২) আওয়াজ	(২) চক্ষু	(২) কৃশতা
(৩) কৃত্রিম	(৩) সোনা	(৩) একটি নিকট আত্মীয়া	(৩) দলিল	(৩) বৃক্ষ বিশেষ

ঝড়ের পরে

শিল্পী—শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৮ম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪১ { ২য় সংখ্যা

মোদের গাঁয়ের নদী

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

মোদের গাঁয়ের ছোট নদী যায় সে এঁকে বেঁকে—
গাইছে সে গান এনেছে যা দূর পাহাড়ের থেকে ;
নীল আকাশে চোখটী তুলে
ঢেউয়ের দোলায় উঠ্ছে দুলে,
তেঁতুল-বনের ছায়াখানি ফেল্ছে তারে ঢেকে,
চপল মেয়ে গাঁয়ের নদী চল্ছে এঁকে বেঁকে।

ওপারে তার শরের বনে ফড়িং বেড়ায় উড়ে,
এপারে বন উঠ্ছে মেতে ভোরের পাখীর সুরে ;

দুধের বরণ বলাকা সে
আজ্‌কে আসে দূর প্রবাসে,
বাঁকের কাছে আখের ক্ষেতে হংস বেড়ায় ঘুরে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপছে নদী ভোরের পাখীর সুরে।

মোদের গাঁয়ের ছোট নদী মোদের ভালবাসে—
মোদের সাথে কতই খেলে সর্ষে ক্ষেতের পাশে।
বটের শাখা জলের কোলে
যে বাঁকে তার পড়ছে ঢ'লে
বুড়ো শিবের ঘাটে যেথায় খেয়ার ডিঙা ভাসে—
গাঁয়ের যত ছেলেরা সব খেল্‌তে সেথায় আসে।

আষাঢ়-ভোরে মেঘরা ওড়ে—আসে আকাশ-তলে,
নতুন মেঘের ছায়া নাচে, মায়া রচে জলে,
ঝর ঝরিয়ে বৃষ্টি ঝরে
পাড়-দোলানো ঢেউয়ের পরে,
শরৎ-দিনে দু'পাড়ে তার কাশের হাসি ঝলে,
আঁকাবাঁকায় বাজিয়ে নূপুর মোদের নদী চলে।

মায়ালোকে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী)

প্রথম দেখালেন,—বাজারের দৃশ্য। চমৎকার বাঁধান তাকের উপর সারি সারি তরকারি সাজান রয়েছে। এক একটা টোমাটো ঠিক তরমুজের মত

বড়; কমলা লেবু বাতাবি লেবুর মত বড়; ভুট্টা যেন এক একটি লাউ, ভিতরে নাকি শাঁস নাই, সবই বীচি; ফলের তো কথাই নাই। একটিও জিনিষ দাগী নয়, একটিও পচা নয়। খাবার থেকে ভিটামিনের অংশ আলাদা ক'রে নিয়ে সেগুলিও শিশিতে ভর্ত্তি ক'রে বিক্রী হচ্ছে। মাছ-মাংস বিশেষ কিছুই নাই—সবই নাকি এখন কৃত্রিম; অর্থাৎ, মাছ এবং মাংসের মত জিনিষ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়ে বিক্রী হচ্ছে;—জীবহত্যার আর দরকার হয় না। সব খাবারই স্বচ্ছ কাগজে মোড়া; কোনও জিনিষ হাত দিয়ে ছোঁয়া হয় না। রাস্তাঘাটে ধুলা নাই ব'লে কোনও জিনিষে ধুলা পড়ে না; পোকামাকড়, মাছি ইত্যাদি জন্মাবার জায়গাই নাই, তা' মাছি, পোকা আস্‌বে কোথা থেকে?

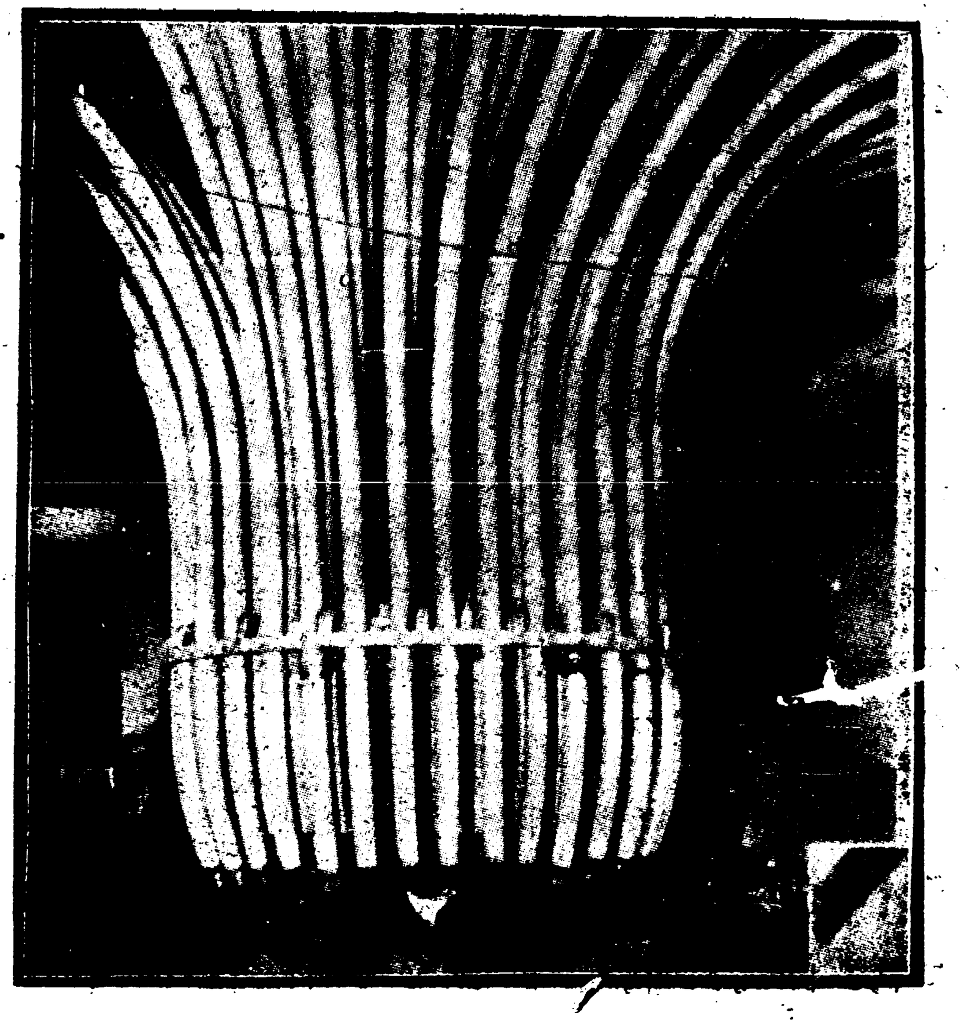

রান্নার জায়গায় দেখ্‌লাম চোঙার মধ্যে দিয়ে খাবার চালানের ব্যবস্থা

এর পর দেখ্‌লাম খেলার জায়গা। সব বাড়ীর একতলাটা চারিদিকে ফাঁকা; সেগুলিই হচ্ছে খেলার জায়গা। ছোটদের জন্য নানা রকম খেলার জিনিষ, বড়দের জন্য জিম্‌নাষ্টিকের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। বড় বড় দু'চারটা বাড়ীর মাঝে ফাঁকা জায়গায় ফুটবল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা আছে। গরীব লোকেরা খেলার জায়গায় গিয়ে খেলা দেখে; বড়লোকেরা ঘরে ব'সে টেলিভিষণে খেলা দেখে। ঘরে ব'সে চেঁচালে মাঠের ধারে লাউড স্পীকারে শোনা যায়; আবার মাঠের চীৎকারও টেলিভিষণ যন্ত্রের সঙ্গে শোনা যাবার ব্যবস্থা আছে (রেডিওতে)। রাত্রেও দিনের মত খেলার ব্যবস্থা আছে। উপরে অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল আলো আছে; তার আলোয় খেলার জায়গা ঠিক সূর্য্যের আলোর মত আলোকিত হয়।

এর পর দেখ্‌লাম রান্নার জায়গা। এখানে আর প্রত্যেক বাড়ীর রান্নার ব্যবস্থা আলাদা নয়। এক একটি বিরাট্ রান্নাঘরে ১০।১৫ হাজার লোকের রান্নার ব্যবস্থা আছে। 'নর-কল' তরকারি কাটে, বাসন ধোয়, ব্যবস্থা করে। মানুষে রান্না করে, খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক বাড়ীতে এক একটি 'রান্না-জিনিষ-সরবরাহ-করা ঘর' আছে। বিরাট্ রান্নাঘর থেকে সেই বাড়ীর রান্না জিনিষ সেখানে আসে। সেখান থেকে ঘরে ঘরে চোঙার মধ্যে দিয়ে বাসন-শুদ্ধ রান্না চালান দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বাসনপত্র সবই এমন জিনিষের তৈরী যে প'ড়ে গেলেও ভাঙে না। বাসন নোংরা থাক্‌লে আপনা থেকে কলের সিটি বেজে ওঠে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "ধোপার ব্যবস্থা কি রকম তা' তো দেখালেন না ?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ধোপার ব্যাপারটা তো আজকাল উঠে গেছে বল্‌লেই হয়। রাস্তাঘাটে ধুলো নাই, আসবাবপত্রে ধুলো নাই, কাদা নাই, কাপড় আজকাল 'আভাঁজা', অর্থাৎ ভাঁজ প'ড়ে নষ্ট হয় না। স্নানের পর গরম হাওয়ায় গা শুখাবার ব্যবস্থা, বাসনপত্র গরম হাওয়ায় শুখাবার ব্যবস্থা, কাজেই তোয়ালের ব্যবহারও প্রায় উঠে গেছে বল্‌লেই হয়। ধোপারা কালে-ভদ্রে দু'-চারটা কাপড় কাচে। আজকাল কাপড় ময়লা বোধ হ'লে শুধু জলে ধুয়ে গরম হাওয়ায় বা রোদে শুখিয়ে নিলেই হ'লো।"

আমি এর পর হাসপাতাল দেখ্‌তে চাইলাম। ভদ্রলোক বল্‌লেন, "হাসপাতালও প্রায় উঠে গেছে। বড় বড় ডাক্তারদের নিজের বাড়ীতে হাসপাতাল আছে। রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা কর্‌তে তাঁরা বাধ্য। যত দিন লোক সুস্থ থাকে ততদিনই তাঁরা টাকা পান। অসুস্থ হ'লেই তাঁরা রোগীকে চিকিৎসা ক'রে সারান। ততদিন কোন টাকা পান্ না। ঘন ঘন অসুখ কর্‌লে সরকার থেকে ডাক্তারকে জরিমানা করা হয়। অবশ্য, দুর্ঘটনায় লোক জখম হ'লে তা'র চিকিৎসার ব্যবস্থা আলাদা আছেই।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "মোটর, এরোপ্লেন ইত্যাদির এত উন্নতি হওয়ায় রেল নিশ্চয় উঠে গেছে ?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "গরীব লোকদের জন্য আর মাল সরবরাহের জন্য এখনও রেল আছে। সে রেলও আধুনিক যুগের উপযুক্ত।" —এ কথা বলেই টেলিভিষণে দেখালেন, অদ্ভুত ডানাওয়ালা রেল বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চ'লেছে। বেশী জোরে গতি হ'লে এ রেল মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে উঠে শূন্যে চল্‌তে থাকে—উড়ে চলে বল্‌লেই হয়। ঘণ্টায় এর গতি ২০০ মাইল।

হঠাৎ ভদ্রলোক টেলিভিষণের কলের একটা চাবি ঘুরিয়ে বল্‌লেন, "এবার দেখুন, ক্যাল্‌কাটা গ্রাউণ্ডে ক্রিকেট ম্যাচ্ হচ্ছে।" দেখ্‌লাম, ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড

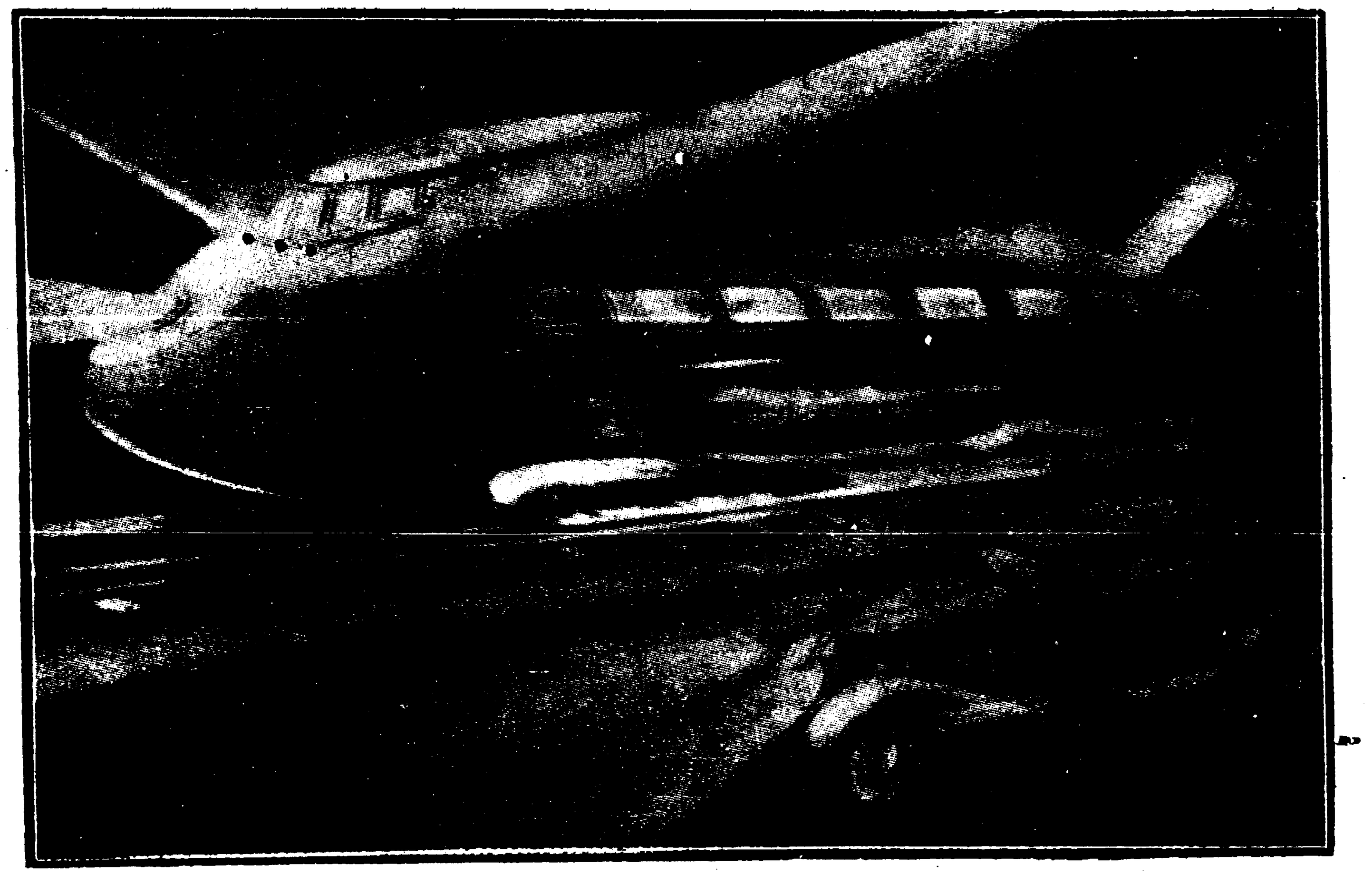

টেলিভিষণে দেখালেন—ডানাওয়ালা রেল বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; মাঝখানে ম্যাচ্ হচ্ছে; বাঙালী একটা টিম ফিল্ডিং কর্‌ছে। হঠাৎ 'হাউ'স্ দ্যাট্' আওয়াজও শোনা গেল। তখনই ভদ্রলোক চট্ ক'রে আবার চাবি টিপে বল্‌লেন, 'এবার দেখুন, অষ্ট্রেলিয়া ভার্সাস্ সাউথ্ আফ্রিকা।' তখন দেখ্‌লাম অষ্ট্রেলিয়ায় খেলা হচ্ছে। হিট্ ক'রে বাউণ্ডারি করার আওয়াজ শোনা গেল, দর্শকদের চীৎকারও স্পষ্ট শোনা গেল।

এই সময় হঠাৎ একটা 'নর-কল' এসে হেঁড়ে-গলায় বল্‌ল, "প্লেন তৈরী"—অম্‌নি ভদ্রলোক আমাকে বল্‌লেন, "এবার তা' হ'লে উঠুন; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স,

জার্ম্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, রুষিয়া, ইটালি, এ সব দেশে একটা চক্কর দিয়ে তিন দিন বাদে দেশে ফেরা যাবে ;—কি বলুন ?"

আমি বল্‌লাম, "দোহাই আপনার! 'মর-কল' যেন এরোপ্লেন না চালায় কিংবা ঘরে ব'সে রেডিওর সাহায্যে যেন এরোপ্লেন না চালান হয় ;—তা' হ'লে আমি যাবই না।"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "না ; এবার আমিই চালা'ব। আমাকেও এখন দেশে ফির্‌তে হবে।"

এ কথা ব'লেই তিনি উঠে পড়্‌লেন ; আমিও উঠে পড়্‌লাম। লিফ্‌ট্‌এ চ'ড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাড়ীর প্রকাণ্ড ছাদে উঠে এরোপ্লেন তৈরী রয়েছে দেখ্‌লাম। এর ভিতরের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। বিছানাপত্র খুবই আরামের ; বস্‌বার ব্যবস্থাও চমৎকার। দু'পাশে ছোট বারান্দা আছে ; ইচ্ছামত একটু পায়চারিও করা যায়। সবই কিন্তু কাচ দিয়ে ঘেরা। জমির সঙ্গে টেলিফোনের—অর্থাৎ, রেডিওফোনের ব্যবস্থা আছে ; খাবার-দাবার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে ; রেডিওতে গান শোনা যাবে, দুনিয়ার খবর পাওয়া যাবে ; টেলিভিষণ যন্ত্রে টকি দেখা যাবে ; দূরবীণের সাহায্যে নীচের দেশের দৃশ্য অনেক বড় আকারে দেখা যাবে ;—আরো কত কি ব্যবস্থা আছে। এরোপ্লেনের চল্‌তি অবস্থায় চালক ইচ্ছা কর্‌লে এরোপ্লেনের যন্ত্রপাতি ছেড়ে কিছুক্ষণ অন্য কাজ কর্‌তে পারে—কোন দুর্ঘটনার ভয় থাক্‌বে না। শূন্য পথে চলার সময়ে নিতান্ত আনাড়িও এরোপ্লেনকে ঠিক রাখ্‌তে পারে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এরোপ্লেন হু হু শব্দে চল্‌তে লাগ্‌ল ; আমেরিকা শূন্যে মিলিয়ে গেল। বেলা তখন ৩টা। ভদ্রলোক তখন বল্‌লেন, "এবার খেয়ে নেওয়া যাক্‌।" পাশে একটা ছোট আলমারীতে খাবার ছিল ; দু'জন খেয়ে নিলাম। কি চমৎকার রান্না! তখনও সব গরম রয়েছে। খাবার পর ভদ্রলোক বল্‌লেন, "এবার আপনি চালান্‌। শুধু এই কাঁটার দিকে নজর রাখ্‌বেন। কাঁটা বাঁ দিকে হেল্‌লে এই হাতলটা একটু ডান দিকে ঠেলে কাঁটাকে সোজা কর্‌বেন ; ডান দিকে কাঁটা হেল্‌লে বাঁ দিকে হাতল ঠেলে কাঁটা সোজা কর্‌বেন।"

ভদ্রলোক শু'তে গেলেন আর মুহূর্ত্তের মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমা'তে লাগ্‌লেন। আমার কিন্তু মনে মনে একটু ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে দেখি, আমরা ঘণ্টায় ৪৫০ মাইল বেগে চলেছি ; বাইরের তাপ তখন শূন্যেরও নীচে ; বাতাসের চাপও খুব কম ; তখন আমরা প্রায় ১০ মাইল উঁচুতে। আমার তো দস্তুর মতন ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। এত বেগে, এত ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে এত উঁচুতে এরোপ্লেন চ'লেছে—যদি কিছু এদিক্‌-ওদিক্‌ হয় তা' হ'লেই দফা ঠাণ্ডা! এ কথা বল্‌তে বল্‌তেই সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন দেখ্‌তে পেলাম। মনে হ'লো সেটা যেন নাক-বরাবর আমাদের দিকেই আস্‌ছে। আমাদের এরোপ্লেন যে রকম বেগে চল্‌ছিল, আর অল্পক্ষণ পরেই তো দুটোতে ঠোকাঠুকি হবে আর দুটোই চূরমার হয়ে যাবে—অন্ততঃ আমাদেরটা হবে।

হতভম্ব হ'য়ে আমি ভদ্রলোককে ঠেল্‌তে লাগ্‌লাম ; তিনি আর ওঠেনই না। ও মা! হঠাৎ আমাদের এরোপ্লেনটা চট্‌ ক'রে যেন ল্যাজ উঁচু ক'রে টুপ্‌ ক'রে ডুব দিল আর সেই বিরাট্‌ এরোপ্লেনটা মাথার উপর দিয়ে হুস্‌ ক'রে উড়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। তখনই আমার মনে হ'লো সেই কাঁটার কথা। চেয়ে দেখি কাঁটা ডান দিকে অনেকখানি হেলে গেছে। তাড়াতাড়ি হাতলটা বাঁ দিকে ঠেল্‌তেই কাঁটা আবার সোজা হ'লো—এরোপ্লেনও সোজা হ'লো। আমার শরীর ক্লান্ত হয়েছিল কিন্তু ভয়ে ঘুমই হ'লো না। নজর কেবল ঐ কাঁটার দিকে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকাল হয়ে গেল ; কিন্তু ভদ্রলোকের ঘুম আর ভাঙেই না। আমিও পড়্‌লাম মুস্কিলে। দূরবীণ দিয়ে দেখ্‌লাম, ডাঙার উপরেই চ'লেছি ; আটলান্টিক মহাসাগর পার হ'য়ে গেছি। তখন অনেকটা সাহস হ'লো। অনেক ঠেলেঠুলে ভদ্রলোককে জাগালাম্‌। তিনি উঠেই হিসাব ক'রে বল্‌লেন, আমরা একটু দক্ষিণ ঘেঁসে আসায় একেবারে ফ্রান্সের উপর এসে পড়েছি। তখনই এরোপ্লেনের বেগ কমিয়ে নাম্‌বার ব্যবস্থা করা হ'লো।

নাম্‌বার আগে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আত্মন্তরীকে একবার পৌঁছ-খবর পর্য্যন্ত দিই নি।" এ কথা ব'লেই তিনি দু'চারটে চাবি টিপে, ফোন কর্‌তে আরম্ভ

কর্‌লেন। দু'মিনিট ফোন করার পর ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আত্মম্ভরী তো চ'টে লাল। সে বলছে এখনই ফির্‌তে। তা'র পাশের বাড়ীর লোকেরা নাকি অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে; তা'রা নাকি ওকে পুলিশে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে। এখনই ফেরা যাক্—কি বলুন?"

আমার তো ফির্‌বার ইচ্ছা খুবই; তবুও ভদ্রতার খাতিরে মুখ একটু গম্ভীর গোছের ক'রে বল্‌লাম, "হ্যাঁ—ফির্‌তে তো হবেই; না হ'লে শেষটায় প্রফেসার ঘোষকেই ফ্যাসাদে পড়্‌তে হবে।"

তখনই এরোপ্লেনের বেগ কমিয়ে নীচের দিকে নাম্‌বার ব্যবস্থা হ'তে লাগ্‌ল। ম্যাপ্ দেখে ভদ্রলোক বল্‌লেন, দু' মাইল দূরে নাম্‌বার জায়গা আছে, সেখানেই নামা যাবে। একটু বিশ্রাম ক'রে, পেট্রল ভ'রে নিয়ে, খাবার সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হ'য় পড়্‌ব।"

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এক বিরাট্ ছাদে এরোপ্লেন নেমে পড়্‌ল আর একটা 'নর-কল' এসে উপরের ঢাকনি খুলে দিল। আমরা নেমে পড়্‌তেই একজন সাহেব এসে জিজ্ঞাসা ক'রে গেল আমাদের কি কি চাই। ভদ্রলোক বল্‌লেন, "পেট্রল ভর্‌তে হবে, এঞ্জিন একটু ঠাণ্ডা কর্‌তে হবে আর ভাল ক'রে সব কল-কব্জা আর বডি পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে হবে। আমরা একটু বিশ্রাম ক'রেই ইণ্ডিয়ার দিকে রওয়ানা হব।"

সাহেব এরোপ্লেনের সব ব্যবস্থা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল; আমরা লিফ্‌ট্ দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। নীচের একটি ঘরে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে, একটু বিশ্রাম ক'রে, খবরের কাগজ নিয়ে আমরা আবার এরোপ্লেনের কাছে এলাম। শরীর তখনও ক্লান্ত বোধ হচ্ছে; কিন্তু বাড়ী ফেরার ঝোঁক তখন এত বেশী যে শরীরের ক্লান্তি একেবারে ভুলে গেলাম। তা' ছাড়া, এত অদ্ভুত কাণ্ড এই দু'দিনের মধ্যে দেখেছি, যে মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম পেলে বাঁচি; অথচ বাড়ী না ফির্‌লে তা' হবারও জো নাই।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এরোপ্লেন আবার খোলা আকাশে পাড়ি দিল। ভদ্রলোক আমাকে বল্‌লেন, "আত্মম্ভরীর বাড়ী পৌঁছা'তে কাল সকাল হয়ে যাবে। আমি

ফোনেই ব'লে দিয়েছি, কাল ভোরে পৌঁছা'ব।" আমি মনে মনে ভাব্‌লাম, "ক'টা ঘণ্টা ভালয় ভালয় পার হ'লে বাঁচি।"

রাত্রে ২।৩ ঘণ্টার জন্য ভদ্রলোক ঘুমালেন; আমি কল-কব্জা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তিন ঘণ্টা বাদে তিনি উঠে আমাকে শু'তে যেতে বল্‌লেন। আমার কিন্তু ঘুম এলই না।

ভোরের দিকে উঠে আমি নীচে তাকিয়ে দেখ্‌লাম। তখন আমরা খুব নীচু দিয়ে চ'লেছি। দেখে মনে হ'লো বাংলা দেশে এসেছি। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তিনি ঢুলু-ঢুলু চোখ ক'রে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, বাংলা দেশেই তো আসার কথা। বেজায় ঘুম পাচ্ছে, তাই কুঁড়েমি ক'রে ম্যাপ্ আর দেখি নি—এবার দেখ্‌ব।" ম্যাপ্ দেখে বোঝা গেল আমরা কল্‌কাতার একেবারে কাছেই এসে পড়েছি। তখনই এরোপ্লেন আরো নীচে নামাবার চেষ্টা করা হ'লো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা প্রফেসার আত্মম্ভরীর বাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে চল্‌লাম। দু'-তিনবার বাড়ীর চারদিকে ঘুরে আমরা ক্রমেই নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লাম। ভদ্রলোক কিন্তু মাটিতে নাম্‌বার নামই করেন না! আমি তো ঘাব্‌ড়ে গেলাম। একবার মণ্টুদের জানালার একেবারে কাছ দিয়ে গেলাম; কাউকে দেখ্‌তে পেলাম না।

এবার ভদ্রলোক আমাকে বল্‌লেন, "আমি কিন্তু আর ঘুম চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আপনি এরোপ্লেন সাম্‌লান।"—এ কথা ব'লেই ভদ্রলোক ধপ্ ক'রে শুয়ে পড়্‌লেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কল-কব্জা সাম্‌লাতে চেষ্টা কর্‌লাম কিন্তু একটা হাতল টেপা ছাড়া আর তো কিছুই জানি না। অল্প জায়গার মধ্যে, মাটির খুব কাছে যখন এরোপ্লেন চলে তখন যে কি কর্‌তে হয় কিছুই তো জানি না। এরোপ্লেন চক্কর দিয়ে প্রফেসার ঘোষের বাড়ীর চার দিকে ঘুর্‌ছে। আমি কত চেষ্টা কর্‌ছি, কিছুতেই আর তা'কে উঠাতেও পার্‌ছি না, নামাতেও পার্‌ছি না। মণ্টুকে কত বার প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাক্‌লাম, সে শুন্‌তেও পেল না। মহা মুস্কিল!

এবার এরোপ্লেনটা চক্কর দিয়ে ফির্‌বার সময়ে একটু বাঁ দিক্ ঘেঁসে এল।

আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি, মণ্টুদের জানালার সঙ্গে ধাক্কা খাবে। ঘরের ভিতরে সেই ক্যালেণ্ডার টাঙ্গানো রয়েছে। ও মা! ও কি! এ যে 1985-এর ক্যালেণ্ডার, 1935 নয়। তাই এত সব অদ্ভুত আজগুবি কাণ্ড ঘট্‌ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন গুলিয়ে গেল। এরোপ্লেন বজ্রের মত শব্দ ক'রে মণ্টুদের দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূরমার হ'য়ে গেল; আমি ছিট্‌কে প'ড়ে গেলাম। তার পর সব অন্ধকার!

জ্ঞান যখন হ'লো তখন চেয়ে দেখি প্রফেসার ঘোষ তাঁর তৈরী এক অদ্ভুত যন্ত্র নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে; ডাক্তার সেন, ডাক্তার বসু এঁরাও আছেন; মণ্টুর বাবা, মণ্টু—এরা সব পাশে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার সেন প্রফেসার ঘোষকে বল্‌ছেন, "আপনার এই ব্রেন্‌-পরীক্ষক যন্ত্রই আজ রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নিউ-ইয়ারের রাত্রে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে একটা লোহা মাথায় লেগে রোগী যে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল তো গেলই। মাঝে মাঝে যখন সামান্য জ্ঞান হ'তো তখন প্রলাপ বকা ছাড়া আর কিছুই শুনি নি! কখনও বল্‌ছে, 'নর-কল', কখনও বল্‌ছে, 'আমেরিকা,' কখনও বল্‌ছে, 'টেলিভিষণ,' কখনও বল্‌ছে, 'ভদ্রলোক,' কখনও বল্‌ছে, 'এবার দেশে ফেরা যাক্‌'। এর মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝি নি। আপনি ব্রেন্‌-পরীক্ষক যন্ত্র দিয়ে এর অজ্ঞানাবস্থার চিন্তাগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে যে সব আশ্চর্য্য খবর আমাদের ব'লেছেন, তারই সাহায্যে আমরা চিকিৎসার পথ পেয়েছি এবং ব্রেনে অপারেশন কর্‌তে সাহসী হয়েছি। যা হোক্‌, আজ বলা যেতে পারে রোগীর প্রাণের আর কোন ভয় নাই।"

তখন আর আমার কিছু বুঝ্‌তে বাকী রইল না ব্যাপারটা কি। মণ্টু বল্‌ল, "লিখ্‌বার মত গল্প বটে! কিন্তু ভাই, প্রফেসার ঘোষও অসাধারণ লোক। সে না থাক্‌লে আজ তোমার এ গল্প শুন্‌তই বা কে, বল্‌তই বা কে?" সত্যিই তো!

দেহাতী গান

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

দেহাতী গান,—সে আবার কি?...কোন রকম কালোয়াতী গান বুঝি?

আরে না, না,—কালোয়াতী গানের আসর আমি এখানে জমাতে বসি নাই,—কোন নতুন ধরণের সঙ্গীতের ইঙ্গিতও তোমরা আমার কাছ থেকে আশা ক'র না। দেহাতী গান,—নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার; সেই কথাই আজ বল্‌ছি।

বিহার প্রদেশের অজ-পাড়াগাঁকে বলে দেহাত্‌, আর সেখানকার নিরক্ষর গ্রামবাসীদের বলে 'দেহাতী'। তাদের গানই হচ্ছে দেহাতী গান।

ও কি! তোমরা যে হেসে উঠ্‌লে! ভাব্‌ছ, জংলীদের আবার গান কি?

আমারও আগে সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু ওদের গ্রামে কয়েক মাস বাস ক'রে আমার সে ধারণা বিল্‌কুল্‌ উল্টে গেছে।

আজ তোমাদের কাছে সেই দেহাতী গানেরই কয়েকটি নমুনা দিতে এসেছি। হয়তো তোমাদের ধারণাও বদ্‌লে যেতে পারে।

দেহাতী ভাষা তোমাদের বুঝ্‌তে অসুবিধা হবে,—তাই তার ভাব যথা সম্ভব বজায় রেখে আমি বাংলায় যে তর্জ্জমা করেছি সেই রসই কিছু তোমাদের আজ পরিবেষণ করছি।

ঝড়ের দিনে ওদের দেশের ছেলেরা ঝড়ের তালে তাল দিয়ে নেচে নেচে গান ধরে—

এলো রে ঐ ঘূর্ণি ঝড়,—
বাঁশের বনে ঝর্‌লো পাতা,
বাব্‌লা গাছের নড়লো মাথা,—
কাঁপ্‌ছে যেন বালুর চর;
ছোট্ট টিয়ে উড়তে গিয়ে
আছ্‌ড়ে' পড়ে ছট্‌ফটিয়ে,—

আন্ তো খাঁচা—শীঘ্র কর্ ;
টিয়ের ছানা কোথায় এটা।
আরে ছিছি, চাম্‌চিকেটা
ধুঁক্‌ছে শুয়ে ধূলোর পর।

ওদের শিকার করতে যাবার গান। ছোট ছেলেরা খেলার সময়েও এই গান করে—

চল্ মোরা ভাই শিকার করি
বনের ভিতরে,
মোদের দলের দলপতি
কর্‌ব কি তোরে ?
বর্শা, ধনুর্ব্বাণ ভরসা মোদের—
গ্রাহ্য করি নে,—
নেক্‌ড়ে, ভালুক, হুঁড়ার, ফেরু,
হায়না, হরিণে।
আমরা সবাই কর্‌ব শিকার
কাঠ-বিড়ালীটা,
বাড়ী এসে খাব সবাই
মহুয়ার পিঠা।

খেলা করতে করতে অনেক সময়ে ওদের ছেলেরা এই গানটাও করে—

তুই বেশ গান গাস্
ভাই রে,
ঠিক যেন পেঁচা ডাকে
বাইরে।
খাসা তোর রূপখানি
সাঁচ্চা,

ঠিক যেন মোরগের
বাচ্চা।

চাঁদ সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা বেশ মজার—

চাঁদের দেবতা বড় লাজুক যে ভাই,
সন্ধ্যায় আঁধারেতে
দেখা দেয় আকাশেতে,—
দিনের বেলায় তারে দেখিতে না পাই।

কেমন মজার কল্পনা! চাঁদ বড় লাজুক—দিনের বেলায় পাছে কেউ তার মুখ দেখে ফেলে সেই লজ্জায় দিনের আলোতে সে বে-মালুম গা ঢাকা দেয়। আর একটি গান শোন—

সুয্যি মামার সঙ্গে বুঝি
চাঁদা মামার আড়ি,
দুই মামাতে হয় না দেখা,
মজার কথা ভারী।
যেমনি চাঁদের মুখ দেখা যায়
অমনি তাড়াতাড়ি
সুয্যি মামা একটি ডুবে
পালায় নিজের বাড়ী ;
আবার যখন সূর্য্য ওঠে
আভাস পেয়ে তারই,
চাঁদা মামা পালায় চোঁচা
আকাশখানা ছাড়ি'।

চারি ধারে আঁধার ক'রে মেঘ ক'রে আস্‌ছে—তখন হয়তো শোনা যায় ছেলের দল্ গান জুড়েছে—

নদীর কোণার জনার-ক্ষেতে
অধীর হ'ল বায়,

তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
কাজল মেঘের বাদল নামে
নীল আকাশের গায়,
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
বন্‌-বাদাড়ে সাঁঝ-আঁধারে
ঐ যে কান্না যায়!
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
ঢোলক বাজে বনের মাঝে
সাঁঝের নিরালায়—
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।

আকাশের তারা সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণাই থাক্‌—ওদের কল্পনাটাও কিন্তু বাস্তবিকই আজব রকমের—

ঝিক্‌মিক্‌ করে ভাই
ওটা কি?
আঁধারেতে আগুনের
ফোঁটা কি?
আকাশেতে ছুলো বুঝি
বাঁধা রে—
জ্বল্‌ জ্বল্‌ চোখ জ্বলে
আঁধারে।

এক গ্রাম থেকে ভিন্‌ গাঁয়ের পথে চল্‌তে চল্‌তে ওদের পুরুষেরা গান করে—

সুনসুনিয়ার ফুল ফুটেছে
পাহাড়-তলীতে—
পায়ে কাঁটা ফুট্‌লো রে ভাই
পথটি চলিতে।

পাহাড়-তলীর পথের বাঁকে
কাদের দুলালী,
গানের তানে মোদের সবার
প্রাণটি দুলালি?
হল্‌দে শাড়ী পরনে তা'র,—
টিপ্‌টি কপালে—
সুনসুনিয়ার শাক তোলে সে
আজ্‌কে সকালে।

সব দেশেই নাতি আর ঠাকুরদা'র সম্বন্ধটা বেশ রস-মধুর। নাতিরা ঠাকুরদা'কে নিয়ে পরিহাস করতে বেশ মজা পায়। এদের দেশেও তার রেওয়াজ আছে।—

তামাক টানে ঠাকুরদাদা—
গুড়ুক্‌-গুড়ুক্‌-গুড়,—
যেমনি মিঠে তামাক রে ভাই,
তেমনি মিঠে সুর।
ঠাকুরদাদার বয়স হ'ল
চারটি কুড়ি পার,—
মাথাতে টাক, পাক ধরেছে
গোঁফ জোড়াতে তার।
এই বয়সেও ঠাকুরদাদার
বেজায় সাহস ভাই,
ফড়িং দেখে কাঁপ্‌তে থাকে,—
সন্দেহ তার নাই।
এই বয়সেও ঠাকুরদাদা
খেতেও পারে বেশ,

আধ্ টুক্‌রো ভুট্টা খেয়ে,
নাকালের একশেষ।

ঠান্‌দি'ও রেহাই পায় না। তার সম্বন্ধেও ছড়ার অভাব নাই।—

আমাদের ঠান্‌দিদি
তার ঢের গুণ,
কথায় কথায় খালি
হেসে হয় খুন।
ছোট ক্ষেতখানি তার
দেখি চেয়ে অনিবার,
কত শত ঝিঙে, লাউ,
পটল, বেগুন;
যদি কিছু খেতে চাই
রাগিয়া আগুন।

আর একটি গানও খুব প্রচলিত—

ভাত রেঁধেছে, ডাল রেঁধেছে,
রাঁধ্‌ল মটর শাক,—
যেমনি বুড়ী বস্‌বে খেতে
ছিনিয়ে নিল কাক।

আহা ঠান্‌দি' বুড়ীর জন্য বাস্তবিকই কষ্ট হয়।

বিয়ের উৎসবে ওরা অনেক সময় এই গানটি করে—

ওরে টিয়ে উড়ে যা'রে
নীল আকাশের পারে,
যেখানে আমার ভাই আছে,
আমার খবর নিয়ে
চুপে চুপে সেথা গিয়ে,
মোর কথা বল্ তার কাছে।

টিয়ে তো শোনে না কথা—
বোঝে না আমার ব্যথা,
ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে শুধু পাখী,
বসিয়া দুয়ার-ধারে
আজি শুধু বারে বারে
ছল ছল করে মোর আঁখি।

বিয়ের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এই করুণ গানটি কেন যে গাওয়া হয় তার কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে পাই নি।

ওদের ছেলে-ভুলানো গানও কেমন সুন্দর—

থাম্ খোকা,—থামা তোর
কান্নাকাটি,
ভুট্টার ছাতু দেব,—
রুটি, চাপাটি,
আকাশের চাঁদ দেব
হাতে তুলিয়া—
এবার কাঁদন তোর
যা'রে ভুলিয়া।

এই রকম আরো কত যে গান আছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সব গান তোমাদের শোনাবার উপযুক্ত নয় ব'লে আজ এইখানেই পালা শেষ কর্‌লাম।

বাঙ্গালী বীর বঙ্কিমবিহারী

(শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু)

নানা রকম ডন-কুস্তি ক'রে, ডাম্বেল-মুগুর ভেঁজে আজকাল লোকে যেমন গায়ের জোর বাড়াচ্ছে, তেম্‌নি আবার অসি, ছোরা, লাঠি, যুযুৎসু ইত্যাদি

শিখেও আত্মরক্ষার সহজ কায়দাগুলো আয়ত্ত করছে। এগুলো বাস্তবিকই প্রত্যেকের শেখা দরকার। মনে কর, তুমি খালি হাতে আস্‌ছ; এমন সময়ে হঠাৎ একটা গুণ্ডা এসে তোমাকে আক্রমণ ক'রে বস্‌ল। সে সময়ে, তোমার যদি যুযুৎসু বিদ্যাটা তেমন জানা না থাকে, তবে তোমার অবস্থা বেশী সুবিধার হবে না। অথচ খুব ভাল একজন যুযুৎসু খেলোয়াড়ের কাছে বেশ পালোয়ান গোছের একজন লোক একটা মস্ত বড় লাঠি নিয়েও কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না—এ এম্‌নি মজার জিনিষ। তার পর অসি, ছোরা, লাঠি—এ সব খেলা জানা থাক্‌লে তো কথাই নেই, স্বয়ং যমরাজ এলেও হয়তো কিছু কর্‌তে পারবেন না।

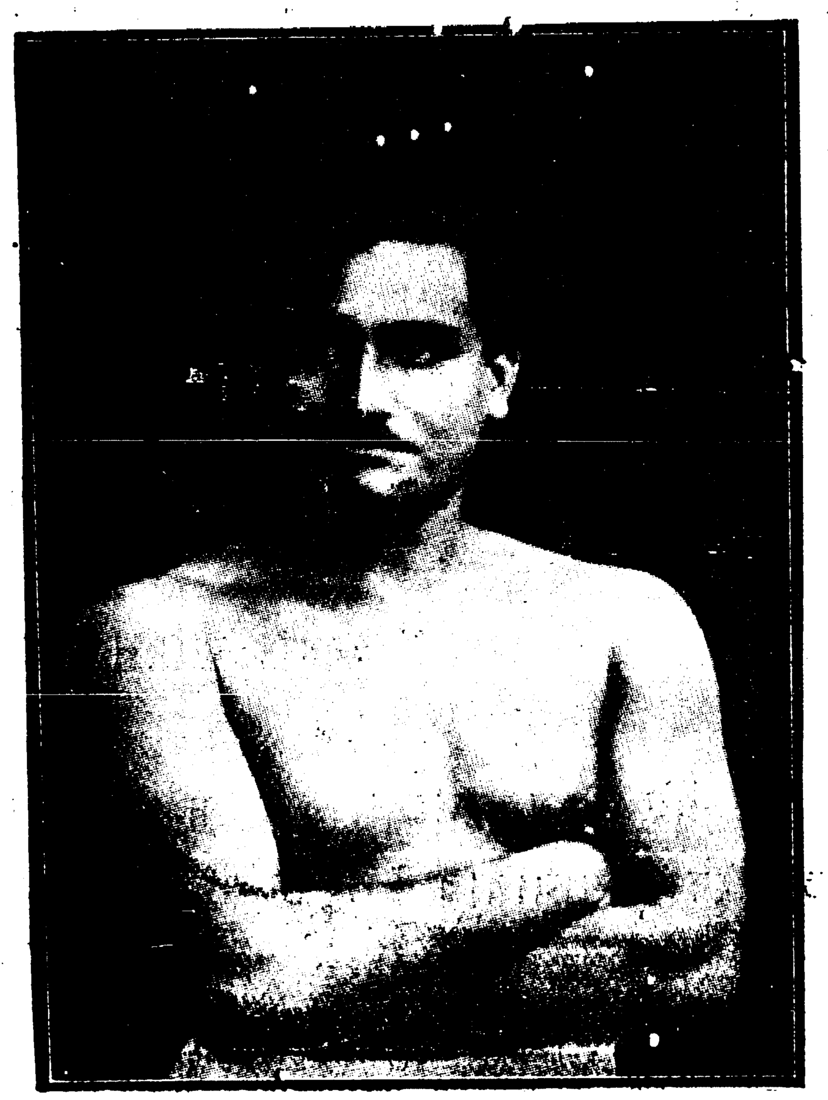

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস

যত রকম অস্ত্রের খেলা আছে তার মধ্যে সব চাইতে আমোদজনক আর কঠিন হচ্ছে অসির অর্থাৎ তলোয়ারের খেলা। এ খেলা খুব প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—তার পর মাঝখানে চর্চ্চার অভাবে এ দেশ থেকে খেলাটা প্রায় উঠেই যায়। আবার যিনি এই অসি খেলার চর্চ্চাটাকে বাংলা দেশে ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর নাম বোধ হয় তোমরা জান—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস। এই পুলিন বাবুরই ভাগ্নে ও শ্রেষ্ঠ সাগরেদ্ হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস। এঁর কথাই আজ তোমাদের কাছে কিছু বল্‌ব।

বঙ্কিম বাবুর জন্ম হয় বাংলা ১৩১১ সালে। তাঁর ছেলেবেলাকার কথা শুন্‌লে তোমরা নিশ্চয় অবাক্ হয়ে যাবে। ১৭ বছর বয়স পর্য্যন্ত ডন-কস্‌রৎ কা'কে বলে

তিনি ভালো করে জানতেন না। ১৭ বছর বয়সে তিনি প্রথম ক'লকাতায় আসেন এবং তাঁর মামা পুলিন বাবুর কাছে শরীর-চর্চ্চা সুরু করেন। এই সময়ে একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল, তা' তোমাদের কাছে না ব'লে পার্‌ছি না।

বঙ্কিম বাবু তখন নতুন নতুন লাঠি খেলা শিখ্‌ছিলেন কিনা,—তাই সেই বিদ্যাটাকে লোকের কাছে জাহির ক'রে খুব বড় লাঠিয়াল ব'লে নাম কিন্‌বার জন্য তিনি ভবানীপুরের "রসা থিয়েটারে" লাঠি খেলার এক প্রদর্শনীতে নাম্‌লেন। কিন্তু মাত্র ১৮।১৯ দিন খেলা শিখে কি আর ওস্তাদ্ হওয়া যায়? তাই তিনি সেদিনকার খেলায় ভয়ানক ভাবে মার খেয়ে একেবারেই অপদস্থ হ'য়ে গেলেন। এম্‌নি ভাবে লাঞ্ছনা পেয়েই তিনি সেদিন থেকে একেবারে জীবন পণ ক'রে লাঠি, ছোরা, অসি ও যুযুৎসু—এই চার বিদ্যা শিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন। মনোযোগ দিয়ে কাজ করার একটা বিশেষ ফল আছেই। বছর খানেকের মধ্যেই তিনি এ সব খেলায় বেশ নাম কিনে ফেল্‌লেন।

এর পর তিনি এলাহাবাদ, হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিখ্যাত অনেক যায়গায় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে তাঁর চমৎকার খেলা দেখিয়ে লোককে অবাক্ ক'রে দিয়েছেন। ক'লকাতা ছাড়াও বাংলার আরো অনেক ছোট-বড় যায়গায় তিনি তাঁর অসির খেলা দেখিয়েছেন। বোধ হয় তোমাদের মধ্যেও তা' কেউ কেউ দেখে থাক্‌বে।

আজকাল বঙ্কিম বাবু যে সব খেলা দেখান, তার মধ্যে একজন লোককে একটা বেঞ্চির ওপর চিৎ ক'রে শুইয়ে তার পেটের ওপরে আলু, কলা, পান কিংবা নাক ও জিহ্বার ওপরে লবঙ্গ, চূণ রেখে সে সব তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলা বা চেঁছে তোলা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। এ সব কাজ তিনি এত তাড়াতাড়ি এবং দক্ষতার সঙ্গে করেন যে যার ওপর করা হয় তার গায়ে আঁচড়টিও লাগে না।

কিন্তু এ সব খেলাও তোমাদের কাছে নেহাৎ সাধারণ ব'লে মনে হবে, যখন তোমরা তাঁর কলাগাছ কাটার কৌশলটি দেখ্‌বে। একটা আস্ত কলাগাছের ডগায় একটা ডাব এবং জল-ভরা একটা কলসী বেঁধে রেখে তিনি গাছটিকে এমন ভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলেন যে, গাছটি কাৎ হয়ে পড়ে যাওয়া তো

দূরের কথা, একটু নড়েও না—এমন কি, ডাব বা জল-ভরা কলসীও নড়ে না—এম্‌নি পাকা হাত তাঁর!

এই লাঠি, ছোরা, অসি ও যুযুৎসু ছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ, গুরুভার উত্তোলন, লোহার পাত বাঁকা করা ইত্যাদিতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এ সব বিভিন্ন খেলায় তিনি এ পর্য্যন্ত শত শত মেডেল, শীল্ড্, কাপ্, ছোরা, পাগ্‌ড়ী, শাল, আলোয়ান প্রভৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। তার ফর্দ্দ দিতে গেলে রামধনুর অনেক-গুলো পৃষ্ঠা লেগে যাবে।

বঙ্কিম বাবুর ছাত্রী মনোরমা লোহার পাত বাঁকাচ্ছে।

আজকাল তিনি ক'ল্‌কাতায়ই কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকের কাজ করেন এবং নিখিল বঙ্গ শরীর-চর্চ্চা সমিতি, খিদিরপুর ব্যায়াম-সমিতি, সিটি কলেজ ব্যায়ামাগার প্রভৃতি অনেকগুলো যায়গায় শরীর-চর্চ্চা বিষয়ে নানা রকম উপদেশ ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ সব ব্যায়ামাগারের অনেক ছোট-বড় ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি নানা রকম ডন্-কস্‌রৎ শিখিয়ে ওস্তাদ্ ক'রে তুলেছেন।

বছর তিনেক আগে খিদিরপুরে একটা বড় ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তা'তে বঙ্কিম বাবুরই ছাত্রী কুমারী গীতা ঘোষ অনেকগুলো খেলায় প্রথম হয়ে 'সেরা মেয়ে খেলোয়াড়' বলে পুরস্কার পেয়েছিল। ছোরা খেলায় গীতার জোড়া মেলা ভার। গীতা ছাড়া বঙ্কিম বাবুর ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী গৌরী ঘোষাল ও কুমারী কনক সরকারও ছোরা খেলায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছে। তাঁর আর একটি ছাত্রী, মনোরমার গায়ে শক্তি ভয়ানক বেশী। তোমরা, সাধারণ ছেলেরা, যে লোহার

পাত মোটেই নাড়াতে পার না, মনোরমা অনায়াসে সে পাতখানাকে হাতে তুলে বাঁকিয়ে দেবে—এম্‌নি তার গায়ে জোর। এ সব খেলা ছাড়া বঙ্কিম বাবু তাদের নতুন নতুন রকমের ড্রিল্, হিউম্যান্ ব্রিজ্, হিউম্যান্ পিরামিড্ প্রভৃতি অনেকগুলো চমৎকার চমৎকার কস্‌রৎ শিখিয়েছেন। বাংলা দেশের নামজাদা ব্যায়াম-বীর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার মেয়েদেরও বঙ্কিম বাবুই ছোরা, লাঠি প্রভৃতি খেলা শেখান। রাজেন বাবুর মেয়ে কুমারী আশাময়ী ছোরা খেলায় খুব নাম করেছে। এমনিধারা ওস্তাদ্ ওস্তাদ্ মেয়ে-খেলোয়াড় বঙ্কিম বাবু এ পর্য্যন্ত অনেক তৈরী করেছেন।

বাংলার ঘরে ঘরে বঙ্কিম বাবুর মত শক্তিমান্ লোক জন্মগ্রহণ করুক এই আমরা চাই।

প্রফেসার ভড়ের উপাখ্যান

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

দোলাইগঞ্জ গ্রামে তোমরা গিয়াছ কিনা জানি না। জলাঙ্গীর ধারে ছোট গ্রামটি, কিন্তু বেশ সমৃদ্ধিশালী। গ্রামে ঢুকিতেই ঘন নারিকেল গাছের আড়ালে যে উঁচু মিনারের মত জিনিষটি চোখে পড়ে সেটিকে কিন্তু তোমরা 'মনুমেণ্ট্-টনুমেণ্ট্' কিছু মনে করিয়া বসিও না। দোলাইগঞ্জ পলাশীর মত কোন বিখ্যাত জায়গা নয়, অন্ধকূপ হত্যার মতও এমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা সেখানে ঘটে নাই যার জন্য একটা মনুমেণ্ট্ বসান হইবে। তবে?

গ্রামের ভিতর আর একটু ঢুকিলেই বুঝিবে যেটিকে মনুমেণ্ট্ বলিয়া ভুল হইতেছিল সেটি একটি বিরাট্ ইটের চিমনী। তবে কি এখানে কোনও বড় কারখানা আছে? না, তা'ও নয়। চিমনীটা স্থানীয় জমীদার-বাড়ীর একটা অংশ।

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে, না? আচ্ছা, এক কাজ কর। ঐ চিমনীর

পাশের দরজাটা দিয়া আরও ভিতরে চলিয়া আইস। অবশ্য সকলকেই যে এখানে ঢুকিতে দেওয়া হয় তা নয়, তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কোনও গোল বাধিবে না। কি দেখিতেছ? প্রকাণ্ড বয়লার, অদ্ভুত অদ্ভুত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, নানা রকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম—এই অজ পাড়াগাঁয়ে এ সব কি কাণ্ড! আর একটু অগ্রসর হও—এই—এই ঘরে, দেখ দেয়াল ভর্ত্তি কত বড় বড় সব চার্ট, নক্সা ঝুলিতেছে! তার গায়ে কত হিজিবিজি লেখা—তোমরা তার মানেও বুঝিতে পারিবে না। সামনে টেবিলের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই, আর তার চেয়েও বড় বড় খাতা—হিসাবের খাতা নয়, তার মধ্যে সব দুরূহ দুরূহ জটিল বিষয়ের নোট্ লেখা আছে।

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ এটি একটি ল্যাবরেটরী। ঘরের এক কোণে বিরলকেশ, কিঞ্চিৎ নধর চেহারার যে ভদ্রলোকটি বসিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে পুঁথি ঘাঁটিতেছেন তিনিই এই ল্যাবরেটরীর মালিক—প্রফেসার ভড়। প্রফেসার শুনিয়া তোমরা যেন মনে করিও না ইনি তোমাদের রামধনু-সম্পাদকের মত কোনও কলেজে প্রফেসারী করেন, কিংবা প্রফেসার রামমূর্ত্তির মত শরীর-চর্চ্চায় কালাতিপাত করেন। তা নয়, ইনি একজন 'য়্যামেচার' বৈজ্ঞানিক—নানা রকম জটিল বিষয় লইয়া ইনি সারাক্ষণ গবেষণা করেন, তাই বন্ধুবান্ধবেরা এঁর নামের আগে একটা সম্মানসূচক 'প্রফেসার' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা প্রফেসার ভড়কে তাদের জমীদার শ্রীযুক্ত ভজগোবিন্দ ভড় বলিয়াই জানে যদিও জমীদার মহাশয়ের বিদ্যানুরাগের কাহিনী গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কারও অবিদিত নাই। প্রফেসার ভড় অগাধ টাকার মালিক, কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ বড়লোকের মত স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন কাটান না। জীবনে একটা কাজের মত কাজ করিয়া যাইবেন এই তাঁর দৃঢ় পণ। নহিলে এই পাড়াগাঁয়ে এত বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এমন একটা ল্যাবরেটরী বসাইবার কথা কখনও শুনিয়াছ? কিছু দিন হইল প্রফেসার ভড় একটা কি নতুন বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। বিষয়টি কি কেহ জানে না কিন্তু খুবই যে অদ্ভুত এবং জটিল একটা কিছু সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হয় হয়। প্রফেসার ভড়কে আজ কয়েক দিন যাবত যেন কেমন একটু বিচলিত দেখা যাইতেছে। গত সপ্তাহে বিলাত হইতে কয়েকখানা মিশরীয় পুঁথির নকল আসিবার পর হইতেই যেন এ ভাবটা একটু বাড়িয়াছে। এখনও তিনি সেই পুঁথির মধ্যেই নিমগ্ন আছেন। তাঁর অনতিদূরে একটা 'বীকার'-এর (কাচের পাত্র) মধ্যে রং-বেরং-এর কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে।

হঠাৎ দরজায় কা'র ছায়া পড়িল। প্রফেসার ভড় ইতিমধ্যে পাত্রটির কাছে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। ঘরে ঢুকিল তাঁর চাকর। সে জড়সড় ভাবে প্রফেসারের সম্মুখে একটা কাপ্ রাখিয়া চলিয়া গেল। কাপ্‌টি খুব ছোট—অর্থাৎ চায়ের কাপের

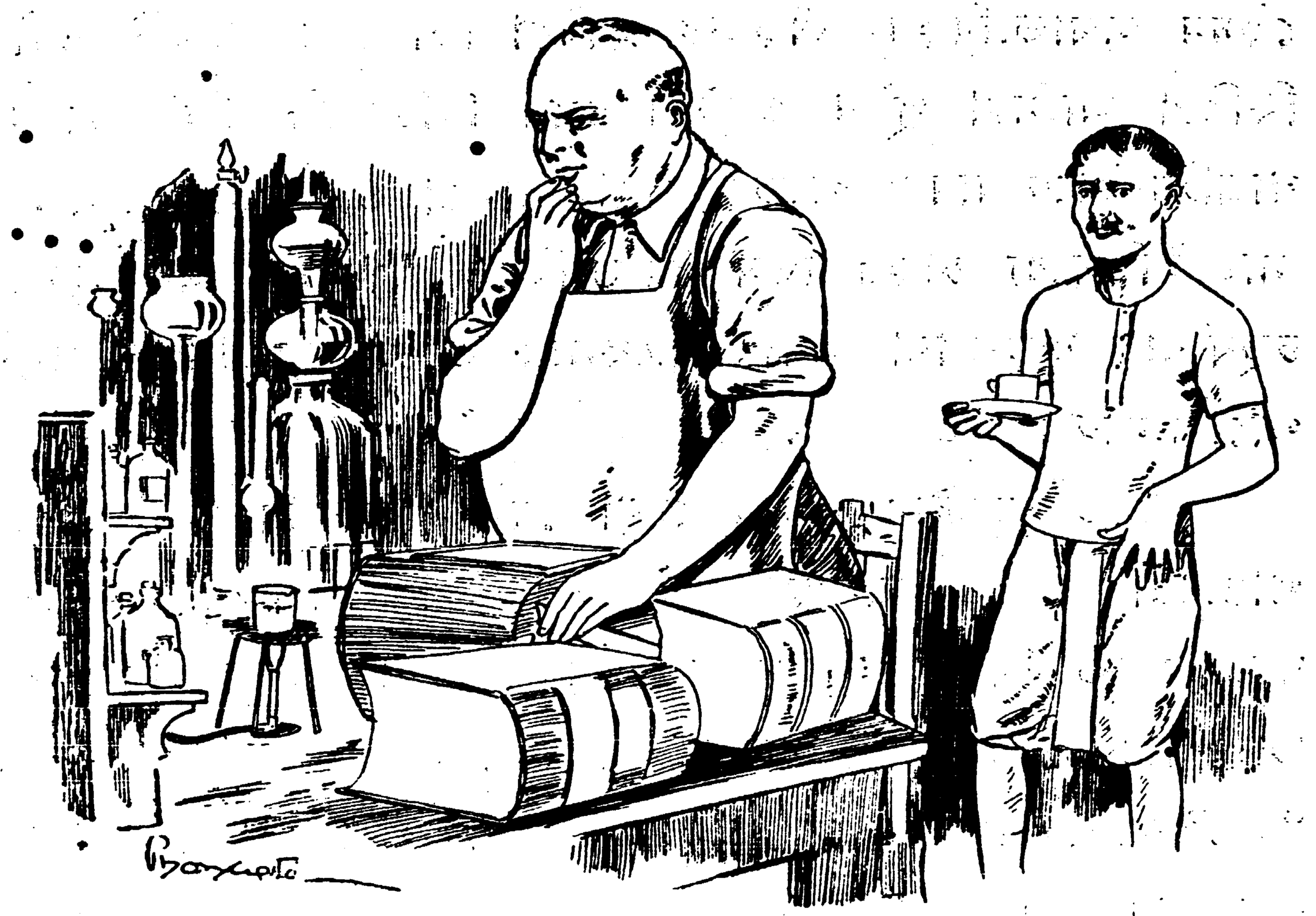

ঘরে ঢুকিল তাঁর চাকর।

চেয়ে ছোট—অর্থাৎ সেটি চায়ের কাপ্ নয়, তার ভিতরকার তরল পদার্থের নাম কফি। প্রফেসার ভড় এ সময়ে চা খান্ না, কারণ আজকাল তাঁকে অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া কাজ করিতে হয়, কফি না খাইলে ঘুমাইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। প্রত্যহ এই সময়টা তাঁর মন 'কফি কফি' করিতে থাকে, কিন্তু আজ যেন তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। অত্যন্ত তাচ্ছীল্যের সঙ্গে তিনি পেয়ালায় একটা চুমুক দিলেন, মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল ঠোঁটটা বুঝি একটু পুড়িয়া গেল। প্রফেসার ভড় বৈজ্ঞানিক হইলেও জমীদারের

ছেলে এবং নিজে জমীদার—স্বভাবতঃই একটু আরামবিলাসী। এরূপ ব্যাপারে তাঁর বেশ একটু বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আজ যেন তাঁর কোন দিকেই খেয়াল নাই। ঠোঁটটি আলগোছে জিভ দিয়া চাটিয়া তিনি আবার নিজের কাজে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

রাত প্রায় বারোটা বাজে। প্রফেসার ভড়ের আজ হইল কি? এতক্ষণের মধ্যে তিনি একবারও ল্যাবরেটরী হইতে বাহির হন্ নাই। মুখের ভাবও তাঁর যেন কেমন অস্বাভাবিক। একবার করিয়া টেবিলের পাত্রটি পরীক্ষা করেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া পুঁথি ওল্‌টান আর হিজিবিজি কি লেখেন। আবার ছুটিয়া পাত্রটির কাছে যান। বাতের ব্যারাম বলিয়া তাঁর সকাল সকাল খাইবার কথা, কিন্তু আজ ইতিমধ্যে চাকর তিন বার ডাকিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। চতুর্থ বার ভড়-জায়া অর্থাৎ প্রফেসার ভড়ের স্ত্রী নিজে আসিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই।

রাত দেড়টার সময়ে দেখা গেল প্রফেসার ভড় ঘরের মধ্যে ভীষণ ভাবে পায়চারী করিতেছেন, আর বিড় বিড় করিয়া কি আওড়াইতেছেন। মুখের ভাব তাঁর অদ্ভুত কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা উৎফুল্ল ভাবও যেন মিশাইয়া আছে। ভড়-জায়া সাহস করিয়া আবার আসিলেন, কিন্তু প্রফেসার এমন জোরে বিরক্ত ভাবে "আঃ" করিয়া উঠিলেন যে তিনি তাঁর বিরাট্ শরীর লইয়াও প্রায় উল্টাইয়া পড়িবার যোগাড়। সে রাত্রে প্রফেসার ভড় আর ল্যাবরেটরী হইতে বাহির হইলেন না।

খুব ভোরবেলা ভড়-জায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি একেবারে ল্যাবরেটরীর দরজায় গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু, কই, প্রফেসার ভড় তো ল্যাবরেটরীর মধ্যে নাই! বাগানে গেলেন, সেখানেও নাই! শোবার ঘরেও নাই, ল্যাবরেটরীতেও নাই, বাগানেও নাই, কোথায় গেলেন তিনি? প্রফেসার ভড়ের ঘুম ভাঙ্গিতে সাধারণতঃ বেশ একটু বেলা হয়, তা ছাড়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া খানিকক্ষণ গড়গড়া না টানিয়া তিনি উঠিতে পারেন না—এমনি তাঁর বদ্ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সেই প্রফেসার ভড় আজ এত ভোরে কোথায় গেলেন?

হঠাৎ ভড়-জায়ার নজরে পড়িল—ছাদের উপর অস্পষ্ট আলোয় কি একটা জিনিষ নড়িতেছে। তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তা' চোখে দেখিলেও বিশ্বাস হইতে চায় না। দেখিলেন, প্রৌঢ় প্রফেসার খালি-গায়ে মালকোছা মারিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়াছেন, আর দুই হাতে তাঁর বড় ছেলে সতুর এক্সারসাইজের দু'টি মুগুর লইয়া পালোয়ান্ গামার মত প্রাণপণে ঘুরাইতেছেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরণার মত ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। হতভম্ব ভড়-জায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, প্রফেসার ভড় সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; মুগুর দু'টি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গোটা কয়েক বৈঠক আর গোটা কতক ডন্ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া গেলেন। ভড়-জায়ার মাথা ঘুরিতেছিল, তিনি সেইখানেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

খানিক পরে ভড়-জায়া নীচে নামিয়া আসিলেন কিন্তু প্রফেসার ভড়ের দেখা নাই। তাঁর ছোট ছেলে নন্তু সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, ভড়-জায়া তা'কেই প্রশ্ন করিলেন, "তোর বাবা কোথায় রে?"

নন্তু জবাব দিল, "এই তো এতক্ষণ দিদির ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাউডার আর 'এসেন্' মাখছিলেন, এই মাত্র বড়দা'র জামা-জুতো প'রে বেরিয়ে গেলেন। আচ্ছা মা, বাবা তো পাউডার কোন দিন মাখেন না, আর বড়দা'র জামা-জুতোই বা প'রতে গেলেন কেন? তাঁর নিজের তো কত আছে!" ভড়-গৃহিণী মুখখানা হাঁড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা দশটা পর্য্যন্ত প্রফেসার ভড়ের কোন খোঁজ নাই। প্রত্যহ তিনি ইহার অনেক আগেই গিয়া ল্যাবরেটরীতে ঢোকেন, কিন্তু আজ এ কি হইল! বাড়ীর সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রফেসার ভড়ের বড় ছেলে সত্যগোবিন্দ অর্থাৎ সতু বাপের খোঁজে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কয়েক পা যাইতেই তার বন্ধু মুকুন্দের সঙ্গে দেখা। "তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম হে"—মুকুন্দ বলিল। "তোমার বাবার কি হয়েছে বল দেখি? সকালবেলা উঠে আমার কাছে গিয়ে হাজির। আমি তো ভাব্‌লাম, এই খেয়েছে, আমাদের সেই 'ড্র্যামেটিক্ ক্লাবে'র কথা হয়তো কোন রকমে জেনে ফেলেছেন, অদৃষ্টে না জানি কি আছে! কিন্তু

ও মা! উনি গিয়ে দিব্যি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লেন, "এই মুকুন্দ, আজ বিকেলে কলকাতা যাবি? খুব ভাল একটা বায়স্কোপ্ আছে। যাস্ তো চারটের সময়ে ষ্টেশনে আমার সঙ্গে 'মিট্' করিস্। শুধু এই নয়, তার পর এবার পূজোর সময়ে কি থিয়েটার করা যাবে তাই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন—"গন্ধর্ব্ব-বিজয়" প্লে করলে তিনি নাকি রাণীর পার্ট্ নিতে রাজী আছেন—বল্লেন, গানও তিনি গাইবেন। এই না ব'লে আমার হার্ম্মোনিয়াম্‌টা টেনে নিয়ে বাজাতে সুরু ক'রে দিলেন! কি ব্যাপার বল্ তো? তোর বাবা তো ভয়ানক গম্ভীর মেজাজের লোক। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি!" লজ্জা, ক্ষোভ, ভয় একত্র মিলিয়া সতুর মুখখানা এতটুকু করিয়া দিল।

বেলা তখন তিনটা হইবে। ভড়-জায়া আত্মীয়-বন্ধু যেখানে যে আছে সকলের কাছে একটা করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আবার স্বামীর খোঁজে আসিলেন। নন্তকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বাবাকে এখনু দেখেছিস্?" নন্ত জবাব দিল, "হুঁ, ঐ তো পেয়ারা-তলায় লাট্টু ঘোরাচ্ছেন।" সত্যিই তাই। প্রফেসার কোমরে কষিয়া কাপড় বাঁধিয়াছেন, আর মাটীতে গোল দাগ কাটিয়া পরমানন্দে তার মধ্যে লাট্টু ঘুরাইতেছেন। ভড়-গৃহিণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। খানিক পরে তিনি আবার সভয়ে দেখিলেন, প্রফেসার ভড় চুপি চুপি পা টিপিয়া রান্নাঘর হইতে এক খাব্‌লা নুন চুরি করিয়া পালাইয়া আসিতেছেন। তার পর উঠানের একটা ছোট আমগাছে উঠিয়া কাঁচা আম পাড়িয়া ডালে বসিয়া বসিয়াই সেই লবণ সহযোগে তার সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরই প্রফেসার ভড় না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, শত সাধ্য-সাধনা করিয়াও তাঁহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া কিছু খাওয়ান' গেল না।

পর দিন সকাল বেলা দেখা গেল প্রফেসার ভড় হামাগুড়ি দিয়া সারা বাড়ী চষিয়া বেড়াইতেছেন, আর মাঝে মাঝে কচি শিশুর মত আধ-আধ স্বরে 'ত্তা ত্তা ত্তা ত্তা' করিতেছেন। তাঁর থাবার মত বড় বড় হাতের তেলো মাটীতে পড়িয়া থপ্ থপ্ আওয়াজ হইতেছে।

ভড়-জায়া একটা ইজি-চেয়ারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনিদ্রায়, অনাহারে, দুশ্চিন্তায় তাঁর সর্ব্বশরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ বিষম খাওয়ার শব্দে তিনি ফিরিয়া দেখেন প্রফেসার ভড় সামনে বসিয়া ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছেন—যেন গলায় কিছু একটা আটকাইয়াছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মুখে হাত দিতেই একটা বড় কোটের বোতাম বাহির হইয়া আসিল। প্রফেসার ভড় খেলা করিতে করিতে সেটা মুখে পূরিয়া দিয়াছিলেন। বিরক্ত হইয়া ভড়-জায়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। খানিক পরে একটা খিল্ খিল্ হাসি শুনিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখেন প্রফেসার টেবিলের নীচে গিয়া বসিয়াছেন। তাঁর নাকে, চোখে, মুখে সর্ব্বত্র কালি মাখা। দু' হাত দিয়া তিনি একটা ভাঙ্গা

কালির দোয়াত লইয়া মাটীতে ঠুকিতেছেন।

কালির দোয়াত লইয়া মাটীতে ঠুকিতেছেন আর মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছেন। নাঃ, ব্যাপার ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

সেই দিনই আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তারের দলে বাড়ী ভর্ত্তি হইয়া গেল। মিটিং বসিল, ওষুধপত্র, ইন্‌জেক্‌শন্ সব তৈরী হইল, কিন্তু ব্যারাম ধরা পড়িল না। এমন

অদ্ভুত রোগের কথা তাঁরা কখনও শোনেন নাই, এমন ধরণের পাগলও তাঁরা কখনও দেখেন নাই।

সেই নিরানন্দের মধ্যেও দুপুর বেলা হঠাৎ বাড়ীর ছেলে-মহলে একটা অস্পষ্ট হর্ষধ্বনি শোনা গেল।—"ধীরেন কাকা এসেছেন রে, ধীরেন কাকা!" ধীরেন কাকা অর্থাৎ ধীরেন বাবু প্রফেসার ভড়ের একজন বাল্যবন্ধু,—এখন পশ্চিমে কোন্ একটা কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। তিনি অবশ্য টেলিগ্রাম পান নাই—কি একটা কাজে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন, একবার প্রফেসার ভড়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে আসিয়াছেন। পালোয়ান্ বলিয়া ইহার একটু-আধটু বদ্-নাম আছে।

বলা বাহুল্য ধীরেন বাবু ছেলে-মহলে যতটা অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন বড়দের মধ্যে তা' পাইলেন না। হাঁ করিয়া তাঁকে সমস্ত ইতিহাস শুনিতে হইল। শুনিয়া ধীরেন বাবু আর স্নানও করিলেন না, খাইলেনও না, আস্তে আস্তে প্রফেসার ভড়ের ল্যাবরেটরীতে ঢুকিয়া ভিতর হইতে খিল লাগাইয়া দিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, ধীরেন বাবু আর বাহির হইবার নাম করেন না। এদিকে প্রফেসার ভড় তাঁর আড়াই বছরের মেয়ে খুকুর সঙ্গে তার পুতুলের বাক্স লইয়া প্রায় মারামারি সুরু করিয়া দিয়াছেন বলিলেই চলে। খুকুও যেমন কান্না যুড়িয়া দিয়াছে তিনিও তেমনি ঠোঁট ফুলাইতেছেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর একবার ধীরেন বাবুর খোঁজ নিতে গিয়া সতু আসিয়া খবর দিল—ধীরেন বাবু ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন, আর মাঝে মাঝে একবার করিয়া আসিয়া বই উল্টাইতেছেন;—টেবিলের উপর সেদিনকার সেই রাসায়নিক মশলার পাত্র এখনও কানায় কানায় ভর্ত্তি, তিনি মাঝে মাঝে সেটাও পরীক্ষা করিতেছেন। হায় রে, তাঁরও বন্ধুর দশা হইল না তো?

সন্ধ্যার একটু আগে ধীরেন বাবু ল্যাবরেটরী হইতে বাহির হইয়া ডাকিলেন, "ভজ!" ভজ অর্থাৎ প্রফেসার ভজগোবিন্দ ভড় তখনই হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া ধীরেন বাবুর হাঁটু ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর পরম আনন্দে ধীরেন বাবুর

নাসিকা তক্ষণে উদ্যত হইলেন। ধীরেন বাবু প্রফেসার ভড়ের টাকের ভিতরকার স্বল্পাবশিষ্ট চুল ক'গাছি ধরিয়া প্রচণ্ড জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়া তাঁর মাথাটা সরাইয়া দিলেন। প্রফেসার ভড়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, "উঃ!" ধীরেন বাবু আর সময় নষ্ট করিলেন না, প্রফেসার ভড়ের নাকে, মুখে, চোখে অনর্গল কীল, চড় বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। ধীরেন বাবু বলিলেন, "আপনারা বাধা দেবেন না, রোগ আমি ধরেছি, ওষুধও বার করেছি; আপনারা দয়া ক'রে একটা নাপিত ডেকে দিন আর এই জিনিষ ক'টা এনে দিন।" জিনিষ আসিল, নাপিত আসিল। প্রফেসার ভড়ের টাকের মাঝখানে যে দু'-চার গাছা চুল ছিল তা'ও কামাইয়া দেওয়া হইল। ধীরেন বাবু চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "কয়েক কলসী ঘোল এনে এখানে আস্তে আস্তে ঢাল্‌তে থাক্"। তার পর তিনি এক শিশি কড়া নস্য আনিয়া প্রফেসার ভড়ের নাকের নীচে ধরিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর পিঠে আবার মুহুর্মুহু কীল-চড় বসাইতে লাগিলেন। হাঁচিতে হাঁচিতে, চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রফেসার ভড় শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু তবু নিস্তার নাই।

রাত্রি তখন প্রায় সাতটা। বসিবার ঘরে সকল গোল হইয়া বসিয়াছেন। ভড়-জায়া নিজ হাতে সকলকে কফি তৈরী করিয়া দিতেছেন। প্রফেসার ভড় এক ধারে ইজি-চেয়ারে চীৎপাৎ হইয়া শুইয়া গড়গড়া টানিতেছেন আর তাঁর পাশে বসিয়া ধীরেন বাবু হাসিমুখে যে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন তোমাদের অবগতির জন্য তা' এখানে তুলিয়া দিলাম—

অনেক দিন যাবত বিলাতের বড় বড় পণ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে বার্দ্ধক্য, জরা ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া নূতন যৌবন বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেউ কেউ খানিকটা সফলও হইয়াছেন—বানরের গ্ল্যাণ্ড্ লাগাইয়া মানুষকে নূতন যৌবন দিবার চেষ্টার কথা কে না জানে? প্রফেসার ভড়েরও ইচ্ছা ছিল ঐ রকম একটা কিছু করার। প্রাচীন মিশরে নাকি এই ব্যাপারটা অনেক দূর আগাইয়াছিল—প্রফেসার ভড় কোথা হইতে সে খবরটা পাইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে পুঁথি

সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সে পুঁথি যোগাড় করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন যাবত তাই লইয়াই দিবারাত্র পরীক্ষা করিতেন। শেষ দিন প্রফেসার ভড় সেই পুঁথি অনুযায়ী একটা ওষুধ তৈরী করেন কিন্তু সম্ভবতঃ ওষুধের বিটকেল গন্ধ ও চেহারা দেখিয়া সাহস করিয়া খাইতে পারেন নাই। ওষুধ না খাইলেও দিবারাত্র ঐ এক চিন্তার ফলে ঐ সময়ে তাঁর মনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে ওষুধ না খাইয়াও হঠাৎ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে তিনি সত্য সত্যই নূতন করিয়া পুরানো জীবন ফিরিয়া পাইতেছেন। এ সব বিষয়ে মন শরীরের উপর কি অসম্ভব রকম আধিপত্য করিতে পারে তা আধুনিক মনোবিজ্ঞান নিয়া যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁরাই জানেন। প্রফেসার ভড়েরও তাহাই হইল। প্রথম দিন তাঁর ধারণা হইল তাঁর বয়স বুঝি কুড়ি-বাইশ বছরের বেশী নয়;—তাঁর আচার-ব্যবহারেও ঠিক সেই ভাব দেখা দিল। তার পর তাঁর বিশ্বাস হইল তিনি আরও ছোট হইয়া গিয়াছেন—একেবারে দশ-বারো বছরের ছেলে যেন। সেই দিনই বিকালবেলা এই ব্যাপার ঘটে। তার পর আজ সকালে তিনি নিজের যে বয়স অনুমান করিলেন সেটা হাস্যকর হইলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে খুব আশ্চর্য্যজনক নয়। ভগবানের দয়া, প্রফেসার ভড় সেই ওষুধটি মুখে দেন নাই—তাই যা কিছু ব্যাপার তাঁর মনের উপর দিয়াই গিয়াছে, শরীরে কোনও পরিবর্ত্তন আনে নাই। ওই ওষুধে সত্যি পরিবর্ত্তন কিছু আনিত কিনা বলা কঠিন, তবে ওষুধ তৈরীতে কোনও গলদ থকিলে তাঁর জীবন বিপন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই। ধীরেন বাবু পুঁথিপত্র, প্রফেসার ভড়ের নোট্ এবং নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া ছয় ঘণ্টার পর যখন এ সব তথ্য সংগ্রহ করিলেন তখন প্রফেসার ভড়ের আরোগ্য লাভের পন্থা বাহির করিতেও বেশী বেগ পাইতে হইল না। কারণ ব্যাধি যেখানে সম্পূর্ণ মানসিক সেখানে কোন উপায়ে মন হইতে সেই চিন্তা একেবারে ঠেলিয়া দিতে পারিলেই হইল। এবং এই কার্য্যে তিনি (ধীরেন বাবু) যে উপায় ঠাওরাইয়াছিলেন তা' কিছু নিষ্ঠুর এবং বর্ব্বর হইলেও সব চাইতে সহজ উপায় সন্দেহ নাই।

ইহার কিছু দিন পরের ঘটনা। দোলাইগঞ্জে ঢুকিতেই এখন আর সেই

বিরাট চিমনীটা চোখে পড়ে না। ভড়-জায়ার নির্দ্দেশে মিস্ত্রীরা সেটিকে শাবলের সাহায্যে (এবং সেই সঙ্গে ল্যাবরেটরীটিকেও) নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

বেবুনের হাতে

(শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে)

যে সব বানরের মুখ কুকুরের মত লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের লেজ ছোট, আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিক্‌টায় কাঁচা মাংসের মত ঢিপি, তাদের নাম বেবুন্। বেবুনের আসল বাড়ী হ'ল আফ্রিকায়। কিন্তু কেউ কেউ এসিয়াতেও ক্বচিৎ ওদের দেখা পান।

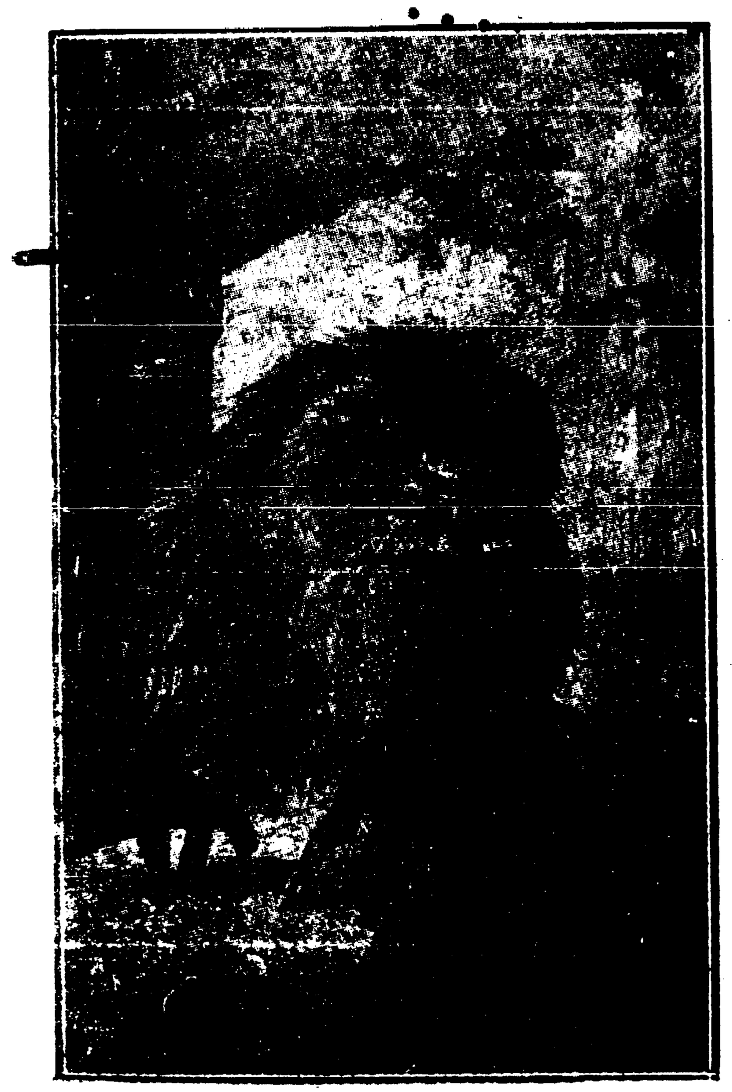

ক্রুদ্ধ বেবুন্

বেবুন্ নানা জাতের আছে—হল্‌দে বেবুন্, লালমুখো বেবুন্, ঝুঁটিওয়ালা বেবুন্, কালো বেবুন্, মেন্‌ড্রিল্ জাতীয় বেবুন্—(এরা আবার চিত্রবিচিত্র রঙ্-এর) ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গী ও চালচলন প্রায় একই রকম—উঁচু উঁচু ধারালো দাঁত, আর বদ্‌খদ্ মেজাজ। এদের মধ্যে আবার সব চেয়ে বিদ্‌ঘুটে চেহারা হচ্ছে ঐ মেন্‌ড্রিল্ জাতীয় বেবুন্‌গুলোর। টক্‌টকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি-করা মুখ,—সব মিলে সে এক অপূর্ব্ব চেহারা।

আফ্রিকার জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। ক্ষেতের উপর অত্যাচার ক'রে ফসল খেয়ে পালায়। মানুষকেও তারা দল বেঁধে বা কোন কোন সময়ে একলাই আক্রমণ করে। বিপদে পড়লে

বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে আসে, তার পর প্রচণ্ড এক কামড় লাগিয়ে দেয়। নখ আর দাঁত, এ দু'টোই হ'ল বেবুন্‌দের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হ'লে তারা পাথর ছুঁড়তেও পারে। বড়-বড় এক-এক খানা পাথর পাহাড় থেকে শত্রুর মাথায় গড়িয়ে ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ্। সেই বেবুনের আক্রমণেরই একটা সত্যিকারের কাহিনী বল্‌ছি।—

দুর্দ্দান্ত শিকারী মিঃ ইসাডোর একবার আফ্রিকার জঙ্গলে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর তাঁবু খাটিয়ে কিছু দিন ছিলেন। বেশ উঁচু জায়গা—সেখান থেকে ঝাঁপ খেলে একেবারে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে নদী-গর্ভে পড়তে হবে। এ রকম জায়গায় থাকতে হ'লে কি রকম সাবধানে থাকতে হয় তা তো বুঝতেই পার।

এক দিন তিনি ভোর বেলা নদীর তীরেই আর একটা ছোট্ট পাহাড়ে গিয়ে উঠ্‌লেন। বন্দুক সঙ্গে না নিয়ে সেদিন তিনি নিয়েছিলেন একটা লাঠি, অবশ্য সে লাঠির এক মাথায় একটা বর্শার ফলা লাগানো ছিল। পাহাড়টার চারদিক্ সাপে ভরা—লাঠি দিয়ে তিনি কয়েকটা সাপকে নাজেহাল ক'রে দিলেন। তার পর ছোট পাহাড়ের কিনারার চূড়ার উপর ব'সে পা দু'টী ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি ভোর-আকাশের সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলেন। আস্তে আস্তে সূর্য্যদেব তাঁর সোনার রথে চড়ে দেখা দিচ্ছেন আর ইসাডোর মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কে যেন মানুষের মত কাসতে লাগ্‌ল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তিনি যেমনি চোখ ফিরিয়েছেন অমনি চম্‌কে উঠ্‌লেন।

তাঁর কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে একটা মস্ত বড় বেবুন্! যেই তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া অমনি বেবুন্‌টা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। ভোরের সূর্য্যের সোনালী আভা বেবুন্‌টার মুখে পড়ে তা' যেন আগুনের ভাঁটার মত ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলতে লাগ্‌ল। পাতার মত দু'টো কান, ঠোঁট দু'টো ঈষৎ ফাঁক্—ভিতরে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত একটা ধারালো দাঁত আর লক্‌লকে জিহ্বা দেখে ইসাডোর সাহেব বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

তাঁর হাতে রাইফেল থাক্‌লে তিনি অতটা ঘাব্‌ড়িয়ে যেতেন না—কিন্তু তাঁর হাতে এক মাত্র লাঠি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র না থাকায় তিনি একটু ইতস্ততঃ ক'রতে লাগলেন। আর বেবুন্‌টার রকম-সকমও মনে হ'ল তেমন সুবিধের নয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে থাকার পর ইসাডোরই হঠাৎ একটা তীব্র ভ্রূকুটি হেনে বসলেন। বেবুনটা তা'তে কিছু মাত্র ভয় না পেয়ে উল্টে তাঁকে ভেংচি কেটে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। তার পর সে যেন নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিল! এক-একবার ইসাডোরের দিকে তাকায় আর মাটী চাপড়ায়, টেনে টেনে জঙ্গল ছেঁড়ে, আবার মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠে ধূলো ছড়িয়ে মুখখানা নানা ভঙ্গিমায় বিকৃত ক'রে ইসাডোরের দিকে তাকায়। এটা যে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ—অর্থাৎ আক্রমণ করবার—তা' বুঝ্‌তে ইসাডোরের তিল মাত্র বিলম্ব হ'ল না। এখন উপায়? একবার তিনি ভাবলেন বেবুন্‌টা যতখানি দেখ্‌তে—শয়তানীতে বোধ হয় অতটা ওস্তাদ্ নয়, হয় তো একটু ভয়-টয় দেখিয়েই চলে যাবে! কিন্তু তা তো নয়! বেবুন্‌টা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ইসাডোরের দিকে একটু একটু ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

এবার আর তিনি চুপ ক'রে না থেকে হাতের লাঠিটাকে বেশ শক্ত ক'রে বাগিয়ে ধরলেন। তার পর বেবুন্‌টা যখন তাঁর কাছ থেকে মাত্র ফুট তিনেক দূরে, তখন তিনি সজোরে হাতের লাঠিখানা দিয়ে বেবুন্‌কে দিলেন এক ঘা' লাগিয়ে। মার খেয়ে বেবুন্‌টা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আরও লম্ফঝম্ফ সুরু ক'রে দিল। হঠাৎ খপ্ ক'রে ইসাডোরের লাঠিখানা ধরে টেনে নেয় আর কি! ইসাডোর সাহেব লাঠি দিয়ে সজোরে একটা খোঁচা দিতেই অবশ্য সে লাঠি ছেড়ে দিল। তার পর তার যে তর্জ্জন-গর্জ্জন আর মুখ ভেংচানী সুরু হ'ল তা' বল্‌বার নয়। হঠাৎ বেবুন্‌টা এক লাফ দিয়ে ইসাডোরের ঘাড়ে পড়তে উদ্যত হ'ল। ইসাডোরও আর চুপ ক'রে থাক্‌বার পাত্র নন্—তিনি লাঠির উপর লাঠি চালাতে লাগলেন। লাঠির ঘা গিয়ে পড়্‌ল তার ঘাড়ে আর বাঁ চোখে—সঙ্গে সঙ্গে তার একটা চোখের হাড় ভেঙ্গে গেল; যন্ত্রণায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে আসে, তার পর প্রচণ্ড এক কামড় লাগিয়ে দেয়। নখ আর দাঁত, এ দু'টোই হ'ল বেবুন্‌দের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হ'লে তারা পাথর ছুঁড়তেও পারে। বড় বড় এক-এক খানা পাথর পাহাড় থেকে শত্রুর মাথায় গড়িয়ে ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ্। সেই বেবুনের আক্রমণেরই একটা সত্যিকারের কাহিনী বল্‌ছি।—

দুর্দ্দান্ত শিকারী মিঃ ইসাডোর একবার আফ্রিকার জঙ্গলে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর তাঁবু খাটিয়ে কিছু দিন ছিলেন। বেশ উঁচু জায়গা—সেখান থেকে ঝাঁপ খেলে একেবারে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে নদী-গর্ভে পড়তে হবে। এ রকম জায়গায় থাকতে হ'লে কি রকম সাবধানে থাকতে হয় তা তো বুঝতেই পার।

এক দিন তিনি ভোর বেলা নদীর তীরেই আর একটা ছোট্ট পাহাড়ে গিয়ে উঠ্‌লেন। বন্দুক সঙ্গে না নিয়ে সেদিন তিনি নিয়েছিলেন একটা লাঠি, অবশ্য সে লাঠির এক মাথায় একটা বর্শার ফলা লাগানো ছিল। পাহাড়টার চারদিক্ সাপে ভরা—লাঠি দিয়ে তিনি কয়েকটা সাপকে নাজেহাল ক'রে দিলেন। তার পর ছোট পাহাড়ের কিনারার চূড়ার উপর ব'সে পা দু'টী ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি ভোর-আকাশের সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলেন। আস্তে আস্তে সূর্য্যদেব তাঁর সোনার রথে চড়ে দেখা দিচ্ছেন আর ইসাডোর মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কে যেন মানুষের মত কাসতে লাগ্‌ল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তিনি যেমনি চোখ ফিরিয়েছেন অমনি চম্‌কে উঠ্‌লেন।

তাঁর কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে একটা মস্ত বড় বেবুন্! যেই তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া অমনি বেবুন্‌টা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। ভোরের সূর্য্যের সোনালী আভা বেবুন্‌টার মুখে পড়ে তা' যেন আগুনের ভাঁটার মত ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলতে লাগ্‌ল। পাতার মত দু'টো কান, ঠোঁট দু'টো ঈষৎ ফাঁক্—ভিতরে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত একটা ধারালো দাঁত আর লক্‌লকে জিহ্বা দেখে ইসাডোর সাহেব বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

তাঁর হাতে রাইফেল থাক্‌লে তিনি অতটা ঘাব্‌ড়িয়ে যেতেন না—কিন্তু তাঁর হাতে এক মাত্র লাঠি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র না থাকায় তিনি একটু ইতস্ততঃ ক'রতে লাগলেন। আর বেবুন্‌টার রকম-সকমও মনে হ'ল তেমন সুবিধের নয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে থাকার পর ইসাডোরই হঠাৎ একটা তীব্র ভ্রূকুটি হেনে বসলেন। বেবুনটা তা'তে কিছু মাত্র ভয় না পেয়ে উল্টে তাঁকে ভেংচি কেটে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। তার পর সে যেন নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিল! এক-একবার ইসাডোরের দিকে তাকায় আর মাটী চাপড়ায়, টেনে টেনে জঙ্গল ছেঁড়ে, আবার মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠে ধূলো ছড়িয়ে মুখখানা নানা ভঙ্গিমায় বিকৃত ক'রে ইসাডোরের দিকে তাকায়। এটা যে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ—অর্থাৎ আক্রমণ করবার—তা' বুঝ্‌তে ইসাডোরের তিল মাত্র বিলম্ব হ'ল না। এখন উপায়? একবার তিনি ভাবলেন বেবুন্‌টা যতখানি দেখ্‌তে—শয়তানীতে বোধ হয় অতটা ওস্তাদ্ নয়, হয় তো একটু ভয়-টয় দেখিয়েই চলে যাবে! কিন্তু তা তো নয়! বেবুন্‌টা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ইসাডোরের দিকে একটু একটু ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

এবার আর তিনি চুপ ক'রে না থেকে হাতের লাঠিটাকে বেশ শক্ত ক'রে বাগিয়ে ধরলেন। তার পর বেবুন্‌টা যখন তাঁর কাছ থেকে মাত্র ফুট তিনেক দূরে, তখন তিনি সজোরে হাতের লাঠিখানা দিয়ে বেবুন্‌কে দিলেন এক ঘা' লাগিয়ে। মার খেয়ে বেবুন্‌টা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আরও লম্ফঝম্ফ সুরু ক'রে দিল। হঠাৎ খপ্ ক'রে ইসাডোরের লাঠিখানা ধরে টেনে নেয় আর কি! 'ইসাডোর সাহেব লাঠি দিয়ে সজোরে একটা খোঁচা দিতেই অবশ্য সে লাঠি ছেড়ে দিল। তার পর তার যে তর্জ্জন-গর্জ্জন আর মুখ ভেংচানী সুরু হ'ল তা' বল্‌বার নয়। হঠাৎ বেবুন্‌টা এক লাফ দিয়ে ইসাডোরের ঘাড়ে পড়তে উদ্যত হ'ল। ইসাডোরও আর চুপ ক'রে থাক্‌বার পাত্র নন্—তিনি লাঠির উপর লাঠি চালাতে লাগলেন। লাঠির ঘা গিয়ে পড়্‌ল তার ঘাড়ে আর বাঁ চোখে—সঙ্গে সঙ্গে তার একটা চোখের হাড় ভেঙ্গে গেল; যন্ত্রণায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

কিছুক্ষণ বেবুন্‌টা মাটীতে লুটিয়ে পড়ে এপাশ-ওপাশ ক'রতে লাগ্‌ল, তার পর উঠে ইসাডোরের দিকে অত্যন্ত কদর্য্য ভঙ্গীতে তাকাতে তাকাতে একটু একটু ক'রে ঝোপের ভিতরে প্রবেশ কর্‌ল। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল—তার পর সে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ইসাডোরও হাঁফ্‌ ছেড়ে, পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে রক্ষা পেলেন মনে ক'রে তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগলেন।

সূর্য্যদেব বেশ স্পষ্ট হ'য়ে আকাশ-পটে উদিত হ'য়েছেন। তাঁর সেই সোনালী কিরণ পাহাড়ের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। জংলী গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো কচি হাসির মত সেই সোনালী কিরণ দেখা যাচ্ছে। নানা পাখীর কাকলী ধ্বনিতে চারিদিক্‌ মুখরিত। ইসাডোর আপন মনে তাঁবুর দিকে ফিরছিলেন—আর মনে মনে একটু অনুতাপ করছিলেন বেবুন্‌টার কথা ভেবে। কিন্তু বেবুন্‌টারই তো দোষ, অযথা কেন সে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতে এল? এমনি ভাব্‌তে ভাব্‌তে ইসাডোর অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন, এমন সময় হঠাৎ পাশের জঙ্গলের লতাপাতার আড়ালে বেশ খানিকটা খক্‌খক্‌ শব্দ! ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন—ও মা! এ কি! এ তো সেই বেবুন্‌টা! আবার তাঁকে আক্রমণ করতে পিছনে পিছনে ফিরে এসেছে! এবার রাগে ক্ষোভে তার চোখ দু'টো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার! ক্ষণ বিলম্ব না ক'রেই বেবুন্‌টা আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হ'ল।

ইসাডোর ভাব্‌লেন, এবার আর রক্ষা নেই—শেষ প্রতিশোধ নিতে ও এবার তাঁকে আক্রমণ ক'রবে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে লাঠির আগায় লাগানো বর্শাফলক দিয়ে তিনি যেমন বেবুন্‌টাকে একটা খোঁচা দিতে গেলেন—অমনি সে এক পাশে সরে গেল; এবার সে বেশ চালাক হ'য়ে এসেছে। যেমনি সে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে অমনি লক্ষ্য ফস্‌কিয়ে ইসাডোর হুমড়ি খেয়ে একেবারে বেবুনের গায়ের উপর পড়লেন। আর যাবে কোথা? বেবুন্‌টা তো আর নেহাৎ কাঁচা নয়! এবার সে বেশ মরিয়া হ'য়েই এসেছে। বেবুন্‌টার দেহের

উপর পড়েই ইসাডোর সাহেব ফস্‌ ক'রে তার গলাটা সজোরে টিপে ধরলেন। তার পর দু'জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি।

ভাগ্যের জোর—বুদ্ধি ক'রে ইসাডোর বেবুনের গলাটা ধরে ফেলেছিলেন, নইলে দাঁত দিয়ে বেবুন্‌টা তাঁকে এতক্ষণ আর আস্ত রাখ্‌ত না। কিন্তু তবু বেবুন্‌টা সমানে চড় আর ঘুঁষি চালাতে লাগ্‌ল; বেবুন্‌ আর মানুষে সে যেন এক সাংঘাতিক ব্যাপার! ইসাডোর বেবুন্‌টার গলা এমনি শক্ত হাতে ধরেছিলেন যে বেবুন্‌টা তা' থেকে কিছুতেই মুক্ত হ'তে পারছিল না। যদি সে একটী বারের জন্য মুক্ত হ'তে পার্‌ত তবে দু'পায়ের নীচে তাঁকে ফেলে বাকী দু'পা দিয়ে তাঁকে যা ক'রে তুল্‌ত তা' তো বুঝতেই পার্‌ছ।

সমানে দু'জনে যুদ্ধ চলেছে—এমন সময় ইসাডোরের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল; বেবুন্‌টার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে করতে তিনি তাকে নিয়ে একেবারে প্রায় নদীটার তীরে এসে হাজির হ'লেন। তিনি মনে করেছিলেন বেবুন্‌টাকে কোন রকমে একবার নীচে ফেলে দিতে পারলেই বাজি মাৎ। কিন্তু ফল ফল্‌ল তার উল্টো—বেবুন্‌টাই বরং তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয় আর কি! একেবারে এই পড়ে তো এই পড়ে। কিন্তু ইসাডোর প্রাণপণ শক্তিতে বেবুন্‌টাকে শক্ত ক'রে ধরে রইলেন কারণ সেখান থেকে একটু ফস্‌কালেই একেবারে পঞ্চাশ ফুট নীচে নদীর মধ্যে। নদীতে পড়ে সাঁতরাবারও উপায় নেই, কারণ তা' অসংখ্য কুমীরে ভরা—পড়বামাত্রে তাদের খপ্পরে যেতে হবে।

এদিকে বেবুন্‌টা মিঃ ইসাডোরের গায়ের মাংস টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগ্‌ল। হঠাৎ ইসাডোরের একটা বুদ্ধি গজাল—তিনি করলেন কি, মুক্ত প্রান্তরের দিক্‌ থেকে তাঁর পা দু'খানা গুটিয়ে এনে প্রাণপণ শক্তিতে বেবুন্‌টাকে এক লাথি মারলেন। অমনি ঝপাং ক'রে একটা শব্দ। নিজে তিনি কোন রকমে টাল সামলাতে সামলাতে পাহাড়ের উপরই র'য়ে গেলেন। তার পর একটু সুস্থির হ'য়ে তাকিয়ে দেখেন—বেবুন্‌টা নির্ব্বিবাদে নদী পার হ'য়ে বালুময় তীরে গিয়ে উঠ্‌ল আর তক্ষুণি দৌড়িয়ে ঢুক্‌ল গিয়ে বনের ভিতর।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি এল্)

২

বিশেষজ্ঞ যুগল

তিন দিন পরের ঘট্না, ঘটনাস্থল কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চল। ছোট্ট অথচ আধুনিক রুচি-সম্পন্ন একখানি বাড়ীর বৈঠকখানায় তুইটী যুবক বসিয়া গল্প করিতেছিল—একজন বাড়ীর মালিক, অপরটি তারই এক আগন্তুক বন্ধু। বাড়ীর মালিকের নাম তুর্গাপ্রসন্ন; বিলাত হইতে সে হস্তাক্ষরবিশেষজ্ঞ (handwriting expert) হইয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং সরকারি অফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরি করিতেছে। আর তার বন্ধুটি? তু শ' কুড়ি গজ, চার শ' চল্লিশ গজ, আট শ' আশী গজ, এক মাইল প্রভৃতি হরেক রকমের দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে একবার নয় একাদিক্রমে অনেক বার সে প্রথম হইয়াছে। হাই-জাম্প্, লং-জাম্পে এখনও তার 'রেকর্ড্' এ দেশে কেউ ভাঙ্গিতে পারিয়াছে কিনা জানি না। তার সাঁতারের কৌশল দেখিয়া এক সাহেব বলিয়াছিল—লোকটা 'ম্যান্-ফিশ্'; এত বড় চৌকস খেলোয়াড় নাকি এ দেশে কমই জন্মিয়াছে। নাম রণজিৎ।

তুই কাপ্ চা নিঃশেষ করিবার পর তুর্গাপ্রসন্ন সশব্দে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কি এক প্রয়োজনে নাকি তাকে বাড়ীর বাহির হইতে হইবে। চেয়ারের উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া জুতার ফিতা আঁটিতে আঁটিতে সে কহিল, "বাই-দি-বাই, রণজিৎ, সেদিন বল্ছিলে তোমার গুরুদেব নাকি আক্ষেপ কর্ছেন যে তেমন জটিল রহস্য আর তাঁর কাছে আসে না; কল্কাতার খানিকটা দূরে কিন্তু বেশ একটু রহস্য চাক বাঁধ্তে সুরু করেছে, এরই মধ্যে একটু একটু গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছেছে!"

রণজিতের 'গুরুদেব' বলিয়া তুর্গাপ্রসন্ন যে ভদ্রলোকটির ইঙ্গিত করিল তিনি আর কেহই নন—সুপ্রসিদ্ধ জাপানী ডিটেক্টিভ্ হুকা-কাশি। রণজিৎ যে হুকা-কাশির বিশেষ গুণগ্রাহী ভক্ত সে কথা তুর্গাপ্রসন্ন জানিত, তাই রণজিতের সম্মুখে তাঁর উল্লেখ করিতে হইলেই ঠাট্টার ছলে বলিত 'তোমার গুরুদেব'।

রণজিৎ বলিল, "হ্যাঁ, মিষ্টার হুকা-কাশি সে কথা বল্ছিলেন বটে! ঘোষ-চৌধুরীর ঘড়ির কিনারা কর্বার পর থেকে তাঁর কাছে যে সব 'কেস্' আস্ছে সে গুলো নাকি একেবারেই ছেলে-খেলার ব্যাপার। তু'-এক দিন মাথা ঘামালেই সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। দস্তুর মত

ঘোরালো কোন্ ব্যাপার না পেলে ওঁর মগজের যে আসল খোরাক জোটে না, সে কথা ভাই আমিও বুঝি। হ্যাঁ, কল্কাতার কাছে কোথায় কি ঘটেছে বল্ছিলে?"

জুতার ফিতা আঁটা হইয়া গিয়াছিল, তুর্গাপ্রসন্ন কাপড়ের খুঁট দিয়া চেয়ারটা একটু ঝাড়িয়া নিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর এক বার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, "শ্রীপুর বলে কোন জায়গার নাম শুনেছ?"

"হ্যাঁ, ঠিক গঙ্গার ওপরেই তো? এক বার এক বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম; মস্ত বড় একটা চিনির কল আছে, না?"

"অনেক খবরই রাখ দেখ্ছি! সেই চিনির কলের মালিকের কথাই বল্ব। ভদ্রলোকের

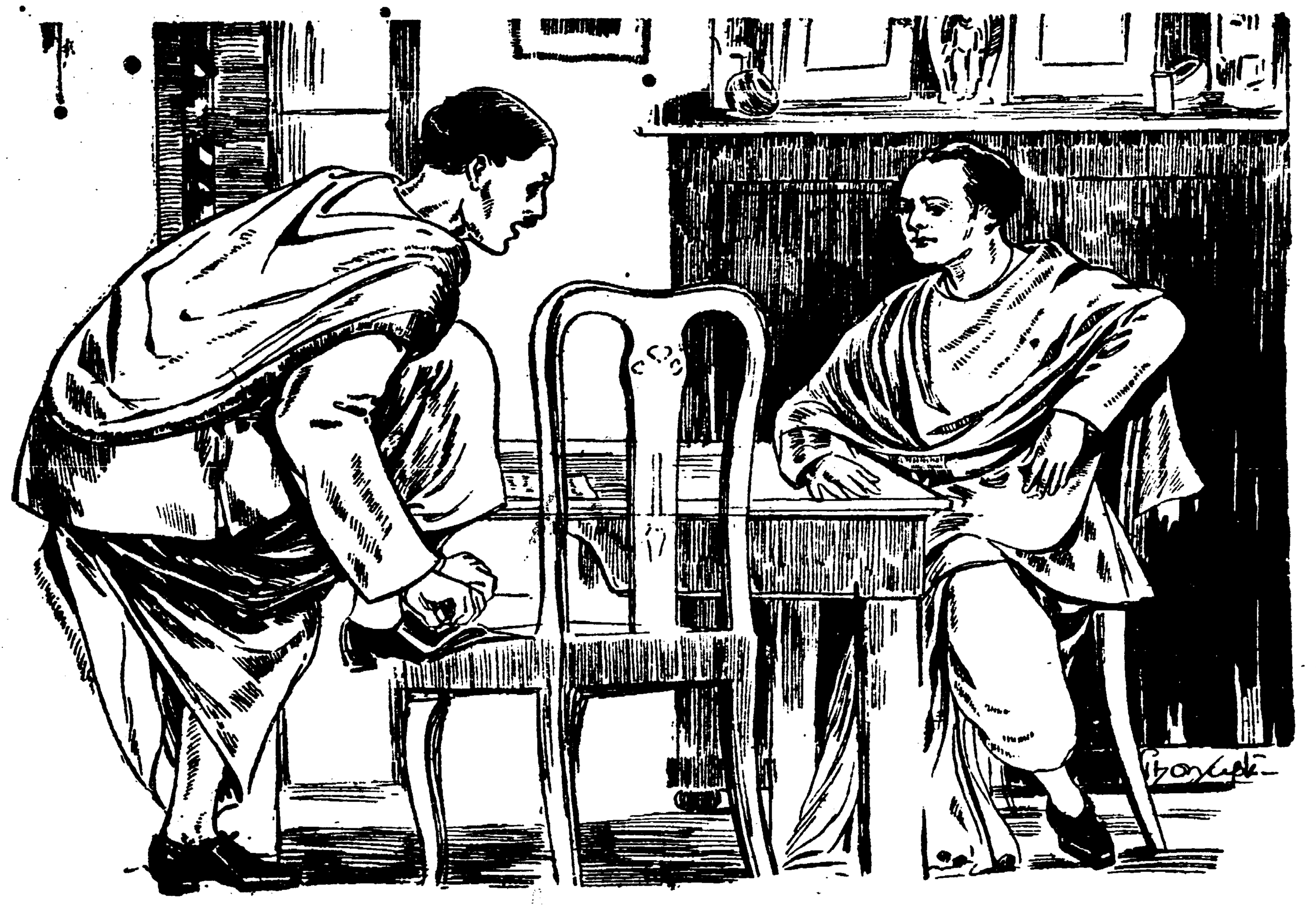

জুতার ফিতা আঁটিতে আঁটিতে...

নাম দ্বারিক বোস্—অতিশয় ঘুঘু লোক, ছেলেবেলা থেকেই ওঁদের চিনি কিনা! বিস্তর পয়সা, আর পয়সা বাড়াবার ফিকির-ফন্দিও নানা রকমের জানা আছে। দিন কতক আগে কোত্থেকে কে এসে চুপি চুপি ওঁকে জানিয়ে গেছ্ল সুন্দরবন-অঞ্চলে ছোটখাটো একটা জমিদারী মাটীর দরে বিক্রী হচ্ছে, আসল দর তার পাঁচ লাখের কম নয়, তবে কমিশন বাবদ লোকটাকে কিছু দিলে এক লাখেই দ্বারিক বোস্কে সে তা পাইয়ে দিতে পারে। বুঝ্তেই পার্ছ কি রকম মোটা রকমের দাঁও! দ্বারিক বাবু হেন ব্যক্তি কথাটাকে পাঁচ কান হতে দিতে পারেন না, তু'দিনের মধ্যেই সম্পত্তি কেন্বার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেল্লেন। এখন কথা হচ্ছে,

হাজার বড় লোক হোক্, ব্যবসাদার তো বটে ; পাঁচ জায়গায় টাকা লাগানো রয়েছে, অত অল্প সময়ের মধ্যে লাখ টাকা একত্র জোগাড় করা একটু কষ্টকর বই কি ? ঠিক করলেন আপাততঃ কোন ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ্জ নিয়ে উপস্থিত কাজ চালিয়ে নেবেন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিতে গেলে কিছু সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া দরকার ; জমিদারী অথবা বাড়ী বন্ধক দিতে গেলে হাঙ্গামা অনেক, আর তা ছাড়া ব্যাপারটা যে জানা-জানি হয়ে পড়বে না তাই বা কে বল্‌বে ? অনেক ভেবে দ্বারিকা বাবু তাঁর তোষাখানা থেকে এমন একখানা জিনিষ বার করলেন যা প্রায় লাখ দু'ই টাকার মাল। আমরা তখন খুব ছোট,—প্রায় বছর পনেরো আগেকার ঘটনা—দেনার দায়ে ইকুলিসপুরের রাজার অনেক ধনরত্ন নিলামে চড়েছিল। দ্বারিক বোস্ সেই নিলামে স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিজে পছন্দ করে একটা সোনার হরিণ কিনে এনেছিলেন। শুনেছি সেটা নীরেট সোনার, শিং দুটো স্ফটিকের, আর গায়ের ছিট্ ছিট্ গুলোর জায়গায় এক একখানি চোখ-ঝল্‌সানো হীরা বসানো। দ্বারিক বাবু তাঁর এটর্ণী অবিনাশ দত্তের মারফৎ সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা আনালেন। তার পর কিছু দিনের মধ্যেই লাখ টাকার জোগাড় দ্বারিক বাবু করে ফেল্লেন। অবিনাশ বাবুর ওপর ভার পড়্‌ল ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে সোনার হরিণটি খালাস করে আন্‌বার। টাকা জমা দিয়ে অবিনাশ বাবু হরিণ ছাড়িয়ে এনেছেন, দু'-এক দিনের মধ্যেই দ্বারিক বাবুর কাছে সেটা পৌঁছে দেবেন, ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। দ্বারিক বোসের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী অহিভূষণ তাঁর নামের একখানা চিঠি দেখিয়ে অবিনাশ বাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণটি হাত করে উধাও হয়ে গেছে।"

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওঃ, এই তোমার রহস্য ? তা, এ ভেদ কর্‌বার জন্যে আর হুকা-কাশির কাছে ছুট্‌বার দরকার নেই, আমিই হদিস বাৎলে দিচ্ছি। সেই জোচ্চোরটার ফটো থাকে তো একখানা ফটো, আর তা না হলে চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ খবরের কাগজে ছাপিয়ে সেই সঙ্গে একটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে দাও, এদিকে পুলিশেও খবর দেওয়া থাক্—দু'দিন বাদে দেখ্‌বে হিড়্ হিড়্ করে তাকে টেনে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। লুকিয়ে মানুষ ক'দিন থাক্‌তে পারে হে ?"

"অত সহজ নয় হে বৎস, অত সহজ নয়। প্রথমতঃ তুমি যাকে জোচ্চোর ঠাউরে বসে আছ সে স্বেচ্ছায় এ কাজ করে নি, করেছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। কি কারণে জানি না, এক দল ষড়্‌যন্ত্রকারীর কাছে লোকটা ঠেকে পড়েছিল—একেবারে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তারাও সুবিধে পেয়ে যন্ত্রের মত ওকে চালিয়েছে। এ কাজটি হাসিল কর্‌বার জন্যে তারা অনবরত ওর ওপর চাপ দিচ্ছিল, অনেক দিন ও যুঝেছে ; তার পর বোধ করি ভাব্‌লে, রাম মার্‌লেও মার্‌বে, রাবণ মার্‌লেও মার্‌বে, যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ সেটাই বরং বেছে নেওয়া যাক্ !…কিন্তু এর

চাইতেও বড় রহস্য হচ্ছে চিঠিখানা। দ্বারিকা বাবু বার বার বল্‌ছেন, ও চিঠির সই কক্ষণো তাঁর নিজের হাতের নয়। সইটা জাল কিনা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য চিঠিখানা আমার কাছে পাঠান হয়েছিল, আমি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, সই আদবেই জাল নয়, স্পষ্ট দ্বারিক বাবুর নিজের হাতের লেখা। জালিয়াৎ আস্তে আস্তে ধ'রে ধ'রে মানুষের হাতের লেখার অবিকল নকল্ করতে পারে বটে, তার ওপর কালীর দাগ বুলিয়ে সাধারণ লোকের চোখে ধূলোও দিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে ধূলো দেওয়া অত সহজ নয়। আস্তে আস্তে ধ'রে ধ'রে যে দাগ টানা হয় তার রেখা হয় ক্ষীণ, জায়গায় জায়গায় তা আবার কেঁপেও যায়। কালীর দাগ বুলোলে সাদা চোখে সে সব ধরা পড়ে না কিন্তু তেমন পাওয়ারফুল্ মাইক্রস্‌কোপের নীচে ফেল্লেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়, ক্ষীণ রেখা, কাঁপুনির আভাস সমস্তই সুস্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রেও এ সব ব্যাপারে অদ্ভুত রকম সাহায্য করে। আমি আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রে ফেলেও পরীক্ষা করেছি, এ একটানা সই, চেষ্টা-চরিত্র করে আঁকা নয়। লেখার ধাঁজও দ্বারিক বোসেরই মত।

"তবে তোমার দ্বারিক বোসকেই ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে বল গে'—ফাইল ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে মনের ভুলে বুড়ো কখন্ কি করে বসেছে।"

"তাও বলেছিলাম হে বন্ধু,—বলেছিলাম, 'আপনার দৃষ্টিশক্তি কম, তাতে চোখে ছানি পড়ে আসেছে, বোধ করি চিঠিখানা ভাল করে পড়্‌তে পারেন নি—উপুড় উপুড় দেখেই সই করে দিয়েছেন।' শুনে বুড়ো ক্ষেপেই অস্থির, বলে, 'হ্যাঁ বুড়ো হলে তোমাদের ওই দশাই হবে তা জানি, তবে আমরা আলাদা কাঠামোয় তৈরী, আমাদের এ রকম ভুল হয় না যে চিঠি না পড়েই সই করে দেব। তোমাদের মত হলে আর করে খেতাম না!' লোকটা বৃথাই এত কাল চিনির কারবার কর্‌লে হে, কারবার করা উচিত ছিল কুইনিনের। কথায় চিনির আভাস মাত্র নেই।… উঠি এইবার, পরীক্ষার ফলটা একবার জানিয়ে আসি।"

পর দিন সকাল বেলা রণজিৎ বাড়ীর বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস পড়িতেছিল। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, শরীরে কেমন একটা জড়তা আসিয়াছিল, তার উপর বইখানায় মনও বসিয়াছিল খুব, রণজিৎ তাই স্থির করিল এ বেলা আর বাড়ীর বাহির হইবে না। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন, অল্প একটু পরেই প্রকাণ্ড একখানা মোটর গাড়ীতে দুর্গাপ্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত, তার সঙ্গে একটী রুগ্নকায় ভদ্রলোক। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই পরিচয়াদির পালা শেষ হইয়া গেল—সঙ্গের ভদ্রলোকটি দ্বারকানাথ, হুকা-কাশির সাক্ষাৎপ্রার্থী—রণজিৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে আসিয়া হুকা-কাশির বাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকিলেন। বাড়ীর

বেহারা রণজিৎকে ভাল মতই চিনিত, স্মিত মুখে অভিবাদন করিয়া সে সকলকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইল, তার পর সবিনয়ে জানাইল কর্ত্তা স্নানের ঘরে আছেন, সেখান হইতেই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া খবরের কাগজ পড়ার উদ্দেশ্যে এই ঘরেই ঢুকিবেন, কাজেই খবর দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সকলে অল্প একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিতর দিক্‌কার দরজায় খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং ঠিক পরের মুহূর্ত্তে, হুকা-কাশি ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চকিত-দৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তিনি চাহিলেন, তার পর রণজিতের দিকে ফিরিয়া একটু সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "রণজিৎ বাবু যে, কতক্ষণ?" চেয়ারে বসিতে বসিতে ঘাড় বাঁকাইয়া ফটকের সম্মুখটা একটু দেখিয়া নিয়াই আবার বলিলেন, "যাক্, গাড়ী বিদেয় করে দিয়েছেন, ওঠ্‌বার জন্যে তা' হলে এখুনি তাড়াহুড়ো কর্‌ছেন না নিশ্চয়ই!"

দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন; তাঁর গাড়ীখানার প্রচুর দাম, চলিবার সময়ে একেবারেই আওয়াজ হয় না বলিয়া মনে মনে তাঁর গর্ব্বও আছে যথেষ্ট! হুকা-কাশি ছিলেন এতক্ষণ বাড়ীর ভিতর স্নানের ঘরে, কেউ তাঁহাকে তাঁদের আগমন-সংবাদ দেয় নাই, অথচ গাড়ীর শব্দ তাঁর কানে গিয়া পৌঁছিল কি ভাবে? লোকটার শ্রবণ-শক্তি কি তবে অসাধারণ নাকি? মনের ঔৎসুক্য মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি বাহির করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আপনি বাড়ীর ভেতর থেকেও আমাদের গাড়ীর আওয়াজ কি করে শুন্‌তে পেলেন তাই ভেবে অবাক্ হচ্ছি?"

"গাড়ীর আওয়াজ? কই, তা তো আমি পাই নি!"

"তবে? আমাদেরকে বাড়ীতে ঢুক্‌তেও তো আপনি দেখেন নি! কি করে আঁচ্‌লেন আমরা হেঁটে আসি নি, গাড়ীতে এসেছি?"

হুকা-কাশি অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, "একটু আগে আপনাকেও তো আমি দেখি নি! তা সত্ত্বেও কি করে এখন বল্‌ছি যে খানিকটা আগে আপনি কোট-প্যাণ্ট্ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?"

দ্বারকানাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই, রণজিতের বাড়ী রওনা হইবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্যুট পরিয়া নানা জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে খবর এ লোকটি পাইল কোথায়? জ্যোতিষ জানা আছে নাকি?

দ্বারকানাথের মনের ভাব হুকা-কাশি বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "আশ্চর্য্য হবার খুব বেশী কিছু কিন্তু নেই এর ভেতর। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার। আমাদের এদিকে পিচের রাস্তা হয় নি, খোয়ার রাস্তা, বৃষ্টি হবার ফলে সেখানে কি রকম কাদা হয়েছে দেখ্‌ছেন

তো! এবার আপনাদের জুতো গুলোর দিকে তাকান দেখি—তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কাদার বাষ্পও ওতে লেগে নেই। যে মেঝের ওপর দিয়ে আপনারা হেঁটে এসেছেন, সেইটেও পরীক্ষা করুন, কাদার সামান্য ছোপ্‌ও চোখে পড়্‌ছে কি? আপনারা ও রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে এ সব ব্যাপার কি কখনো সম্ভব হ'ত? বুঝ্‌লাম, নিশ্চয়ই আপনারা গাড়ীতে এসেছেন। কোন গাড়ীই ফটকের আশ-পাশে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কাজেই আপাততঃ সেটা নিশ্চয়ই বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে।"

রণজিৎ ছাড়া আর সকলেই হুকা-কাশির পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। দ্বারকানাথ বলিলেন, "কিন্তু এখানে আস্‌বার আগেই স্যুট্ বদ্‌লে ধুতি পরে এসেছি সে খবর কি করে জান্‌লেন? গায়ে তো আর স্যুটের দাগ লেগে নেই?"

হুকা-কাশি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাও আছে। আপনার চুল অনেক দিন ছাঁটা হয় নি, বেশ বড় হয়ে পড়েছে; তার ওপর টুপিটা একটু আঁট্ হয়েছিল, ফলে চুলের ওপর একটু গোল দাগ এখনো নজরে পড়্‌ছে। কপালও একটু লাল্‌চে হয়ে আছে। বেশী আগে টুপি খোলেন নি, তা হলে এগুলো মিলিয়ে যেত নিশ্চয়ই। আপনি বাঙ্গালী, কাজেই ধুতির ওপর যে টুপি পরেন নি. স্যুট্ পরেছিলেন এ কথা আঁচা আর শক্ত কি?"

দ্বারকানাথ এবং দুর্গাপ্রসন্ন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

কমলাদের জামাই বাবু

(শ্রীহেমলতা দেবী)

কমলাদের জামাই বাবু ভারী সুরসিক। কত মজার মজার গল্প যে তিনি জানেন, কত রকমারি খেলা, কত নতুন ধরণের ধাঁধা, তা আর কি বল্‌ব! তিনি বেড়াতে আস্‌বেন শুন্‌লে বাড়ীর ছেলে-মহলে এক উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। তারা পাড়ার বুড়োদের কাছ থেকে কত জামাই-ঠকানো প্রশ্ন, রকমারি ধাঁধা আগে থেকে শিখে রাখে, মৎলবখানা জামাই বাবু এলেই তাঁকে কাৎ করে দেবে। কিন্তু

জামাই বাবু বড় শক্ত চীজ, কাৎ তো হনই না বরং সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে উল্টে এম্‌নি কতকগুলো ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে বসেন যে কমলারা ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায়, জবাব খুঁজে পায় না কোথাও।

সেবার ইষ্টারের বন্ধে জামাই বাবু চিঠি লিখ্‌লেন, কয়েক দিনের জন্য তিনি শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে আস্‌বেন। শুনে সবাইকারই ভারী ফূর্ত্তি। পূজোর সময় কমলা আর পৃথ্বীশ জামাই বাবুর হাতে বেজায় নাকাল হয়েছিল, তারা তাদের ইস্কুলের সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্থির করে তুল্‌ল—এবার য়্যায়সা ধাঁধা তাদের শিখিয়ে দিতে হবে যে তা শুনে জামাই বাবুর চক্ষু যেন চড়ক গাছ হয়ে যায়। দিন কতক ফিস্‌-ফিস্‌ ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করবার পর তাদের ধাঁধা ঠিক হল, এবার বড় দিনের ছুটী এলেই হয়।

বড় দিনের ছুটী এল যথা সময়েই। কিন্তু কমলাদের মনে হল বড্ড দেরী করে এসেছে। তার পর এক দিন সকাল বেলা জামাই বাবু এসে উপস্থিত হলেন। ছেলে-মহলে একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর জামাই বাবুকে নিয়ে সবাই ঘিরে বস্‌ল। প্রথমেই কমলা তার ধাঁধা জিজ্ঞাসা করলে, তাদের ইস্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাশের একটি মেয়ে তাকে প্রশ্নটি শিখিয়ে দিয়েছিল। ধাঁধাটি হচ্ছে এই—একটি মেয়ে B. A. পাশ করবার পরেই তার নামের পেছনে M. A. লিখতে সুরু কর্‌ল। প্রথমটা সকলেই অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার পরেই তারা বুঝতে পারল এতে কিছু অন্যায় হয় নি। ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হতে পারে? এ ধাঁধার উত্তর কিছু কঠিন নয়; B. A. কথাটা পূরো করে লিখ্‌লে হয় Bachelor of Arts. এখন তোমরা জান, Bachelor কথাটা পুংলিঙ্গ, তার স্ত্রীলিঙ্গে হয় Maid; কাজেই সে মেয়েটি নিজের নামের শেষে Bachelor of Arts না লিখে Maid of Arts লিখেছিল, সেটাই হল সংক্ষেপে M. A। কমলা ভেবেছিল জামাই বাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না; জামাই বাবু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁধাটির ঠিক মত জবাব দিয়ে কমলাকে একেবারে বসিয়ে দিলেন। কমলার মাথা হেঁট হয়ে গেছে দেখে পৃথ্বীশ অম্‌নি তাড়াতাড়ি তার প্রশ্ন হেঁকে বস্‌ল—"একজন লোক ১৯২০ সনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙ্গ্‌ল তার ১৯২১ সনে;

অথচ সব শুদ্ধ সে সাত ঘণ্টার বেশী ঘুমোয় নি। কি করে তা হয়?" জামাই বাবু বল্লেন, "কেন তা হবে না? সে যদি ১৯২০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার ঠিক আগে ঘুমোয় তবে সাত ঘণ্টা পরে উঠে আলবৎ দেখ্‌বে যে ১৯২১ সন এসে গেছে।"

এক নিমেষে কমলার মত পৃথ্বীশেরও উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেল।

তখন জামাই বাবু বল্লেন, "তোমরা তো দু' দুটো প্রশ্ন করে নিজেরাই ঠকে গেলে, এবার আমি একটা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা জবাব দাও দেখি········কল্‌কাতা সহরে একজন লোক ঘড়ি ধরে ঠিক বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় বাড়ী থেকে রওনা হল—তাকে শেয়ালদা যেতে হবে। শেয়ালদা যেতে লাগে পাঁচ মিনিট; সেখানে গিয়ে সে যখন উপস্থিত হল তখন বারোটা বাজ্‌তে এক মিনিট বাকী! বল তো কি করে হল?"

কমলাদের ভারী উৎসাহ লেগে গেল। প্রশ্নটার জবাব দিয়ে জামাই বাবুর মুখ ভোঁতা করে দিতেই হবে। তারা ক্যাল্‌কাটা টাইম্‌, ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌ নিয়ে অনেক অঙ্ক কষ্‌ল, জিওগ্রাফি খুলে গ্রীণ্‌উইচের আর আমেরিকার সময়ের সঙ্গে কল্‌কাতার সময় মিলিয়ে দেখ্‌ল, কত কি যে কর্‌ল তার ঠিকানা নাই। কিন্তু জবাব মেলে না কিছুতেই। শেষটায় তারা এক দম্‌ হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, "হার মান্‌লুম জামাই বাবু, কি হবে বলুন না!"

জামাই বাবু বল্‌লেন, "পার্‌লে না তো?"

"না"

"হুঁ হুঁ, পারলে না তো?"

"না"

জামাই বাবু একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "লোকটার ঘড়ি খানিকটা ফাষ্ট্‌ ছিল।"

কমলার দিদি এবং অন্যান্য দাদারা আড়ালেই ছিল, সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। বাস্তবিকই জামাই বাবু ভারী দুষ্টু, নয় কি?

সন্দেশ

কিছু দিন পূর্ব্বে তোমরা রামধনুতে বিব্ ও বার্টন্ সাহেবের অদ্ভুত ঘর তৈরী করিয়া গভীর সমুদ্রে নামিয়া গবেষণা করিবার কাহিনী পড়িয়াছ। পাশে যে বিরাট্ বলের মত জিনিষটি দেখিতেছ এটিও সেই ধরণের একটি অদ্ভুত ঘর—তবে আরও অনেক বড়। এই বলের ব্যাস ৩০ ফিট্—আগাগোড়া মজবুত ইস্পাতে তৈরী, অবশ্য ভিতর হইতে দেখিবার জন্য স্বচ্ছ পর্দ্দার ব্যবস্থা আছে। ক্লড্ নামে একজন ফরসী বৈজ্ঞানিক এটি তৈরী করিয়াছেন। সমুদ্রের ভিতর আধ মাইল্ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়া সেখানকার নানা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এটি তৈরী করা হইয়াছে।

সমুদ্রের নীচে নামিবার অদ্ভুত ঘর

* * *

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন পৃথিবীতে এখনও প্রায় ১০ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা মানুষের অনাবিষ্কৃত আছে। সে দেশ চিরতুষারের দেশ—সেখানকার প্রচণ্ড শীতের জন্যই মানুষ এ পর্য্যন্ত তাকে জয় করিতে পারে নাই। সম্প্রতি আমেরিকার ডক্টর হ্যারিশ্ এই অনাবিষ্কৃত দেশ সম্বন্ধে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য রওনা হইবেন ঠিক করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী আয়োজন করিতেছেন। এই যাত্রা জল-পথে হইবে না, হইবে আকাশ-পথে এবং ইহার জন্য বিশেষ ভাবে একখানি এরোপ্লেন্ও তৈরী করা হইয়াছে।

* * *

ইউরোপের কোন কোন সহরে আজকাল ট্রাম গাড়ীর চাকা মোটর-বাসের মত ছো[illegible] রবার দিয়া তৈরী করা হইতেছে। যদিও সে চাকা লাইনের উপর দিয়া চলে কিন্তু তা'তে কোনও বিরক্তিকর আওয়াজ হয় না।

* * *

জনৈক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন আমরা প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ১৫ ছটাক বাতাস টানিয়া লই এবং ১০ ছটাক বাহির করিয়া দেই।

* * *

দূর আকাশের উপর দিয়া যখন এরোপ্লেন্ উড়িয়া যায় তখন তার শব্দে কান ঝালাপালা হইবার যোগাড় হয়, কাছে আসিলে তো কথাই নাই! বাস্তবিক এরোপ্লেনের সব ভাল,

শুধু ঐখানেই গণ্ডগোল্। কিন্তু সম্প্রতি ক্যাপ্টেন্ ডারউমাল নামে এক পণ্ডিত একখানা একেবারে শব্দহীন এরোপ্লেন্ তৈরী করিয়াছেন। এই এরোপ্লেন্ যখন আকাশ দিয়া নিঃশব্দে চলে তখন চোখে না দেখিলে নীচে হইতে কেহ তা টের পায় না।

* * *

পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্ব ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। কিন্তু চাঁদ এত ছোট যে ৬ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ একত্র হইলে তবে সূর্য্যের মত আলো দিতে পারিত। চাঁদকে ভাঙ্গিয়া তা দিয়া পৃথিবী গড়িতে হইলে প্রায় পঞ্চাশটি চাঁদের দরকার।

* * *

এ বছর জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে খুব ঘটা করিয়া উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, কিন্তু এবারই প্রথম এই উৎসব হইল।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেরও বয়স এ বছর এক শ' বছর পূর্ণ হওয়ায় শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি সার প্রদেশ-সমস্যা লইয়া বেশ হৈ চৈ হইয়া গেল। সার একটি ছোট প্রদেশ—কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। গত মহাযুদ্ধের আগে সার প্রদেশ জার্ম্মান্ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিতে ঠিক হয় যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এখানকার সমস্ত কয়লার খনি ফ্রান্সের অধিকারে যাইবে এবং জায়গাটির শাসনভার থাকিবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) হাতে। ১৫ বছর পরে সারের অধিবাসীরা ভোট দিয়া ঠিক করিবে যে সার ইহার পর ফ্রান্সের অধীনে যাইবে, না আবার জার্ম্মেনীর অধীন হইবে, না যেমন আছে—অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাসনেই—থাকিবে। গত ১৩ই জানুয়ারী সেই ১৫ বছর পুর্ণ হইয়াছে এবং সারের লোকদের ভোট নেওয়া হইয়াছে।

ভোটের ফল দাঁড়াইয়াছে এইরূপ—শত করা ৯০.৮ জন ভোট দিয়াছে জার্ম্মেনীর অধীনে যাইবার জন্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে থাকিবার জন্য দিয়াছে ৮.৮৭ জন এবং ফ্রান্সের অধীনে থাকিবার জন্য মাত্র .৪ জন। —রাঃ সঃ

* * *

কিছু দিন আগে স্কট্ল্যাণ্ডে পোষা ঈগল পাখীর দৌড়ের একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তা'তে কোন কোন ঈগল ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে উড়েছিল। কোথায় লাগে এরোপ্লেন?

* * *

সিতারো মাৎসুদা নামে একজন জাপানী তাঁর বাগানে এত বড় বড় আপেল ফলিয়েছেন যে শুনলে বিশ্বাস হবে না। এক-একটা আপেলের ওজন ৪ সের।

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

বৈজ্ঞানিক ভোজ—অধ্যাপক ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ প্রণীত। ২৭, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, বিচিত্রানিকেতন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের—অর্থাৎ সাধুভাষায় যাহাদের শিশু না বলিয়া বালক-বালিকা বলা হয় তাহাদের—উপযোগী গল্পের বই খুব বেশী নাই। "বৈজ্ঞানিক ভোজ" পড়িয়া মনে হইল এই একখানি বই সে অভাব অনেকখানি পূরাইয়াছে। প্রথম গল্প 'বৈজ্ঞানিক ভোজ'—এক কথায় অতি অনবদ্য হইয়াছে। এমন হাস্যসরস এবং "মৌলিক" গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। পড়িয়া অনেককে পড়াইয়াছি এবং হাসিতে হাসিতে গড়াইয়াছি। 'ভাবী রায় বাহাদুর' এবং 'অচেনা সই' গল্প দু'টিও ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে। শেষ গল্পটি একটু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেদের জন্য। এক কথায় কৃতবিদ্য গ্রন্থকারের নিকট আমরা যেমন আশা করিয়াছিলাম তেমনটিই পাইয়াছি।

গল্পের সঙ্গে সমানে তাল ফেলিয়া চলিয়াছে ছবিগুলি—বিশেষতঃ মলাটটি। ছাপা, কাগজও বেশ সুন্দর। আমরা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এই বই পড়িয়া দেখিতে বলি।

খেয়াল—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত, আশুতোষ লাইব্রেরী (৫ নং কলেজ স্কোয়ার) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০।

বইখানি কতকগুলি ছোট ছোট গল্পের সমষ্টী। ইহার অনেকগুলি গল্প রামধনুতে বাহির হইয়াছিল। সুবিনয় বাবু শিশু-সাহিত্যের একজন নামকরা লেখক—কি করিয়া ছেলেদের মন ভুলাইতে হয় তা তিনি জানেন। ইহার প্রত্যেকটি গল্পই লেখার ভঙ্গীতে, সরসতায় এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে অনবদ্য। ছবি, ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর।

আজব দেশে অমলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত; প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ল হাউস্, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ॥০।

ইংরাজী Alice in Wonderland বইখানি পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যের মধ্যে একখানি দামী রত্ন। সেই বইখানিই "আজব দেশে অমলা" নাম দিয়া বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া হেমেন বাবু বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের একটা মস্ত অভাব ঘুচাইয়াছেন। হেমেন বাবু শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত। এই হাস্যমধুর বইখানি সকলকেই আনন্দ দিবে।

পরাগ—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১—ছেলেমেয়েদের হাতে-লেখা সচিত্র দ্বৈমাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীহীরালালপ্রসাদ ও শশাঙ্কশেখর বসু।—বেহালা। বাংলা দেশের অনেক বড় বড় লেখকেরই এই ধরণের হাতে-লেখা কাগজে প্রথম সাহিত্যিক হাতে-খড়ি হইয়াছে। পরাগ

পড়িয়াও আমাদের মনে হইল এই শিশু-সাহিত্যিকদের অনেকে বড় হইয়া বেশ সুলেখক হইবে। অনুরূপ অধিকাংশ হাতে-লেখা কাগজের চেয়ে এই পত্রিকাখানি উচ্চাঙ্গের। ছেলেদের লেখার সহিত কয়েক জন সুপরিচিত লেখকের লেখাও ইহাতে দেখিতে পাইলাম।

অর্ঘ্য—শ্রীঅনাদিকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং তেলিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত। হাতে লেখা এই ধরণের মাসিকপত্রের যত বেশী প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। পত্রিকাখানার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি পড়িয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমরা উদ্যোক্তাদের উদ্যমের প্রশংসা এবং পত্রিকাখানির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সমুদ্রদৃশ্য (সাগরদ্বীপ হইতে)

আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বসন্তের আবির্ভাব

(শ্রীমতী ভারতী দেবী)

হিমের খেলা সাঙ্গ হ'ল—
বইছে না আর হিমেল বায়,
শীত ঋতু আজ ক্ষুণ্ণ মনে
মোদের কাছে বিদায় চায়।
কুহেলিকার আঁধার ছায়া
পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে।
বসন্ত ঐ হাতছানিতে
ডাকছে মোদের 'আয় ওরে'।
সোনার ঝলক রোদের হাসি
রাঙ্গিয়ে দিল আকাশ-বন,
ঋতুরাজের আবাহনে
ঘরের কোণে রয় না মন।

গেঁয়ো নদী

শিল্পী—শ্রীসুমথনাথ মিত্র

গ্রাঃ নং ১৪২১

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প রা গ	বি ক ল	মো হ ন	পা ব ক	গ গ ন
রা হু ল	ক পি ল	হ রে ক	ব প ন	গ র্জ্জ ন
গ ল দ	ল ল না	ন ক ল	ক ন ক	ন ন দ

চ	ছ
প্ল ন স	স ত ত
ন য় ন	ত নি মা
সঁ ন দ	ত মা ল

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

ধীরাজকুমার ও দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি); ৭৫ নং দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা); মলয় আঢ্য ও মুকুল আঢ্য (কর্ণেলগোলা—মেদিনীপুর); সন্নু, মন্নু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); রামেন্দু, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, যোগজীবন, নির্ম্মলেন্দু সেন (ভবানীপুর); প্রশান্তকুমার বসু (সীতারামপুর); হাতু-রমি (কুচবিহার); গোপাল ও বাণী (বক্তিয়ারপুর); কৃষ্ণবরণ, অমর, প্রতিভা (বাণীমন্দির—মুড়াগাছা)।

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে—

তড়িৎ ও মঞ্জু (মধুপুর); আশালতা দেবী (আগ্রা); অশোক দত্ত (কলিকাতা)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

মণ্টু, ফড়িং, দ্বিজু, ননী, রামেন্দ্র, বিজু (কালিগ্রাম—মালদহ); শিবপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, শিবশঙ্কর, রাসমণি, রাধা, তারা, শ্যামা প্রভৃতি (বেহালা); ভারতলক্ষ্মী দেবী (ঢাকা); পাঁচুগোপাল ঘোষ (বাবুঘাট); সুপ্রভা সেনগুপ্তা (কানপুর); সুজনকুমার দাস ও চিন্ময়ী দাস (কলিকাতা); কনক, সত্যেন্দ্র ও স্মৃতিলেখা সিংহ (কলিকাতা); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী, আলো, ছায়া, মেজদা, বৌদি প্রভৃতি (জামালপুর); হাসি, দিলু, কমলেশ (কাতরাসগড়);

জিতেন্দ্রভূষণ ঘোষ, সুশীলকুমার রায় (মাথাভাঙ্গা—কুচবিহার); বুলি, ময়না, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় (ভাস্তারা—হুগলী); স্মৃতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্)।

নূতন ধাঁধা

(আঁকাবাঁকা (Zigzag) ধাঁধা)

সঙ্কেত ঃ—নীচে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজান আছে, তার মধ্যে কতকগুলি অক্ষর বড়। গোড়া হইতে আরম্ভ হইয়া এই বড় অক্ষরগুলি সাপের মত আঁকাবাঁকা ভাবে বসান আছে, আর উপরে নীচে পড়িলে হয় একজন লোকের নাম—'হরিপদ চৌধুরী'।

হ রি ণ
স **রি** যা
ক ল **প**
ক **দ** লী
চৌ দো লা
ম **ধু** র
মা ধু **রী**

নীচে এই রকম আরও তিনটি ধাঁধা দিলাম। তাহাতে যে শব্দগুলি দেওয়া হইল তাহাদের ঠিক মত এক-একটা প্রতিশব্দ বসাইয়া এই রকম আঁকাবাঁকা ভাবে উপর নীচে পড়িলে তিন জন বিখ্যাত বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যাইবে। নামগুলি বাহির কর তো—

(১)	(২)	(৩)
বাতাস	চুল	আরাম
এখন	পোষ্যপুত্র	বাতাস
যাহাতে কিছুই ফলে না	সমুদ্র	যে কবি নয়
শরীরের একটি অংশ	কাজল	যক্ষরাজ
ছেলে	চক্ষু	একটি তীর্থ
অঙ্গ বিশেষ	অর্পণ	ছেলে
অধীন	শুষ্ক	হর্ষ

দুই ভাই
(বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী রুবেন্‌স্‌-এর আঁকা)

৮ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪১ { ৩য় সংখ্যা

খোকা-প্রশস্তি

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্‌-এ, বি-টি)

[পিতা 'খোকা-প্রশস্তি' লিখছেন,—পাশেই তাঁর নিজের খোকা]

ওরে সুন্দর চঞ্চল মোর দুষ্টু খোকা !
(দাঁড়া, দাঁড়া ! তোর সজল চোখটি দিইরে মুছে ।)
ওরে ধব্‌ধবে স্নিগ্ধকান্তি, তুই ফুটন্ত ফুলের থোকা ।
(এই ম'ল, ব্যাটা নিজের কানটা বিঁধ্‌ছে ছুঁচে !)
ওরে সহাস্য, পালকের মত হাল্কা শাদা,
এখনো ধরার কালি-কলঙ্ক ছোঁয় নি তোরে—
(ও বাবা ! ব্যাটা যে পেড়েছে আমার বইয়ের গাদা !
আল্‌পিন্‌-টাকে গিল্লে বুঝি বা চিবিয়ে জোরে !)

তোর গায়ে যাত্ব রেশমের জামা মানায় ভালো,
তুই হাতে তোর রঙীন্ খেল্না, মরি কি শোভা !
পাখীর মতন ডানা মেলে ঘর করেছ আলো ;
কাকলিতে তোর এ গৃহ মুখর,—(ভালো হ'ত যদি হতিস্ বোবা,—
ব্যাটা চীৎকার কর্ছে ধোপার গাধাটা যেন—
ও কি, দেশলাই-কাঠিতে আগুন জ্বাল্লি কেন ?)
তুই শিশু প্রেম-শতদলে যেন গন্ধ-মায়া,
তুই যে মায়ের বক্ষের নিধি, মাণিক খাঁটি !
(দূর্ ব্যাটা ! তুই মার খেলি এত তবু বেহায়া—
দোয়াত উল্টে টেবিল-ক্লথ্টা কর্লি মাটি !)
তুই স্বর্গের পরী-শিশু যেন মর্ত্ত্যে এলি,
হাসি দেখে তোর চাঁদের মুখের হাসি শুকালো ।
(এই ম'ল ছোঁড়া, কুকুরের লেজ টান্তে গেলি !
কোথা কে আছ গো, ছেলেটার গায়ে এসেন্স্ ঢালো—
কড্-লিভারের শিশিটা মাথায় করেছে খালি !)
তোর চোখে জ্বলে ইন্দ্রধনুর রং-দেয়ালি,
তুই জীবনের মরুভূমি মাঝে তটিনী-ধারা ;
অকূল সাগরে তুই প্রবালের দ্বীপের মত,
ভোরের আকাশে তুই জ্বল্জ্বলে শুক্র-তারা—
(ওরে বাবা ! ছোঁড়া মুঠো মুঠো মুড়ি খাচ্ছে কত !)
শিশু তোর মনে ওড়ে নি এখনো ঝড়ের ধূলি ।
(এই যাঃ ! ব্যাটা যে আয়না-খানাকে ভাঙ্লে, কোথায় পেয়েছে খুঁজি !)
মনে তোর শুধু স্বচ্ছ মধুর স্বপ্নগুলি !
(গেল গেল ! পাজী কাঁচিতে জামাটা কাট্লে বুঝি !)
খেল খেল শিশু, খেলে যথা বনে বিহঙ্গমে ;
মনের পাতায় প্রজাপতি সম উড়িয়া খেল ।

(একি নচ্ছার ! ভুলেও কি এ'কে নেয় না যমে !
ওরে কে আছিস্, ধর না ছোঁড়াকে, আজ লেখা মোর
চুলোয় গেল ।) *

কুসংস্কার

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

কুসংস্কার একটা ছোঁয়াচে রোগ—এর উৎপত্তি কল্পনা, অজ্ঞতা এবং ভয় থেকে, তা ছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এর জন্য অনেকটা দায়ী ।

আদিম কালের মানুষ প্রকৃতির নানা রূপ ও বৈচিত্র্যের কোন অর্থ বুঝতে না পেরে মনে কর্ত যে সে সব বুঝি নানা দেব-দৈত্যের কারসাজি । এখনও অসভ্য-সমাজের মধ্যে এ ভাব চলিত আছে । শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক প্রাচীন মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু কুসংস্কার তার সমাজ থেকে এখন পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত হয় নি ।

মানুষের যখন প্রচুর অবসর থাকে তখন সে নানা উদ্ভট কল্পনার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয় । এরই ফলে জগতে নানা বিচিত্র ধারণার সৃষ্টি হয়েছে । একটা উদাহরণ দিই—পল্লীবাসী মানুষ তার সহরবাসী ভাইয়ের চেয়ে সাধারণতঃ একটু বেশী কল্পনাপ্রবণ । হয় ত সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লীবাসী আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে, হঠাৎ একটা তারা খসে পড়্ল—সে অমনি ভেবে ভেবে ঠিক কর্ল যে ঐ তারা একটি শিশুর জন্মের নিদর্শন । সোঁ-সোঁ শব্দে বাতাস বইছে—তার ধারণা হ'ল যে একটা দৈত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে । তার

* একটি ইংরাজী কবিতার অনুকরণে

সহরবাসী ভাইয়ের এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই—কিন্তু কুসংস্কারের 'পোকা' প্রত্যেক মানুষের মাথায় ঘুমিয়ে আছে,—তাই দেখি কর্ম্মব্যস্ত লোকটিও কিছু দিন পরে তার নিষ্কর্ম্মা ভাইয়ের আজগুবি ধারণা মেনে নিয়েছে,—বাক্স থেকে টাকাকড়ি বার করবার সময়ে তাতে ২।১টা পয়সা রেখে দিচ্ছে, কারণ তার ধারণা জন্মে গেছে যে টাকায় টাকা টানে! কেউ হয় ত দিনের প্রথম উপার্জ্জিত পয়সাটি মুখে মাথায় ঠেকিয়ে বা তাতে থুথু ছিটিয়ে আরও পয়সা আসবার পথ পরিষ্কার ক'রে রাখছে।

শিশু যখন জন্মায় তখন সে সব থেকেই মুক্ত, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বয়োবৃদ্ধদের কাছে একটু একটু করে তার হাতেখড়ি আরম্ভ হয়। সে জানতে সুরু করে—অন্ধকারে ভূত-পেত্নী থাকে বা দরজার চৌকাঠের উপর বসলে মিথ্যা অপবাদ হয়। অবশ্য সুশিক্ষা দিতে পারলে অনেক কুসংস্কারই কেটে যায়।

এবার কয়েক জন বড় বড় নাম-করা লোকের কুসংস্কার সম্বন্ধে যে সব গল্প শোনা যায় তার কয়েকটা বলি। ক্রিকেট-বীর ৺রণজিৎ সিংজীর নাম জগৎ-বিখ্যাত। তিনি ছিলেন রাজা, উচ্চ-শিক্ষাও বড় কম পান্ নি, অথচ তাঁর কতকগুলো কুসংস্কার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। কুচ্‌কুচে কালো বিড়ালকে তিনি বিশেষ পয়মন্ত বলে মনে করতেন, শিকারের বা ক্রিকেট খেলার দিন কালো বিড়াল দেখতে পেলে তিনি

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী

সে দিনটা সার্থক বলে মনে করে ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌তেন। '১৩' সংখ্যাটিকে ভয় করেন না এমন ইংরাজ খুব বেশী নেই; '১৩'-র হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেকের ব্যস্ততা দেখলে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় সাহিত্যিক দা'নুৎসিও '১৩' লিখবার সময়ে লেখেন '১২+১' এবং '১২-এ'।

ভয়ও কুসংস্কারের একটা উৎস সে কথা বলেছি। ভূমিকম্পকে ভয় করে সকলেই, কিন্তু তাই বলে ভূমিকম্প আরম্ভ হ'লেই আমি যদি তার মধ্যে দৈত্য-দানবের ক্ষেপে ওঠা বা বাসুকীর ফণা নাড়াবার চিত্র কল্পনা করে ঢাক-ঢোল, শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করি ত তার মধ্যে এতটুকু যুক্তি থাকে না। এইটাই কুসংস্কার, কারণ বিজ্ঞান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এ সব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

বিজ্ঞানের শত দৃষ্টান্ত সত্বেও মানুষের মন সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত হবার নয়—মাতৃদুগ্ধের মত এ-ও আমাদের দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, এমন কঠিন ভাবে আমাদেরকে আঁকড়িয়ে ধরেছে যে এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন। সেই কারণে দেখি নিম্নশ্রেণীর মানুষ বাইরের থেকে কোন শিক্ষা ও শক্তি না পেয়ে সারা জীবন ধরেই অজস্র কুসংস্কারের গোলামী করে চলেছে।

আবার, আমাদের মধ্যে কুসংস্কারভাবাপন্ন একটা মনও আছে—কোন রকমের শিক্ষা বা শাসন এ মানে না। ডাঃ স্যামুয়েল্ জন্‌সনের মত পণ্ডিত ইংরাজদের মধ্যে খুব বেশী জন্মান নি। কি কারণে বলা যায় না, তাঁর ধারণা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে পথে চল্‌তে চল্‌তে দু'পাশের প্রত্যেক থাম ও খুঁটীগুলোকে ছুঁয়ে যাওয়া দরকার—নয় ত অমঙ্গল হবে! বিখ্যাত ধনী ও দাতা জন্, ডি, রক্‌ফেলার একবার এক ঈগল পাখীর বাসা থেকে একটি অদ্ভুত পাথর পান। তিনি তার গায়ে একটা ফুটো করে তাতে ফিতা পরিয়ে রাখতেন। কোন প্রার্থীকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাবার ইচ্ছে হ'লে সেই ফিতার এক টুক্‌রো কেটে তাকে দিতেন—তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে এর সাহায্যে গ্রহীতার কপাল খুলে যাবে।

অনেক সময়ে দেখা যায় কুসংস্কারের সমর্থন করে নানা দৃষ্টান্ত হাজির করা হয়। গত মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কয়েক জন

বিশিষ্ট বাঙ্গালীর উৎসাহ ও চেষ্টায় একটি বাঙ্গালী ডাক্তার ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয় এবং প্রায় সমস্তই বাঙ্গালীর অর্থে ও তত্ত্বাবধানে 'বেঙ্গলী' নামে একখানি জাহাজ সজ্জিত হয়ে গন্তব্য-পথে যাত্রা করে। প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে বিদায়-অভিনন্দনাদির পালা শেষ হ'লে সমাগত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ জাহাজখানি পরিদর্শন করতে যান। এর পরের কথা আমি ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম—

"ইহার পর আমরা নীচে নামিয়া একটী ছোট ক্যাবিনে গিয়া বসিয়াছি, হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পাশের ক্যাবিনে দু'একজন ইংরাজ চা পান করিতেছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম একজনের হাতের পেয়ালা নীচে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম কাচভাঙ্গা কুলক্ষণ, হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিলাম।

* * *

"আজ ২৩শে মে সকালে সংবাদপত্রে দেখিলাম 'বেঙ্গলী' জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে!"

এই একটি। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মাঙ্গো পার্ক্ স্যর ওয়াল্টার স্কটের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আফ্রিকায় দ্বিতীয় বারের মারাত্মক ভ্রমণে বেরুবার আগে পার্ক্ স্যার ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে একটা নালা ডিঙ্গাতে গিয়ে পার্কের ঘোড়া হোঁচট্ খেল। স্যর ওয়াল্টার চিন্তিত ভাবে বললেন, "তাই ত, ভারী ভয় হচ্ছে হে, এ যে দেখছি তুর্লক্ষণ!"

বিখ্যাত আবিষ্কারক মাঙ্গো পার্ক্

উত্তরে পার্ক হেসে বল্‌লেন, "দুর্লক্ষণের দিকে তাকালেই সে অনুসরণ করে।" সে-জীবনে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আর সাক্ষাৎ ঘটে নি।

এই রকমের সব ঘটনার কাহিনীই কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখবার সাহায্য করে, অথচ কাচ না ভাঙ্গলেও বা ঘোড়া হোঁচট্ না খেলেও যে কত লোক দৈবদুর্ঘটনায় মারা পড়ে তার সংখ্যা নেই।

কোন কোন কুসংস্কার আবার দেশাচার বা শিষ্টাচারের সামিল হয়ে উঠেছে—যেমন ইংরাজদের টেবিলে খেতে বস্‌বার আগে ছুরী-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে তা আড়াআড়ি (Cross) ভাবে রাখ্‌লে দেখতে বড়ই বিশ্রী হয়—কিন্তু ভয় দেখান' হয় এই যে ওতে সংসারে দুর্দ্দৈব বা ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত হবে। ঠিক এই ভাবেই বাড়ীতে কোথাও জুতো উল্‌টিয়ে পড়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে অনেকের প্রথম কাজ সেটাকে সোজা করে রাখা। চৌকাঠে বসা ব্যাপারটাও এই ধরণের। অনেক সময়ে দেখেছি বন্ধু যদি বন্ধুকে ছুরী, কাঁচি বা ক্ষুর উপহার দেয় ত বিনিময়ে ২।১টা পয়সা চেয়ে নেয়—না হ'লে বুঝি তাদের বন্ধুত্বের বাঁধন কেটে যাবে!

আবার, কোথাও বা বৃষ্টির সময়ে পয়সা কুড়িয়ে পেলে তাকে ঈশ্বর-প্রেরিত সৌভাগ্যবাহক-রূপে মাদুলী করে পরা হয়—ছিদ্রযুক্ত মুদ্রারও এই সম্মান। বিড়ালের মৃত্যুর কারণ হ'লে নাকি সেই বিড়ালের সমান ওজনের নূন ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়—নয় ত নির্ঘাৎ যক্ষ্মার আক্রমণ!

হাতুড়ে ডাক্তারদেরও বেশ কিছু কুসংস্কার আছে। আমাদের একটি চাকর ছিল, বেচারা রাতকাণা। এক দিন সে এসে বল্‌ল যে তাকে ২।৪টি জোনাকী পোকা ধরে দিতে হবে কারণ কোন্ এক 'ডাক্তার' নাকি বলেছেন যে কলা বা অম্‌নি কিছুর মধ্যে জোনাকী পূরে খেলে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হয়ে যায়! বোহেমিয়ায় কেউ কেউ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে শিয়ালের জিভ ধারণ করতে উপদেশ দেন এবং আরবের কোন কোন হাকিম সিংহের কল্‌জের দাওয়াই বাৎলান্! পায়রার পালক দিয়ে তৈরী বিছানা-বালিশে শুলে নাকি মানুষ মরে না! মাথা ধরার কারণ জান্‌তে চাইলে এক ভিষগাচার্য্য বলেছিলেন, "তা বাপু, যেমনটি মনে হয় তেমনটি কইব—রাগ করো নি, তোমার মাথার চুল দিয়ে হয়তো কোন কাগ-পাখী বাসা বাইন্যাচ্ছে।"

তুর্কীস্থানে বলা হয় যে শিস্ দেওয়াটা বড় গর্হিত কাজ; স্বামী শিস্ দিলে

স্ত্রীর অমঙ্গল, এবং ছেলেমেয়েরা সে দোষ করলে তাদের পিতা বা মাতার অমঙ্গল্‌!

তিব্বতীয়দের ধারণায় যাত্রার মুখেই যদি জীর্ণ কাপড়চোপড়-পরা কোন বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় এবং তার হাতে যদি শূন্য চুপড়ি থাকে ত তার চেয়ে ভীষণ দুর্লক্ষণ আর হ'তে পারে না—সেদিন নাকি তারা কোন মতেই এগুবে না!

ভুঁড়িকম্প

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্‌-এ, বি-টি)

(১)

স্বপ্ন না সত্য

ইংরেজী ১৯৩৪ সাল, তারিখ ১৫ই জানুয়ারী, সময় দুপুর আড়াইটা। প্রাত্যহিক মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ করিয়া নলগড়ার স্বনামধন্য জমীদার সুখবিলাস সেন বহুমূল্য পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় দিবানিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পদে—তিন দিকে তিনটি পুরুষ্টু তাকিয়া। শীতের মধ্যাহ্নে পরিপাটী ভোজনের পরে নিদ্রার আবেশটুকু বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, ফলে সুখবিলাস বাবু এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তাঁহার নূতন-কেনা মথ্‌ এরোপ্লেনটি যেন তাঁহাকে লইয়া বায়ুভরে উর্দ্ধে উঠিতেছে। আরো—আরো—আরো—আকাশের অসীম নীলিমা ভেদ করিয়া ক্রমাগত উঠিতেইছে। মর্ত্ত্যের বদ্ধ সীমানা ছাড়াইয়া তিনি স্বর্গের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবেন,

এমন সময়ে হঠাৎ

ধুঃম্‌ করিয়া এক ধাক্কা। তার পর হ—ড়্‌—ড়্‌—ড়্‌ করিয়া অনবরত শিকল খোলার ঝন্‌ঝনা বাতাসে গড়াইয়া চলিতে লাগিল।...বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সুখবিলাস লক্ষ্য করিলেন, যেন প্যারাসুট্‌ তাঁহাকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে শূন্য বাহিয়া ক্রমশঃ

নীচে নামিতেছে। হায়, হায়, প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তিও বুঝি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

হঠাৎ "আঁ-হ্‌, আঁ-হ্‌" করিয়া এক বিকট চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে সুকোমল শয্যা হইতে দুঃম্‌ করিয়া জমীদার সুখবিলাসের মেঝেয় পতন ও মূর্চ্ছা!

উপরের তারিখ দেখিয়া সুবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ব্যাপারটা সেই স্মরণীয় দিনের বিরাট্‌ ভূমিকম্প ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু স্বপ্নচারী, প্যারাসুট্‌-বিহারী জমীদার তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। সেই পৃথ্বীব্যাপী প্রবল দোলনের প্রথম ধাক্কায় তাড়াতাড়িতে সকলেই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, জমীদার বাবুর খোঁজ লইতে তেতালায় উঠিবার অবসর পায় নাই। সহসা ভীষণ চীৎকার-শব্দে সকলের চৈতন্যোদয় হইল—তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া সকলে দেখিতে পাইল ভদ্রলোক মৃতের মত নিঃসাড় অবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া আছেন, দুই চোখ বোঁজা, দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। গায়ের রাগ্‌টা এক পাশে লুটাইতেছে।

দাবানলের মত সহরময় এই দারুণ দুর্ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আত্মীয়-বন্ধু-মোসাহেবের দলে বাড়ী ভরিয়া উঠিল, বড় বড় ডাক্তারদের 'কল্‌' দেওয়া হইল, নার্সের সন্ধানে সরকার-গোমস্তার দল চাদর ঘাড়ে বাহির হইয়া পড়িলেন।

(২)

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রভাব

সেদিন সমস্ত রাত কাহারও দুটি চোখের পাতা এক হইতে পাইল না। দুইজন ডাক্তার অনবরত ঔষধের উপর ঔষধ, মালিস, ইঞ্জেক্‌সন্‌ দিয়া সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ কোন রকমে রোগীকে মোটামুটি সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন, এমন সময় টেলিগ্রাম-পিওন আসিয়া একটি জরুরী তার বিলি করিয়া গেল—Miraculously escaped. Starting today. Madan (আশ্চর্য্যরকম ভাবে বাঁচিয়া গিয়াছি। অদ্য রওনা হইতেছি। মদন)

জমীদার সুখবিলাস বাবুর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনবিলাস স্বাস্থ্য-অন্বেষণে

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বাড়ীর বিশ্বস্ত দর্‌ওয়ান গদাধারীর খবরদারীতে মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন। টেলিগ্রাম করিয়াছেন তিনিই। কারণ স্পষ্ট। ভূমিকম্পের কবলে সমগ্র বিহার-অঞ্চলের যে কতখানি ক্ষতি হইয়াছে তাহা তখনও দেশবাসী কিছুই জানিতে পারে নাই, খবরের কাগজে ধ্বংসের একটা আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় মুঙ্গের হইতে মদন বাবুর 'তার' পাইয়া সকলেই অল্প-বিস্তর উৎসুক এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

বেলা এগারটার সময় মদনবিলাসকে লইয়া বাড়ীর মোটর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। মুঙ্গের হইতে কলিকাতা অবধি তিনি এরোপ্লেনেই আসিয়াছেন, কলিকাতা হইতে ট্রেনে। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী, দীর্ঘকায় রুটিপুষ্ট ভোজপুরী দরওয়ান গদাধারী

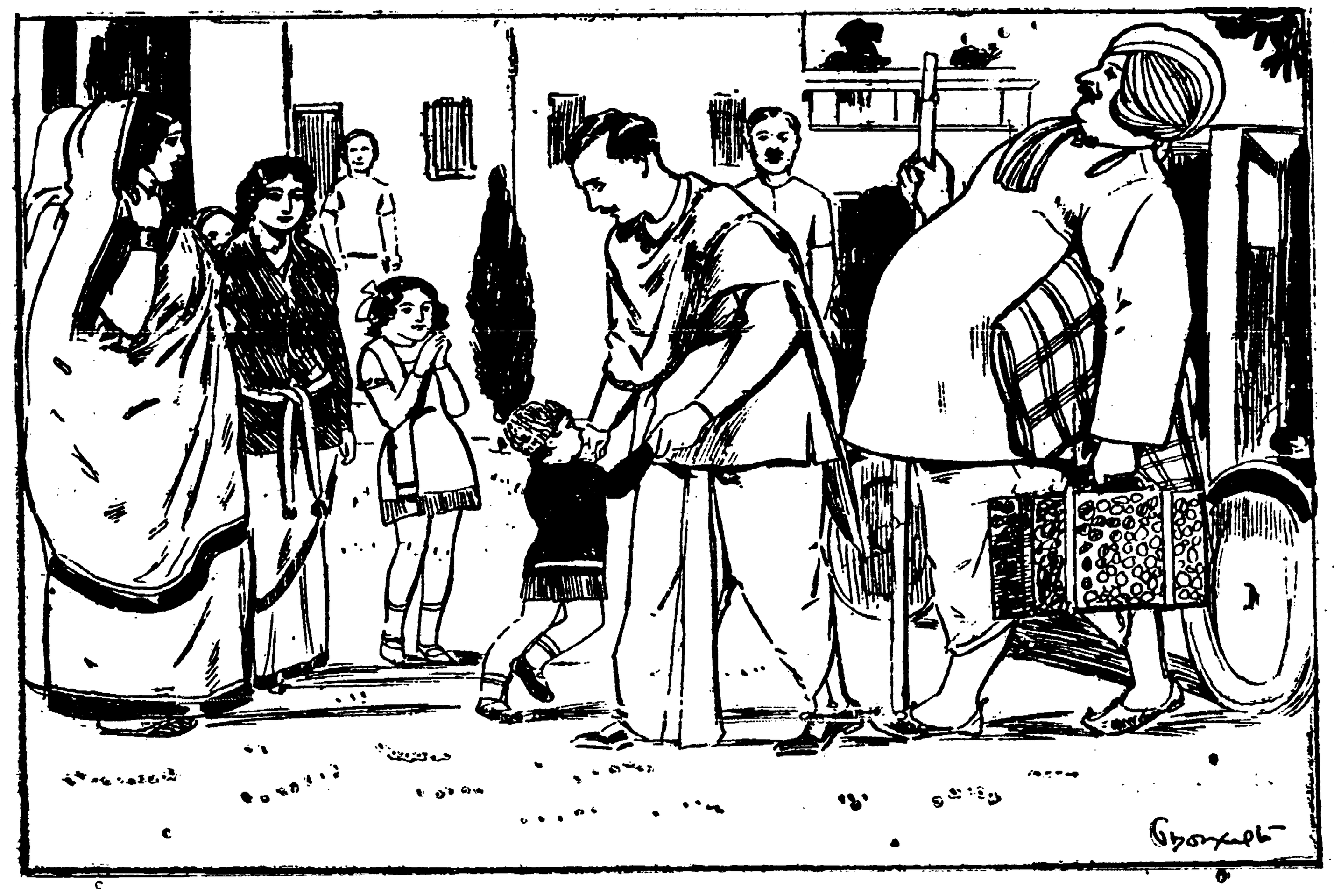

সঙ্গে দীর্ঘকায় রুটিপুষ্ট ভোজপুরী দরওয়ান গদাধারী সিং

সিং। হ্যাঁ সিঙ্গিই বটে। তেলে পাকান লাঠিখানি (গদা?) এতবড় ধাক্কার চোটেও কিন্তু গদাধারীর হস্তচ্যুত হয় নাই।

ষ্টেশনে নামিয়াই মদনবিলাস দাদার সংবাদ পাইয়াছিলেন, উদ্বিগ্ন মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে সুখবিলাসের খবর লইলেন। কিন্তু তারপর ঝাড়া

চার পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মুখের বা মনের বিরাম মিলিল না। চোখমুখ বিস্ফারিত করিয়া, হাত-পা নাড়িয়া পাড়ার এবং বাহিরের ইতরভদ্র সকলের নিকট একই ঘটনার লোমহর্ষণ কাহিনীর আবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি করিয়াও রেহাই নাই। বিকাল বেলা আবার স্থানীয় সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদ-দাতা সরোজিনীকান্ত বাবু আসিয়া প্রত্যক্ষদর্শী মদনবিলাস বাবুর বর্ণনা লইয়া গেলেন।

স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দোহাইতে মদনবিলাস বাবু নিজের বাড়ীর জন্য যে সব 'সেফ্‌-গার্ডের' ব্যবস্থা করিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রণিধান-যোগ্য। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে মাত্র একটি দিনের ধাক্কায় পৃথিবীর বহুদিন-পোষিত আক্রোশের শেষ হইবে না। এমন একটি দারুণ ভূমিকম্পের জের ক্রমান্বয়ে আরো কিছু দিন অন্ততঃ মৃদুতর কম্পনে চলিতে থাকিবে। অতএব মদনবাবুর মতে সকলেরই যথাসাধ্য পুরানো বাড়ীঘরের মায়া ছাড়িয়া কিছুদিন খোলা জায়গায় তাঁবুর মধ্যে আস্তানা নেওয়া প্রয়োজন ; যাহাদের পোক্ত পাকা বাড়ী আছে তাহাদেরও যথাসম্ভব দ্বিতল-ত্রিতলের মায়া কাটাইয়া দিনকতক চাকর-বাকরদের সঙ্গে একতালার গৃহগুলিতেই আশ্রয় নেওয়া উচিত, এবং এই শীতের দাপট যতই প্রবল হোক্ না কেন, শয়ন-ঘরের প্রধান দুয়ারটি যথাসম্ভব উন্মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ কখন্ কোন্ পথে যে রুদ্রদেবতার রোষবহ্নি প্রকাশিত হইবে তাহার নাকি কিছুই স্থিরতা নাই।

সদ্য মুঙ্গের-প্রত্যাগত মদনবিলাসের এই লোমহর্ষণ বর্ণনা ও বিচিত্র রক্ষা-কবচের ইস্তাহার মুখে মুখে সমস্ত সহরে ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইল না।

(৩)

ভূঁড়িকম্প

ইতিমধ্যে সুখবিলাস বাবু অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন—তাঁহার 'নার্ভাস্ শক্' এই কয় ঘণ্টার সুনিপুণ শুশ্রূষার গুণে ক্রমশঃ শোধ্‌রাইয়া আসিয়াছে। ছোট ভাই মদনবিলাসের হঠাৎ প্রত্যাগমনের কারণও তিনি সহজেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন।

এদিকে মদনবিলাসের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বাড়ীর ছোটবড় সকলকেই ‘কম্পাতঙ্ক’ রোগে পাইয়াছে যেন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচবার কেহ-না-কেহ—“ঐরে কাঁপ্‌ছে!” বলিয়া মরি-পড়ি করিয়া নীচে ছুটিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে এক দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ তাহার অন্ধ অনুসরণে সোজা প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, সন্ধ্যার মুখে ঘরে ঘরে শয্যা রচনা করিতে গিয়া দাসদাসীরা পড়িল মহা মুস্কিলে। আজ আর কেহই উপরের ঘরগুলিতে রাত্রিবাস করিতে রাজী হইল না, কারণ ‘কখন্ কোন্ পথ দিয়া’ ইত্যাদি মদনবিলাসের কবিত্বময় উপসংহারটি স্মরণমাত্র সকলেই সংহারের স্বপ্নে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অগত্যা, আসবাব-পত্র সরাইয়া মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া নীচেকার ঘরগুলিতে ঢালা বিছানা পাতা হইল। বেচারা চাকর-বাকরদের যে এই দারুণ শীতে কোথায় ঠাঁই মিলিবে সে কথা চিন্তা করিবারও কাহারো অবসর জুটিল না। এদিকে মদনবিলাসের কড়া হুকুম, তেতালার ঐ ‘সুরক্ষিত গৃহে’ সম্প্রতি সুখবিলাসের শুইবার ব্যবস্থা কিছুতেই হইতে পারিবে না। তাঁহার জন্য অবশ্যই ‘ড্রইংরুমের’ একপাশে বিছানার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মদনবিলাস ‘ভূমিকম্প-প্রুফ’ মুঙ্গের-ফেরৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সুতরাং পূজনীয়া বৌদিদিরও সাহস হইল না যে দেবরের এই খেয়ালের মৃদুতম প্রতিবাদ করেন; অগত্যা বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য বাড়ীতে যে একখানা ফিতার চার-পাই ছিল, তাহারই উপর সুকোমল গদির বিছানা পাতিয়া ড্রইং রুমের একপাশে সুখবিলাসের শয্যা রচনা হইল। তাঁহার শিয়রের বামদিকের দরজাটা রহিল ঈষৎ উন্মুক্ত, প্রশস্ত ড্রইংরুমের অপরদিকে ঢালা বিছানায় মেয়েদের শুইবার ব্যবস্থা হইল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মদনবিলাস বাবু স্বয়ং গিয়া নীচেকার সবগুলি ঘর আর বারান্দা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিয়া আসিলেন। চাকর-দরওয়ানেরা যে যার কম্বল মুড়ি দিয়া ভিতরের বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের নানাপ্রকার উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া তবে তিনি শুইতে যাইবেন। হঠাৎ কি মনে করিয়া তিনি তাঁহার “একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য” গদাধারীকে সুখবিলাস বাবুর কাছাকাছি কোন এক জায়গায় মাথা গুঁজিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। দাদার শরীর ভাল নয়, একজন হুঁসিয়ার গোছের কেহ কাছাকাছি থাকা দরকার, কারণ “কখন কি”··· ইত্যাদি।

দুপুর রাত্রি—নীরব নিস্তব্ধ! শীতের প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীটা যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া আছে।

সহসা ড্রইংরুম ভেদ করিয়া একটা আর্ত্ত চীৎকার সমস্ত বাড়ীখানি কাঁপাইয়া তুলিল—ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!!

এক মিনিট্! মাত্র এক মিনিটের মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। দোলায়মান চার-পাই ছাড়িয়া লম্বমান কম্বলসহ সুখবিলাসের দেড়মণী দেহভার কখন্ কি ভাবে আসিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থিতিলাভ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার নাই। এদিকে সেই ভীষণ চীৎকারে সচকিত হইয়া কখন যে সবাই জাগিয়া উঠিয়াছে, কখন যে তাহারা নরম লেপের গরম আওতা ছাড়িয়া খালি গায়ে খালি পায়ে আসিয়া বাহিরে সমবেত হইয়াছে তাহারও ঠিক নাই। চাকর-দাসী, আম্‌লা-কর্ম্মচারী, পাইক-বরকন্দাজ—মায় কুকুর তিনটা অবধি—সবাই ত্রস্তপদে মহাজনপন্থানুসরণ করিয়াছে মাত্র!

এক মিনিট! শুধু বুকের স্পন্দন ছাড়া চারিদিক্ তেমনি নীরব নিথর। মদনবিলাস বুঝিলেন, ভূমিকম্প আদৌ হয় নাই। তখন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তিনিই প্রথম কথা কহিলেন, “আচ্ছা, যে যার ঘর থেকে বাইরে এসেছ তো ঠিক?”

কথাটা চিন্তা করিবার খেয়াল এতক্ষণ আর কাহারো হয় নাই। আতঙ্কে (না শীতে?) তখনও সবাই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

“সিংজী কই? গদাধারী সিং?”

য়্যাঁ, তাইতো! গদাধারীকে তো বারান্দায় বা উঠানে, কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না!

“বোধ হয় ঘরেই আছে” বলিয়া মদনবিলাস নিজেই ত্রস্তপদে ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এ দুইদিন নানা ঝঞ্ঝাটে আয়েসী সিংজীর ঘুমটা জমিতে পায় নাই। আজ বোধ হয় পরম আরামে তাহারই প্রাণপণ প্রতিশোধ চলিতেছিল। খোলা জায়গায় খালি কম্বলে শীত মানাইবে না বুঝিয়াই বুদ্ধিমান্ গদাধারী বড়বাবুর চার-পাইটার নীচে আলগোছে এক কাতে আশ্রয় লইয়াছিল। তার পর রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে সুখনিদ্রার গভীরতাও যখন বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন নিজের অলক্ষ্যেই বেচারা চিৎ হইয়া শুইয়াছে, ফল দাঁড়াইয়াছে, নেওয়ারের ফিতার ঠিক অব্যবহিত নীচে তাহার ভুঁড়ি আর উপরেই বড়বাবুর পিঠ। আশ্চর্য্য, এত বড় চীৎকারও গদাধারীর ঘনঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। তখনও গদাধারীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাহার বিপুল ভুঁড়ির উত্থান-পতনের দোলায় চারপাইএর উপর এলোমেলো লেপকম্বলগুলি তালে তালে দুলিতেছিল……।

আনুপূর্ব্বিক ব্যাপারটি অনুমান করিয়া মদনবিলাস হাসিবেন কি কাঁদিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাচের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

সেদিন সকাল বেলা আমাদের লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া আমার দুই ভাগ্নের সঙ্গে একটা গভীর গবেষণায় মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। গবেষণাটা অবশ্য চলিতেছিল জিভের সাহায্যে—তবে বিষয়টি নেহাৎ তুচ্ছ করিবার মত নয়, সেটি এই—"আমাদের পৃথিবীটাকে আজকালকার সভ্য চেহারায় আনিবার জন্য কোন্ কোন্ জিনিষকে পুরস্কার দেওয়া উচিত—লোহাকে না কয়লাকে না আগুনকে না কাগজকে? হঠাৎ জোরে একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে খোলা আলমারী হইতে একখানা কাচ ঝন্ ঝন্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল—ভাবখানা যেন 'আমার কথাটা তোমাদের একবারটি মনে পড়িল না—আচ্ছা অকৃতজ্ঞ তো!'

সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বুঁজিয়া ফেলিলাম, ভাগ্নেদের চোখও বুঁজাইয়া দিলাম। তার পর মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, "হে কাচ-শিশু, জগতের উন্নতির জন্য তুমি কি কি

স্মরণযোগ্য কাজ করিয়াছ?" পরক্ষণেই যে উত্তর আসিল তা'তে যেন একেবারে ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাই ত!

দরজা, সার্সি, আর্শী, আলোর চিমনী, দোয়াত, চশমা—এসব ঘরোয়া জিনিষের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কিন্তু কাচ না থাকিলে বিজ্ঞানের দশা কি দাঁড়াইত? কোথায় বা থাকিত দূরবীণ আর কোথায় বা থাকিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র! আমাদের পরিচিত পৃথিবী যেন চুপ্‌সিয়া একেবারে ছোট্টটি হইয়া যাইত। আমাদের পৃথিবীর বাহিরের অতি বড় ব্রাহ্মাণ্ডের কোনও খবর আমরা পাইতাম না, আবার আমাদের চোখের আড়ালে যে অতি ছোট সূক্ষ্ম জগৎ আছে—অণুবীক্ষণ যন্ত্র যা আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে—তাঁরও কোন খোঁজ পাওয়া যাইত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কি অবস্থা হইত ভাবিলেও গা শিহরিয়া উঠে। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—থার্ম্মোমিটার, ব্যারোমিটার, রসায়নশাস্ত্রের যা কিছু যন্ত্রপাতি সবই তো প্রায় কাচের তৈরী! এগুলির নামও বোধ হয় কেউ জানিত না। সমস্ত জিনিষের ফর্দ্দ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা চলে যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর অবস্থা যেমনটা ছিল কাচ না থাকিলে বোধ হয় এখনও তার অবস্থা অনেকটা সেই রকমই থাকিত—পৃথিবীর সভ্যতা অন্ততঃ তিনশ' সাড়ে তিনশ' বছর পিছাইয়া যাইত।

কাচের আবিষ্কার প্রথম কোন্ দেশে হয় সে বিষয়ে এখনও পণ্ডিতেরা একমত হন নাই। তবে খুব প্রাচীন কালে মিশর, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, চীন, (এবং আমাদের ভারতবর্ষেও) কাচের চলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর এক দলের মতে কয়েক জন ফিনিসীয় সওদাগর প্রথম কাচ আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে একটা ভারী মজার গল্প আছে।—

সওদাগরের দল চলিয়াছিল জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য করিতে। পথে যাইতে যাইতে তাদের কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। জাহাজ বাঁধিয়া তারা নদীর ধারে বালির উপর উনান জ্বালাইয়া রান্না করিবে ঠিক করিল। এখন, গোল বাধিল উনান তৈরী লইয়া। উনান তৈরী করিতে হইলে ইট কিংবা পাথরের দরকার, কিন্তু তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজি হইল কিন্তু কোন ফল

হইল না। অবশেষে একজনের মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সওদাগরদের সঙ্গে ছিল বাসনপত্র পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি সোডা-ক্ষারের (যাকে ইংরাজীতে বলে ন্যাট্রন্) চাক্‌তি; সে তাই দিয়াই এক উনান গড়িয়া ফেলিল। তার পর যথাকালে সে উনানে আগুন জ্বালাইয়া রান্না এবং খাওয়ার পর্ব্ব শেষ হইল। খাওয়া-দাওয়ার পর ক্ষারের চাক্‌তিগুলি তুলিতে গিয়া সকলে দেখে—অবাক্ কাণ্ড! সেগুলি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে আর তার জায়গায় চমৎকার স্বচ্ছ 'পাথরের মত কতকগুলি জিনিষ পড়িয়া আছে! নদীর পাড়ের বালি আর ক্ষার একত্রে উনানের প্রচণ্ড তাপে গলিয়া গিয়া এই কাণ্ডটি বাধাইয়াছে। বলা বাহুল্য এই স্বচ্ছ জিনিষগুলিই কাচ।

তার পর হইতে নাকি উহারই অনুকরণে বালি আর ক্ষার একত্র গালাইয়া কাচ তৈরী হইতে সুরু হইল। কিছুদিন পরে আবার ওরই মধ্যে নানা রকম রং আর মশলা মিশাইয়া নানা রকম রঙ্গিন কাচ, পুঁতি ইত্যাদির আবিষ্কার হইয়া গেল। সে সব কাচ এখনকার কাচের মত অত নিখুঁত এবং পরিষ্কার না হইলেও তার জন্য মেহনৎ নেহাৎ কম ছিল না। সাধারণ লোকে তখন কাচকে একটা মহামূল্যবান্ চীজ্ বলিয়া মনে করিত। খুব বড় বড় লোক—রাজা-মহারাজার বাড়ীতেই কাচের দেখা পাওয়া যাইত এবং তাঁরাও খুব দামী দামী হীরা-জহরতের সঙ্গে কাচকে সমান আসন দিতেন। কাচের অত দাম হইবার আর একটা কারণ ছিল—কাচ তৈরীর কৌশল খুব কম লোকেই জানিত এবং যারা জানিত তারাও পারতপক্ষে কাহাকেও তা' শিখাইত না। এমন কি ভেনিস্ প্রভৃতি জায়গায় আইন

চার-পাঁচ শ' বছর আগেকার ইয়োরোপীয় কাচের কারখানা

করা হইয়াছিল যে কোনও কাচের কারিগর যদি কোনও বিদেশীকে কাচ তৈরীর বিদ্যা শিখায় তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করা হইবে। এবং সত্যি সত্যিই এ ভাবে কয়েক জনকে হত্যা করাও হইয়াছিল। প্রায় শ' তিনেক বছর আগে কয়েক জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় কাচ জিনিষটার আসল উন্নতি হয় এবং ক্রমে দেখিতে দেখিতে সাধারণ লোকের বাড়ীতেও নানা রকম ঘরোয়া কাজে কাচের চলন সুরু হয়।

আজকাল কাচ কেমন করিয়া তৈরী হয় তা' বোধ হয় অনেকেই জান না। আগেই বলিয়াছি সেকালে ক্ষারের সঙ্গে বালি মিশাইয়া কাচ তৈরী হইত—এখনও সেই নিয়মই চলে, বালি আর ক্ষারই হইতেছে কাচের প্রধান মশলা। কিন্তু সাধারণ বালিতে নানা রকম ময়লা এবং বাজে জিনিষ মিশান থাকে—ভাল, পরিষ্কার কাচের পক্ষে সেগুলি ঠিক খাটে না; সেই জন্য কাচ তৈরী করিতে হইলে পরিষ্কার এবং বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ বালি ব্যবহার করিতে হয়। ক্ষারও আবার নানা জাতের আছে—সোডা-ক্ষার, পটাশ-ক্ষার, চুণ ইত্যাদি।—এর সবগুলিই এক কাচে ব্যবহার করা হয় না, এক-এক ধরণের কাচে এক-এক ধরণের জিনিষ ব্যবহার করিতে হয়,—পরিমাণও নেওয়া হয় এক-এক রকম। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ কাচের জন্য আরও অনেক রকম জিনিষ ব্যবহার করা হয়—যেমন সীসা, বেরিয়াম্, এলুমিনিয়াম্, টিন্, দস্তা প্রভৃতি নানা রকম ধাতুর অক্সাইড্ ইত্যাদি। রঙ্গিন কাচের জন্য নানা রকম রং-এর মশলাও মিশাইতে হয়—তবে এগুলি দেওয়া হয় সাধারণতঃ কাচ গলিয়া গেলে পরে। কাচের মশলা ঠিক মত মাপা হইলে ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া লইয়া বেশ করিয়া মিশান হয়, তার পর অনেকখানি উত্তাপ সহ্য করিতে পারে এমন একটা পাত্রে করিয়া চুল্লীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। সে চুল্লীও কিন্তু সাধারণ চুল্লী নয়—বিশেষ ভাবে তৈরী চুল্লী, কারণ কাচের মশলা গলাইতে প্রায় ১৪০০-১৫০০ ডিগ্রী উত্তাপের দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাচের মশলা চুল্লীর উপর জ্বাল হইতে থাকে, তার পর আস্তে আস্তে গলিয়া আলকাৎরার মত হইয়া যায়। এই শেষের দিকে খুব সাবধানে কাজ করিতে হয়। কাচ গলিয়া গেলে সেই নরম অবস্থাতেই তা' দিয়া নানা আসবাবপত্র তৈরী হয়। এই ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত।

কারিগরের দল আসিয়া প্রথমে একটা লম্বা লোহার নল তরল কাচের গামলার মধ্যে ডুবাইয়া দেয়—ফলে এক তাল গরম নরম কাচ সেই নলের মুখে উঠিয়া আসে। তার পর সেই নলের অপর মুখে ফুঁ দিলে সেই কাচের তালটা বুদ্বুদের মত ফাঁপা হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন তাকে নাড়িয়া, দোলাইয়া, লোহার ছাঁচে চাপিয়া ইচ্ছামত শিশি, বোতল, গ্লাস প্রভৃতি নানা জিনিষ গড়া যায়। একবার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে আবার চুল্লীতে গরম এবং নরম করিয়া নেওয়া চলে। এ সব ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি এবং এমন অদ্ভুত কৌশলে করা হয় যে চোখে না দেখিলে লিখিয়া বুঝান কঠিন। যে সব কারিগর এ কাজ করে তাদের ফুস্‌ফুসের অবস্থা যে কিছু দিনের মধ্যেই বেশ কাহিল হইয়া পড়ে তা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

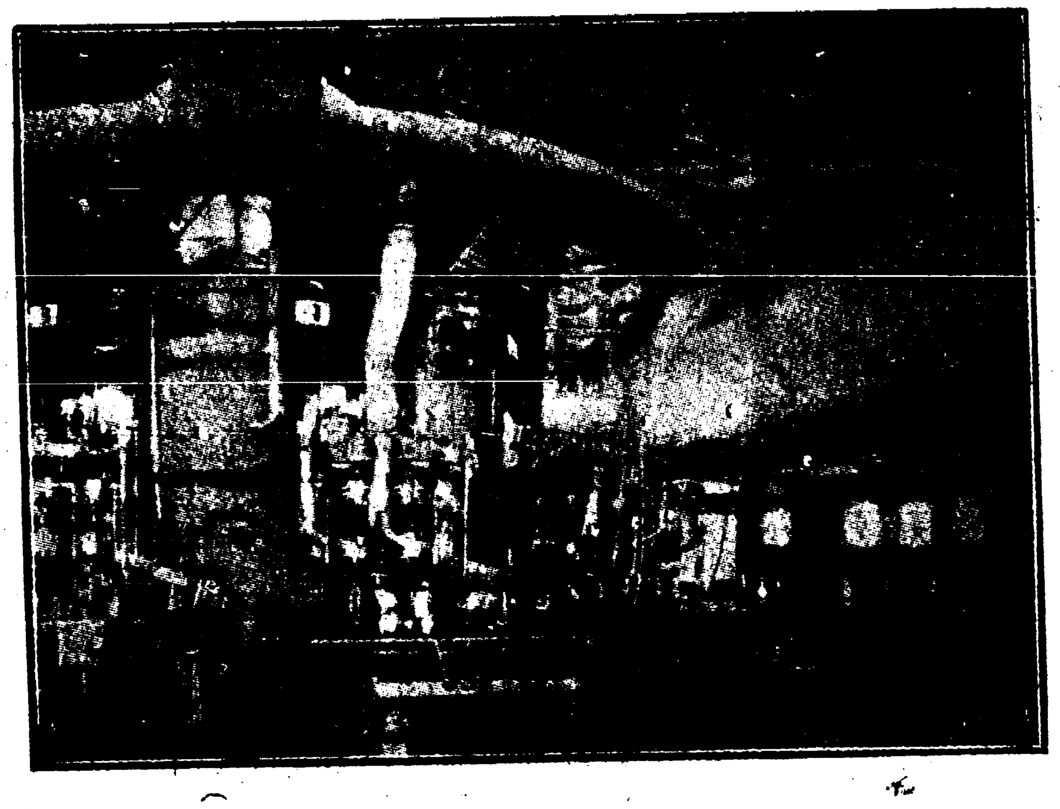

আধুনিক কাচের কারখানার একটি দৃশ্য

আজকাল আবার অনেক বড় বড় কারখানায় কারিগরদের কাজ অনেকখানি কলে করা হয়। বলা বাহুল্য কলে হাতের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হয়। কাচকে নরম অবস্থায় ছাঁচে ঢালাই করিয়া ভিতরে নকল বাতাসের চাপ দিয়া নানা জিনিষ গড়া হয়—জিনিষগুলিও দাঁড়ায় নিখুঁত। এ সব কলকে নেহাৎ ছোটখাট চীজ্ মনে করিও না—ছবিতে দেখ একটা বোতল তৈরীর কল—কি ভীষণ রকমের কিম্ভূতকিমাকার!

সাধারণ সার্সির কাচ তৈরী করিবার সময়ে প্রথমে গোল গোল কাচের চোঙ্গা তৈরী করা হয়। তার পর সেগুলিকে চিরিয়া টেবিলের উপর পাতিয়া নরম করিয়া,

চাপ দিয়া সার্সির কাচ তৈরী হয়। বড় বড় সার্সির বেলায় আর চোঙ্গা-টোঙ্গা করা হয় না, বড় বড় হাতায় করিয়া তরল কাচ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার টেবিলের উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। তার পর সেগুলিকে রোলার দিয়া দলাই-মলাই করিয়া এবং পরিশেষে পালিশ করিয়া প্রয়োজন মত চেহারায় আনিয়া দাঁড় করানো হয়।

কাচের আসবাবপত্র তৈরী করার পর তাকে ঠাণ্ডা করা এক মহা ফ্যাসাদ। এই কাজটি খুব হুঁসিয়ার ভাবে না করিতে পারিলে সব পণ্ড। কাচের জিনিষের উপরের দিক্‌টা যদি ভিতরের চাইতে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় তবে জিনিষটি ভয়ানক ঠুন্‌কো হইয়া যাইবে, তা দিয়া কাজ চলিবে না। কাজেই এইখানটায় খুব অতিরিক্ত রকম সাবধান হইতে হয়। বড় বড় কারখানায় কাচের আসবাবগুলিকে লইয়া একটা সুড়ঙ্গের মত ঘরে রাখা হয়। সুড়ঙ্গের একটা দিক্ থাকে খুব গরম—তার পর আস্তে আস্তে উত্তাপ কমাইতে কমাইতে অপর দিক্ রাখা হয় একেবারে ঠাণ্ডা। কাচের আসবাব তৈরী করিয়া গরম অবস্থায় তাকে সুড়ঙ্গের গরম দিকে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তার পর আস্তে আস্তে যেমন সেগুলি ঠাণ্ডা হইতে থাকে অমনি সঙ্গে সঙ্গে কলের সাহায্যে একটু একটু করিয়া ক্রমে ঠাণ্ডা দিক্‌টায় আনিয়া হাজির করানো হয়। ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে "য়্যানিল" করা।

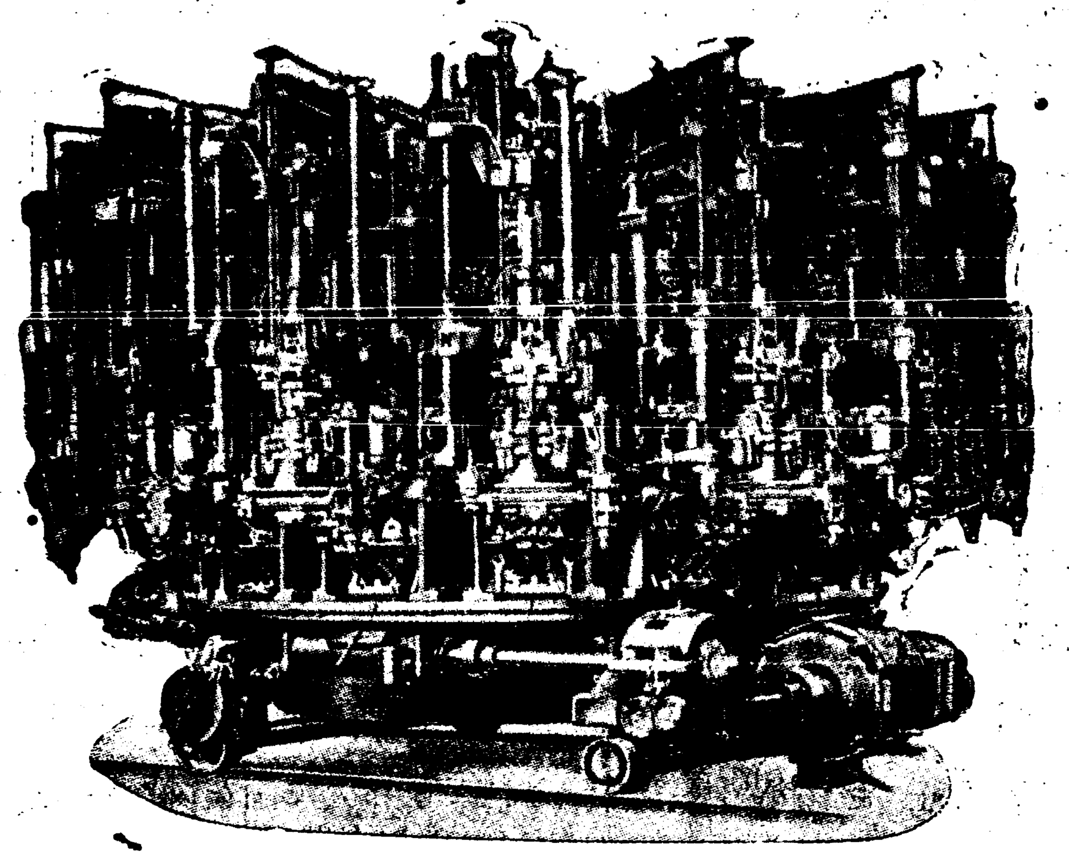

কাচের বোতল তৈরী করিবার অদ্ভুত যন্ত্র

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য যে সব কাচ দরকার সেগুলির জন্যই হাঙ্গামা পোহাইতে হয় সব চেয়ে বেশী। কারণ এগুলি হওয়া চাই একেবারে নিখুঁত।

এ সবের জন্য খুব ভাল এবং বিশুদ্ধ মাল-মশলা ব্যবহার করা হয়—চুল্লীও তৈরী হয় বিশেষ ভাবে। যে পাত্রে কাচ জ্বাল হইবে তার মধ্যেও অনেকখানি নূতনত্ব থাকে। প্রথমে অল্প আঁচে, তার পর কড়া আঁচে কাচের মশলা জ্বাল হইতে থাকে। ইতিমধ্যে সেগুলিকে ক্রমাগতঃ ঘুঁটিতে হয়। কাচ ঠিক মত গলিয়া গেলে তাকে খুব সাবধানে ঢালাই করা হয়। তার পর ঠাণ্ডা করিবার পালা। এই শেষের ব্যাপারটির জন্য যে কি ভীষণ রকম তোয়াজ করিতে হয় এবং ততোধিক অদ্ভুত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় তা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবে। চুল্লীর চারিদিকে ইটের দেয়াল গাঁথিয়া দিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া নানা কৌশলে এই 'ঠাণ্ডা করা'র ব্যাপার চলে। কিন্তু এত করিয়াও প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় কাচ ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে কিংবা তার মধ্যে নানা রকম গলদ রহিয়া গিয়াছে। তেমন তেমন এক-একখানা কাচ দশ বার—বিশ বার—এমন কি ত্রিশ-চল্লিশ বার বিফল হইবার পর তবে মনের মত অবস্থায় বাহির হয়। একটা উদাহরণ দিতেছি। কিছুদিন আগে আমেরিকার এক 'অবজারভেটারী'র জন্য এমনিধারা একখানি দূরবীণের কাচ তৈরী করা হইয়াছিল। কাচখানি নিখুঁতভাবে তৈরী করিতে তোরো বছর ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কাচখানির দাম কত পড়িয়াছিল বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে? প্রায় দশ লক্ষ টাকা।

সোনার ঘড়ি

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

রাম বাবু বড়ই বিপদে পড়েছেন। বড় মেয়ে মলিনার বিয়েতে জামাইকে যে ঘড়িটি দিয়েছিলেন, বাবাজী সেটা পছন্দ করেন নি। ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন—একটি ভালো সোনার রিষ্ট্ ওয়াচ্ চাই, তার সঙ্গে সোনার ব্যাণ্ড্। জামাইটি

রেলে চাকরি করেন, একটা সোনার ঘড়ি না হ'লে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাতেই পারছেন না।

সে তো সত্যি কথা। কিন্তু ঘড়ি কিন্‌বার টাকা কোথায়? এদিকে রাম বাবুর আফিসের অবস্থা যা' দাঁড়িয়েছে চাকরিটি যে থাকে বলা যায় না। বড় সাহেব তো রীতিমত ক্ষেপে গেছেন। আরদালী বলছিল কাল রাত দু'টোর সময়ে সাহেব নাকি একটা ঢিলে পায়জামা পরে ক্রমাগতঃ ছাদের উপর ডিগ্‌বাজি খেয়েছেন। সে তো খাবার কথাই। অতগুলো টাকার শোক! ঘটনাটা তো সোজা নয়! সাহেব বুনো ওলের ব্যবসা করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নৌকো দু' হাজার মণ ওল সমেত পদ্মায় ডুবে গেছে। ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হ'লে কথা ছিল না। কিন্তু তা তো হ'ল না। পদ্মার জল খেয়ে সাতখানা গাঁয়ের লোক গলা ফুলে মারা যায় আর কি? শেষটায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুকুম দিয়েছেন দশ দিনের মধ্যে দু' হাজার মণ বাঘা তেঁতুল পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে সাহেবের নিস্তার নেই। মাদ্রাজের গ্রামে গ্রামে লোক পাঠানো হ'য়েছে। কিন্তু এখনো পাঁচ শ' মণের বেশী জোগাড় হয় নি। রাম বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। কেননা, তেঁতুল যোগাবার ভার পড়েছে তাঁরই উপর।

তাই বলছিলাম রাম বাবু বড়ই বিপদে পড়েছেন। কাউকে অবহেলা করবার উপায় নেই—যেমন সাহেব, তেমনি জামাই। যেমন বাঘা তেঁতুল, তেমনি সোনার ঘড়ি। ভাবতে ভাবতেই ক'দিন চলে গেল। তার পর মলিনার এক চিঠি। মেয়ে অনেক দুঃখ করে লিখেছে যে ঘড়ির জন্য তাকে বেশ দু' কথা শুনতে হ'চ্ছে। কাজেই রাম বাবু কিছু টাকা ধার করে ঘড়িটা কিনে ফেললেন। আর দেরী করা উচিত নয়। স্থির হ'ল ওটা নিজে গিয়েই দিয়ে আসবেন। মেয়েটিকে অনেক দিন চোখে দেখেন নি। জলভরা চোখের উপর ঘোমটা টেনে কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়ার গাড়ীর কোণটিতে গিয়ে বস্‌ল—মলিনার সেই বিদায়-বেলাকার মলিন মুখখানি যেন চোখের মধ্যে ভরে আছে। দেখতে দেখতে ছ'টা মাস চলে গেল।

আফিসে ছুটির কথা জানাতেই সাহেব ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে তাড়া করলেন। তাই অগত্যা বড় ছেলে মণীশের উপর ভার পড়্‌ল ঘড়িটা পৌঁছে

দেবার। মণীশের মা আপত্তি করেছিলেন। ছেলে যদিও এবার ফার্ষ্ট্ ক্লাশে উঠেছে কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই, এবং কোন কালে হ'বে বলেও ভরসা নেই। একেবারে পাগল। ওর হাত দিয়ে অত বড় দামী জিনিষটা পাঠানো, পথে-ঘাটে, একেবারেই কাজের কথা নয়। মণীশ তো শুনে একেবারে আগুন।—"তোমরা কী যে বল তার ঠিক নেই। একটা ঘড়ি নিয়ে যেতে পার্‌ব না, আমি কি খোকা নাকি? সেদিন আমাদের ক্লাশের নটেন তার মাকে নিয়ে কাশী চলে গেল, আর আমি এখান থেকে এখানে বহরমপুর যেতে পার্‌ব না?"

ছেলে যাই বলুক, তার বুদ্ধির উপরে রাম বাবুরও যে বিশেষ ভরসা ছিল তা নয়। কিন্তু অন্য কোন উপায় নেই বলেই রাজী হ'লেন। তা ছাড়া মলিনার বিয়ের সময়ে মণীশ পরীক্ষা নিয়ে কলকাতার বাসায় থাকতে বাধ্য হ'য়েছিল, দেশে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে নি। জামাই বাবুর সঙ্গেও দেখাশুনা নেই। এই উপলক্ষ্যে আলাপ-সালাপও হ'বে। ঠিক হ'ল, পরশু ভালো দিন আছে, সেদিনই যাওয়া হ'বে।

এই দু'টি দিন মণীশ যেন হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। উৎসাহের উত্তেজনায় তার সমস্ত রাত ঘুমই হয় না। যে সে কথা নয়। জীবনে প্রথম সে রেলগাড়ী চড়ে অনেক দূর যাবে, কারও সঙ্গে নয়, একা,—একেবারে একা। উঠতে বসতে কারও ধমক শুনতে হ'বে না। ওখানে যেও না, ওখানে শুয়ো না বলে কেউ তাড়া করবে না। যা খুসী করবে, যেখানে খুসী বসবে, দাঁড়াবে। মাথার উপর কেউ নেই। সে একা। মণীশের সমস্ত মন প্রজাপতির মত নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল।

রাম বাবু নিজে গিয়ে টিকেট কিনে ছেলেকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিলেন। অনেক বার করে বললেন, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িও না, গাড়ী একদম না থামলে কক্ষণো নেমো না, ইষ্টেশনের খাবার খেয়ো না ইত্যাদি। রাণাঘাটে গাড়ী বদলে ওভার-ব্রীজের উপর দিয়ে ওপারে গিয়ে আবার গাড়ীতে উঠতে হ'বে—সেটাও ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন।

গাড়ী ছাড়তেই মণীশ ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে হাতে পরে নিল। যদিও সময় দেখবার দরকার ছিল না, তবু দু'-চার মিনিট অন্তর কেবলই হাতটা ঘুরিয়ে

ঘড়ি দেখতে লাগ্‌ল, যেন এখনই তার ভয়ানক জরুরি কাজ আছে। পাশের একটি ভদ্রলোক বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, "ক'টা বেজেছে খোকা?" মণীশের বুকখানা যেন দশ হাত ফুলে উঠ্‌ল। সে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—"আটটা তেরো"।

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকতেই মণীশ পড়্‌ল—রাণাঘাট। ছোট্ট পুঁটুলিটা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌ল। ওপারের প্লাট্‌ফর্‌মে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মণীশ একটি ই-বি-আর-মার্কা সাদা পোষাক-পরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কর্‌ল, "ওটা কোথাকার গাড়ী স্যার?"

তিনি গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—"থারটিন্ আপ্।"

মণীশ বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল। "থারটিন আপ্" অর্থাৎ 'তেরো উপরে' মানে যে কী সেটা তার একেবারেই মাথায় ঢুক্‌ল না। আর একটি ভদ্রলোকের কাছে সে জেনে নিল যে তার গাড়ীর এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী। এতক্ষণ কে বসে থাকে? একবার বাইরে ঘুরে আসা যায় না? মণীশ দেখ্‌ল অনেকে গেটে টিকিট দেখিয়ে বাইরে যাচ্ছে। সেও তার বাইরের পকেটে মনিব্যাগের ভিতর থেকে টিকেট বের করে দেখাল।

ইষ্টেশনের কাছেই একটা জায়গায় গোল হয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মণীশ উঁকি মেরে দেখ্‌ল—ম্যাজিক। সে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল। একেবারে আজব কাণ্ড! একটা দাড়িওয়ালা লোক একটা আমের আঁটি সকলের চোখের সামনে মাটিতে পুঁতে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঝুড়ি তুলতেই একটি চমৎকার আমের চারা। তার চেয়েও আশ্চর্য্য সেই কাগজের দড়িটা। লোকটা কতগুলো টুকরো কাগজ চিবিয়ে খেল। তার পর মুখে হাত দিয়ে টেনে বার কর্‌ল কাগজপাকানো দড়ি। সে দড়ি বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই তার আর শেষ নেই। মণীশ হেসে আকুল। এমনি সময়ে একটা ঘণ্টা কানে যেতেই সে ছুটে ষ্টেশনে এল এবং ওভার-ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল।

একটা ইষ্টেশন পরেই সাদা পোষাক-পরা ক্রু এসে উপস্থিত। সবাই টিকিট দেখাচ্ছে। মণীশ পকেটে হাত দিতেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌ল; সমস্ত শরীরে

ঘাম ছুট্‌ল। সর্ব্বনাশ! ব্যাগ কই? তার পর এ পকেট্‌ ও পকেট—তন্নতন্ন করে খুঁজেও ব্যাগের দেখা মিল্‌ল না। মণীশ মনে করে দেখ্‌ল রাণাঘাটে ইষ্টেশনের গেটে টিকিট দেখিয়ে ব্যাগ পকেটে রেখেছিল। তার পর আর খোঁজ নেয় নি। মনিব্যাগে কিছু টাকা এবং কয়েক আনা পয়সাও ছিল।

এদিকে ক্রু এগিয়ে আসছে। মণীশের মনে হল—তাকে কে যেন একটা প্রকাণ্ড এরোপ্লেনের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলেছে, সে ক্রমাগতঃ ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ছে। তার চারিদিকে সব ঘুরছে—মাঠ, গাছপালা, লোকজন, মায় সাদা পোষাক-পরা ক্রুটি পর্য্যন্ত।

"টিকেট্‌?"

মণীশ হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌ল—ক্রু বাবাজী একেবারে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে। তার গলা দিয়ে স্বর ফুটতে চায় না। কোন রকমে জানাল—টিকিট চুরি হয়ে গেছে।

—"তবে পয়সা দাও।"

—"পয়সাও তাই।"

ক্রু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে "ও সব চালাকি রেখে দাও ছোকরা। পয়সা বের কর।"

পাশে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, একটু হেসে বললেন—"আজকালকার ছোকরা। ছেলে তো নয় এক-একটি রত্ন। দেখুন না ঘড়ি বাঁধার ঘটাটা!"

মণীশ অনেক মিনতি করে বল্‌ল তার ব্যাগ সত্যিই চুরি গেছে, কিন্তু ক্রু ছাড়্‌ল না। বহরমপুর ইষ্টেশনে নেমে একজন ওপরওলা সর্দ্দার ক্রুকে ডাকা হ'ল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন,—"ভাড়া না দিলে তোমাকে পুলিশে দেওয়া হবে। তিন মাস জেল হয়ে যাবে।"

জেলের নাম শুনে মণীশের কান্না বেড়ে গেল। হাত যোড় করে বল্‌ল, "দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি দিদির বাড়ী যাচ্ছি। সেখান থেকে পয়সা এনে আপনাদের দেব।"

আগেকার ক্রুটি বল্‌ল, "তোমার দিদি-টিদি চিনি না। পয়সা না দিতে পার তো ঐ ঘড়িটা রেখে যাও।"

—"আজ্ঞে, ঘড়ি আমার নয়, জামাইবাবুর।"

ছু'টি ক্রুই হেসে উঠ্‌ল।

শেষটায় তাই হ'ল। ঘড়ি রেখে মণীশকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কথা রইল, ভাড়া এবং ফাইন্‌ সমেত ছ' টাকা বারো আনা যদি সে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই জমা দিতে পারে তবে ঘড়ি ফিরিয়ে পাবে।

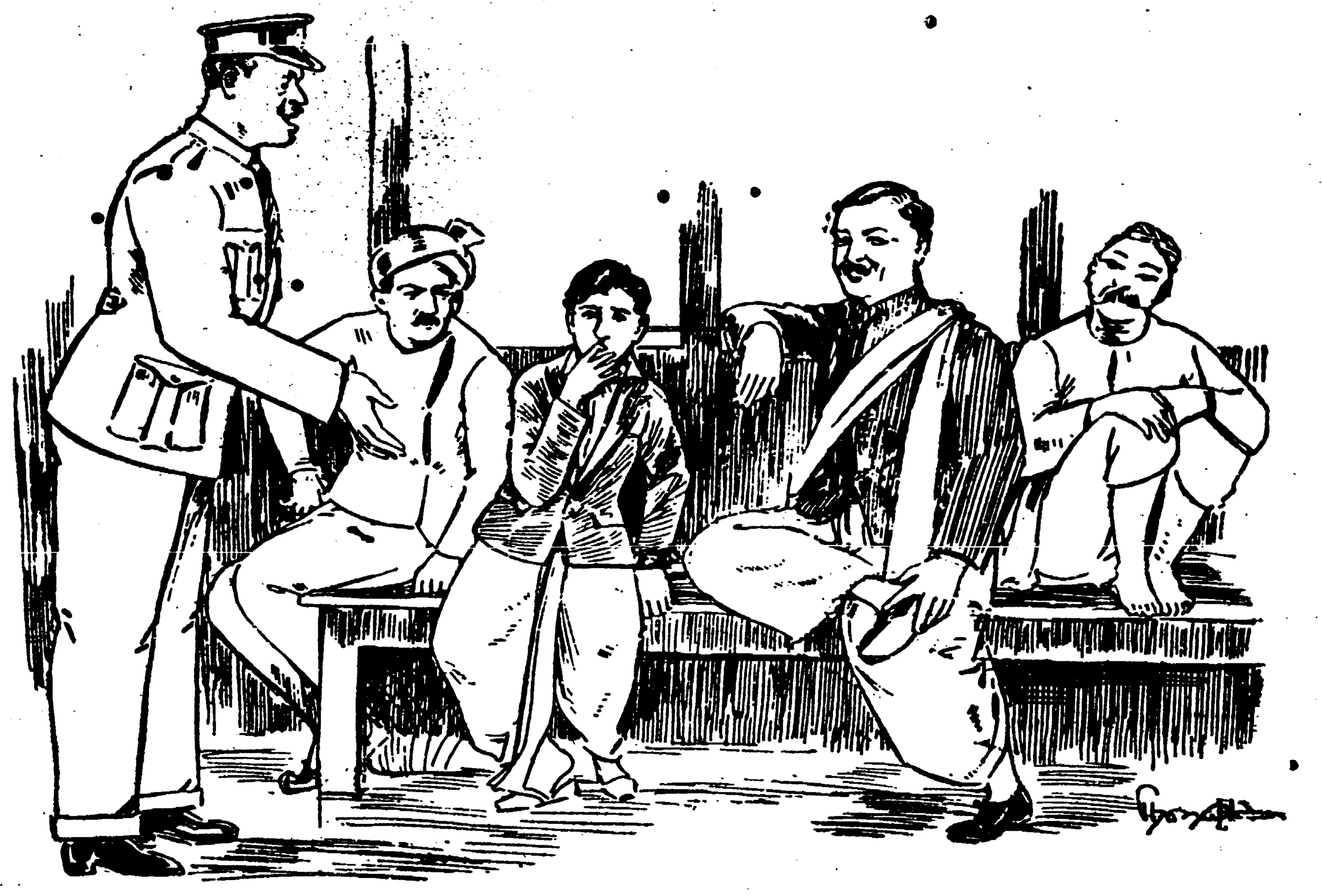

ও সব চালাকি রেখে দাও ছোকরা—

মণীশ চলে গেলে ক্রু অটল বাবু আর সর্দ্দার ক্রু পটল বাবুতে অনেক ফিস্‌ফিস্ চল্‌ল।

অটল বাবু বল্‌লে, "আপনি ক্ষেপেছেন? ঐ ছোকরা কখনও টাকা নিয়ে আসে? আর যদি আসেই, সোজা "না" বলে দেব। প্রমাণ কই? আপনি আর আমি।"

ছু'জনে বেরিয়ে পড়্‌ল স্যাকরার দোকানে। স্যাকরা চালাক লোক। অনেক দর কষাকষির পর তিরিশ টাকার বেশী আর এক পয়সাও উঠতে চাইল না। তা'তেই

রফা হ'ল—যদিও সবাই বুঝ্‌ল ঘড়ির দাম দেড় শ' টাকার কম নয়। ভাগে অটল পেল দশ আর পটল বাবু কুড়ি।

দশ টাকার নোটখানা পকেটে ফেলে অটলের মন একেবারে সোলার মত হাল্কা হয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছা হ'ল গলা ছেড়ে গান ধরে। কিন্তু তাতে রাস্তার লোক পাছে কিছু মনে করে বসে এই ভয়ে গুণ্‌ গুণ্‌ করে গাইল—"আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।" লম্বা লম্বা পা ফেলে সে একেবারে শোবার ঘরে হাজির। বারান্দায় একটি ছেলে খেতে বসেছে। অটল চমকে উঠ্‌ল—"এ কে!" মলিনা হেসে ফেল্‌ল—"ও মা, তুমি ভয় পেলে নাকি? এ যে আমাদের মণীশ।" তারপর গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"কী রকম কাণ্ড দেখ দিকিন। বাবা এত টাকা দিয়ে তোমার জন্য সোনার ঘড়ি কিনে পাঠালেন, ছেলেমানুষ পেয়ে তোমাদের কোন্‌ মুখপোড়া ক্রু কেড়ে নিয়ে নিলে। ও তো কেঁদেই আকুল। আমি বল্‌লাম্‌, তোর জামাইবাবু এলে—এ কি, তোমার কি হ'ল!"

অটল সেই ধড়াচূড়া সমেত মেঝের উপর বসে পড়ে শুকনো গলায় বল্‌ল,... "জল।" মলিনা অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে জল আন্‌তে ছুট্‌ল। মণীশ মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমি চাই নে এমন সুখ

(শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমি চাই নে এমন সুখ,—
মানুষ যাতে ঘৃণার সাথে
ফেরায় আপন মুখ।
দুঃখী হ'লেও জগৎ মাঝে
লাগিই যদি কারুর কাজে
তা'তে কি গো আনন্দে মোর
ভ'র্‌বে নাক' বুক?

উচ্চ আমি, দৃপ্ত আমি,
সবার চেয়ে ধনী,
অন্য সবাই তুচ্ছ অতি
তাদের নাহি গণি;
ব'ল্‌বে সবাই, "সেলাম্‌ বাবু,
প্রণাম, নমস্কার,
ততই মনে উঠ্‌বে বেড়ে
অন্ধ অহঙ্কার;
দ'ল্‌ব্‌ পাঁয়ে আমোদ-ভরে
দুখীর যত দুখ—
আমি চাই নে এমন সুখ।

মানের আসন রাখ্‌ব আপন
সবার মাথার 'পর,
নিষ্পেষণের রাজ্যোপরি
বাঁধ্‌ব সাধের ঘর;
নিঠুর স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা
নিত্য নূতন ক'র্‌ব খেলা,
কর্‌তে হবে চূর্ণ কত
শত কোমল বুক—
আমি চাইনে এমন সুখ।

ক্ষুদ্র হ'তে নেইক' আমার
মোটেই কোন ক্ষোভ,
একটুকুও নেইক' মনে
বড় হবার লোভ;
যত পার নামাও মোরে,
বিলাও প্রভু, পরের তরে,
সবার লাগি' সমান ভাবে
পাত্‌ব আমার বুক;
আমার সেই ত' হবে সুখ।

আনে কা বখৎ

যানে কা বখৎ

রতনের রগড়

(নিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

মাণিকপুরের জমীদার রত্নেশ্বর বাবু কাছারি-ঘরে একখানা খোলা চিঠির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে। নায়েব, গোমস্তা সব তটস্থ ; সবারই মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। চিঠিখানা যে নেমন্তন্ন-পত্র নয় এটা বেশ বোঝা যায়।

খানিকক্ষণ পরে জমীদার বাবু নিবন্ত গড়গড়টায় একটা টান্ মেরে বল্‌লেন—"তাই ত, কি করা যায় নায়েব মশায় ?"

নায়েব মিত্তির মশায় আঙ্গুলে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে ইষ্টমন্ত্র জপছিলেন, বিবর্ণ মুখে বল্‌লেন—"এ যে সর্ব্বনেশে কথা বাবু, মাণিকপুরের জমীদারকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখা ! বিশে ব্যাটার আস্পদ্দা দেখ্‌ছি দিন দিন বেড়েই চলেছে" ?

চিঠির লেখক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবু। ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে বাঙ্গালা দেশ যখন ঘোর অরাজক ছিল, যখন সর্ব্বত্র লুঠ-তরাজ খুন-জখম হ'ত—এক কথায় মানুষে মানুষে যখন অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল, ঠিক সেই সময়েই বিশ্বনাথ বাবুর অভ্যুদয়। তখনকার দিনের ধনকুবেররা বিশ্বনাথের নামে মূর্চ্ছা যেতেন। তাঁদের অগাধ ধনের এক অংশ যে বিশ্বনাথের অবশ্য-প্রাপ্য, সহজে না দিলে সে যে সেটা বলে আদায় ক'রে নেবে এটা তাঁরা বেশ বুঝতেন। বিশ্বনাথ বাবুর চিঠি পেয়ে তার দাবী অগ্রাহ্য করবার সাহস পায় তেমন প্রতাপ-শালী জমীদার তখন বাঙ্গালা মুল্লুকে দু'-একজনের বেশী ছিল না।

চিঠিটা কিন্তু খুব মোলায়েম ভাষায় লেখা। পড়ে হঠাৎ ধারণাই করা যায় না যে এর মধ্যে ভয়ের কারণ কি থাক্‌তে পারে। কড়া কথা বা জুলুম মোটে নেই ; চিঠিতে লেখা—

—'প্রণামান্তে নিবেদন, আপনার লাটের টাকা কয়টী যদি গরীবদের দয়া ক'রে ভিক্ষে দেন তবে আমরা কিছু দিন অন্নের ভাবনা থেকে রেহাই পাই। আপনার বাড়ী গিয়ে ভিক্ষে নিতে লজ্জা করে। যাদের হাতে কিস্তীর টাকা চালান দেবেন তাদের ব'লে রাখবেন, তারা যেন গলাকাটার খালের ধারে জোড়া-বাবলার তলায় টাকার বস্তা নামিয়ে রেখে চলে আসে।' নইলে লজ্জার মাথা খেয়ে আপনার বাড়ী থেকেই ভিক্ষে নিয়ে আসতে হবে। ইতি—

তলায় বিশ্বনাথের আঁকুবাঁকু স্বাক্ষর—'বিশে বাগ্‌দী'। সর্ব্বনাশ, কি হবে ! কা'কে দিয়ে কিস্তীর টাকা সদরে পাঠানো যায় ? রত্নেশ্বর বাবু দুশ্চিন্তায়, ভয়ে ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে আড় হ'য়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে রতন সর্দ্দার উঠে দাঁড়াল। লাঠিগাছটা রত্নেশ্বর বাবুর পায়ের

তলায় রেখে বল্‌লে—"বাবু অনুমতি করেন তো আমরা দু'ভায়ে বিশেকে ভিক্ষেটা দিয়ে আসি।"

নায়েব মশায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন—"চুপ্ কর ব্যাটা ভেমো। সাধে বলে, আশী বছর না হ'লে তোরা সাবালক হোস্ না। আমরা মরছি দুশ্চিন্তায়, ভেবে ভেবে পেটের ভাত চাল হ'য়ে যাচ্ছে—আর উনি ভাব্‌ছেন ভিক্ষে নিয়ে যাবার লোক মিল্‌ছে না।" তার পর সনাতনের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আলোটা নিয়ে চল্ তো বাবা, বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিবি। আজ আর বাড়ী থেকে আলোটা আনতে মনে ছিল না; লাঠিটাও নিস্"।

রত্নেশ্বর বাবু ধমক দিয়ে ব'লে উঠলেন—"আলো, লাঠি কি হবে?···ভয়ে যে একেবারে ম'লেন দেখছি।"

—"আজ্ঞে না, তার জন্যে নয়···বড় সাপ-খোপের উৎপাত কিনা"···

ইসারায় সনাতনকে ডেকে নায়েব মশায় সট্‌কে পড়লেন। আসলে তিনি তখন চারদিকেই বিশ্বনাথের ছায়া দেখ্‌ছিলেন। একা যাবার সাহস তাঁর ছিল না।

*　　*　　*　　*

এই সনাতন আর রতনের কথা তোমরা গত বৈশাখের 'রামধনুতে' পড়েছ। তাদের দু' ভায়ের মতন লাঠিয়াল সে অঞ্চলে তখন আর ছিল না। হাতে একখানা লাঠি পেলে তারা এক শ' লোককে রুখে দাঁড়াতে পারত। এক সময়ে তারাও ডাকাতের দলে ছিল, তার পর একবার বাবুদের দয়ায় প্রাণে বেঁচে বাবুদের বাড়ী লাঠিয়াল হয়। রতনের কথায় রত্নেশ্বর বাবু তাদের ওপরই টাকা সদরে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে শুধু বল্‌লেন—"দেখিস্ বাবা, টাকা সদরে না গেলে পথে বসতে হবে"। রতন মুখে কিছু বল্‌ল না, শুধু লাঠিখানার দিকে একবার তাকাল।

পর দিন মিত্তির মশায় এই কথা শুনে একটু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। কে জানে, ও বেটাদের মনে কি আছে; ওদের আবার লোকে বিশ্বাস করে? কথায় বলে, 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'। বাবুদের কি? টাকা গেলে বিষয়ই নয় লাটে উঠবে—প্রাণটা তো থাক্‌বে। কিন্তু তাঁ'কেই তো সঙ্গে যেতে

হবে! শেষে পথের মাঝে ওরাই যদি······ভগবান্ তুমিই ভরসা ঠাকুর, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

*　　*　　*　　*

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। টাকা বোঝাই দু'টো মস্ত বড় বড় গেঁজে ঘাড়ে নিয়ে সনাতন আর রতন মাণিকপুরের জমীদার-বাড়ীর খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনে নায়েব মশায় দুর্গানাম জপ্‌তে জপ্‌তে সরকারী কাগজপত্র নিয়ে এক রকম আধা-দৌড় দিতে লাগলেন।

ক্রোশ আষ্টেক একটানা রাস্তা চ'লে একটা প্রকাণ্ড আম-বাগানের মধ্যে এসে সনাতন বল্‌লে, "নায়েব মশায়, আপনি ঐখানে বসে খানিক জিরোও, আমরা ততক্ষণ একবার তামাক খেয়ে নি।"

—"না বাবা, আমার আর বিশ্রামের দরকার নেই। তোমরা বরঞ্চ তাড়াতাড়ি সেরে নাও, এ জায়গাটা বড় সুবিধের নয়"। নায়েব মশায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, কিছুতেই বসলেন না।

"কোন ভয় নেই নায়েব মশায়। আমরা যখন রয়েছি তখন আপনার এত ভয় কিসের? নে রত্না, তামাকে আগুন দে"—বলে সনাতন পা ছড়িয়ে বসে পড়্‌ল।

"ভয় কিছুরই নেই বটে কিন্তু ভরসাও তো বিশেষ নেই। তোমরাই এখন এক ঘা' কষিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়লে মা ব'লতেও নেই, বাপ ব'লতেও নেই।" মিত্তির মশায়ের বুকের মধ্যে যেন কেমন ধারা গুড়্‌গুড়্ ক'রে উঠ্‌ল।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে বাগানটা গম্‌গম্ করে উঠ্‌ল। সনাতন বেশ একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। রতন বল্‌লে—"হ্যাঁ দাদা, এ যে 'কুকি'র আওয়াজ! গতিক বড় সুবিধে বলে বোধ হচ্ছে না! আর দেরী নয়—চল"।

টাকার গেঁজে দু'টো পিঠে বেঁধে উঠে দাঁড়াতেই হৈ হৈ ক'রে জন কুড়ি-বাইশ ডাকাত ঝপাঝপ্ এগাছ ওগাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের ঘিরে দাঁড়াল।

"ওরে বাবারে, গেছিরে"—বলে নায়েব মশায় দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে পড়লেন।

একজন ডাকাত বল্‌লে—"আরে, এ যে রতন সর্দ্দার! ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভদ্দরলোক হ'য়ে গেছ, আর যে চেনাই যায় না—দাও, বস্তা দু'টো আবার বাঁধলে কেন? শীগ্‌গির খুলে দাও"।

রতন প্রথমে ভেবেছিল, তা'কে দেখলে হয়তো জুলুম না কর্‌তেও পারে। কিন্তু এখন বুঝ্‌লে এরা সে পাত্র নয়—সহজে ছাড়বে না। তবু বল্‌লে—"যদি না দিই"?

—"না দিলে মরতে হবে। দেখ্‌ছ তো তোমাদের বেড়ে দাঁড়িয়েছি,—লাঠিতে হাত দিয়েছ কি মরেছ।"

রতন দেখলে, করকরে টাকার লোভে ব্যাটারা ক্ষেপে রয়েছে, পায়ের তলা থেকে লাঠিটা তুলতে গেলেই মাথায় লাঠি পড়বে। আহা, এ সময়ে হাতে হুঁকো না থেকে যদি লাঠিগাছটা থাক্‌ত!...তুলোধুনো ক'রে ছেড়ে দিত না!

—"কই, সর্দ্দার, টাকার তোড়া নামাও, নয় লাঠি চালাই—বড্ড দেরী হচ্ছে"।

নাঃ, আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। এত কাল ডাকাতের সর্দ্দারি ক'রে এসে এগুলোকে সে জব্দ করতে পারবে না? মনে মনে মতলব এঁটে রতন একমুখ হেসে বল্‌লে—"এতক্ষণ তোদের ভাবগতিক দেখ্‌ছিলাম—তোরা ভাবছিস্‌ আমি টাকা দেব না,—না? ওরে, এ কি আমার নিজের টাকা যে দরদ হবে? নে ব্যাটারা নে,—দাঁড়া আজ তোদের টাকার হরির লুট দিয়ে যাব,—কুড়ো" বলে রতন নিমেষে গেঁজের মুখ খুলে টাকাগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে চারদিকে গোল করে ছড়িয়ে দিল।

ধান ছড়িয়ে, "আয় আয় চৈ চৈ" ব'লে ডাকলে পোষা পায়রার দল চারদিক্‌ থেকে উড়ে এসে যেমন গোল হ'য়ে ধান খেতে আরম্ভ করে, ডাকাতের দল তেমনি দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে উবু হ'য়ে বসে দু' হাত দিয়ে টাকা কুড়োতে লেগে গেল।

ব্যস্‌, এই সুযোগ! সনাতনকে ইসারা ক'রে বিদ্যুদ্বেগে রতন নিজের লাঠি কুড়িয়ে নিমেষে দলকে দল শুইয়া ফেললে! হাত, পা, মুখ ভেঙ্গে ডাকাতগুলো চারদিকে কুমড়ো-গড়ান গড়াতে লাগ্‌ল। তাদের আর্ত্তনাদে, গালমন্দতে সারা বনটা যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগ্‌ল।

—"দেখ্‌ রগড় এবার;—হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ তো আর দেখ নি; এবার দেখ।" বলে রতন সব ক'টাকে আচ্ছা করে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌ল।

টাকাগুলো সব কুড়িয়ে গেঁজে বোঝাই ক'রে নায়েব মশায়কে ডাকতে গিয়ে রতন দেখে মিত্তির মশায় ভয়ে আধমরা হ'য়ে পড়ে খাবি খাচ্ছেন।

—"এঃ, নায়েব মশায় যে ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছ? চল, আর আপনার ভয় নেই"—ব'লে রতন হাত ধরে তাঁকে টেনে তুল্‌ল।

—"ঘেমে নয় বাবা, তোমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে রক্ত জল হ'য়ে বেরিয়ে গেছে বাবা......সাম্‌লাতে পারি নি! চল, দুর্গা দুর্গা......"

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

৩

খগেনের সন্দেহ

বেলেঘাটার খাল হইতে অল্প কিছু দূরে গলির মধ্যে একখানা বাড়ীতে কয়েকটী লোক রবিবারের আনন্দময় সকাল যাপন করিতেছিল। লোকগুলি সংখ্যায় যে খুব বেশী তা নয়, বোধ করি জনা পাঁচ-ছয় হইবে, আর সকলেই যে সমবয়সী তাও বলা চলে না; যুবকের ভাগই বেশী তবে প্রৌঢ়-বয়সীও দু'-এক জন আছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলে কয়টী ঘরের এক কোণে সতরঞ্চি পাতিয়া ভাগাভাগি করিয়া একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আর অপর কোণে দুই জন বয়স্ক ব্যক্তি খাটো গলায় একটা গোপন পরামর্শে নিমগ্ন ছিল। তাদের আলোচনাটা চলিতেছিল এই ধরণের; এক জন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, "সবই তো ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে ওঠা গেল, খগেনবাবু, কত রকমের বাধা-বিপত্তি ভেবে মাথা গরম করছিলেন, কোনটাই আমাদের আট্‌কে রাখ্‌তে পারে নি।

অহিভূষণ চৌধুরীকেও ওরা খুঁজে বার করেছে আর সোনার হরিণও উদ্ধার করেছে—হাঃ হাঃ হাঃ। যার জন্যে এত কাণ্ড সেই আসল ব্যাপারটায় এবার হাত দেওয়া যাক্—সে কাজটাও তো বড় সহজ নয়।”

‘খগেনবাবু’ বলিয়া যে লোকটীকে সম্বোধন করা হইল, ভাবে বোধ হইল সেই এ দলের প্রধান সহায়, সম্বল এবং পরামর্শদাতা। লোকটীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। চোখ দুইটী দেখিলে মনে হয় ধূর্ত্ততায় সে ধুরন্ধর। সঙ্গীর কথার জবাবে সে কহিল, “আপাততঃ ও সমস্ত মৎলব শিকেয় তুলে রাখুন, অশনি বাবু, বছর তিন-চারের মধ্যে ও ব্যাপারে হাত দেওয়া অসম্ভব।”

“তি-ন চা-র ব-ছ-র!” অশনিকান্তের চক্ষু কপালে উঠিল, “কিন্তু খগেন বাবু—”

খগেনবাবু অশনিকান্তের উৎকণ্ঠা আমোলেই আনিল না, অন্য এক চিন্তা তখন তার মাথায় ঘুরিতেছে। একটু কাল নীরব থাকিয়া সে কহিল, “শ্রীপুরের একটী লোকের কথা ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরকার রহস্যের বিন্দু-বিসর্গও যদি কেউ টের পেয়ে থাকে তবে সে-ই তা পেয়েছে।”

“সে কি কথা! কে সে লোকটা?”

খগেন তার সন্দেহ-পাত্রের নাম উল্লেখ করিল।

“বলেন কি! সেই ল্যালাখাবা গোছের ছোকরা? তাকেই আপনার এত ভয়?”

‘আহা—আপনি ভুল কর্‌ছেন! আমি ভয় পাচ্ছি সে ‘ল্যালাখাবা’ বলে নয়, পাছে আমাদের গুপ্ত ব্যাপারের কিছু টের পেয়ে থাকে সেই আশঙ্কায়।”

ঠিক এমনি সময় ঘরের ওদিক্‌কার কোণটাতে একটা কলধ্বনি উঠিল, খবরের কাগজের একখানা পৃষ্ঠা সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া এ উহার আগে পড়িতে চাহিতেছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া খগেন এবং অশনিকান্ত উভয়েই উদগ্রীব ভাবে সেদিকে আগাইয়া গেল। তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একজন যুবক বলিয়া উঠিল, “অহিভূষণ চৌধুরীর সন্ধানের জন্য খবরের কাগজে নোটিস্ ছাপান হয়েছে, দেখেছেন? দু’-এক টাকা নয়, একেবারে টাকার আণ্ডিল, তিন তিন হাজার টাকা পুরস্কার!”

কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া খগেন কাগজখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল, দেখিল বিজ্ঞাপনে অহিভূষণের চেহারার একটা বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—“বয়স পঁয়ত্রিশ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ডানদিকের গালে একটা আঁচিল, মাথার ঘন কৃষ্ণ চুল ব্যাক্‌ব্রাস করিয়া পেছনের দিকে ফেরান, একটা চোখ কিছু ট্যারা, সেটিকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ সময়েই চশমা ব্যবহার করে…ইত্যাদি। যে কেহ সন্ধান দিতে পারিলে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।”

বিজ্ঞাপনটি পড়িবার সময়ে খগেনের মুখে এতটুকু আতঙ্কের বা অস্বস্তিরও ছায়াপাত হয় নাই, কিন্তু সর্ব্ব শেষে নাম স্বাক্ষরটি পড়িয়া সে বার কয়েক দাড়ি চুলকাইল, কহিল, “এ কি, এ দেখি রণজিতের নাম! তাই ত, তার নামে এ বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে কেন? নাঃ, একটু ভাবালে দেখ্‌ছি।”

অশনিকান্ত বলিল, “রণজিৎ বলতে কার কথা বলছেন বুঝছি না, সেই মেলোয়াড়ের? তা হয়ই বা যদি সে, তাকে ভয় করবার কি আছে? সে অহিভূষণ চৌধুরীর সংবাদ জান্‌তে পার্‌বে এ ধারণা আপনার কি থেকে হল?”

“রণজিৎ ছেড়ে রণজিতের ঠাকুরদাদারও ক্ষমতা নেই যে এ ব্যাপারে দন্তস্ফুট করে, সে জন্যে আমি ভাবি না, আমি দেখ্‌ছি রণজিতের আড়ালে আর একটি ছবি—সে বড় ভয়ঙ্কর চীজ্।”

“অর্থাৎ”?

“অর্থাৎ হুকাকাশি”।

কথাটা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই অশনিকান্তের হাতে একটা আচমকা হেঁচ্‌কা টান মারিয়া খগেন জানালার ধার হইতে সরিয়া আসিল, তার পর কম্পিত হস্তে আঙ্গুল দিয়া গলির ওধারে অল্প দূরের একটা দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করিল। এক যুবক অপর একটী লোকের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কি কথা কহিতেছে আর মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছে। অশনিকান্ত একবার মাত্র সেদিকে তাকাইয়াই যুবকটিকে চিনিয়া ফেলিল, ইহার কথাই খগেন একটু আগে উল্লেখ করিয়াছিল। সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ তখন তারও মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

চোখের ইসারায় সকলকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিয়া খগেন স্তব্ধভাবে ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। খবরের কাগজ খানা তখনও তার হাতেই রহিয়াছে। সেখানার প্রতি অতর্কিতে আর একবার তাকাইতেই কিন্তু তার মুখ হইতে অন্ধকার কালো মেঘখানি ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল আর তার জায়গায় দেখা দিল প্রসন্ন ভাব। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "আমাদের সন্দেহ একেবারেই অমূলক অশনিবাবু, এখন না দেখে যদি আর আধ ঘণ্টা আগে ওকে দেখতাম তা' হলে ভাবনার অন্ত থাক্‌ত না। বুঝতে পারছেন কেন এ কথা বলছি ?"

অশনিকান্ত ভ্রূ কুঁচকাইয়া কি কারণ তাহাই ভাবিতে লাগিল, তার পর হঠাৎ কোন কথা মানুষের মনে আসিলে সে যেমন ভাবে শব্দ করিয়া ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিল, "ও হোঃ হোঃ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এখন আর ভাব্‌নার কোন কারণ নেই। বাস্তবিক বিপদের গন্ধ পেলে মাথাটা কেমন চন্‌ করে ওঠে আর সোজা জিনিষগুলোও সব গুলিয়ে যায়।"

খগেন আবার বলিল, "কলকাতার যে কোন রাস্তায় যে কোন লোকের যখন তখন প্রয়োজন থাক্‌তে পারে ; কাজেই যাকে এ অঞ্চলে দেখ্‌বার মোটেই আশা করি না তাকে যদি কোন রকমে দেখ্‌তেও বা পাই তা হলেও ভয়ে শিউরে ওঠ্‌বার কোন কারণ নাই"। কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া জানালার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিতে লাগিল যুবকটি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছে, না চলিয়া গেছে। দেখা গেল চলিয়া সে যায় নাই, তখনও সেই অপরিচিত লোকটির সহিত বাক্যালাপেই মগ্ন।

"দেখুন অশনিবাবু", খগেন পুনরায় কথা আরম্ভ করিল, "সাবধানের বিনাশ নাই। আপনি ওকে চিনলেও ও আপনাকে চেনে না নিশ্চিত। আমি বলি আপনি এই মুহূর্ত্তেই পেছু পেছু ওকে অনুসরণ করুন। ও কোথায় যায়, কি করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে ফির্‌বেন।"

* * * *

বেলা আড়াইটা বাজিয়া গেল, অশনিকান্ত তখনও গোয়েন্দাগিরি করিয়া ফেরে নাই। হয় তো শ্রীপুর পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে হইয়াছে মনে করিয়া খগেনও বড়

বেশী চিন্তিত হয় নাই কিন্তু তিনটা যখন বাজিবার উপক্রম হইল তখন ব্যস্তবিকই চিন্তার কিছু কারণ ঘটিল বই কি ! উদ্বিগ্ন ভাবে বেশীক্ষণ কিন্তু কাটাইবার দরকার হইল না, বার কতক 'ঘর বার' করিবার পরই দেখা গেল অশনিকান্ত এমুখো হইতেছে। আজ বেচারার শাস্তি বড় কম হয় নাই, খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, সকাল হইতে সুরু করিয়া এই দুরন্ত রৌদ্র মাথায় এতটা বেলা পর্য্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছে। বয়সেও সে তো আর নবীন যুবা পুরুষটি নয় !

অশনিকান্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই খগেন সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি দেখে এলেন অশনিবাবু ? সব মঙ্গল তো—আমার ধারণা অভ্রান্ত তো ?"

"হ্যাঁ, মানে এদিক্ থেকে ভয় পাবার কোন কারণ দেখ্‌লাম না। যেতে হয়েছিল কিন্তু একেবারে শ্রীপুর পর্য্যন্ত তেড়ে। শ্রীপুর পৌঁছে ও যখন সোজা গিয়ে চিনির কারখানায় ঢুক্‌ল তখনই বুঝলাম ব্যাপার বেশী গুরুতর নয়। বেলেঘাটায় এসে আমাদের আঁচ্‌তে পেরে থাক্‌লে ও কি একবার দ্বারিকবাবুর সঙ্গে দেখা না করেই কারখানায় ঢুক্‌ত—আমার তো একবারও মনে হয় না। ......ভাল কথা, সেই বিজ্ঞাপন দেনেওয়ালা খেলোয়াড়টিকে যে শ্রীপুরে দেখে এলাম—সঙ্গে আর এক ভদ্দরলোক, কে তা চিনি না, দ্বারিকবাবুর চাকর কালীচরণটাকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ কর্‌ছে।"

"কালীচরণকে জিজ্ঞাসাবাদ ? আপনি ঠিক চিনেছেন কালীচরণ ? মানে আর কেউ নয় ?" আর্ত্তের মত খগেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল। প্রতিমুহূর্ত্তে সে তখন হুকাকাশির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছে—বুক তার ঢিব ঢিব করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার কয়েক জন কবি

(শ্রীচারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবিদের স্বভাব বরাবরই সাধারণ লোকেদের চেয়ে একটু অন্য ধরণের।

একটু খামখেয়ালি—একটু ভাবপ্রবণতা অনেক কবির মধ্যেই দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে এই রকম মজার মজার ২।১টা গল্প আজ তোমাদের শুনাইব।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম তোমরা সকলেই জান। সেই যে "ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়" কিংবা "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশে নি যারে" প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতাগুলি যিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ভয়ানক সত্যনিষ্ঠ লোক—কথায় বা কাজে কোন রকম ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে কখনও যাইতেন না—অপর কেহ গেলেও তা পছন্দ করিতেন না।

কৃষ্ণচন্দ্র তখন যশোহরে একটা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। এক দিন তিনি একখানা কাপড় কিনিবার জন্য বাজারে গিয়াছেন। কাপড়ের ব্যবসা বেশীর ভাগ জায়গায়ই মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া—কৃষ্ণচন্দ্রও গিয়া এক মাড়োয়ারীর দোকানে ঢুকিলেন। এখন, সেখানকার মাড়োয়ারীদের অভ্যাস—প্রত্যেক জিনিষেরই দাম বাড়াইয়া বলা। যে জিনিষটা তারা দু' টাকায় বিক্রী করিবে তার দাম হাঁকিবে তিন টাকা। সেখানকার সকলেই এ ব্যাপার জানে কাজেই কাপড় কিনিতে গেলে সকলেই প্রথমে দোকানদার যা চায় তার অর্দ্ধেক বলে, তার পর দর কষাকষি করিয়া ন্যায্য দামে কেনে। কৃষ্ণচন্দ্র যে কাপড়খানি পছন্দ করিলেন তার দাম দেড় টাকা, কিন্তু মাড়োয়ারী তার অভ্যাস মত এক টাকা বাড়াইয়া আড়াই টাকা দাম হাঁকিল। কৃষ্ণচন্দ্র কোনও ঘোর-প্যাঁচের ধার ধারেন না, তিনি তখনই আড়াইটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া কাপড় লইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলে হঠাৎ মাড়োয়ারীর ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। তাই তো, এমন ভাল মানুষকে কি ঠকাইতে আছে! সে তখন কবির পিছন পিছন দৌড়াইয়া গিয়া তাঁকে থামাইল, তার পর জানাইল যে কাপড়খানার আসল দাম দেড় টাকা—কাজেই এক টাকা তিনি ফেরৎ লইতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি আড়াই টাকা চেয়েছিলে কেন?" দোকানদার বলিল, এখানে ওই রকমই দস্তুর, তাই সে দাম বাড়াইয়া বলিয়াছিল; তিনি যে একটুও দর করিবেন না তা' সে ভাবে নাই। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিলেন, "কি! তুমি তা' হ'লে প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছিলে? মিথ্যাবাদীর জিনিষ আমি নেই না"—বলিয়া

কাপড় ও টাকা দুইই মাড়োয়ারীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। মাড়োয়ারী ত' থ।

* * * *

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধেও অনেক মজার মজার গল্প আছে। মাইকেল ছিলেন ব্যারিষ্টার তা' বোধ হয় জান। কবি মানুষ, ব্যারিষ্টার হইলেও কবিতা তাঁকে ছাড়িবে কেন? একবার মাইকেল এক খুনের মামলায় আসামী-পক্ষের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। খুনটা হইয়াছিল মাঘ মাসে গভীর রাত্রিতে। মাইকেল আইনের মারপ্যাঁচ ছাড়িয়া জজকে এই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে অত শীতের রাত্রে লোকে লেপের তলা ছাড়িয়া উঠিতেই পারে না তা খুন করিবে কি? মাঘের শীত কি সোজা জিনিষ—বাংলার এক বড় কবি ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী'—কাজেই সেই মাঘের হিমানীর মধ্যে উঠিয়া গিয়া খুন করা অসম্ভব!

সেই জজটির সঙ্গে মাইকেলের বেশী সদ্ভাব ছিল না। ইহার পর মাইকেল কোন মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইলেই সে জজটি বলিতেন, "আপনি তো আইন-কানুনের ধার ধারেন না, শুধু কবিতা আওড়ান।"

* * * *

আর একজন কবির কথা শোন। ইনি বাংলার একজন খুব পুরানো কবি—রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের বিখ্যাত বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। সে গান বাংলার একেবারে খাঁটী নিজস্ব জিনিষ।

রামপ্রসাদ এক জমীদারীর মধ্যে খাতা লেখার কাজ করিতেন। কিন্তু কবির কাছে কি হিসাবের খাতা না কবিতার খাতা সব সময়ে ঠিক থাকে? প্রায়ই তিনি হিসাবের খাতার মধ্যে কবিতা লিখিয়া ফেলিতেন। জমীদারের হাতে খাতা গেলে তিনি প্রায়ই দেখেন তার মধ্যে যেখানে সেখানে নানা কবিতা লেখা (কবিতাগুলি যদিও বেশ উঁচু দরের)। এই রকম প্রায়ই হইতে লাগিল। তখন রামপ্রসাদের তলব পড়িল। জমীদার তাঁকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁর আর এ ভাবে কাজ করা চলিবে না—চাকরীটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু জমীদার বেরসিক

ছিলেন না, তিনি গুণীর আদর বুঝিতেন। রামপ্রসাদকে তিনি চাকরী হইতে ছাড়াইলেন বটে কিন্তু এমন একটা মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে অতঃপর রামপ্রসাদ নিশ্চিন্ত মনে কবিতা লিখিয়া সমস্ত দেশবাসীকে তৃপ্তি দিতে পারেন।

তুরস্কের বিদুষী নারী মাদাম্ খালেদা আদিব খানম

আধুনিক যুগে যে সব মেয়েরা দেশকে—জাতিকে বড় করিয়া পৃথিবীযোড়া নাম করিয়াছেন মাদাম্ খালেদা আদিব খানম তাঁদের এক-জন। ইনি নব্যতুর্কীর নেতা কামালপাশার একজন সহকর্ম্মিণী। কামাল পাশার হাতে অতি অল্পদিনের মধ্যে তুরস্কে কি অদ্ভুত রকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে সে বিস্ময়কর কাহিনী বোধ হয় তোমরা অল্পবিস্তর জান—বছর কয়েক আগে এই রামধনুতেই তা বাহির হইয়াছিল। মাদাম্ খালেদা কামাল পাশার সঙ্গে থাকিয়া দেশের এই নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে যে সব কাজ করিয়াছেন তুরস্কের ইতিহাসে তা চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে।

মাদাম্ খালেদা আদিব খানম

মাদাম্ খালেদা শুধু বড় রাষ্ট্রনেত্রীই নন্, তিনি মস্ত বড় বিদুষী, কবি এবং গ্রন্থকর্ত্রী। তুরস্কের স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি আন্দোলনের তিনি একজন নেত্রী।

তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে মাদাম্ খালেদা সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন—তাঁর ইচ্ছা তিনি ভারতের সঙ্গে মিশিয়া ভাল করিয়া তার পরিচয় লইবেন। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট সভায় মাদাম্ খালেদা তুরস্কের সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও অন্যান্য সংস্কারের কাহিনী শুনাইয়াছেন। আমাদের দেশের কি করিয়া নানা উন্নতি করা যায় সে সম্বন্ধেও ছাত্রদের নানা উপদেশ দিয়াছেন। হাজার হাজার লোক এই সভায় যোগ দিয়া তাঁকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

হোলি

(শ্রীঅনিমা গুহ, শ্রীসুবর্ণ গুহ ও শ্রীনিরুপমা সেন)

যেতে তোমায় দেব না আজ
রাখাল সাথে খেলতে খেলা,
আমরা শিশু, তোমায় নিয়ে
কুঞ্জবনে দুলব দোলা।

তোমার সাথে খেলতে হোলি
রং এনেছি ডালিম ফুলি,
কালো বরণ রাঙ্গিয়ে দেব
মাখিয়ে দিয়ে আবীর-ধূলি ;
তোমার সাথে হে শ্রীহরি,
আমরা শিশু, খেলব হোলি।

বালকের বীরত্ব

(ব-এর বহুরূপ)

(শ্রীশশাঙ্কশেখর বসু)

বর্ষাকাল। বুলুর বাপ বঙ্কিম বাবু ব্যাধিতে বিছানায় বসেছিলেন। বালক বুলু বাপের ব্যারামে ব্যস্তভাবে বৃষ্টিতেই বাড়ীর বাইরে বেরুল। বৈদ্য বুলুকে ব'কে বল্লেন—"বৃষ্টিতে বাইরে বেরুন বাতুলতা।" বুলু বুঝ্‌ল না, ব্যস্ত বুলুকে বুঝান বৃথা। বৃষ্টিপাতে বুলুরও ব্যাধি বাড়্‌ল। বৃহস্পতিবার বৈকাল বেলা বারো বয়সের বালক বুলুর বিয়োগে বঙ্কিম বাবুর বুকে বাণ বিঁধ্‌ল। বৈদ্য বল্লেন, 'বাস্তবিকই বুলু বীর বটে। বেশ বুঝেছি বৃষ্টিতে বাইরে বেরিয়েই বুলুর বুকে ব্রঙ্কাইটিস্ বেধেছিল।' বুলুর বিয়োগ বঙ্কিম বাবু বাদেও বহু ব্যক্তির বুকে বেজেছিল।

রবীন্দ্রবন্দনা

(শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত)

বঙ্গবাণীর মানস-সরে শ্বেত শতদল ফুটল গো,
বিশ্ববনের মধুপ যত মধুব্রতে জুটল গো।

ছন্দ-মরাল, ভিড়িয়ে ডানা গাইছ কি গান ছন্দেতে ?
উতল হ'ল বিশ্বহৃদয় মকরন্দ গন্ধেতে।
উঠ্‌ল বেজে বীণাপাণির হাতের বীণা সপ্তস্বরা,
সুপ্ত পরাণ উঠ্‌ল জেগে, পরশ পেয়ে মুগ্ধা ধরা।
শুনেছিলাম তিলে তিলে গড়েছিল তিলোত্তমা,
তাহার চেয়েও তোমার গড়া নিখুঁত, দেখি নাই উপমা।
মূর্ত্তি দিলে লাবণ্যকে, গড়্‌লে সোনার বঙ্গভূমি,
বিশ্ব-হিয়ার মণিকোঠায় সত্যি পরশমাণিক তুমি।
যশের, জ্ঞানের প্রতীক্ তুমি, সোনার কাঠি তোমার হাতে,
কাব্যে হৃদয় জয় করেছ, বাঁধলে সবে বিশ্বসাথে।
তোমার ধ্যানে কবির গানে প্রকাশ হলেন সরস্বতী,
বিশ্বকবি, আমরা আজি তোমার পায়ে জানাই নতি।

সূর্য্যমুখী ফুলের জন্ম

(শ্রীমতী শেফালিকা রায়চৌধুরী)

পুলিনা নামে ছোট্ট একটী মেয়ে এক্ নদীর ধারে বাস কর্‌ত। প্রত্যহই সূর্য্যদেব তাঁর সাত ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়ে পুলিনার সম্মুখ দিয়ে চলে যেতেন। অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁ করে সূর্য্যদেবের রাঙ্গা রথের পানে চেয়ে থাক্‌ত, আর মনে মনে ভাব্‌ত নিশ্চয়ই সূর্য্যদেব তার পানে একবার তাকাবেন। কিন্তু কোন দিনই সূর্য্যদেব তার পানে তাকাতেন না।

পুলিনা কাঁদতে কাঁদতে গাছপালা, পশুপক্ষী, নদী, পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত কেন সূর্য্যদেব তার দিকে তাকান না। নদীর জল পাড়ে আছড়ে পড়ে তার ব্যথায় করুণা জানাত, পাহাড়-পর্ব্বত মৌনদৃষ্টিতে তার প্রতি সমবেদনা জানাত।

নদীর তীরে এক নির্জ্জন জায়গায় বসে পুলিনা সর্ব্বক্ষণই সূর্য্যের পানে চেয়ে থাক্‌ত, আর মনে মনে বল্‌ত—'হে দেবতা, আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে চাই না,

শুধু একবার তুমি আমার দিকে ফিরে চাও; কিন্তু সেই ছোট্ট কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা সূর্য্যদেবের কাছে পৌঁছাত না।

দিনের পর দিন এই ভাবে কেটে যেতে লাগ্‌ল। তার চোখের জলেই নদী-তীর সিক্ত হয়ে গেল, তার সুন্দর চুলের গুচ্ছে জটা পাকিয়ে গেল, কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের পাতা বুজে গেল, তার রূপ মলিন হয়ে গেল—তবুও সূর্য্যদেবের দয়া হ'ল না।

যখন মরণদূত তার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিতে এল তখন বিধাতার দয়া হ'ল। মরণদূত তাকে স্পর্শ করা মাত্র বিধাতা তাকে সুন্দর এক ফুলে পরিণত কর্‌লেন। তার পর থেকে প্রত্যহই সূর্য্যদেব উঠবার সময়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে যান, আবার অস্ত যাবার সময়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে যান।

সেই দিন থেকে মানুষ দেখতে পায়,—সূর্য্য উঠবার সময়ে ফুলটি তার সুন্দর পাপড়ি মেলে ধরে, আর সূর্য্যদেব তাঁর উজ্জ্বল কিরণ দিয়ে তাকে স্নান করিয়ে দেন। অস্ত যাবার সময়ে ফুলটি আর সূর্য্যদেবকে দেখতে পায় না, তখন সে শোকে ঝরে পড়ে। তাই মানুষ তাকে সূর্য্যমুখী ফুল বলে ডাকে। *

মহুয়া-তলায় মেঠো ছেলে বাজায় মিঠে তান—

(কুমারী সুজাতা গুপ্তা)

আজ মহুয়া-তলায় মেঠো ছেলে বাজায় মিঠে তান,
পরনে তার হল্‌দে কাপড়, চোখে কাজল টান।
কাশের গোছা বাব্‌রি চুলে,
কোঁচড় ভরা বুনো ফুলে,
ভুঁইচাঁপারা দুল্‌ছে দোদুল ছেয়ে তাহার কান,
ওরে বাজায় মিঠে তান।

* একটি বিদেশী উপকথা অবলম্বনে।

তারই সুরে আকুল হ'ল বনের পাখীর প্রাণ;
কোয়েল কহে শ্যামায় ডাকি
"মোদের বনে আজ এল কি?
এত দিনে হ'ল মোদের গানের অপমান!"
ওরে বাজায় মিঠে তান।
জলের ধারে গিয়ে হরিণ চম্‌কে থাম্‌য় পান;
ফুলেরা সব দলে দলে
ভ্রমর-কানে হেঁকে বলে
"ভোম্‌রা, তুমি আজ হ'তে ভাই থামাও তোমার গান।"
ওরে বাজায় মিঠে তান।
নদী দাঁড়ায় পথের মাঝে ভুলে আপন মান;
ঢেউগুলি সব মুচকে হেসে
এ ওর গায়ে প্রড়ে শেষে,
হঠাৎ কেন থাম্‌ল গতি হয় না অনুমান।
ওরে বাজায় মিঠে তান।

হাস্য-কৌতুক

(শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা)

ভদ্রলোক—খোকা, তোমাদের পাশের বাড়ীতে কে থাকেন জান?

খোকা—জানি।

ভদ্রলোক—তাঁর নাম কি বল তো?

খোকা (এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এসে)—এখন বলতে পার্‌ব না, মা ভাত চাপিয়েছেন।

ভদ্রলোক—তাতে কি হয়েছে?

খোকা—লোকে বলে ও বাড়ীর কর্ত্তার নাম করলে হাঁড়ী ফাটে। এখন যদি আমাদের হাঁড়ী ফেটে যায় তবে তো খাওয়াই বন্ধ!

চিঠিপত্র

"আমরা একটি গল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি। গল্পটি ৩ থেকে ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে একটি স্বর্ণপদক এবং ৫ খানি গল্পের বই। দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে একটা রৌপ্য পদক এবং ৩ খানি গল্পের বই। একজন একাধিক গল্প দিতে পারেন। ১৫ই চৈত্রের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে।—শ্রীনবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়া, হুগলী।"

(এই পুরস্কারের জন্য রামধনু-সম্পাদক দায়ী নন।)

"আমার বড়দাদা ৺অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে আমি প্রতি বৎসর 'রামধনু'র মারফৎ "অক্ষয়-পদক" নামে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দিব। প্রতি বৎসর পুরস্কারের বিষয় হইবে ভিন্ন। এই প্রতিযোগিতার জন্য রামধনু-সম্পাদক দায়ী নহেন। রামধনুর গ্রাহকেরা—যাঁহাদের বয়স ১৫ বৎসরের মধ্যে তাঁহারাই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। ফলাফল রামধনুতে বাহির হইবে। বিষয়—একটি করুণ কবিতা। ২৫শে চৈত্রের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।—শ্রীঅধীররঞ্জন দে, C/o শ্রীকুঞ্জমোহন দে, A. S. O. সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ অফিস, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী)।"

"অর্ঘ্য নামে যে হাতে লেখা মাসিকটি সমালোচনা করিয়াছেন তাহা কি কিনিতে পাওয়া যায়?"—শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়।

(এ বিষয়ে শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়া, হুগলী—এই ঠিকানায় পত্রালাপ করুন—রাঃ সঃ)

"ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিলে কি লেখকের অনুমতি লইতে হয়?"—শ্রীঅধীররঞ্জন দে।

(হাঁ, 'কপিরাইট্‌' থাকিলে লইতে হয়।—রাঃ সঃ)

"প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডের জীবনী ও আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোনও বাংলা বইএ আছে কি?"—শ্রীমতী সবিতা সেন।

(শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বিজ্ঞান-বুড়ো' পুস্তকে আছে—রাঃ সঃ)

সন্দেশ

প্রসিদ্ধ মহিলা কবি ও সাহিত্যিক প্রিয়ম্বদা দেবী আর ইহলোকে নাই। তাঁর মৃত্যুতে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বাংলা শিশু সাহিত্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৩ বছর হইয়াছিল।

* * * *

সম্প্রতি পারস্য সরকার ঠিক করিয়াছেন যে আগামী ২১শে মার্চ্চের পর আর তাঁরা পারস্যকে "পারসিয়া" বলিবেন না, বলিবেন "ইরাণ"। ইরাণই নাকি তাঁদের দেশের প্রাচীন নাম এবং ইরাণ বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় পারসিয়া বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। প্যার্‌সিস্‌ (পারসিয়া) শব্দটি নাকি গ্রীকদের দেওয়া।

* * * *

১৯৩৩ সনে ভারতবর্ষে ৯৫৫৮টি রেজেষ্ট্রি করা কল-কারখানা ছিল। তার মধ্যে চিনির কল ২১৩টি। তার আগের বছর চিনির কল ছিল মাত্র ১৬৬টি। এই বছর গড়ে ১৪০৩২১২ জন শ্রমিক এই সব কলে কাজ করিয়াছে।

* * * *

একটি বোতল ভাঙ্গিতেছে—তার ফটো

পাশের ছবিখানি দেখিয়া বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না? এটি একটি বোতল ভাঙ্গার ফটো। বোতল ভাঙ্গা অর্থাৎ ভাঙ্গা বোতল নয়, বোতলটি যখন ভাঙ্গিতেছে—সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গে নাই, তখন এই ফটোটি তোলা হইয়াছে। ফটোটি তুলিতে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময় লাগিয়াছে। কিন্তু সেইখানেই ইহার বাহাদুরী নয়, বাহাদুরী এই ব্যাপারে যে ফটোটি তোলা হইয়াছে একটি সাধারণ অল্পদামী 'হাণ্ড ক্যামেরা'য় এবং যে তুলিয়াছে সে তোমার-আমার মতই একজন সখের ফটোগ্রাফার।

যে সব জিনিষকে আমরা খাঁটী লোহা বলিয়া মনে করি সেগুলি কিন্তু খাঁটি লোহা নয়—বেশীর ভাগ লোহাতেই অঙ্গার, মাটী, ম্যাঙ্গানীজ্ প্রভৃতি নানা রকম খাদ মিশান থাকে। এগুলি না মিশাইলে লোহা শক্ত হয় না। অনেকের বিশ্বাস ইস্পাতই সব চেয়ে খাঁটী লোহা—কিন্তু সেটাও ভুল ধারণা; ইস্পাতের মধ্যে অঙ্গার না থাকিলে তাকে ইস্পাত বলে না। আজকাল আবার ইস্পাতের মধ্যে মলিব্ডিনাম্, ভ্যানাডিয়াম্ প্রভৃতি নানা রকম ধাতু খুব অল্প পরিমাণ মিশাইয়া এমন শক্ত শক্ত লোহা তৈরী হইতেছে যা দিয়া কাচের মত শক্ত জিনিষও কাটিয়া ফেলা যায়।

• • • •

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আকারে বড় হয় ইহাই আমরা জানি। আমাদের পরিচিত অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও ঠিক এই নিয়মই দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতের ব্যাঙ আছে তাদের বেলায় দেখা যায় উল্টা রকম। ব্যাঙাচি অবস্থায় এই জীবগুলি লেজ সমেত প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা থাকে, তার পর যখন শরীর সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে তখন দেখা যায় শুধু লেজই লোপ পায় নাই, সমস্ত শরীরটাও ছোট হইয়া মাত্র আড়াই ইঞ্চিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। কি অদ্ভুত বল তো!

• • • •

বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ব্যামন্ সাহেব নানা পরীক্ষার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে শরীরের ওজন অনুযায়ী হিসাব করিলে এক-একটি ওরাং ওটাং কিংবা শিম্পাঞ্জী সাধারণ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ মানুষের চেয়ে ৪-৫ গুণ বেশী জোর রাখে। ডাইনোমিটার চাপিয়া ধরিয়া কে কত ঘর পর্য্যন্ত কাঁটা ঘুরাইতে পারে তা দেখিয়া হাতের জোর পরীক্ষা করা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। কলেজে পড়িবার সময়ে একবার এই ধরণের কাঁটা ঘুরাইয়া ছেলেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা দেখিয়াছিলাম। বেশীর ভাগ ছেলেই ৪৫—৫০ ঘর পর্য্যন্ত কাঁটা নামাইয়াছিল, একজন ৬০ এর কোঠায়ও গিয়াছিল।
কে একজন বলিষ্ঠ লোক নাকি ২০০ ঘর পর্য্যন্ত কাঁটা ঘুরাইয়াছিল—সেটাই বোধ হয় মানুষের রেকর্ড্। ব্যামন্ সাহেব শিম্পাঞ্জীর হাতে ঐ যন্ত্র দিয়া দেখিয়াছেন যে একটা শিম্পাঞ্জী ৮৪৭ ঘর এবং আর একটা (সেটা খুবই পালোয়ান) ১২৬০ ঘর পর্য্যন্ত কাঁটা ঘুরাইয়াছে। তিনি মনে করেন সভ্যতার আবেষ্টনীই মানুষের এই দুর্ব্বলতার কারণ।—রাঃ সঃ

• • • •

গত বছর ইংল্যাণ্ডের পোষ্ট-অফিস্গুলিতে তিন কোটী ছিয়ানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ডাক-টিকেট বিক্রী হইয়াছে। ঐ বছর সেখানে টেলিফোনে 'ডাক' (call) হইয়াছিল একশ' আটাশ কোটী। টেলিগ্রাম্ গিয়াছিল চার কোটী পঞ্চান্ন লক্ষ।—শ্রীরামপ্রসাদ সিং

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

ম	রু	ৎ
অ	**শ্রু**	না
অ	প্র	**সু**
উ	**দ**	র
ন	ন্দ	ন
ব	**দ**	ন
আ	য়	**ত্ত**

(২)

চি	কু	র
দ	**ত্ত**	ক
সা	গ	**র**
অ	**ঞ্জ**	ন
ন	য়	ন
প্র	**দা**	ন
নী	র	**স**

(৩)

স্বা	চ্ছ	ন্দ্য
স	**মী**	র
অ	ক	**বি**
কু	**বে**	র
কা	মা	খ্যা
ত	**ন**	য়
আ	ন	**ন্দ**

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

চিন্ময়ী দাস ও সুজনকুমার দাস (কলিকাতা); অমল, খোকা, কালিদাস, সান্ত্বনা, উমা, প্রফুল্ল গুপ্ত (মালদহ); সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ফেণী); বোচা, খোকা, শীতল, কানু, বৈদ্যনাথ, শম্ভু, ডলি প্রভৃতি (ঢাকা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); অশ্বিনী, অমিয়, অনিল, অজিত, অসিত, বীণা, অরুণকুমার গোস্বামী প্রভৃতি (বাণীগ্রাম); রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, শিবশঙ্কর, রাধা, রাসমণি, শ্যামা, তারা প্রভৃতি (বেহালা); সুধীর, বঙ্কিম, পুতুল, পবন, নবকুমার (কালনা); অমিতাভ, স্নেহমুকুল, বুলবুল (কুতুবপুর—রঙ্গপুর); খোকু, মন্টু, মোহন, খুসী, বুড়ী (কলিকাতা); গোপাল ও বাণী (বক্তিয়ারপুর); মলয় আঢ্য ও মুকুল আঢ্য (কর্ণেলগোলা); কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা, পঞ্চানন, শেফালিকা (কলিকাতা); রামেন্দু ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, যোগজীবন ও নির্ম্মলেন্দু সেন (ভবানীপুর); বিনয়গোপাল দাস (বাঁকুড়া); কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর); বিদ্যুৎ, অনু, উমা (ছাপরা); পাঁচুগোপাল ঘোষ, যামিনীকান্ত মণ্ডল (নওপাড়া); পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিপাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (পানিহাটী); সুললিত, অমর, প্রতিভা (বাণীমন্দির—মুড়াগাছা); মাখনচন্দ্র বাগচী, অজয়, দাদাবাবু, কমলা, শোভা, চিন্ময়ী, অরুণা (লক্ষ্মণপুর); সেজকাকা, ফুটু, বিনু, যদু, কুলু, বিমলু, নিমু প্রভৃতি (মৌড়ী—হাওড়া); অনিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট); ডলি, পলি, তপেন, গোটে (নিউ দিল্লী); হাসি, দিলু, কমলেশ, মা (কাত্রাশগড়); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী, লীলা, রেণু, ছায়া, আলো প্রভৃতি (জামালপুর); শঙ্করনারায়ণ কুমার, মিলনদা', প্রভাত, গৌর, রেণু, মন্টু, ফুটু (পূর্ণিয়া); জ্যোৎস্না নাহা, রসরাজদা', রথীন্দ্র, নাণ্টু, রাণী, অর্দ্ধেন্দু, ঝুলন (রাজাপুর—চট্টগ্রাম); হাঁদু, রমি, ভাইয়া, মিনু (কুচবিহার), সমীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর);

মাথাভাঙ্গা স্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (কুচবিহার); উমা, উষা, নেলী, বাণী, অমল, বিমল, নির্ম্মল প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা—কুচবিহার); ছবিরন্‌নেছা বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মাথাভাঙ্গা—কুচবিহার); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্‌); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

সুরমা, প্রতিমা, নীলিমা, সতী, তমাল, প্রীতি (পাতিহাল—হাওড়া); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু, ননী, মণ্টু, কানু (চুঁচুড়া); কুড়িগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (কুড়িগ্রাম); কনককুমার সিংহ (বর্দ্ধমান)।

নূতন প্রশ্ন

সুনীলের সেজদা' তার শ্লেটে একটা ভাগ অঙ্ক লিখে সুনীলকে কষতে দিয়ে গেছেন; আধ ঘণ্টা বাদে তিনি এসে সেটা দেখবেন, এর মধ্যে না হ'লে সুনীলের বরাতে কিছু আছে—কারণ সেজদা' ভয়ানক কড়া লোক। সুনীল কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই অঙ্কটা কষে ফেলেছে—উত্তর বেরিয়ে গেছে, ভাগশেষও কিছু নেই, কাজেই অঙ্কটা ঠিকই কষা হয়েছে সন্দেহ নেই।

কুড়ি মিনিট চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে থাকবার ছেলে সুনীল নয়; সে ভাবলে, মিনিট পনের বাইরে ঘুরে আসি না, এর মধ্যে তো সেজদা' আসছেন না, আর অঙ্ক তো হয়ে গেছেই। পনের মিনিট পরে ফিরে এসে সে দেখে শ্লেটের ওপর তার পোষা কুকুর জ্যাকি দিব্যি আরামে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি শ্লেট্‌ তুলে সুনীল দেখে, সর্ব্বনাশ! জ্যাকির গায়ের ঘষায় অঙ্কের কতকগুলো জায়গা একদম মুছে গেছে, এমন কি আসল অঙ্কেরও সবটা নেই। এখন উপায়? সেজদা' ফিরে এসে অঙ্ক না পেলে তো তাকে আস্ত রাখবেন না। বেচারা সুনীল! তার জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই খুব সহানুভূতি হচ্ছে? তোমরা তার একটু উপকার করবে? অঙ্কটার যতটা আছে এখানে তুলে দিচ্ছি—আর যে জায়গাগুলো মুছে গেছে সেখানে একটা ক'রে × চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি। সেজদা' ফিরবার আগেই তোমরা মাথা খাটিয়ে মুছে-যাওয়া অংশগুলি বসিয়ে দিতে পার? অঙ্কটা এই রকম আছে—

```
২১৫) × ৭ × ৯ × (১ × ×
      × × ×
      -------
       × ৫ × ৯
       × ৫ × ৫
      -------
           × ৪ ×
           × × ×
           -------
```

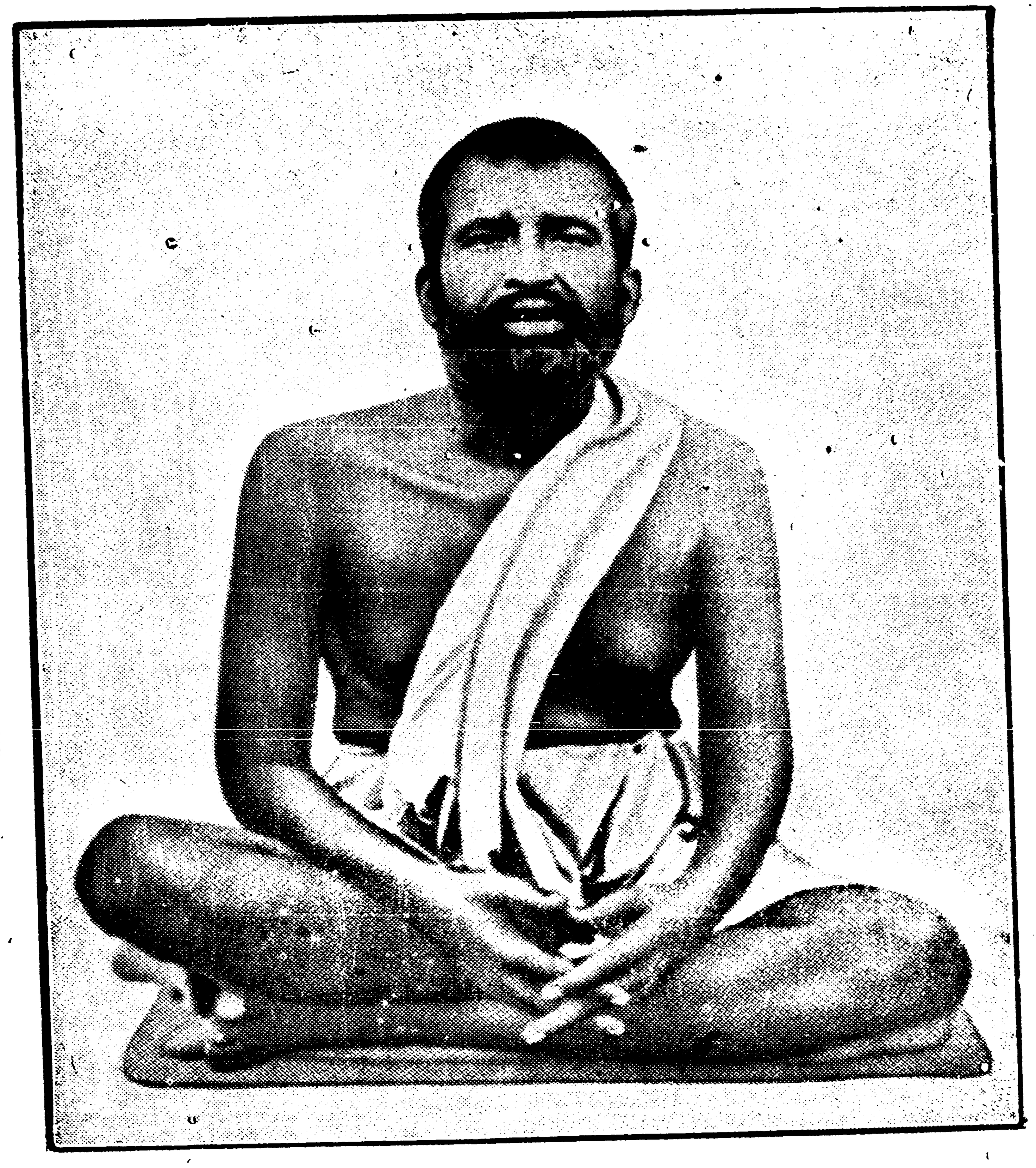

মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ

[শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব সম্প্রতি সমাধা হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী আজ বাংলার এই 'পাগল' ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধাবনত]

৮-ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪২ { ৪র্থ সংখ্যা

সম্রাট্ ও মন্ত্রী

[সম্রাট্ শাজাহানের জনৈক সচিব সম্বন্ধীয় প্রবাদ অবলম্বনে]

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্)

আভিজাত্য করি পরিহার
সাতুল্লারে করিলা প্রদান
—বিদ্যামাত্র সম্বল যাহার—
সচিবের পদ শাজাহান।

আক্রমিল ওমরার দলে
ঈর্ষানল করি তিল তিল,
নারিল নিভাতে সে অনলে
যমুনার সলিল সুনীল।

নিভৃত মহলে আগ্রার
অসূয়া করিল পরকাশ,—
"জাঁহাপনা, অমাত্য তোমার
অপদেবে সেবে বার মাস।

বিদ্যা তার ভণ্ডামি কেবল,
নম্র শুধু সম্রাটের পাশ,
লভিয়াছে যাদুমন্ত্রবল,
অচিরে সে আনিবে বিনাশ।

পেটকের খুলি আবরণ—
অপদেবে করিতে সহায়—
কি জানি কি করে নিরীক্ষণ
প্রতি দিন আসিতে সভায়।

দূত যদি পাঠাও ত্বরিত,
আনিবে সে পেটক এখনি,
কপটতা হইবে বিদিত,
শূন্য হবে পাণ্ডিত্যের খনি।"

ছুটিল কোটাল রাজাজ্ঞায়,
সচিবের ঘিরিল ভবন,
আনিল সে পেটক সভায়,
আবরণ করিল মোচন।

বিস্ময়ে দেখিল সভাজন,—
নহে কোন দুষ্ট শয়তান—
শুধু জীর্ণ মলিন বসন
পেটকে করিছে অবস্থান।

জিজ্ঞাসিলা বিস্ময়ে নৃপতি
"কেন, মন্ত্রী, এ ছার বসন
সংগ্রহে হয়েছে তব মতি ?
কেন নিত্য কর বিলোকন ?"

ধীর স্বরে কহিলা সচিব,—
"নহি আমি ওমরা-নন্দন,
ছিনু ক্ষুদ্র, নগণ্য, গরীব,
উচ্চপদে করেছ বরণ।

তন্ত্র মন্ত্র কভু, মহারাজ,
সাদুল্লার নাহিক অভ্যাস,
রেখেছিল স্বীয় পূর্ব্ব সাজ,
আসিয়াছে তাই তব পাশ।

দরিদ্র লভিয়া মন্ত্রি-পদ
ভোলে পাছে দরিদ্রের ব্যথা,
তাই এই জীর্ণ পরিচ্ছদ,
স্মরিতে সে অতীতের কথা।"

হাসিয়া কহিলা শাজাহান,—
"অপরূপ তব ব্যবহার,
ধন্য তুমি অমাত্য মহান,
ধন্য তব চরিত্র উদার।"

ট্যারা চোখের সুবিধা-অসুবিধা

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

গোরা চটে গেছে, ভয়ানক রকম চটে গেছে। কোন মানুষের, কি পশুপক্ষীর ওপরে নয়, যাদের 'অপদার্থ' ব'লে গাল দিয়ে অপমান করা যেতে পারে। গোরা চটেছে সমস্ত নির্জ্জীব পদার্থের ওপরে। ওদের নির্জ্জীব ভেবে যতটা নিরীহ মনে করি আমরা, আসলে ওরা ততটা ভালো মানুষ নয়। হাড়ে হাড়ে ওদের বদ্মাইসি।

এই দেখ না, কত কষ্ট করে একটা আধুলি সে আদায় কর্‌ল মামীমার কাছ থেকে বায়স্কোপ্ দেখ্‌বে বলে—কিন্তু এক্ষুণি হঠাৎ হাত থেকে পড়ে পাজি আধুলিটা সে কোথায় গিয়ে লুকোলো কে জানে! এইটুকু তো ঘর—তার কোন জায়গা খুঁজ্‌তেই বাকি রাখে নি গোরা। এ কোণ দেখ্‌ল, ও কোণ দেখ্‌ল, চেয়ার সরা'ল, টেবিল সরা'ল, ছেঁড়া কাগজের বাস্কেটটাও সন্ধান কর্‌ল—কিন্তু নাঃ! তার পাত্তাই নেই।

এই ত ঘর! এর মধ্যে কোথায় যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে! ঐ পা-পোষটার তলায় সেঁধোয় নি তো হতভাগা? আশান্বিত অন্তরে অত্যন্ত সন্তর্পণে গোরা পা-পোষটাকে তুল্‌ল। নাঃ, নেই। হতাশ হয়ে মাটিতেই বসে পড়্‌ল গোরা—ঘরে অতগুলো গদিয়ান্ চেয়ার থাকা সত্ত্বেও।

কোথায় যেতে পারে তবে? এই তো চক্ষের পলক বল্‌তে গেলে,—একটু আগেই চক্‌চকে বস্তুটা তার মুঠোর মধ্যেই ঘাম্‌ছিল। বেশীক্ষণ তো হয় নি যে বেশী দূর যাবে? এই ঘরের মধ্যেই কোথাও আছে। আচ্ছা, দেয়ালে টাঙানো ঐ ছবিগুলোর পেছনে নেই তো? মাটিতে পড়ে একেবারে অতটা লাফিয়ে উঠ্‌বে? আধুলিদের হাই-জাম্পের রেকর্ড্ অবশ্য গোরার জানা নেই—কিন্তু অতটা যে গোরা নিজেই লাফাতে পারে না!

যাই হোক্, তবু একবার দেখা ভালো। সে 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে, যেখান থেকে হোক্, ব্যাটাকে খুঁজে বের করবেই। বের ক'রে এখুনি ওকে ভেঙ্গে বত্রিশখানা করবে,—তা হ'লে ওর রাগ যাবে। তখন, হ্যাঁ, তখনই ব্যাটা জব্দ হবে—ওর পক্ষে লুকোনো হবে অন্ততঃ বত্রিশ গুণ কঠিন। কিন্তু নাঃ, ছবিগুলোর পেছনেও নেই। গোরার হাই-জাম্পের রেকর্ড্ ভাঙ্‌তে পারা আধুলির সাধ্য নয়! ছবিগুলোর পেছনে ওকে না পেয়ে গোরা একটু খুশিই হ'ল মনে মনে।

এমন লুকিয়ে থাক্‌বার কায়দা জানে এই টাকা-পয়সাগুলো যে তারিফ করতে হয়। কিন্তু তারিফ করার মত মনের অবস্থা নয় এখন গোরার। ম্যাটিনির শো-এ 'ইন্‌ভিজিব্‌ল্' ম্যান্ দেখ্‌তে যাচ্ছে সে, কিন্তু ইন্‌ভিজিবল্ আধুলির জন্য কি বিপদে পড়্‌ল দেখ দেখি! গোরা ভারী চটে গেছে। নইলে স্বভাবতঃ সে সহজে চটে না, ভারী মিষ্টি স্বভাব আমাদের গোরার, কিন্তু এখন চট্‌তে হয়েছে ওকে। আধুলিটার বোঝা উচিত যে গোরার এখন সিনেমার তাড়া, লুকোচুরি খেলার সময় এখন না।

নাঃ, আধুলির সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে এখন রাজী নয় গোরা। এখন কেন, কোন সময়েই না। গোরা আবার মাটিতে বসে পড়্‌ল—কি করবে বল আর? অসহায় ভাবে সে এবার শুয়েই পড়্‌ল মাটিতে। না, সত্যিই এরা বড় অভদ্র ব্যবহার করছে গোরার সঙ্গে—এই সব নির্জ্জীব পদার্থেরা।

বাস্তবিকই এদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে দিন দিন। এই তো গত হপ্তায় স্কুলের স্পোর্ট্‌স্ দেখ্‌তে গিয়ে মার্কাস্ স্কোয়ারে কি নাকালটাই না সে

হয়েছে। গেট্ বন্ধ হয়ে গেছ্‌ল, রেলিং টপ্‌কাতে গিয়ে তার অমন জরি-পেড়ে কাপড়খানা—! কাপড়ের দশা ভাব্‌তে গেলে চোখে জল আসে। এক নিমেষে একেবারে ফর্দ্দাফাঁই! তার ওপরে এই উপলক্ষ্যে ইস্কুলের ছেলেরা কি হাসিটাই না হাস্‌ল! এত লোকের সাম্‌নে রেলিংয়ের এই দুর্ব্ব্যবহারের কথা এ জীবনে ভুল্‌বার নয়।

এই তো সেদিন রুমালে ফুল তুল্‌তে গিয়ে মামীমা ছুঁচ্ হারিয়ে বস্‌লেন। খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ, কোথায় গেল ছুঁচটা? কিন্তু আর কি তার পাত্তা আছে? মামীমা বল্লেন, "গোরা, একবার দেখ না খুঁজে কোথায় ভুলে ফেল্‌লাম?"

গোরা জবাব দিয়েছে, "আমি পার্‌ব না মামীমা। আমি এখন "হিমালয়ের চূড়ায়" পড়ছি যে।"

স্বীকার করি, যত রাজ্যের কৌতূহল প্রেমেন মিত্তিরের ঐ বইখানায় জড় হয়েছে সেই কারণে ছুঁচ খোঁজার আগ্রহ গোরার তখন না থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু খুঁজলেই গোরা ভালো করত। মামীমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গোরা ভাব্‌ল, যাই চিলেকোঠার ঘরে চুপচাপ বসে পড়ি গে। কিন্তু যেই না কুশান্‌টায় বস্‌তে যাবে, তার আগেই যে ছুঁচ মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে বসে আছেন তা কে জান্‌ত? কাজেই গোরা হিমালয়ের চূড়ায় পড়তে গিয়ে পড়্‌ল গিয়ে কিনা ছুঁচের চূড়ায়!—

মেজমামা বলেন, "বড্ড বেঁচে গেল এবার ধনুষ্টঙ্কার হ'তে হ'তে।"

মামীমা বলেন, "একমাত্র ভগবানের দয়ায়!"

মেজমামা সংশোধন ক'রে দেন—"উঁহু, একমাত্র টিন্‌চার্ আইডিনের কৃপায়! ঠিক সময়মত পড়েছিল।"

কিন্তু টিন্‌চার আইডিনের জ্বালাই কি গোরা ভুল্‌তে পারবে? সজীব বোল্‌তার কামড়ের চেয়ে এই নির্জ্জীব তরল পদার্থের দাঁত কম ধারালো নয়। সত্যি, গোরা অনেক বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "নির্জ্জীব ব'লে আর কাঁহাতক্ এদের মার্জ্জনা করা যায়?" প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বড্ড বাড় বেড়েছে এরা। জুতোর একটা

কাঁটা কিছুদিন ওকে কি কষ্টটাই না দিল! কিন্তু জুতো ছেড়ে যেদিন না সে স্লিপার্ ধরেছে সেইদিনই দুর্ঘটনা! একটা সামান্য কলার খোসা,—কলার খোসার কি প্রাণ আছে? থাক্‌লেও নিশ্চয়ই খুব নীচুদরের হবে, গোরার বিবেচনায়, কলার খোসাদের কিছুতেই মহাপ্রাণদের মধ্যে গণ্য করা যায় না।

ব্যাপার আর কি, তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাবার মুখে একটা কলার খোসার প্যাঁচে পড়ে আমাদের গোরা একেবারে কুপোকাৎ! আর একটা ছেলে, কোথাকার কোন্ রাবিশ্ ইস্কুলের কে জানে, গোরাকে এসে বল্‌ল—"উঁহু, খোকা, উঠ না উঠ না। আর একটু ঐভাবে।"

গোরা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু আত্মসম্বরণ কর্‌ল—"কেন?"

"বেশ কায়দায় পড়েছ তুমি। তোমার এই ফিগার্‌টা খাতায় টুকে নিই। একেবারে যাকে বলে ফর্‌টিফিপ্‌থ্ থিয়োরেম্!"

গোরা মর্ম্মান্তিক চটে গেল, কলার খোসা এবং ছেলেটা—দু'জনের উপরেই—দু'টোই সমান বকাটে। কিন্তু তার এই মানহানির জন্য দায়ী তো ঐ কলার খোসাটাই? ছেলেটাও তত নয়, জিওমেট্রিও ততটা নয়—যত নষ্টের মূল ঐ অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ টা!

তার ওপরে আজ এই আধুলির উপদ্রব!

গোরা মাটিতে শুয়ে শুয়ে, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে, এই সব কথাই ভাব্‌ছিল। এই সব নষ্ট বস্তুর চরিত্র সংশোধন কি হবে কখনও? বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি একদা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন গোরা আজ সেই সমস্যার মুখোমুখি শুয়ে আছে। তাঁদের ভাবনার বিষয় ছিল মানুষ, কিন্তু গোরার উপলক্ষ্য হচ্ছে অমানুষ, কিন্তু প্রশ্ন সেই একই।—কোনদিন কি উদ্ধার হবে এদের? অন্ততঃ এই আধুলিটার?

কোথা থেকে মেজমামা এসে পড়লেন—"কিরে, ভূঁয়ে শুয়ে কেন? বিছানা খুঁজে পাচ্ছিস্ নে?"

গোরা তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়ায়—"উঁহু। বিছানা নয়, একটা আধুলি। এইখেনে পড়ে গেল এক্ষুণি।"

"বটে? দাঁড়া, খুঁজে দেখি।" ব'লে মেজমামা একদৃষ্টে গোরার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

"আধুলি কি আমার মুখে রয়েছে"—গোরা একবার নিজের মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেখে নেয়—"যে এখান থেকে বার করবে তুমি?"

"উঁহু। ঐ যে ওই দেয়ালের পাশটায় গিয়ে চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পলাতক।"

সত্যিই ত। গোরা এক লাফে গিয়ে আধুলিটাকে আক্রমণ করে। গোরার এই অবস্থার লং জাম্প একটা রেকর্ড্-যোগ্য। কিন্তু নিতান্তই দিনটা খারাপ তার, নইলে আর একটা রেকর্ড্ জাম্প দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্ত্তেই মেজমামা কখনও তাকে বাধা দেন?

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে আধুলি নিয়ে? বায়স্কোপে? রবিবার ব'লে বুঝি পড়তে নেই। নিয়ে আয় জিওমেট্রি।"

জিওমেট্রি খুলে বস্‌তে হ'ল গোরাকে। "উঁহু, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়্, পড়ছিস্ কিনা আমি ও ঘর থেকে শুন্‌ব।" মেজমামা শেল্‌ফ্ থেকে ডিটেক্‌টিভ্ নভেল্‌টা টেনে নিয়ে পাশের ঘরের সোফায় গিয়ে সটান্ হন।

গোরা চেঁচিয়ে পড়া সুরু করে; ওর মনে ভয়ানক প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। এমন জোর চেঁচাবে যে মামাকে নিজেই এসে থামাতে হবে—আরাম ক'রে নভেল পড়ার দফা রফা ক'রে তবে ছাড়বে। হ্যাঁ, গোরা আজ 'মরিয়া'—বিশ্বসংসারের ওপর সে আজ বীতশ্রদ্ধ। মামীমা ঘরে ঢোকেন, গোরা চোখ তুলে একবার দৃক্‌পাত করে মাত্র, কিন্তু তার তারস্বর থামায় না।

"ভারী সোরগোল তুলেছিস্ যে?"

"দেখ্‌তে পাচ্ছ না পড়ছি।"

"কি পড়ছিস্?"

"জানি নে!"

"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিস্ অথচ জানিস্ নে?"

গোরা গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—"পড়ছি কিন্তু শুন্‌ছি না।"

মামীমা হাস্‌তে থাকেন। "তা বেশ করছিস্। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় কোথাও বেরুস্ নি যেন, ঘোষ সাহেবের বাড়ী পার্টি আছে।"

আসন্ন ভোজের ভরসায় গোরা কিছু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। "আচ্ছা, মামীমা তুমি না বল্‌ছিলে যে কোন্ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে?"

"জগদীশচন্দ্র।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। আমি রোজই তার প্রমাণ পাই। আমি খুব বিশ্বাস করি। জগদীশচন্দ্রকে একটা চিঠি লিখে জানাব এ কথা?"

"তা জানাস্।"

"তা হলে খাম দিয়ো তুমি। কেবল প্রাণ নয়, পেটে পেটে ওদের দুষ্টু বুদ্ধি। তোমার সেই আধুলিটার কীর্ত্তি শুন্‌বে? একটু আগেই হাত থেকে পড়ে ঐ কোণে গিয়ে এমন লুকিয়েছিলেন যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"কে বার কর্‌ল খুঁজে?"

"মেজমামার ট্যারা চোখ। ট্যারা চোখের অনেক সুবিধা, বুঝলে মামীমা? হায়, আমার যদি ট্যারা চোখ হ'ত!" গোরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "আয়না নিয়ে আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই হয় না।"

চোখকে নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যে গণ্য করা যায় কি না গোরা বিবেচনা করতে থাকে।

মামীমা বলেন—"দেখিস্, সাবধান! আজকের পার্টিতে যেন আবার সেদিনকার মত না হয়!"

আগের পার্টির সেই দুর্ঘটনার কথা ভাবতেও গোরা শিউরে ওঠে। কিন্তু সে কি গোরার দোষ? আর যদি তাও হয় তা হ'লেও তার একার দোষ নয়। হয়েছে কি, আলুর দমের প্লেট্ থেকে একটা গোটা আলুকে যেমন না সে বাগাতে যাবে, আলুটা করল কিনা, গোরার হাত থেকে, কি কৌশলে বলা যায় না, নিজেকে কোন রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ যেন আকাশে উড়তে সুরু করে দিলে! গোরা বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে দেখল, আকাশে উল্কাপাতের বেলা যা হয় তেমনি

অদ্ভুত ব্যাপার! আলুর দমটা যেন নক্ষত্রবেগে শূন্য-পথ দিয়ে ছুটে চল্‌ল—ডিনার-টেবিলের একেবারে ওধারে বসে ছিলেন ঘোষ সাহেব, লাগ্‌বি তো লাগ্ লাগ্‌ল গিয়ে তাঁরই নাকের ডগায়!

ঘোষ সাহেব আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লেন—"য়্যাঁ? কি লাগ্‌ল আমার নাকে?"

চারিদিকে তাকালেন কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? ঘোষ-সাহেবকে বক্সিংএর প্যাঁচে কাবু করে সে তখন জান্‌লা দিয়ে সবেগে প্রস্থান করেছে। গোরার ভাগ্য ভালো যে মামীমা ছাড়া এই উল্কাপাত—মানে, আলুর দম-পাত আর কারুর নজরে পড়ে নি।

মামীমা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন—"ও কিছু না, মিষ্টার ঘোষ। আলুর দমের কাই মাত্র।"

ঘোষ সাহেব রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন, তাই তো, আলুর দমের কাইই ত বটে, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হ'ল—"কাইই তো দেখ্‌ছি কিন্তু কাই এত জোরে লাগ্‌বে?" তিনি ঘাড় নাড়তে লাগ্‌লেন—"উঁহু, কাইয়ের কখনও এত জোর হ'তে পারে না।"

গোরা দেখ্‌ল ঘোষ সাহেবের সন্দেহকে বেশী দূর এগুতে দিলেই সর্ব্বনাশ, কাইয়ের সবলতার পক্ষে ওকালতি করা সে প্রয়োজন মনে কর্‌ল। তাড়াতাড়ি বল্‌ল—"আপনি কি ভাবেন যে কাই জিনিসটা খুব রোগা?…মানে তার গায়ে একটুও জোর নেই?"

ঘোষ সাহেব নাকে হাত বুলোতে বুলোতে গোরার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন—"নিশ্চয়ই না।"

"আপনি তা হ'লে বল্‌বেন যে আলুর গায়েও জোর নেই? বেশ একটা আলুর দম টিপে ভাঙুন দেখি।" ব'লে গোরা সাবধান হয়ে বসে, নিজের নাক তো বাঁচাতে হবে! আলুর দম টেপা মানেই আসন্ন বিপদ্, যদিও যে টেপে তার নয়। কিন্তু গোরার নাকের ফাঁড়া সেদিন কাট্‌ল, ঘোষ সাহেব কি ভেবে বলা যায় না, হাতের সাহায্য না নিয়ে দাঁতের সাহায্যেই আলুর দমের শক্তি পরীক্ষা করলেন।

গোরা মামীমাকে আশ্বাস দেয়—"তুমি ভেব না মামীমা! পাজি আলুর ছায়াও মাড়াব না আমি আজ। কিন্তু তা তো নয়, কি করলে চোখ ট্যারা হয় তাই ভাব্‌ছি আমি।"

"কেন বল্‌ তো?"

গোরা মুখখানা ভারী গম্ভীর ক'রে তোলে—"ট্যারা চোখ হলে নেমন্তন্ন-বাড়ী গিয়ে ডবল খাওয়া যায়।"

"বলিস্‌ কিরে!"

"তুমি অবাক্‌ হচ্ছ? কেন, সেদিন ঘোষ সাহেবের বাড়ী মেজমামা কি করলেন? আমার পাশেই বসে, নিজের প্লেট্‌ থেকেও খাচ্ছিলেন আবার নিজের প্লেট্‌ মনে ক'রে আমার প্লেট্‌ থেকেও তুল্‌ছিলেন। আমার খাওয়াই হ'ল না সেদিন।"

মামীমা হাস্‌তে থাকেন। "আজ তুই তবে আমার পাশে বসিস্‌।"

"তা না হয় বস্‌ব।···বস্‌তেই হবে আমাকে, যদ্দিন না চোখ দুটোকে ট্যারা করতে পারছি। স্বচক্ষে দেখে তো মেজমামার প্লেট্‌ থেকে তুল্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু কত চেষ্টা করছি—" ব'লে গোরা কপাল কুঁচ্‌কে, মুখ বেঁকিয়ে চোখের অদ্ভুত এক ভঙ্গী করে। "দেখ না মামীমা, হয়েছে? হয়েছে?"

"উঁহু।"

"ও হবার নয়।" গোরা হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে—"আমি রোজ এক ঘণ্টা ক'রে চোখের এক্‌সার্‌সাইজ করি তবু হয় না। চোখ ভারী শয়তান্‌, ওকে সোজা করা, মানে—বাঁকা করা ভারী শক্ত।"

"বেশী খাবার জন্য তো তোর চোখ ট্যারা করা? তা, এম্‌নি তোর যত পেটে ধরে খাস্‌।"

"উঁহু, এম্‌নি কেমন চক্ষুলজ্জা হয়। কিন্তু খাওয়াই কি সব? ট্যারা চোখের আরো কত সুবিধা। মেজমামা অত বিদ্বান্‌ হ'ল কি করে? পাঁচ পাঁচটা পাশ করা কি মুখের কথা? অথচ মেজমামা চেঁচিয়ে পড়া দূরে থাক্‌ কোন দিন পড়ার বই ছোঁয়ও নি। কেবল ট্যারা চোখের গুণে।"

"কি রকম?" মামীমার কৌতূহল হয়।

"পরীক্ষার হল্‌-এ বেমালুম পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকে। মেজমামা নিজে একজনের কাছে গল্প করছিলেন আমি শুনেছি। যে সময় গার্ড ভাব্‌ছে তিনি নিজের খাতায় চোখ রেখেছেন সে সময়ে তিনি অন্য ছেলের খাতা থেকে ছেঁকে তুল্‌ছেন। আগাগোড়া টুকে পাশ, বুঝলে মামীমা? আমাকেও যদি মেজমামার মত পাঁচ পাঁচটা পাশ করতে হয় তা হ'লে আমার চোখও ট্যারা করে দিতে হবে কিন্তু। আচ্ছা মামীমা, ওষুধ খেলে কি চোখের অপারেশন্‌ করলে হয় না?"

মামীমা হাস্‌তে থাকেন—"ট্যারা চোখের জন্য তোর মামার চাক্‌রি যায় যায় হয়েছে তা জানিস্‌?"

"কেন? কেন?"

"ছেলেরা সব ক্ষেপে গেছে ওঁর ওপরে, মাষ্টারি কাজ আর বুঝি থাকে না। এবার ইস্কুলের টেস্‌টে উনি গার্ড্‌ হয়েছিলেন; এক শ' তিন জন ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছিল, তার মধ্যে কুড়িটাকে তিনি নকল করতে ধরে ফেলেছেন।"

"হুঁ, কখন অন্য দিকে তাকাচ্ছেন আর কখন তাদের দিকে তাকাচ্ছেন ছেলেরা বুঝতে পারে নি কিনা। মেজমামার বেলা সব উল্টো।"

"সেই কুড়িটার তো পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। বাকী তিরাশিটা ছেলে নকল করবার সুযোগ পেল না ব'লে পাশই করতে পার্‌ল না। সব এবার ডিস্‌এলাউড্‌। আবার টেস্‌ট্‌ হবে, উনি বল্‌ছেন উনি আবার গার্ড্‌ দেবেন। শুনে ছেলেরা সব ক্ষেপে গেছে, সমস্ত ইস্কুল ষ্ট্রাইক্‌ করবে নাকি।"

"তা হলে তো ভারী মুস্কিল!"

"মুস্কিল ব'লে মুস্কিল! সবাই ওঁকে ইস্তফা দিতে বলেছেন, নইলে ইস্কুলই তুলে দিতে হয়।"

গোরা সহানুভূতি প্রকাশ করে—"এক কাজ করা যাক্‌ না মামীমা? আমরা দু'জনেই অপারেশন্‌ ক'রে চোখ বদ্‌লে নিই না কেন? মেজমামাকে আর তো পাশ করতে হবে না, কি দরকার তাঁর ট্যারা চোখের আর?" সহসা সে উৎসাহিত

হয়ে ওঠে—"হ্যাঁ, আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, ক্যাম্বেলে পড়ে, আমি বল্‌লেই সে চোখ কেটে দেবে। কিন্তু মেজমামা রাজী হ'লে হয়।"

"আচ্ছা, আমি রাজী করাব। এখন তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে নে তো; ঘোষ সাহেবের আসার সময় হ'ল। এ কি, এ আবার কি ছিরি জামা পরার!"

গোরা তাকিয়ে দেখে ষ্ট্রাইপের শার্ট্‌-টা সে উল্টো করে গায়ে দিয়েছে—ষ্ট্রাইপের চক্‌চকে দিক্‌টা ভেতরে ঢাকা পড়েছে, তবু এতক্ষণ তার খেয়াল হয় নি! গোরা নিজের অমনোযোগে অবাক্ হয়ে গেল।

"ও, তাই উনি খাবার সময়ে বল্‌ছিলেন যে সকাল থেকে গোরা একটা নতুন জামা গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু কি ভোলা মন হয়েছে দেখ, আমিই কিনে দিয়েছি জামাটা, কিন্তু কখন কিনে দিলুম কিছুতেই মনে পড়ছে না। আর এদিকে বাবুর উল্টো করে শার্ট্‌ পরা হয়েছে!"—মামীমার হাসি আর থামে না।

তাই তো! কি সর্ব্বনাশ! সকাল থেকে গোরা এই জামা গায়ে দিয়ে ট্রামের অল্‌-ডে-টিকিটে সমস্ত কলকাতা ঘুরেছে আর কত লোকের চোখেই না পড়েছে, তাদের তো মেজমামার মত ট্যারা চোখ নয় যে তারা নতুন জামা বলে সন্দেহ করবে! তারা নিশ্চয় ভেবেছে যে এ ছেলেটা এখনও জামা পরতেই শেখে নি! কি লজ্জার কথা ভাব দেখি! গোরার বিরক্তি চরমে ওঠে—"আমি কি আর উল্টো ক'রে পড়েছি, আমাকেই উল্টো করে পরেছে জামাটা! এরা যে কি দুষ্টু তুমি জান না মামীমা! এরা যা আমার পেছনে লেগেছে। আমি আর পেরে উঠি না এদের সঙ্গে!"

গোরার কাঁদতে বাকী থাকে। এই হতচ্ছাড়া জামা গোরাকে কি অপমানটাই না করেছে আজ সমস্ত দিন! অথচ গোরাকে তা মোটেই জানতে দেয় নি। না জানিয়ে অপমান—তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না! একে ছিঁড়ে কুটি কুটি করলে তবে গোরার রাগ যায়। হ্যাঁ, তাই করবে, তাই করবে গোরা, এখুনি একে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে—ইতর-বস্তুদের অভদ্রতার চূড়ান্ত শোধ নেবে সে আজ। এই তার প্রতিজ্ঞা!

জামা-বধের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গোরা সবেগে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যার মুখে ঘোষ সাহেবের মোটর গাড়ী গোরাদের বাড়ী ঢুকল, গোরা তখন তার বন্ধু ঘুন্টুর সঙ্গে মার্ব্বেল্ খেলায় মত্ত। ঘোষ সাহেব গাড়ী থেকে নামতেই গোরা ছুটে এল—"আমরা কেউ আজ পার্টিতে যেতে পারব না মিষ্টার ঘোষ! মেজমামা এই মাত্র পা ভেঙে ফেলে হাসপাতালে গেলেন।"

"কি রকম, পা ভেঙে ফেল্‌লেন কি রকম?"

"কি রকম আর!" গোরা মুরুব্বিয়ানা চালে জবাব দেয়, "আমি আর ঘুন্টি এই লন্‌-এ মার্ব্বেল খেলছি আর ওখানে ঐ যে সিঁড়ি—ঐ যে তিনটে ধাপ—ঐ সিঁড়ি দিয়ে মেজমামা নাম্‌ছিলেন। সিঁড়িগুলো দেখ্‌তে পাচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছি বই কি।"

"কিন্তু মেজমামা দেখতে পান্ নি।"

"দেখতে পান্ নি কি রকম?"

"আমি তো স্পষ্ট দেখলাম তিনি সিঁড়ি দেখেই নাম্‌ছেন কিন্তু পরে জানা গেল তা নয়। সিঁড়ির দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন বটে কিন্তু দেখছিলেন ঐ গীর্জ্জার ঘড়িটা।... মেজমামার কোন দোষ নেই বুঝলেন মিষ্টার ঘোষ! ঐ সিঁড়ি-গুলোই ভারী পাজী, আমাকেও কতবার ফেলে দিয়েছে কিন্তু পা ভাঙতে পারে নি। আমার পা শক্ত কিনা!"

নির্লজ্জ

যুদ্ধ বেধেছে। এক দল সৈন্য ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। হঠাৎ বিপক্ষের দল কোত্থেকে কামান দাগতে সুরু কর্‌ল। ট্রেঞ্চের মধ্যে তখন ভয়ানক ব্যাপার! একজন সৈন্যের মাথা উড়ে গেল, আর একজনের আঙ্গুলের খানিকটা গেল কেটে; সে বেচারা যন্ত্রণায় চীৎকার আরম্ভ কর্‌ল। তাই দেখে সেনাপতি মশাই তাঁকে ধমক দিয়ে বল্লেন, "তুমি তো আচ্ছা নির্লজ্জ হে! যে লোকটার মাথা উড়ে গেল তার মুখে একটি কথা নেই আর তুমি সামান্য একটা আঙ্গুলের জন্য চীৎকার করছ?"

সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পী—"আঃ, কী মধুর বসন্ত! মন আমার আকুল ক'রে দিয়েছে! দাঁড়াও, দৃশ্যটা এঁকে ফেলি।"

আদ্যিকালের পৃথিবী

(শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্-এস্-সি)

সে বহু যুগের কথা, ঠিক কবে যে তা এখনও জানা যায় নাই; হয়ত কোটি কোটি বছরই হইবে—পৃথিবী তখন সবে মাত্র জন্মাইয়াছে (কেমন করিয়া তা' তোমাদের কিছু দিন আগেই বলিয়াছি)। চেহারাখানি তার বেশ সুগোল নাদুসনুদুস বটে, কিন্তু একেবারে গরম গন্‌গনে জ্বলন্ত গ্যাসে তৈরী তার শরীর।

তার উপর কোথায় বা তখন এখনকার পাহাড়-পর্ব্বত, আর কোথায় বা গাছপালা, পশুপাখী! মানুষের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

এমনি একখানি মূর্ত্তি লইয়া আমাদের পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিল, ঠিক যেন সূর্য্যের একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। তা হইবে নাই বা কেন? সূর্য্যেরই মেয়ে ত! তার পর দিন দিন করিয়া মেয়ের বয়স বাড়িতে লাগিল। কিন্তু ও মা! বয়স বাড়িলে কি হইবে, মেয়ে আর বাড়ে না! উল্‌টিয়া ক্রমশঃ যেন সে ছোটই হইতে লাগিল। তোমার আমার ব্যাপার হইলে নিশ্চয়ই ডাক্তার ডাকিতে হইত, কিন্তু পৃথিবী ত আর আমাদের মত মানুষ নয়, কিংবা গাছপালার মত উদ্ভিদ্‌ও নয়! তার বয়স যত বাড়িবে গায়ের গরমও তত কমিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরও ততই কোঁকড়াইয়া ছোট হইয়া আসিবে—এইটাই তার পক্ষে নেহাৎ স্বাভাবিক। গরমে যে সাধারণ জিনিষ মাত্রেরই আয়তন বাড়িয়া যায় আর ঠাণ্ডা করিলে কমিয়া আসে—এটি বিজ্ঞানের একটি গোড়াকার কথা; তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই নূতন নয়।

এমনি করিয়া গরম কমিতে কমিতে কিছু কাল পরে (হয়ত কয়েক লক্ষ বছর পরে) দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর উপরটা একদিন এমন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল যে তার গায়ের গ্যাসের মধ্যে জায়গায় জায়গায় তরল বিন্দু দেখা দিল। ঠাণ্ডা বলিয়া মনে করিও না বরফের মত ঠাণ্ডা বা শীতকালের ভোর রাত্রের মত ঠাণ্ডা। আগের জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবী যে রকম অসম্ভব গরম ছিল তারই তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা। এই মনে কর না কেন, গলান লোহা যে রকম ঠাণ্ডা সেই রকমটি আর কি! তা' ঐ রকম উত্তাপেও কয়েকটা গ্যাস আর গ্যাস থাকে না, তরল হইয়া যায়। তারাই প্রথমে তরল হইয়া পৃথিবীর গায়ে জায়গায় জায়গায় দেখা দিল।

এই তরল হওয়া ব্যাপারটা কি রকম জান? ফুটন্ত জলের বাষ্পকে একখানি ঠাণ্ডা থালার গায়ে লাগাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিলে সে বাষ্প যেমন ফোঁটা ফোঁটা জল হইয়া থালার গায়ে দেখা দেয়, ঠিক তেম্‌নি। তবে এক-একটা গ্যাস এক-এক অবস্থায় তরল হয়। জলের বাষ্প যতখানি ঠাণ্ডা হইলে জল হয় পৃথিবীর গায়ের

সব গ্যাস তার চেয়ে অনেক বেশী গরম অবস্থাতেই তরল হইয়া গিয়াছিল, কেননা তাদের স্বভাবই তাই।

কিন্তু উপরের হাল্কা গ্যাসের মধ্যে কি আর তরল জিনিষ থাকিতে পারে? সে বিন্দুগুলি আপনাদের ভারে, অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর ভিতরের টানে, পৃথিবীর শরীরের গ্যাস ভেদ করিয়া তার পেটের দিকে জড় হইতে লাগিল। প্রথমে একটি দু'টি করিয়া, তার পর তাড়াতাড়ি, তার পর আরও তাড়াতাড়ি। এমনি করিয়া তারা পৃথিবীর গায়ের উপরে জন্মাইয়া পৃথিবীর পেটের ভিতর গিয়া জমিতে লাগিল। জমিতে জমিতে কিছু কাল পরে (অন্ততঃ কয়েক লক্ষ বছর পরে) পৃথিবীর শরীরের প্রায় সব গ্যাসই তরল হইয়া গেল। তার দেহখানি তখন দিব্যি নিটোল টল্‌টলে একটি তরল গোলক হইয়া দাঁড়াইল। কেবল কয়েকটা নাছোড়-বান্দা গ্যাস তখনও তরল হয় নাই। তাদের তরল হইবার মত অবস্থা তখনও আসে নাই, পৃথিবী তাদের কাছে তখনও খুব গরম। তাই তারা পৃথিবীর তরল শরীরটিকে ঘিরিয়া একটি চাদরের মত রহিয়া গেল। এ দলে রহিল কারা জান? জলের বাষ্প হইল এ দলের পাণ্ডা। সঙ্গে রহিল কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড্ আর অন্য দু'-একটা গ্যাস। এই বাষ্প-গ্যাসের চাদর ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো তখন আসিতে পারিতেছিল না, অর্থাৎ সূর্য্য তখনও তার মেয়ের সুন্দর নিটোল তরল দেহটি দেখিতে পাইত না।

এদিকে পৃথিবী আবার ঠাণ্ডা হইয়া চলিল। ঠাণ্ডা হইতে হইতে ক্রমে তার তরল গায়ের উপর একটি দু'টি করিয়া নীরেট দানা দেখা দিল—মিছরির গরম রস ঠাণ্ডা করিলে যেমন তা'তে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে তেমনি করিয়া। সেই দানাগুলি আবার আপনাদের ভারে পৃথিবীর তরল দেহের ভিতর দিয়া তার পেটের মধ্যে গিয়া জমা হইতে লাগিল। তবে পৃথিবীর তরল শরীরে ত আর একটি জিনিষ ছিল না—কত নানান্ রকম পাথর, ধাতু দিয়া তা' তৈরী। তাই তাদের মধ্যে ভারী যেগুলি—অর্থাৎ ধাতুগুলি—তারাই আগে জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর পেটে গিয়া জমিল। ক্রমে আরও ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে তার উপর আর একটু হাল্কা পাথর, তার উপর আর একটু হাল্কা, এই রকম ভাবে জমা হইতে

লাগিল। এদের মধ্যে সকলের শেষে এবং সকলের উপরে জমাট বাঁধিল সব চেয়ে হাল্কা পাথর,—যার কথা তোমাদের মাঘ মাসে বলিয়াছি।

এরই মধ্যে এদিকে হইয়াছে কি, সেই যে পৃথিবীর গায়ের চারিদিকের বাষ্প-গ্যাসের চাদরখানি সূর্য্যের আলোকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, সেও ত সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে! ঠাণ্ডা হইতে হইতে এক সময়ে তার মধ্যেকার সেই জলের বাষ্প তরল হইয়া বৃষ্টির মত পৃথিবীর দিকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখন কি আর পৃথিবীর উপর পড়িবার মত অবস্থা আছে? বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পৃথিবীর কাছাকাছি আসে, আর তার গায়ের গরমে আবার বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; আবার আসে আবার যায়। এম্‌নি করিয়াই আবার কিছু দিন চলিল। পৃথিবীও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল। এক দিন এক পশলা বৃষ্টি নামিতে নামিতে সত্যি সত্যি একেবারে পৃথিবীর গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। পৃথিবীর গাটি কিন্তু তখনও যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় নাই, তাই পড়া মাত্রেই অম্‌নি সেই বৃষ্টির জল আবার বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল। আবার এক পশলা আসিয়া পড়িল, আবার সে উড়িয়া গেল। এম্‌নি করিয়া যেন জলের সঙ্গে আর পৃথিবীর সঙ্গে কিছু কাল ধরিয়া দিন রাত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টিরই জিৎ হইল। পৃথিবীর গা ত ঠাণ্ডা হইতেই ছিল, এক সময়ে এতটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল যে বৃষ্টির জলকে সে আর বাষ্প করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিল না, বৃষ্টির জল আসিয়া আস্তে আস্তে পৃথিবীর সারা গা জুড়িয়া জমা হইয়া গেল। আকাশও আর তখন ঝাপ্‌সা রহিল না; বেশ পরিষ্কার স্বচ্ছ হইয়া গেল। সেখানে রহিল কেবল কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড আর বাকী সব গ্যাস। সে সব গ্যাসকে ত আর দেখা যায় না, তাই তখন চাদরটা অদৃশ্যই রহিয়া গেল—সে-ই আমাদের এখনকার বাতাস। আর সেই স্বচ্ছ বাতাসের মধ্য দিয়া এত দিন পরে সূর্য্য প্রথম তার মেয়েকে দেখিতে পাইল। সূর্য্যের এক ঝলক আলো আসিয়া আস্তে আস্তে পৃথিবীর মুখের উপর পড়িল। সেইদিনই যেন পৃথিবীর সত্যি সত্যি জন্ম হইল।

কিন্তু সে পৃথিবী আমাদের আজকের পৃথিবীর মত মোটেই ছিল না। কি করিয়াই বা থাকিবে? তার উপরে আগাগোড়া সমস্তটাই যে জলে থই থই

করিতেছে! ডাঙা আর পাথরের রাজ্য তখনও মুখ তোলে নাই, তারা সেই জলের তলে। কেমন করিয়া, কবে যে সেই জল ভেদ করিয়া তার নীচে হইতে ডাঙা উঁকি মারিল সে কথা এখনও ঠিক করিয়া জানা যায় নাই। কেউ বলেন যে এরই মধ্যে কখন পৃথিবীর শরীর হইতে খানিকটা অংশ ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গিয়া চাঁদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই রাখিয়া-যাওয়া সেই গর্ত্তটাই পৃথিবীর উপর প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া গেল। যত জল সেখানে গিয়া জমা হইল, আর জায়গায় জায়গায় ডাঙা মাথা জাগাইয়া উঠিল।

আবার কেউ বলেন, যে পৃথিবীর ভিতরে কিছু নীচে গ্র্যানাইট্ প্রভৃতি পাথরের মধ্যে রেডিয়ম্ জাতের সব জিনিষ পাওয়া যায়। সোনা যেমন চিরকাল সোনাই থাকে, রূপা যেমন রূপাই থাকে, এ সব জিনিষ তেমন থাকে না; তারা এক রকম জিনিষ ক্ষয় করিয়া আর এক রকম হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ ছাড়িতে থাকে। পৃথিবীর ভিতরে এই সব জিনিষ নিশ্চয়ই সমান ভাবে গোছান ছিল না, কোথাও বেশী, কোথাও বা কম, এমনিই ছিল। তাই জায়গায় জায়গায় গরম বেশী হইয়াছিল। তারই ফলে খুব গরম হইয়া হয়ত জায়গায় জায়গায় গলিয়া গিয়া জলের উপর ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। আর সেগুলি জমিয়া শক্ত হইয়াই বোধ হয় প্রথম ডাঙার সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর বুকে প্রথম ডাঙ্গার জন্ম

এই রকম অনেক মতই আছে। তা যেমন করিয়াই হউক্, এক সময়ে ডাঙা আসিয়া জলের মাঝে মাঝে দেখা দিল, পৃথিবীর উপর ডাঙা আর সমুদ্রের

জন্ম হইল। এই সময়েও বোধ হয় পৃথিবীর নড়া-চড়া, আর আগ্নেয় গিরির উৎপাত খুব বেশী ছিল। সেই সব আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতে সব নূতন নূতন গ্যাস বাহির হইয়া বাতাসে জমা হইতে লাগিল। সূর্য্য তখন দেখিল এইবার মেয়েকে মানুষ করিবার সময় আসিয়াছে। সে তখন তার আলো আর উত্তাপ দিয়া পৃথিবীর উপরের ডাঙার পাথরগুলি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। বাতাসের গ্যাসগুলি—বিশেষ করিয়া কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস আর বৃষ্টির জল আসিয়া এ কাজে যোগ দিল। ডাঙার পাথর ক্ষয় হইয়া হইয়া সমুদ্রের জলে পড়িতে লাগিল। সমুদ্রের জল একটু একটু করিয়া নোনা হইয়া আসিতে লাগিল। বাতাসের গ্যাস কমিয়া গেল, পৃথিবীর উপরের অবস্থা অল্পে অল্পে বদ্‌লাইয়া আসিল।

এমনি সব পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবে কেমন করিয়া যে অতি ছোট শ্যাওলা জাতের উদ্ভিদ্ গোছের জিনিষ সমুদ্রের জলে দেখা দিল, সেও এক মহা সমস্যার কথা হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ঐ রকম এক সময়েই যে তারা দেখা দিয়াছিল সে কথা 'পৃথিবীর ডায়েরী' হইতেই পাওয়া যায়—অর্থাৎ পৃথিবীর উপরের প্রায় সব চেয়ে পুরানো পাথরের মধ্যে তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। এরাই আমাদের এখনকার গাছপালার এক রকম আদিপুরুষ। কিন্তু ডাঙায় তখনও না আছে জনপ্রাণী, না আছে গাছপালা। শুধু পৃথিবীর এই সব আদি উদ্ভিদ্‌ই পৃথিবীর বাতাসকে অন্য প্রাণীর উপযুক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। আজকাল গাছেরা যেমন বাতাসের কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড্ হইতে কিছু কিছু জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়, আদি উদ্ভিদ্‌গুলিও নিশ্চয় তাই-ই করিত। এম্‌নি করিয়া তারা বাতাসের কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের ভাগ কমাইয়া অক্সিজেনের সৃষ্টি করিতে লাগিল। তাই আজ বাতাসে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের বদলে অক্সিজেন গ্যাসেরই ভাগ বেশী, আর মানুষ, পশু-পাখী সব নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই অক্সিজেন টানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পাইতেছে।

এই ত গেল মোটামুটি রকমে আদ্যিকালের পৃথিবীর একটা ছোটখাট বিবরণ। এটাকে কিন্তু নিছক কল্পনা মনে করিও না। ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদের অনেক গবেষণার ফলে এই সব কথা আবিষ্কার হইয়াছে। অবশ্য এ কাহিনীর সবটাই যে

একেবারে নিছক সত্যি তা না হইতেও পারে, অনেক জায়গায় বৈজ্ঞানিকদের বেশ কিছু সন্দেহও আছে। তবে এখন পর্য্যন্ত তাঁদের যত দূর জ্ঞান, তাই জোড়াতাড়া দিয়া তাঁরা আদি পৃথিবীকে এই রকম একটা রূপ দিয়াছেন।

হরদাসের জ্যাঠা

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্‌-এ, বি-টি)

"ও কে যায় রে? এই ছোকরা?"

"আজ্ঞে, এই আমি।"

"আমি? ইয়ে, আমি কে রে?"

অগত্যা অমূল্যকে আগাইতেই হয়। বলা বাহুল্য, এই অবেলায় পথের মধ্যে আট্‌কা পড়িতে অমূল্যের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বাজারের ফির্‌তি পথে বেলা ১২ টার সময় মাছ-তরকারীর বোঝা হাতে লইয়া কাহারই বা ইচ্ছা হয় পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেরী করিতে। বিশেষতঃ যিনি ডাকিতেছেন তিনি অমূল্যের প্রাণের বন্ধু তো নহেনই, বরং তাঁহার ছায়া দেখিলেও অমূল্যের বয়সী যে কোন ছেলেরই বোধ করি পালাইবার ইচ্ছা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ভয়ে অমূল্য এই পথটা সোজা হইলেও বরাবর এড়াইয়াই চলিয়াছে এ কয় দিন। তবে আজ নাকি তার বড় তাড়া—দুপুরেই গাঙ্গুলী-বাড়ীতে সারস্বত-সমিতির সভা—তাই না সে তাড়াতাড়ি 'শর্টকাটে' পা বাড়াইয়াছিল! আর দুরদৃষ্ট, ঠিক সেই সময়েই স্বনাম-প্রসিদ্ধ হরদাসের জ্যাঠার সঙ্গে ঘটিয়া গেল তাহার শুভ সাক্ষাৎকার।

"তার পর, ইয়ে, তোমার নামটা কি তো?"

"আজ্ঞে অমূল্য।"

"য়ঁ্যা, অ—মূ—ল্য! ইয়ে, ইংরেজীতে কি হবে, ভ্যালুলেস্‌ না ইন্‌ভ্যালুয়েব্‌ল্‌! বল তো কোন্‌টি হবে?"

এই রে! অমূল্য প্রমাদ গণিল। যাহা শুনিয়াছে তবে সত্যিই তাই? অমূল্যের মনে হইল ইহার চেয়ে ঘোরা পথে দশটি বাঁশের সাঁকো পার হওয়াও বুঝি সুখের ছিল।

"য়ঁ্যা, বল না হে, ইয়ে ভ্যালুলেস্‌ না ইন্‌ভ্যালুয়েব্‌ল্‌?"

"বোধ হয়……"

"বোধ হয় কি হে, ইয়ে, স্থির হয়ে ভেবেই বল না! ব্যস্তটা কি?"

বড় বড় তপ্‌সে মাছ দেখ্‌ছি যে, য়ঁ্যা!

"আজ্ঞে ইন্‌ভ্যালুয়েব্‌ল্‌।"

"আচ্ছা বেশ, বেশ! তার পর, ইয়ে, দেখি তোমার খালুইটা? আচ্ছা, বল তো খালুইএর ইংরেজীটি কি?"

অমূল্য শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখের পানা পুকুরটার পরপারের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

"য়্যাঁ, ইয়ে, খালুইয়ের ইংরেজী বল্‌তে পারছ না? ইয়ে, কোন্ ক্লাস্?"

"ক্লাস্ টেন্‌এ উঠেছি।"

"উঠেছ? ইয়ে, উঠ্‌তে দিলে? ইয়ে, টেন্থ্ ক্লাসে পড়্‌ছ, আর ইয়ে খালুইএর ইংরেজীটা জানো নি? য়্যাঃ! আচ্ছা দেখি ইয়ে, খালুইএর ভেতর কী মাছ?"

অমূল্যের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভদ্রলোক নিজেই কষ্ট করিয়া খালুইএর মুখের মূলোশাকের আঁটি সরাইয়া একবার উঁকি মারিয়া বলিলেন, "এঃ খুব বড় বড় তপ্‌সে মাছ দেখ্‌ছি যে, য়্যাঁ! আচ্ছা ইয়ে, বল তো তপ্‌সে মাছের ইংরেজীটা কি?"

"তোমার মুণ্ডু" অমূল্য মনে মনে বলিল। রাগে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিতেছিল। মনে মনে সে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল—মুখ দিয়া কোন কথা না বাহির হইলেও ঠোঁট তাহার নড়িতেছিল।

"য়্যাঁ, ইয়ে, মনে পড়্‌ছে না? ইয়ে, ওয়ার্ড্‌বুকটা পড় নি? আচ্ছা ইয়ে, গু—পী! ওরে গু—পে?"

হরদাসের জ্যাঠার আহ্বানে হরদাসের জ্যেঠ্‌তুতো ছোট ভাইটি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইল। এ হাসির গূঢ়ার্থ অমূল্যের বুঝিতে বাকী রহিল না, কারণ এরূপ অভিনয়ের বিবরণ আসিয়া অবধি সে পর পর অনেকের মুখেই শুনিয়াছে।

"আচ্ছা, ইয়ে গুপী, বল্ তো তপ্‌সে মাছের ইংরেজী কি?"

"ম্যাঙ্গো ফিস্।"

"আচ্ছা ইয়ে, তোর তো কোন্ ক্লাস্?

"ক্লাস্ সেভেন্।"

তার পর অবনত-মুখ অমূল্যকে উদ্দেশ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "ইয়ে, তোমার না কোন্ ক্লাস বল্লে?"

"ক্লাস টেন্ হবে।" অমূল্যের স্বরে ভরা অসহ্য বিরক্তি। সে ছাড়া পাইলে বাঁচে।

"আচ্ছা ইয়ে, যাও এবার বাড়ী যাও, বোধ হয় ইয়ে, অনেক বেলা হয়েছে। আর বিকেলের দিকে ইয়ে, বরং ইদিকে একবার এস—ইয়ে, ইংরেজীটা রপ্ত করে দেব'খন।"

সারাটা পথ অমূল্য মনে মনে হরদাসের জ্যাঠার ইংরাজী বিদ্যার নিকুচি করিতে করিতে চলিল। লোকটার ভারী বাড় বাড়িয়াছে। করেন তো কোন্ পাটের আফিসে দালালী, তার আবার ইংরাজী বিদ্যা ফলানো। হ্যাঃ।

রাগে, দুঃখে, অপমানে, তথা পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অমূল্য যখন 'লটকাটে' বাড়ী ফিরিল তখন বেলা দেড়টা।

(২)

এই হরদাসের জ্যাঠাটি সত্যই এক অপূর্ব্ব বস্তু! কৃতান্তকিঙ্কর বাবুকে স্বনামে সে পাড়ার কেহ বড় চেনেও না। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরদাস গাঁয়ের ইস্কুলে পড়ে। বাপ নাই, মার কাছে বাড়ীতে থাকে। জ্যাঠাটি পাটের দালালী করেন, মাসে মাসে বাড়ীতে কিঞ্চিৎ খরচ পাঠান। আর প্রায় প্রতি ছুটিতেই সপুত্র বাড়ী আসিয়া ঘরদোর জমাজমি ঠিক আছে কিনা খবর লইয়া যান। যে ক'দিন দেশের বাড়ীতে বাস করেন সে ক'দিন পূরাদমে হরদাসের মাষ্টারীগিরি করিতে কিছুই কসুর করেন না; অর্থাৎ, ক'দিনের মারের চোটে বেচারার প্রাণটুকুই যা অতি কষ্টে দেহগত থাকে! তবু যদি শুধু হরদাসের উপর দিয়াই তার সবটুকু ধাক্কা পোহাইত সেও ছিল এক রকম। পাড়ার পড়ুয়া ছেলেদের ওই কয়দিন তাঁহার সুমুখে পড়িলে আর নিস্তার নাই। হয়ত এই দুই কারণেই, বিশেষ করিয়া, ভদ্রলোক নিজ নামটি খোয়াইয়া 'হরদাসের জ্যাঠা' ইতি খ্যাত হইয়াছেন। সত্যি, ছুটির দিনে হরদাসের জ্যাঠার জ্বালায় পাড়ার ছেলে-ছোক্‌রাদের এক পাও বাহিরে যাইবার যো ছিল না। দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই—যখন যে অবস্থায়, যে কেউ ওর সামনে পড়িয়াছে কি প্রশ্নের ধাক্কায় একেবারে নাস্তানাবুদ! আর সে কী প্রশ্ন! বাপ্‌রে বাপ্! ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান—কিছুতেই যেন ভদ্রলোকের অরুচি নাই;—অন্ততঃ ভাবটা দেখান যেন সবজান্তা। বাছিয়া বাছিয়া যত সব বিদ্‌ঘুটে ইংরেজী, আর আন্‌ইম্‌পর্টেণ্ট্ জায়গার নাম মকস করিয়া নিজের

ছেলে গুলীকে রপ্ত করিয়া রাখেন, তার পর ছুটিতে বাড়ী আসিয়া ছেলেদের ধরিয়া তারই পরীক্ষা নেন।

ভদ্রলোকের ‘মাষ্টারি’ করার এই উৎকট আকাঙ্ক্ষার একটু মজার ইতিহাস আছে। সাতবার এফ্-এ ফেল্ করার পর হতাশ ভাবে তিনি নিজের গাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ‘সহরের’ লোকেরা তাঁহার অতল পাণ্ডিত্যের কদর রাখে নাই তাই নিজের গাঁয়ের লোকেদের কাছে বিদ্যার বোঝা খানিকটা ঝাড়িবার বোধ হয় লোভ হইয়াছিল, তিনি গাঁয়ের ইস্কুলে একটি মাষ্টারির খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেমনই স্কুলের সেক্রেটারী তেম্‌নি হেড্‌মাষ্টার—এত বড় সুবর্ণসুযোগ হাতে পাইয়াও কাজে লাগাইলেন না! ফলে হরদাসের ছোট কাকার উপরই প্রথমটা সজোরে মাষ্টারি আরম্ভ হইল, পরে সে চোট আরও ব্যাপকতর হইয়া নীচের ‘জেনারেশনে’ অর্থাৎ, জ্ঞাতিগোষ্ঠির ছেলেপেলেদের দিকে নামিতে সুরু করিল। আরও কত দূর নামিত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ তিনি এক পাটের অফিসের বড় বাবুর সুনজরে পড়িয়া যাওয়ায় গাঁয়ের ছেলেগুলি রক্ষা পাইল। সেই হইতে আজ পনেরো বছর ধরিয়া তিনি ইছাপুর পাটের অফিসের দালালীতে লিপ্ত আছেন। শোনা যায়, নিজেকে ‘জুট্ ব্রোকার’ ছাড়া হরদাসের জ্যাঠা কখনো ‘দালাল’ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। দালালীর প্যাঁচে পড়িয়াও কিন্তু তাঁহার মাষ্টারি বুদ্ধি নাকি মরিতে পায় নাই। তাই ছুটি-ছাঁটাতে যে ক’দিন তিনি বাড়ী আসিয়া থাকেন, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের প্রতি তাহার প্রশ্নের প্রক্ষেপেই তিনি বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন।

* * * *

ব্যাপারটা অমূল্য শত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিল না। ‘বিশেষতঃ ঐ পুঁচ্‌কে ছোঁড়া গুপে—ক্লাস সেভেনে পড়ে—তারই সামনে কিনা ডাকিয়া নিয়া অপমান! এ জ্বালা অসহ্য, হ্যাঁ, অমূল্যের পক্ষে অসহ্য।

দুপুর বেলায় ‘সারস্বত-সমিতিতে’ বিলম্বে-হাজির অমূল্যের হাঁড়িমুখ দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল—ইতিমধ্যে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়া গেছে!

যাহা হউক, উপস্থিত আগামী সরস্বতী পূজার আয়োজনের চাপে অমূল্যের অপমানের জ্বালা চাপা পড়িয়া গেল; গত বারে দাসপাড়ায় ওরিয়েণ্টাল প্যাটার্ণের

ঠাকুর হইয়াছিল, তাহাদেরও এবার ওরিয়েণ্টাল চাই, তা’ সে যত দামই লাগুক্। তা ছাড়া সাহিত্য-সভা, থিয়েটার, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি তো আছেই। মোটের উপর সব দিক্ দিয়া দাসপাড়ার উৎসবটি ‘কাণা’ করিবার যত রকম ফন্দী হইতে পারে মহোল্লাসে তাহারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় সারাটি দুপুর কাটিয়া গেল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই সভাতেই আগামী উৎসবের সেক্রেটারীত্বে অমূল্যকে বরণ করা হইল। উৎসবের যাবতীয় প্রোগ্রাম তাহাকেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩)

শ্রীপঞ্চমী। বাগ্দেবীর পূজার ধূম পড়িয়া গেছে। সাজসজ্জায় অমূল্যদের পাড়ার ঠাকুর সব চেয়ে যে সেরা হইয়াছে এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু শুধু ঠাকুর সুন্দর হইলেই অমূল্যের আশা মিটিবে না, আনুষঙ্গিক সবগুলি অনুষ্ঠানই যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় অমূল্যের দল তাহারই জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেছে। থিয়েটার, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি ছাড়া সে যে নূতন একটি আইটেমের (item) ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা পাড়াগাঁয়ের পক্ষে যেমন অভিনব তেমনি আশ্চর্য্যজনক। পাবনা হইতে তাহার কাকার বন্ধু প্রোফেসর প্যাটাক্ অমূল্যের অনুরোধে তাঁহার অদ্ভুত সম্মোহন-বিদ্যা দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। খবরটা ইতিমধ্যে আগুনের মতই গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দলে দলে কৌতূহলী জনতা সেনপাড়ার প্রাঙ্গণে আসিয়া জমিতে লাগিল। একজন সভাপতি হওয়া চাই, হরদাসের জ্যাঠা কৃতান্ত বাবুকে অনুরোধ করিতেই তিনি সানন্দে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইতে রাজী হইলেন। ছেলে-মহলে একটু আপত্তি যে না উঠিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু অমূল্য ক্ষমার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। সভা আরম্ভ হইবার সময়ে বোধ হয় গ্রামের আর কাহারও সেখানে আসিতে বাকী নাই।

যথারীতি সভাপতি-বরণ, রিপোর্ট্-পাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা শেষ হইলে সকলের উৎসুক দৃষ্টির মধ্যে কালো কোট্ প্যাণ্ট্ পরা, লিকলিকে লম্বা চেহারা, চশমাধারী প্রোফেসর প্যাটাক্ অমূল্যের আহ্বানে আসরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত সভা তখন নিস্তব্ধ, সূচটি পড়িলেও বোধ হয় তাহার শব্দ শোনা যায়।

কোনরূপ ভূমিকার বালাই না করিয়া প্রোফেসর প্যাটাক্ আবিষ্ট (Hypnotised) হইবার জন্য চারি জন লোক চাহিলেন। স্বাভাবিক কুসংস্কারবশতঃ প্রথমটা তো কেহই উঠিতে চায় না। শেষে অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর তিনটি স্কুলের ছেলে আসিয়া জুটিল। অগত্যা অমূল্যকেই চতুর্থ ব্যক্তির স্থান পূরণ করিতে হইল। তার পর চারিজনকে সমান ভাবে দাঁড় করাইয়া প্রোফেসর প্যাটাক্ রহস্যময় গম্ভীর সুরে স্লীপ্—স্লীপ্—স্লীপ্ বলিয়া আবিষ্ট করিবার চেষ্টা সুরু করিলেন। এবং প্রোফেসরের আশ্চর্য্য শক্তির প্রভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারি ব্যক্তিই তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া পড়িল।

তার পর?

তার পর প্রোফেসর এক-একজনকে এক-একটা অতি অদ্ভুত আদেশ করেন আর সে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা পালন করে, আর চারিদিকে হাততালি আর হাসাহাসির ধূম পড়িয়া যায়। এইরূপে কাহাকেও কাগজের বিস্কুট, কাহাকেও বা মাটির রসগোল্লা খাওয়াইয়া, কাহাকেও অনর্থক হাসাইয়া, কাহাকেও বা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদাইয়া, প্রোফেসর ছেলে ক'টিকে নিয়া যেন পুতুল নাচাইয়া ছাড়িলেন। সব শেষে আসিল অমূল্যের পালা। প্রোফেসর প্যাটাক্ এবার অমূল্যকে উদ্দেশ করিয়া সমবেত ভদ্রলোকের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন— "হ্যাঁ, দেখুন, এই মনে করুন আপনি যেন এখানকার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, আর এঁরা আপনার ছাত্র। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবার আপনি একটু ইংরেজীর ক্লাস্‌টা নিন্ তো।"

বলা বাহুল্য অমূল্য কলের পুতুলের মতই প্রোফেসরের আদেশ পালনে তৎপর হইল। সামনেই হরদাসের জ্যাঠার ডাহিনে ও বামে টিনের চেয়ারে পাড়ার কয়েক জন বয়স্ক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন, মাষ্টার-বেশী অমূল্য তাঁহাদিগকেই তাহার ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতে সুরু করিল। ভদ্রলোকেরাও কৌতুকবশতঃ প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে দ্বিধা করিলেন না। যদি কারও এতটুকু ত্রুটী হইল, অমনি অমূল্য পরম গম্ভীর ভাবে ভ্রূ কুঁচ্‌কাইতেও ত্রুটী করিল না। ব্যাপার দেখিয়া সভামধ্যে, বিশেষতঃ ইস্কুলে-পড়া ছেলেদের মধ্যে

মহা হাসাহাসির ধূম পড়িয়া গেল। হাসিল না কেবল দুই জন—প্রোফেসর প্যাটাক্ নিজে আর মাষ্টার-বেশী অমূল্য।

ঘন ঘন হাততালি আর হাসাহাসির মধ্যে অমূল্যের নকল মাষ্টারী-গিরি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; সভাপতি হরদাসের জ্যাঠা শুদ্ধ হাসিয়া অস্থির। এমন সময়ে অমূল্য স্বয়ং সভাপতিকে উদ্দেশ করিয়াই প্রশ্ন সুরু করিল।—

"আচ্ছা, ইয়ে, বল তো 'কাম্‌স্‌কেটাক্কিজম্' কথার মানে কি?"

হঠাৎ সমস্ত সভা ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। সভার প্রবীণ উদ্যোগীরা প্রমাদ গণিল, কী জানি ছেলেটা কিসে কি প্রশ্ন করিয়া বসে? অমূল্য তো আর নিজের বশে নাই? এদিকে হরদাসের জ্যাঠা চালাক লোক, দালালী করিয়া খান, ব্যাপারটা নেহাৎ কৌতুকের বুঝিয়াই একটু উপেক্ষার হাসি হাসিলেন মাত্র। কিন্তু মাষ্টার-বেশী অমূল্য ছাড়ে কই? ছাত্রকে নীরবে হাসিতে দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

"য়্যাঁ, ইয়ে, তাও জান না? ইয়ে, আবার হাসা হচ্ছে? বলি, ইয়ে, কোন্ ক্লাস?"

হরদাসের জ্যাঠা তথাপি তেমনি নিরুত্তর। ভাবটা যেন—ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করিতেছেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। প্রোফেসর গম্ভীর মুখে পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

"ইয়ে, বলি কোন্ ক্লাস্? ইয়ে, কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে হয়—তাও শেখ নি! য়্যাঁ, ইয়ে, ভারী ইয়ার হয়েছ যে!" অমূল্য চোখ কট্‌মট্ করিয়া হরদাসের জ্যাঠার পানে তাকাইল। সে ভদ্রলোক এতক্ষণে চটিয়া লাল হইয়াছেন, কৌতুকের অভিনয়ে একি অসহনীয় বেয়দপি! সভামধ্যেই যেন একটু অসন্তোষের ভাব দেখা গেল,—অমূল্য তখনও গজ্‌রাইতেছিল, "য়্যাঁ, অবাক্ কাণ্ড! ছেলে ক্লাস টেনে পড়েন অথচ ইয়ে, নেবুকাড্‌নেজার বানান জানেন না, কনফিউসাসের ইয়ে, কাকার নাম ভুলে যান, ইয়ে, হাচিমুচিগারুর উত্তরে কোন্ নদী তার খবর রাখেন না, জুফেগাস্ কথার মানে জানেন না! ইয়ে, তোমার টিফিন্ বন্ধ, আর ইয়ে, ছুটীর পর দেড় ঘণ্টা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।" ব্যাপার বড়ই বাড়াবাড়িতে যাইতেছে দেখিয়া দু'-একজন প্রবীণ ব্যক্তি উঠিয়া গিয়া প্রোফেসর প্যাটাক্‌কে মন্ত্র

তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিতে গেলেন। অমূল্য কি তাহাদের আগাইতে দেয়, একেবারে উন্মাদের মত আস্ফালন করিতে লাগিল। সভামধ্যে তখন প্রায় তাণ্ডব ব্যাপার সুরু হইল। ভিড় ঠেলিয়া প্রোফেসর প্যাটাক্ অমূল্যের পিঠের উপর কয়েক বার হাত বুলাইতেই অমূল্য নিজের সত্তা ফিরিয়া পাইল বটে কিন্তু সেই গণ্ডগোলের মধ্যে স্বয়ং সভাপতি হরদাসের জ্যাঠা কৃতান্তকিঙ্কর বাবু কখন্ যে আসন ছাড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছেন, তাহা কাহারোই মালুমে আসে নাই।

* * * *

সেদিনকার সমস্ত ব্যাপার চুকিয়া যাওয়ার পর অমূল্যকে ঘিরিয়া পাড়ার সর্দ্দার ছেলেরা নাকি খুব একচোট হাসিয়াছিল—এমন একটা কানাঘুষা অনেকের কাছে শুনিয়াছি।

মাটন্

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

'মাটন' নাম শুনিয়া তোমরা যেন মনে করিও না আমি কোনও মুখ-রোচক খাদ্যবিশেষ লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মাটন্ একটি গ্রামের নাম,—বাংলা দেশের গ্রাম নয়, বাংলা হইতে বহু দূরে—প্রায় সতের-আঠার শ' মাইল্ দূরে কাশ্মীর প্রদেশের একটি গ্রাম।

আজ দীর্ঘ সাত বছর পরে, কেন জানি না, মাটনের কথা বার বার মনে পড়িতেছে। আমার জীবনের খাতার একটি কোণে মাটনের স্মৃতি চিরকাল গাঁথা হইয়া থাকিবে তা আমি জানিতাম ; শুধু আমার বলিয়া নয়, মাটনের সঙ্গে একবার যার পরিচয় হইয়াছে মাটনের কথা সে কখনও ভুলিতে পারিবে না এ কথাও আমি ভাল করিয়াই জানি। তবু আজ কেন নতুন করিয়া মাটনের কথা মনে ভাসিয়া উঠিল ? কারণটি বোধ হয় এই—

সেদিন সকাল বেলা কি একটা কাজে একটি বিখ্যাত মন্দিরের পাশ দিয়া

যাইতেছিলাম। বড় সহরের মন্দির—ছোট, অপরিচ্ছন্ন, জনাকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া সেখানে যাইতে হয়। মন্দিরের দু' পাশে বাজার, রাস্তায় স্তূপীকৃত ধূলা—তারই উপর সার বাঁধিয়া ভিখারীর দল চীৎকার করিতেছে। সেদিন আবার কি একটা পার্ব্বণ ছিল, পঙ্গপালের মত মন্দিরের দিকে লোক ছুটিয়াছে—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, উড়িয়া, মান্দ্রাজী—সর্ব্ব দেশের লোক। তারই ভিতর অবস্থাপন্ন লোকেদের গাড়ী-মোটরের বিকট আওয়াজে কানে তালা লাগিতেছে। মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইবার তিলার্দ্ধ জায়গা নাই—ফলে হট্টগোল আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। তারই উপর পাণ্ডার দল ধর্ম্মভীরু যাত্রীদের কাছে পয়সার জন্য তারস্বরে নিবেদন করিতেছে। ভগবানের আরাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে। এই দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয় নতুন করিয়া মাটনের কথা মনে পড়িল। মাটন্ও একটি তীর্থ স্থান, কিন্তু কি প্রভেদ !

তবে একটু খুলিয়াই বলি। মাটন্-ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আমার পুরানো ডায়েরী হইতেই উদ্ধার করা যাইবে।

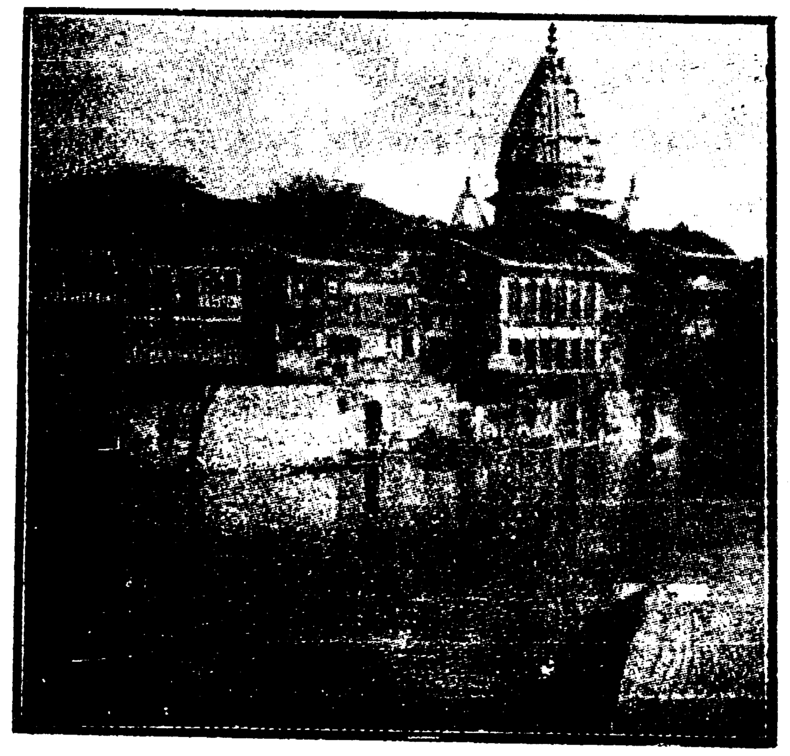

ঝিলমের পাড়ে শ্রীনগর

১৯২৮ সনের জুন্ মাস ; কলিকাতায় তখন প্রচণ্ড গরম। আলিপুরের হাওয়া-অফিসের মতে বাতাস নাকি কয়েক দিন যাবত আগুন মাখিয়া ছুটাছুটী করিতেছে। কিন্তু আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ আমি তখন কলিকাতা হইতে বহু দূরে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর সহরে ঝিলম্ নদীর ধারে একটা বাড়ীর তেতালায় বসিয়া মনের সুখে চা পান করিতেছি। মনে সুখ হইবার অবশ্য কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট্ উঁচু জায়গায় বসিয়া সকাল বেলার মৃদু মৃদু শীতে মৃদু-উষ্ণ চা একটি দেবভোগ্য জিনিষ।

দ্বিতীয়তঃ, আমার সম্মুখে শুধু চা-ই ছিল না, আরও ছিল কতকগুলি একেবারে সদ্য গাছ-হইতে-পাড়া চেরী, ষ্ট্রবেরী, মাল্‌বেরী, আখরোট, নাসপাতি ইত্যাদি পশ্চিম দেশীয় মেওয়া (যা আরও কয়েক দিন পরে শুষ্ক চেহারা লইয়া—অর্থাৎ আসল রসটুকু হারাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে।) কিন্তু এ দু'টি কারণই সব নয়, তৃতীয় কারণ (এবং প্রধান কারণ) জানিতে হইলে যাইতে হইবে নীচে রাস্তায়—যেখানে আমাদের মাটন্ লইয়া যাইবার জন্য একখানি মোটরগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সেই মাটন্—যার কথা বলিতে গিয়া বিখ্যাত পর্য্যটক ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড্ বলিয়াছিলেন, "ইট্ ইজ্ ওয়ান্ অব্ দি মোষ্ট্ হেভেন্‌লি স্পট্‌স্ অন্ দি আর্থ্" (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় স্থানগুলির মধ্যে এটি একটি।)

যথা সময়ে মোটর ছাড়িয়া দিল এবং শ্রীনগরের পরিচ্ছন্ন রাস্তার ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কি পরিষ্কার রাস্তা! দু' পাশে সার বাঁধিয়া পপ্‌লার গাছের 'য়্যাভিনিউ' চলিয়া গিয়াছে। সে সার যত দূর দৃষ্টি যায় তোমাদের জ্যামিতির ভাষায় যা'কে বলে একেবারে 'প্যারালাল্' অর্থাৎ সমান্তরাল। কি সুন্দরই না দেখিতে!

ক্রমে শ্রীনগর সহর পিছনে পড়িয়া রহিল। এখন আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ী-ঘর দেখা যায় না, দেখা যায় দূরে নীল আকাশের বুকে বিরাট্ পর্ব্বতশ্রেণী সার বাঁধিয়া চলিয়াছে—তার মাথাটা একেবারে সাদা বরফ দিয়া তৈরী। সকাল বেলার সূর্য্যকিরণ তার গায়ে পড়িয়া যেন একরাশ সোনা ঢালিয়া দিয়াছে, আর মাঝে মাঝে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমাদের পাশ ঘেঁষিয়া আঁকাবাঁকা ঝিলম্ নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত কাশ্মীর প্রদেশটিই এই ঝিলম্ নদীর উপত্যকা তা' বোধ হয় তোমরা জান।

আমাদের মোটর কখনও খোলা মাঠের ভিতর দিয়া, কখনও বনের (তপোবন?) ভিতর দিয়া, আবার কখনও বা পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া চলিতে লাগিল। পথে-ঘাটে এমন অজস্র ফুলের বাহার আমি কখনও দেখি নাই। সত্যিই কাশ্মীর ফুলের দেশ।

দেখিতে দেখিতে পাম্পুর গ্রাম ছাড়াইয়া অবন্তীপুরে আসিয়া পড়িলাম।

মোটর হইতেই দু'টি পুরানো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়িল—মন্দিরের ফটক, চাতাল প্রভৃতির কারুকার্য্য বড় ভাল লাগিল। সেখানে বেশী সময়ক্ষেপ করিবার উপায় ছিল না, তাই আবার যাত্রা সুরু করিলাম। পথে খানাবল, অনন্তনাগ প্রভৃতি আরও কয়েকটা উল্লেখযোগ্য জায়গা পার হইয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে মাটনে পৌঁছান গেল।

এইখানে মাটনের একটু পরিচয় দেই। 'মাটন্' কথাটা 'মার্ত্তণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ। মার্ত্তণ্ড মানে তো তোমরা জানই—সূর্য্য। প্রায় বারো শ' বছর আগে কাশ্মীরে ললিতাদিত্য নামে এক মস্ত বড় রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি এখানে একটা প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ড-মন্দির অর্থাৎ সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মার্ত্তণ্ড-মন্দির হইতেই এ জায়গার নাম প্রথমে মার্ত্তণ্ড, তার পর একটু একটু করিয়া বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে মাটন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জায়গাটি কাশ্মীরের একটি মস্ত বড় তীর্থস্থান।

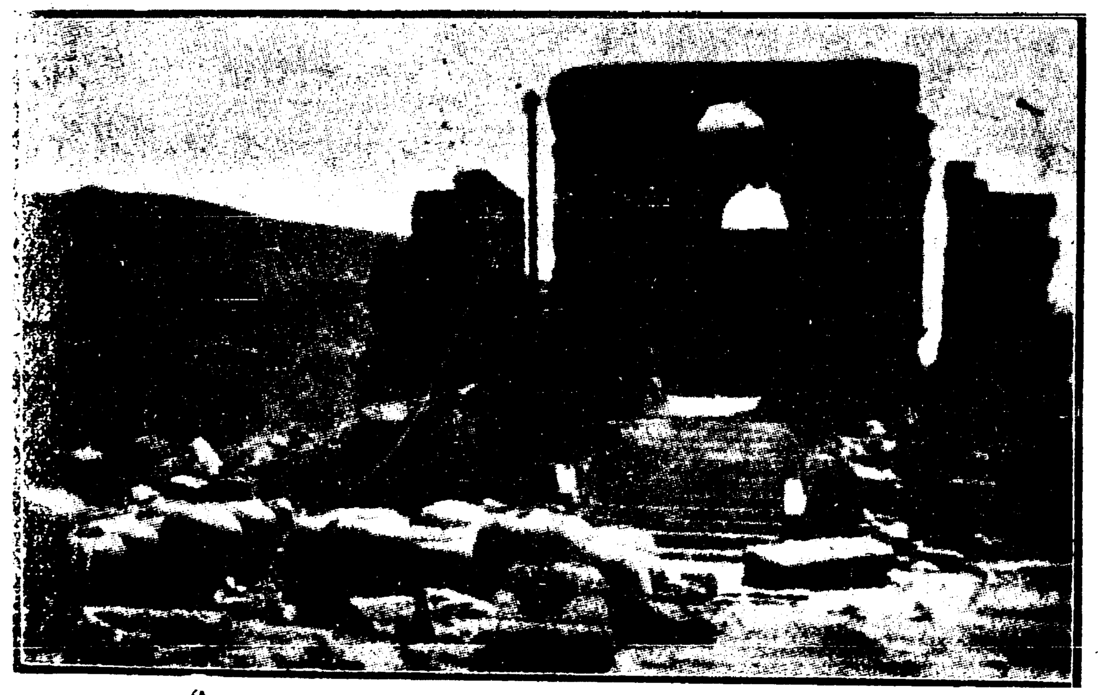

প্রাচীন মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—মাটন্ (মন্দিরের চূড়া ও বিগ্রহ পাওয়া যায় নাই)

ললিতাদিত্যের সেই বিরাট্ সূর্য্য-মন্দিরে এখন আর বিগ্রহ নাই, পূজাও আর হয় না। সে মন্দির কালের নিষ্ঠুর প্রতাপে ভাঙ্গিয়া মাটী চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন—প্রায় সবটাই।

এখনকার মাটন্ গ্রাম বলিয়া আমাদের যেখানটায় নামাইয়া দিল সেটা সেই প্রাচীন মার্ত্তণ্ড-মন্দির হইতে খানিকটা দূরে। এখানে এখন নতুন করিয়া আর একটি

মার্ত্তণ্ড-মন্দির গড়া হইয়াছে এবং সেখানে পূজা, হোম, উৎসব সবই হয়। বলা বাহুল্য এ মন্দিরটি, আমাদের পরিচিত বেশীর ভাগ মন্দিরের মতই, যাত্রীর ভিড় ও হট্টগোল হইতে রেহাই পায় নাই।

আমরা নামিতেই পাণ্ডার দল আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের পাণ্ডা শ্রীনগরেই ঠিক করা হইয়াছিল, সে আসিয়া সকলকে সরাইয়া আমাদের দখল করিল। এখানকার পাণ্ডারা কিন্তু বেশ সভ্য আর বড় ভদ্র, দর্শকদের ব্যতিব্যস্ত মোটেই করে না বরঞ্চ যত দূর সম্ভব সুবিধাই করিয়া দেয়—সত্যসত্যই প্রাণ ঢালিয়া আদর-যত্ন করে। কাশ্মীরে শতকরা সাত জন মাত্র হিন্দু। এই হিন্দুরা সকলেই ব্রাহ্মণ—এদের বলা 'হয় পণ্ডিত। এরা প্রায় সকলেই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সেকালকার আর্য্যদের মতই সুশ্রী। পাণ্ডা আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠজি," (কেন জানি না, কাশ্মীরে অনেকেই আমাদের শেঠজি বলিয়া ডাকিত—বোধ হয় আমরা স্যুট্ পরিতাম না বলিয়া। অনেকে আবার আমাদের বোম্বাই-এর অধিবাসী বলিয়া মনে করিত।) "আপনারা তো 'বাঙ্গাল্' থেকে আস্‌ছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানেন? তিনি আমাদের যজমান।" যাক্, রবি ঠাকুরের সহিত আমাদের অন্ততঃ এক বিষয়ে মিল আছে জানিয়া পুলকিত হইলাম। কারণ রবি বাবু ও আমরা একই পাণ্ডার যজমানত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

মাটনের আধুনিক মার্ত্তণ্ড-মন্দির ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা গেল। সাত ঘোড়ার রথে সূর্য্য ঠাকুর বসিয়া আছেন—তাঁর আশ-পাশে অনেক দেবদেবী, প্রায় প্রত্যেকেরই পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটা কুণ্ড (বাঁধান জলাশয়)। সেখানে একটা ভারী মজার জিনিষ দেখিলাম। ছোট্ট—কয়েক হাত চওড়া কুণ্ড, কিন্তু তার মধ্যে হাজার হাজার কালো কালো মাছ কিল্‌বিল্ করিতেছে! এত অসংখ্য যে অনেক সময়ে জল চোখে পড়ে না, মনে হয় ওটা যেন একটা স্তূপীকৃত মাছেরই পুকুর। সে বড় অদ্ভুত দৃশ্য! এই মাছগুলিকে "কৃষ্ণের জীবের" মত অতি যত্নে পোষা হয়, কাহাকেও ধরিতে দেওয়া হয় না। কাশ্মীরীরা মাছ বড় কেউ খায় না—হিন্দুরা তো নয়ই।

নতুন মন্দির দেখিয়া সেই প্রাচীন মন্দির দেখিতে চলিলাম। প্রায় মাইল্ দুই হাঁটিয়া পাহাড় বাহিয়া অবশেষে মন্দিরের কাছে পৌঁছান গেল।

সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। খানিকক্ষণের জন্য মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। "অভিভূত" হইয়া যাওয়া বলিয়া সাধুভাষায় যে একটা কথা আছে—আমি বোধ হয় তাই-ই হইয়া গিয়াছিলাম। এমন দৃশ্য দেখিব আমি কখনও ভাবি নাই,—কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। পাহাড়ের উপর অনেকখানি জায়গা যুড়িয়া একটা বিরাট্ সমতলক্ষেত্র। তারই মাঝখানে কালো পাথরে গড়া বিরাট্ মন্দির ধ্যানরত তপস্বীর মত দাঁড়াইয়া আছে। বিশাল ফটক—ঘাড় উঁচু করিয়া তার দিকে তাকাইতে গেলেও ঘাড় ব্যথা হইয়া যায়, আবার তার মধ্যে এমন অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যে একবার চাহিলে ঘাড় ফিরাইতেও ইচ্ছা করে না।

প্রাচীন মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের বিশাল ফটক—নিকটের লোক কয়টির সঙ্গে তুলনা করিলেই ফটকের আয়তন সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইবে।

মন্দিরের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সেখানে মাটীর তলা হইতে খুঁড়িয়া-পাওয়া অনেক জিনিষ ও মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে দেখা গেল। কতকগুলি সেকালকার মাটীর জালা দেখিলাম—সেগুলি এত বড় যে তার এক-একটার মধ্যে আলিবাবার গল্পের দস্যুদের মতন চার-পাঁচ জন অনায়াসে ঢুকিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে।

মন্দিরের মধ্যে সূর্য্য-মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু যার উপর মূর্ত্তি ছিল সেই বেদী রহিয়াছে। দেয়ালে পাথর ক্ষুদিয়া নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা—কারুকার্য্য

এত সুন্দর ও এত সূক্ষ্ম যে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। মন্দিরের আয়তনও বড় কম নয় ; দু'পাশে সার বাঁধিয়া লম্বা অতিথিশালা চলিয়া গিয়াছে—একটার পর একটা, সব কালো পাথরে তৈরী।

ভারতের অনেক বড় বড় তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছি, কিন্তু এমনটা বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই। মন্দিরের জায়গাটিই বা কী চমৎকার বাছা হইয়াছে! উঁচু পাহাড়ের উপর অনেকখানি সমতলক্ষেত্র—তার উপর বিশাল মন্দির। পিছনে, পাশে আকাশ ছুঁইয়া বরফের খেলা ; সম্মুখে নীচে বিশাল কাশ্মীর উপত্যকা ঝিলম্‌কে বুকে লইয়া হাসিতেছে। তার পর যত দূর দৃষ্টি যায় সার বাঁধিয়া পীরপাঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়াছে—তার শুভ্র চূড়া ধীরে ধীরে নীল আকাশের গায়ে শুভ্র মেঘের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ,—লোক নাই, জন নাই, কোন কোলাহল নাই। এই অপরিসীম নিস্তব্ধতাই যেন সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তীর্থ তো এমনটাই হওয়া উচিত—ভগবান্‌কে ডাকিবার এই তো উপযুক্ত জায়গা!

কতক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলাম হুঁস নাই, পাণ্ডার ডাকে চমক ভাঙ্গিল। পাণ্ডা আমাদের "সকুল" দেখাইতে লইয়া চলিল। "সকুল" অর্থাৎ মিশনারী স্কুল। এখানকার (পাঞ্জাবেও) ইংরাজী-না-জানা লোকেরা স-কিংবা ষ-এর যুক্তাক্ষর ঐ ভাবে উচ্চারণ করে—'ষ্টেশন্'কে বলে 'সটেশন্', 'স্ক্রু'কে বলে 'সক্রু' (আমাদের দেশে অবশ্য বলে ইস্‌কুরুপ্—'প্' যে কোথা হইতে আসিল ভগবান্ জানেন)।

মধ্যাহ্নভোজনটি ভালই হইল। ব্রাহ্মণভোজনের পুণ্যটা পাণ্ডাই লইল। একটা ভারী মজার জিনিষ খাইলাম—কাশ্মীরীরা তাকে বলে "কুচ্ছি"—একটা তরকারি, দেখিতে 'উচ্ছে'র মত কিন্তু খাইতে একেবারে মাংসের মত। কাশ্মীরী পণ্ডিতাইন-এর (পণ্ডিতের স্ত্রী) হাতের রান্না বেশ সুন্দর। পাণ্ডাদের—বিশেষতঃ আমাদের পাণ্ডাটির সাংসারিক অবস্থাও বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল।

এখানে পাহাড়ের গায়ে একটা বড় সুড়ঙ্গ (গুহা?) আছে, অতঃপর তাহারই উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেল। খুব লম্বা সুড়ঙ্গ—অত্যন্ত অন্ধকার, আলো লইয়া ঢুকিতে হয়। একটু ভিতরে গিয়াই কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল,

কেমন একটা ভাঁপসা গন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। ভিতরে একটা ঝরণার শব্দও শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম সুড়ঙ্গের আর একটু ভিতরে একটি নরকঙ্কাল আছে—এক সাধুর কঙ্কাল। অনেক দিন আগে তিনি এই সুড়ঙ্গের ভিতর বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেন এবং অবশেষে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। আমাদের সঙ্গে মহিলা ছিলেন, সুতরাং এ সংবাদের পর তিনি আর বেশী দূর যাইতে দিলেন না (কারণ সাধুরই হউক্ আর যারই হউক্, কঙ্কাল তো বটে!)

পাহাড়ের গায়ে আরও কয়েকটা ছোট-বড় গুহা দেখিলাম। অনেকগুলি "চশমা"ও (চোখে লাগাইবার চশমা নয়, এ দেশে ঝরণাকে চশমা বলে) চোখে পড়িল। কি ঠাণ্ডা আর সুস্বাদু জল এগুলির! আমাদের পাণ্ডার মতে এই চশমার জল খাইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটা চিনার গাছের (বটগাছের মত বড় গাছ—কাশ্মীরীদের বড় প্রিয়) ছায়ায় কাটাইতে পারিলে প্রত্যহ আধ তোলা করিয়া শরীরের মাংস বাড়িয়া যায়।

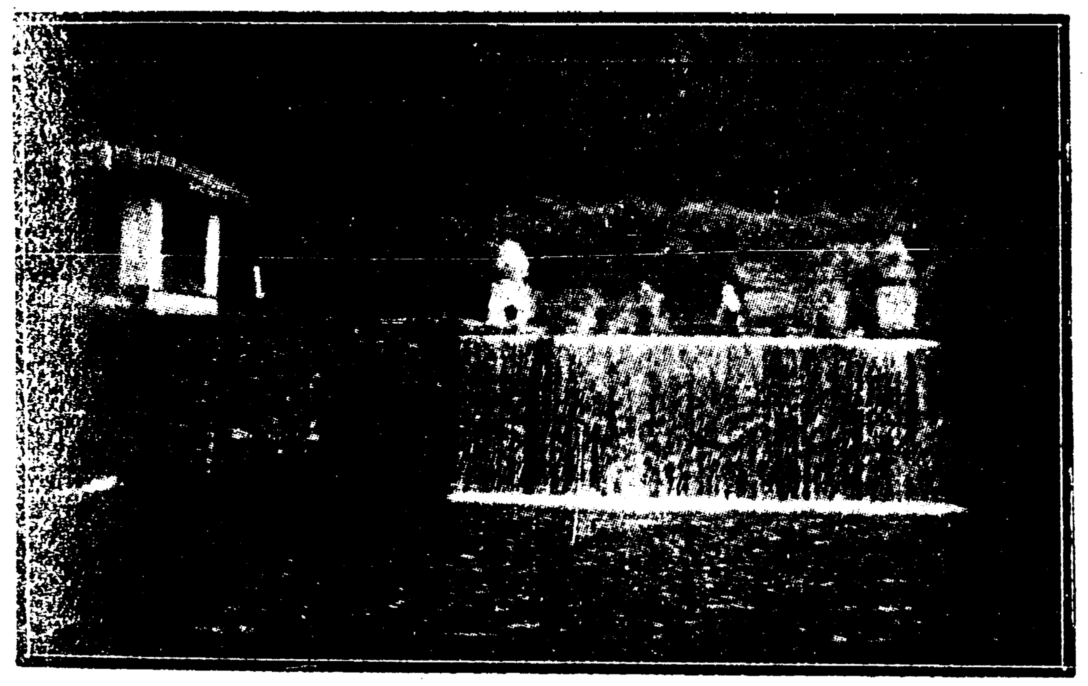

আছিবল বাগ—কাশ্মীর

আবার মোটর। ফিরিবার পথে "অনন্তনাগে" নামা গেল। অনন্তনাগের আর এক নাম 'ইস্‌লামাবাদ'। হঠাৎ নাকে এক ঝলক উগ্র গন্ধকের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। এখানে কতকগুলি গন্ধকের ঝরণা আছে (Sulphur spring) তারই জলে এই গন্ধকের গন্ধ।—বহু দূর পর্য্যন্ত সে গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসে। গন্ধক-জল একটু চাখিয়া দেখা গেল, কারণ এ জল নাকি হজমের পক্ষে ভারী উপকারী।

অনন্তনাগ হইতে গেলাম "আছিবল।" এখানে একটি চমৎকার বাগান আছে। যদিও শ্রীনগরের কাছেও এই ধরণের বাগান—আরও বড় (নিষাদ বাগ,

শালিমার বাগ) দেখিয়াছিলাম তবুও বেশ সুন্দর লাগিল। বাগানের অনেকখানি অবশ্য মানুষের তৈরী। ভিতরে অসংখ্য ফোয়ারা। মাঝে মাঝে চশমাকে কৃত্রিম জলপ্রপাতে পরিণত করা হইয়াছে। আমার হাতে ক্যামেরা দেখিয়া মালী ফোয়ারাগুলি খুলিয়া দিল। বাগানের পিছন দিকে একটা ছোট পাহাড় চীর গাছে (অনেকটা পাইন গাছের মত) ঢাকা,—দূর হইতে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। পাহাড়ের গায়ে একটা বহু প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ।

বাগানের পাশেই আর একটা জিনিষ—বাংলা দেশে তা' কখনও দেখি নাই। জিনিষটাকে মাছের বাগান বলিতে পার। নানা রকম জ্যান্ত মাছ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে—বোতলের মধ্যে নয়, স্বচ্ছ, অগভীর খাল কাটিয়া তার মধ্যে। তখন মাছগুলিকে খাবার দেওয়া হইতেছিল। বড় মাছগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া অম্লান-বদনে নিজেদেরই ছোট ছোট জাতভাইদের খাইতে সুরু করিয়া দিল। এক জায়গায় কতকগুলি মাছ দেখিলাম—তাদের গায়ে ঠিক চিতা বাঘের মত কারিকুরী।

আছিবল ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় মোটরে উঠিলাম। সন্ধ্যার সময়ে আবার শ্রীনগর।

ভগবান্

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

শুনি তোমার হরেক রকম নাম,
কত রকম সুরে তোমায় ডাকে,
তীর্থ কতই, কত তোমার ধাম,
নানান্ রূপে নানান্ ঠাঁয়ে রাখে।
কত বেশ আর কত তোমার বরণ,
দেখেই আমি অবাক্ হয়ে যাই,
কতই ভোমায় প্রণাম করার ধরণ,
মুদ্রা কতই সংখ্যা তাহার নাই।

চক্রী কুটিল, তুমি সরল সোজা,
দয়াল ভয়াল তুমি সবার সব,
বুঝতে গেলে যায় না তোমায় বোঝা,
তোমার কাছে সব ভাষা নীরব।
ধন্য তারা ভোমায় চেনে যারা,
আমরা চিনি তোমার বাঁশী গান ;
তুমি গোপাল, চাই নে তোমা ছাড়া
বালকগণের বালক ভগবান্।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৪

চাদর-তত্ত্ব

অহিভূষণের অন্তর্ধানের পর হইতেই শ্রীপুর সুগার-মিলে কাজকর্ম্মে যে বেশ একটু ঢিল পড়িয়াছে কারখানার বেয়ারা-আর্দ্দালী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মচারীই তা কিছু না কিছু টের পাইয়াছিল। প্রতিদিন যে পরিমাণ চিনি কল হইতে বাহির হইবার কথা, এ ক'দিনে বোধ করি তার অর্দ্ধেকটাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। চিনি সরবরাহের জন্য নানা জায়গার পাইকারদের কাছ হইতে অর্ডারের পর অর্ডার আসিতেছে, সময়মত মাল না পাওয়ায় তারা তাগিদের উপর তাগিদ দিতেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন সুবন্দোবস্তেরই লক্ষণ নাই। অহিভূষণের কাজকর্ম্ম ছিল ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দ্দিষ্ট ; ঠিক সাড়ে দশটার সময় সে আসিয়া দ্বারকানাথের বাড়ীতে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে উপস্থিত হইত। জরুরী চিঠিপত্র-পাঠ এবং সেগুলির কি জবাব দেওয়া হইবে তার খস্ড়া তৈরী করাই ছিল এ সময়কার প্রধান কাজ। দ্বারকানাথের কড়া হুকুম জারি করা ছিল, এ সময় কেউ

গিয়া আধ মিনিটের জন্যও তার সময় নষ্ট করিতে পারিবে না। বেলা বারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র গুছাইয়া অহিভূষণ কারখানায় চলিয়া আসিত, ঠিক তার দেড় ঘণ্টা পরে দ্বারিক বাবুর বাড়ী হইতে তার জন্য কারখানাতেই খাবার যাইত। সুদক্ষ সেনাপতি যেমন সাম্‌নে একখানা নক্সা রাখিয়া বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করেন, অহিভূষণও তেম্‌নি আপিস্ ঘরের টেবিলের উপরেই নিজের প্রয়োজনীয় একটা খস্‌ড়া রাখিয়া কেবল মাত্র কাগজ কলম্ আর স্লিপের সাহায্যেই এত বড় কারবারটা চালাইয়া দিত। অনাবশ্যক হুঙ্কার, অনাবশ্যক ছুটাছুটি করিতে কেউ তাকে কখনো দেখে নাই, বেশী কথার লোকও সে ছিল না, অথচ যন্ত্রের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকটি কাজ বিনা বাধায় উঠিয়া যাইত।

অহিভূষণের অভাবে দ্বারকানাথকে আপাততঃ চিনির কল চালাইবার ভার দিতে হইয়াছে তাঁর ছোট ভাই সলিলের উপর। কিন্তু সলিল যে এ কাজের পক্ষে কতটা অনুপযুক্ত এ ক'দিনের মধ্যেই সকলে তা টের পাইয়াছে—বিশেষ করিয়া সন্তোষ। থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে কোথায় যে সে গা-ঢাকা দিয়া বসে, সন্তোষ ভাবিয়া কূলকিনারা পায় না। সোণার হরিণটি খোয়া যাওয়ার পর হইতে সলিলের যে বেশ একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, আর কারো নজরে না আসিলেও সন্তোষের সতর্ক চক্ষুতে তা এড়ায় নাই। অন্ততঃ বিশবার তার মনে হইয়াছে ব্যাপারটা দ্বারকানাথের গোচর করে, কিন্তু প্রতিবারই শেষ মুহূর্ত্তে দ্বিধা আসিয়া পড়িয়াছে এই ভাবিয়া—পাছে তিনি মনে করিয়া বসেন সলিলের প্রতি সে ঈর্ষাভাবাপন্ন। বাস্তবিকই তো সলিল ছাড়া আপনার জন বলিতে এ জগতে আজ আর তাঁর আছে কে? একটি ভাগিনেয় ছিল—পরম আদরের ভাগিনেয়—দ্বারকানাথের স্বর্গতা দিদির একমাত্র পুত্র। এক দিন সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ তাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছে। সলিলের বড় তাঁর আর একটি ভাই ছিল, সেও আজ আট বছরের উপর সুদূর এমেরিকায় পড়িয়া আছে। ছেলেবেলা হইতেই সে বেচারার একটু যাত্রা-থিয়েটারের দিকে ঝোঁক্ ছিল, বড় হইয়া সে এক দিন কলিকাতায় কোন্ এক পেশাদারী থিয়েটারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ব্যস, সেই হইতে দ্বারকানাথের বাড়ীর দরজা তারও নিকট

বন্ধ এবং বোধ করি চির কালের জন্যই বন্ধ। এ হেন সর্ব্বনেশে বুড়াকে ঘাঁটান আর খোঁচাইয়া ঘা তৈরী করা তো একই কথা! সন্তোষ দেখিতে গোবেচারা, মনে হয় বুঝি সাত চড়ের পরেও সে কথা কহিতে পারিবে না, কিন্তু আসলে সে বোঝে অনেক—অনেক খানি।

কয়েক জন বিশিষ্ট পাইকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার উদ্দেশ্যে আজ সকালের দিকে সন্তোষকে একবার কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল, সে আলোচনার ফলাফল সলিলকে জানানো দরকার, কেননা ব্যাপারটা একটু প্রয়োজনীয়। কারখানায় ঢুকিয়া কিন্তু সে শুনিতে পাইল সলিল সেখানে নাই; বেলা অনেকটা গড়াইয়াছে, আহারাদ্দিরও সময় হইয়াছে, বোধ হয় সেই কারণেই সলিল অনুপস্থিত এইরূপ মনে করিয়া সন্তোষও বাড়ীর পথেই হাঁটা দিল। সে যখন বাড়ীর ফটকের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন তার নজরে পড়িল, দু'টি ভদ্রলোক গেট্ পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতেছেন। সন্তোষ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল; শুধু দুপুর বলিয়া নয়, আজ কাল কোন সময়েই দ্বারকানাথ বড় একটা বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। তার উপর দূর হইতে যতটা মনে হয় লোক দুইটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অসময়ে এই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আকস্মিক আগমনের কি হেতু হইতে পারে?

সাধারণতঃ যতটা জোরে সে বরাবর পথ চলিতে অভ্যস্ত তার চাইতে অনেক বেশী জোরে—এক রকম ছুটিতে ছুটিতেই—অগ্রসর হইয়া সন্তোষ লক্ষ্য করিল, সাম্‌নেকার বিরাট্ চত্বরটি পার হইয়া আগন্তুকদ্বয় ধীরে ধীরে বাড়ীর বারান্দায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। একটু পরেই ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁদের সম্মুখীন হইল, প্রশ্ন করিল, "কাকে চান্ আপনারা?" আগন্তুকদের মধ্যে একজন বয়সে যুবক, অপরটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। যুবকটিকেই উদ্দেশ করিয়া সন্তোষ প্রশ্ন করিয়াছিল।

"দ্বারিক বাবুর বাড়ী এইটে তো?"

"কোত্থেকে আস্‌ছেন আপনারা?"

যুবকটি এ প্রশ্নের সহসা কোন জবাব দিল না, আড়্‌চোখে তার সঙ্গীর

মুখের পানে একবার তাকাইল মাত্র। এ ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে তার সঙ্গী কোন রকম ভুল করিলেন না, কথাবার্ত্তা চালাইবার ভার নিজের উপর লইয়া বলিলেন, "দ্বারিক বাবু আমাদের প্রত্যাশা করছেন, তাঁকে এই খবরটুকু দিলেই চলবে।"

সন্তোষ একটু সন্দিগ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল, কিন্তু কয়েক-মুহূর্ত্ত পরেই মহা ব্যস্ত ভাবে এক সঙ্গে তিন-চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া আসিল। তার হাতে একটা চাবি, তারই সাহায্যে পাশের একটা কামরা খুলিয়া দিতে দিতে সে সসম্ভ্রমে বলিল, "কর্ত্তা এলেন বলে, আপনারা এই ঘরে ততক্ষণ বসুন এসে।"

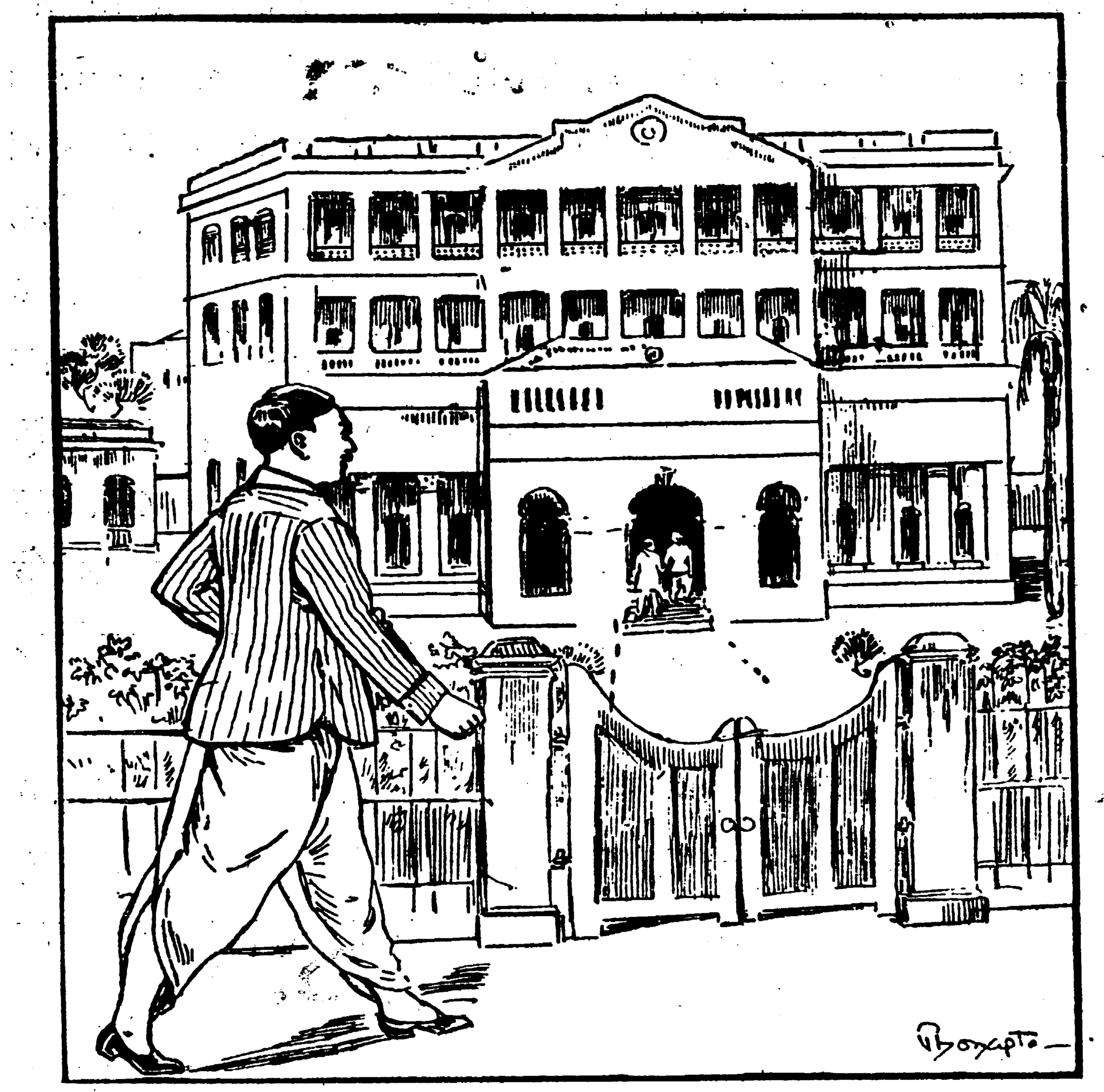

আগন্তুকদ্বয় বারান্দায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল, অসুস্থ দ্বারকানাথ লাঠি ভর দিয়া নামিতেছেন। প্রত্যেকটি সিঁড়ি লাঠি দিয়া বেশ করিয়া অনুভব করিতে করিতে তিনি নামিতেছিলেন, অভ্যাগতদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সাড়ে এগারোটার গাড়ীতেও যখন এলেন না, তখন মনে করেছিলাম আজ বুঝি তবে আর আপনারা এলেনই না মিষ্টার হুকা-কাশি!"

"আজ্ঞে ট্রেনটা মিস্ করার দরুণ ষ্টিমারে আস্তে হল কিনা তাই পৌঁছুতে দেরী হয়ে গেছে।...আপনার শরীর খারাপ তার ওপর চোখে দেখ্‌তে অসুবিধে হয়, কষ্ট করে নীচে নামবার কি দরকার ছিল? আমরাই তো ওপরে উঠে আপনার কাছে যেতে পার্‌তাম্!"

যে ঘরটা সন্তোষ খুলিয়া দিয়াছিল কথা বলিতে বলিতে সকলে সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, "এ রুম্‌টা অন্যান্য রুমের চাইতে একটু অন্ধকার হলেও, এমন নিরিবিলি জায়গা এ বাড়ীতে নেই বল্লেই চলে। দরজার পাশেই কামিনী ফুলের ঝাড় আর হাসনুহানার বেড়াটা পড়েছে কিনা তাই আলো একটু কম আসে, কিন্তু নির্জ্জন বলে আমার সেক্রেটারী অহিভূষণের ভারী পছন্দসই ছিল এ রুম্‌টা। তার সমস্ত কাজকর্ম্ম সে এখানে বসেই করত।...আঃ, বেজায় ধুলো জমেছে তো দেখ্‌ছি, ক'দিন ধরে এ ঘরটায় আর ঝাঁড়-পোঁছও পড়েনি বুঝি? এ ঘর পরিষ্কারের ভার কার ওপর হে সন্তোষ, ভজুয়ার?"

"আজ্ঞে না, কালীচরণের?"

"ডাক তো সে হতভাগাটাকে, কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার!"

কাজের গাফিলতির জন্য স্বয়ং কর্ত্তা তলব করিয়াছেন খবর পাইয়া কালীচরণ বেচারার মুখের চেহারাটা বড়ই বিশ্রী হইয়া গেল, বৈশাখ মাসের কমলালেবুর মত শুক্‌নো মুখে সে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। দ্বারকানাথ রাগত ভাবে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁকে চোখের ইসারায় নিরস্ত করিয়া প্রথমেই কথা পাড়িলেন হুকা-কাশি। ভয়ে মৃতপ্রায় সেই বেচারার মুখের উপর দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "কোথায় রেখেছ সে চাদরটা?"

"আজ্ঞে, আজ্ঞে চাদর..."

"হ্যাঁগো, সেদিনকার সেই চাদরটার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। কোথায় সেটা?"

"আজ্ঞে আছে তো আমার ঘরেই।"

"তোমার ঘরে, বটে? নিয়ে এসো তো!"

যদি বলা যায় এই ব্যাপারে দ্বারকানাথ এবং সন্তোষ বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তবে খুবই কম বলা হইল। বাস্তবিক যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল তা তাঁরা

কানে শুনিয়া এবং চোখে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে ব্যক্তি এ বাড়ীতে জীবনে আজই প্রথম পদার্পণ করিল, একটু আগে পর্য্যন্ত কালীচরণকে চর্ম্মচক্ষে দেখা দূরে থাক, নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই, তার সঙ্গে কালীচরণের এ হেন কথাবার্ত্তা শুনিলে বাস্তবিকই লোকে যে শুনিতে ভুল করিয়াছে মনে করিবে তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল না কেবল রণজিৎ। এ কথার অর্থ এ নয় যে সেও ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তবে অনেক দিন ধরিয়া হুকা-কাশির সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা, এ অদ্ভুত লোকটিকে যাদুকরের মত অভাবনীয় অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইতে এত বেশী বার সে দেখিয়াছে যে এখন আর এঁর কোন কথায় বা কোন কাজেই সে বিস্ময় প্রকাশ করে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই হেঁয়ালি মনে হোক্ না কেন, হুকা-কাশির প্রত্যেকটি কাজেরই যে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, এত দিনের অভিজ্ঞতায় রণজিৎ তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছে।

দ্বারকানাথের অট্টালিকা হইতে খানিকটা দূরে চাকরদের থাকিবার সারিবদ্ধ ঘর—যেমন সাধারণতঃ সাহেব-সুবাদের বাড়ীতে হইয়া থাকে। বাড়ীর অনেকখানি কম্পাউণ্ড্ পার হইয়া তবে এ ঘরগুলিতে পৌঁছিতে হয়। সকলে দেখিতে পাইল, কালীচরণ মাঠ পার হইয়া তার নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে আগাইতেছে। হুকা-কাশি হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোজা মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন। দেখা গেল কালীচরণকে মাঝ পথে থামাইয়া তিনি কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন। সন্তোষ গলা বাড়াইয়া ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইল পাণ্ডুর মুখে সলিল এক দৃষ্টে হুকা-কাশির পানে তাকাইয়া আছে—তার সমস্ত শরীর একটা দেয়ালের আড়ালে লুক্কায়িত।

(ক্রমশঃ)

শেষ পাঠ

(শ্রীনিখিল সেন)

[১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঙ্কো-জার্ম্মান্ যুদ্ধের পর Alsace প্রদেশ জার্ম্মানীকে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ লোকই ছিল ফরাসী, জার্ম্মান্ প্রভুত্ব ও তাঁদের ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁদের ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর Alsace আবার ফরাসীর অধিকারে আসে। নীচের অংশটা বিজেতা জার্ম্মান্ জাতির প্রতি ফরাসীদের বিতৃষ্ণার একটি চিহ্ন।]*

আজকে একটু বেলা করেই ইস্কুলে যাচ্ছিলাম, কেননা, গ্রামারের পড়া একটুও হয় নি। আবার পার্টিসিপ্‌লের (Participle) পড়া না পারলে মসিয়েঁ এমেলের খুব বকুনি খেতে হবে। ইস্কুল পালাবার ইচ্ছাটা হঠাৎ মনের মধ্যে উঁকি মার্‌ল। দিনটাও ছিল বেশ ফুট্‌ফুটে; পাখীগুলি শীস্ দিচ্ছে গাছের শাখায় বসে, আর প্রুষিয়ার সেনাদল পার্কে ড্রিল করছে। প্রবল ইচ্ছাটা দমিয়ে রেখে ছুট্‌লাম ইস্কুলের পানে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

মেয়রের বাড়ী ছেড়ে নোটিস্-বোর্ডে একটী নূতন নোটিস্ টাঙ্গানো দেখলাম। আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা পড়ছে। গত দু'বছর ধরে অনেক দুঃসংবাদ এখানে ঝুলান হয়েছে—পরাজয়ের সংবাদ আর যুদ্ধের জন্য টাকা ও লোকের হুকুম। বুড়ো কামারটী সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশ কেটে যাবার সময়ে সে বল্‌ল, "ছুটো না খোকা; ইস্কুল আজ দেরীতেই বসবে।" আমার মনে হ'ল, সে যেন আমায় ঠাট্টা করছে। আমি ছুটে চল্‌লাম।

খেলার মাঠ পেরিয়েও ক্লাসের কোন ভ্যান-ভ্যানানি শুনতে পেলাম না। সবাই যে চুপ হয়ে আছে। এই স্তব্ধতার মাঝে দরজা খুলে খুব ভয়ে ভয়ে ক্লাসে ঢুকলাম, কিন্তু মঃ এমেল শুধু আমার পানে একবার তাকালেন। স্বরে দয়া মাখিয়ে বললেন, "ফ্রেঞ্জ, তোমার সিটে এসে বস; আমরা এই একটু আগে কাজ আরম্ভ করেছি।"

* একটি বিদেশী গল্প হইতে।

জায়গায় বসেই আমার নজর পড়্‌ল মাষ্টার মশায়ের সুন্দর সবুজ কোট, কাজ করা সার্টের কলার আর তাঁর সিল্কের ভাল্লো টুপির ওপর। এ পোষাক তিনি শুধু পরীক্ষার দিন আর পুরস্কার বিতরণের দিন পরতেন। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য্য হ'লাম পেছনের অব্যবহৃত বেঞ্চগুলিতে সহরের পূর্ব্ব-ছাত্রদেরকে আমাদের মত নীরবে বসে থাক্‌তে দেখে।

মসিয়েঁ এমেল তাঁর আসনে বসলেন এবং মিষ্ট গম্ভীর স্বরে বললেন, "ছাত্রগণ, আজকেই তোমাদের পড়াবার আমার শেষ দিন। বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে—Alsace-এর ইস্কুলগুলিতে জার্ম্মান্ ছাড়া আর কোন ভাষা পড়ানো হবে না। কালকেই নতুন মাষ্টার মশায় আসবেন। ফরাসী ভাষায় আজ তোমাদের শেষ পাঠ। তোমরা বেশ মনে দিয়ে শুন।"

এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলাম, কেন তিনি আজ তাঁর সুন্দর রবিবারের পোষাক পরেছেন; আর কেন পেছনে বসে আছে পূর্ব্ব-ছাত্রগণ। ফরাসী ভাষায় আমার শেষ পাঠ! কেন? আমি ত এখনও ভাল করে লিখতেও পারি না। আমার অনুতাপ হ'ল যে সময়টা সারে (Saar) এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেরিয়েছি কেবল পাখীর ছানা ধরে ধরে—তার জন্য। বইগুলি তখন আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ত না। পুরানো বন্ধুর মত তারাও এখন আমায় ছেড়ে যেতে বসেছে। আমার নাম ডাকা হ'ল। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম; মাথা তুলতেও সাহসে কুলাল না। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, কেন পার্টিসিপ্‌লের পড়া করে আসি নি।

"আমি তোমাকে আর গাল দেব না, ফ্রেঞ্জ।" মঃ এমেল করুণ স্বরে বল্লেন, "আমি তোমাকে খুব শাস্তি দিয়েছি। রোজ রোজ তুমি বলতে, স্যার, সময় পাই নি—কালকে পড়া করে আস্‌ব। কিন্তু এখন দেখ, কী হয়েছে! কালকের জন্য পাঠ রেখে দেওয়ার ফল Alsace-এর সবাই পাচ্ছে এখন। বিজেতারা বলছে, 'ফরাসী বলে তোমরা কী করে বড়াই কর? তোমাদের মাতৃভাষাও ত তোমরা লিখতে পড়তে পার না!"

ফরাসী ভাষা জগতে অতি মিষ্ট মধুর আর সম্পদ্‌শালী ভাষা। তার উন্নতির

প্রতি আমাদের নজর রাখা উচিত—এ যেন আমরা সবাই না ভুলি। এমন কি যখন কোন জাতির করে দাসত্বশৃঙ্খল অর্পণ করা হয়, তখনও তারা তাদের মাতৃভাষাকে সজীব রাখে, কারাগারের চাবীর মত।"

তার পর তিনি গ্রামারের খানিকটা আমাদের পড়িয়ে দিলেন। আমি বিস্মিত হলাম, তার সবটুকু আমি বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছি। তেমন মন দিয়ে আমি আর কখনও শুনি নি; আর তিনিও যেন তেমন মন দিয়ে আর বুঝান নি। আমার মনে হল, তিনি যেন তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডটা আমাদের মাথায় এক দিনেই ঢেলে দিতে চান।

তিনি আমাদের লিখতে দিলেন—আমাদের জন্য তৈরী সম্পূর্ণ নতুন একটি অনুশীলন। আমরা বড় বড় অক্ষরে লিখলাম, 'ফরাসীর Alsace; Alsace শুধু ফরাসীরই'। আমরা তখন আকুল হয়ে লিখছিলাম, কাগজের ওপর পেন্‌সিলের খস্-খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনা যায় না। একটী প্রজাপতি ক্লাসে ঢুক্‌ল। কিন্তু লেখা ফেলে কেউ তার পানে তাকাল না, ঘরের কার্নীচের ওপর পায়রাগুলি ডাকছিল। আমার মনে হয়, তারাও বুঝি জার্ম্মান্ ভাষায় গান করতে ঘৃণা বোধ করবে।

মঃ এমেল চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এ চেয়ারে তিনি বসে আসছেন। কিন্তু কাল তাঁকে চিরতরে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাঁর বোন এখনও ঘরে বাঁধা-ছাঁধা করছেন। তবুও তিনি ইস্কুলের কাজ করে যাচ্ছেন শেষ পর্য্যন্ত।

হঠাৎ দুপুরের ঘণ্টা বেজে উঠে। প্রুষিয়ার সৈন্যগণও বিগ্‌ল বাজায় সমান তালে। মঃ এমেলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়; চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি কোমল সুরে বলেন, "বন্ধুগণ,—বন্ধুগণ—আমি——"

তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল কথার চাপে। এক টুক্‌রো খড়ি নিয়ে ব্ল্যাক্‌বোর্ডের কাছে গিয়ে খুব বড় বড় করে লিখ্‌লেন,—ফরাসী ভাষা চির-জীবী হোক!

তার পর দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত নেড়ে কেবল বল্লেন, "এস, বন্ধু—বিদায়!"

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

চিঠিপত্র

"গ্রাহকদের অনুরোধে গত মাসে প্রকাশিত দু'টি পুরস্কার-প্রতিযোগিতারই সময় ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ১ম পুরস্কারটি শুধু রামধনুর গ্রাহকদের জন্যই নয়, সর্ব্ব-সাধারণের জন্য। দ্বিতীয় পুরস্কারটি শুধু রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। গ্রাহকদের অনুরোধে ২য়টিতে প্রতিযোগীদের বয়স বাড়াইয়া ১৫র বদলে ১৮ করা হইল।"

শ্রীনবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅধীররঞ্জন দে।

"চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'কাচের কথা' প্রবন্ধে ক্ষিতীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে নানা রকম রংএর মশলা মিশাইয়া কাচকে রঙ্গিন করা হয়। আমি কত রকম রং মিশাইয়া গালাইয়া দেখিলাম—রঙ্গিন হইল না তো!"

— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ

[কাচকে ও ভাবে রঙ্গিন করা হয় না, কাচ তৈরীর সময়েই তরল কাচের মধ্যে রংএর মশলা মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই রংএর মশলা সাধারণ রং নয়, তামা, ক্রোমিয়াম্, কোবাল্ট্ প্রভৃতি নানা রকম ধাতুর অক্সাইড্। প্রবন্ধ বেশী জটিল হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় এ সব মশলার নাম আর উল্লেখ করা হয় নাই—ক্ষি, ভ।

"ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কোনও মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়?

—শ্রীরণেন্দ্রকুমার মিত্র।

(অনেক বাহির হয়। গবেষণাপূর্ণ মাসিকের তো সংখ্যাই নাই, সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পত্রিকাও আছে। তাদের কয়েকখানার নাম—Popular Science, Scientific American, Popular Mechanics, Popular Wireless ইত্যাদি। —রাঃ সঃ)

বাংলা ভাষায় এমন কি বই আছে যাতে পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে?"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

[একখানা বইএ সমস্ত বৈজ্ঞানিকের কথা আছে এমন বই পাওয়া কঠিন, তবে নিম্ন-লিখিত বইগুলিতে অনেকের কথা আছে—প্রাকৃতিকী, বৈজ্ঞানিকী, বিজ্ঞান-বুড়ো, বিজ্ঞান-

কাহিনী, বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। —রাঃ সঃ]

"রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে যাঁরা Boy Scout বা Girl Guide আছেন তাঁদের নাম পেলে আনন্দিত হব।" —শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গুহ, সারদা কুটীর, গোমস্তাপাড়া, রঙ্গপুর।

ছোটদের চিত্রশালা

(এই বিভাগে গ্রাহকদের আঁকা ছবি কিংবা নিজের হাতে তোলা ফটো ছাপা হয়। ফটো খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার, কোন রকম ঝাপসা না হয়; পেন্সিল কিংবা লিখিবার কালিতে আঁকা ছবি নেওয়া হয় না। ছবির গায়ে কিছু লেখা থাকিলে কিংবা ছবি ভাঁজ করিলে তাহাও ছাপানো যায় না। —রাঃ সঃ)

পাটনার শস্যাগার

আলোকচিত্র-গ্রহীতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ পালিত

পাটনার শস্যাগার

দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কায় তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ১৭৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট্ শস্যাগারটি পাটনা সহরের কালেক্টার গার্ষ্টিন্ সাহেব তৈরী করান। শস্যাগারটি কত বড় তার পরিচয় সম্বন্ধে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে ১৪৪টি সিঁড়ি আছে। শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ না হওয়ায় এটির আর কোনও প্রয়োজন হয় নাই। তাই লোকে এটির নাম দিয়াছে—"গার্ষ্টিন্স্ ফলি"।

আস্‌ছে মাসে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি নতুন গল্প বার হবে।

চিত্রশিল্পী—
শ্রীপঙ্কজকুমার ভৌমিক

কাল-বৈশাখী

সন্দেশ

১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

• • •

এ বছর ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মের পর এক শ' বছর হইয়া যাওয়ায় তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব হইয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণের পুণ্যময় কথা তোমরা সকলেই জান, বর্ত্তমান

যুগে রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষ কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে আমরাও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইতেছি।

• • •

এবারকার কলিকাতা হকি লীগ্ শেষ হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে মস্ত গৌরবের কথা এবার লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হইয়াছে বাঙ্গালীর বড় আদরের টিম্ মোহনবাগান। ইতিপূর্ব্বে এক গ্রীয়ার ছাড়া কোনও ভারতীয় টিম্ লীগ্ পায় নাই—গ্রীয়ার অবশ্য দু' দু'বার পাইয়াছিল। এবারকার খেলার আর একটা বিশেষত্ব মোহনবাগান এবার কোনও দলের কাছে হারে নাই—১৪টি খেলার মধ্যে ৯টিতে জয়লাভ করিয়াছে, বাকী ৫টিতে ড্র রাখিয়াছে। রানার্স্ আপ্ হইয়াছে রেঞ্জার্স্। অনেকে ভাবিয়াছিল রেঞ্জার্স্ এবারেও চ্যাম্পিয়ন্ হইবে। মোহনবাগান হইতে তারা মাত্র ১ পয়েণ্ট কম পাইয়াছে। সব চেয়ে নীচে হইয়াছে 'রাজপুত্স্'। কিন্তু তারা মিলিটারী টিম্ বলিয়া ২য় বিভাগে নামিবে না। নামিবে তার উপরকার মহামেডান্ স্পোর্টিং এবং সম্ভবতঃ গ্রীয়ার—যে গ্রীয়ার ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম লীগ্ পায়। ২য় বিভাগে ১ম হইয়াছে বি, জি, প্রেস্. ২য়—আর্ম্মেনীয়ান্। ইহারা আগামী বারে ১ম বিভাগে খেলিবে।

এ বছরকার হকি লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ মোহনবাগান দল্

• • •

জার্ম্মেনীতে শরীরচর্চ্চার এত আদর যে সেখানকার কারখানার শ্রমিকদেরও প্রত্যহ কাজের মধ্যে খানিকটা সময় ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হয়।

• • •

সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক কোল্গ্যাসের (যা দিয়া আলো জ্বালান, রান্না করা ইত্যাদি চলে) মত এমন এক গ্যাস বাহির করিয়াছেন যা দিয়া কোল্গ্যাসের মত সমস্ত কাজই নাকি চলিবে উপরন্তু সে গ্যাস জলের মত তরল অবস্থায় সাধারণ একটা বোতলের মধ্যে

ভরিয়া রাখা যাইবে। বৈজ্ঞানিক বলেন কোল্‌গ্যাসের চাইতে তাঁর গ্যাসের শক্তিও অনেক বেশী হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

অঙ্কটি এই রকম হবে—

```
২১৫ ) ৩৭১৯৫ ( ১৭৩
      ২১৫
      ----
      ১৫৬৯
     ১৫০৫
     -----
       ৬৪৫
       ৬৪৫
       ---
```

উত্তরদাতাদের নাম

সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); শুভেন্দু ও শান্তনু মুখার্জ্জি (বাসন্তী পাঠাগার—শ্রীরামপুর); শৈলেশকুমার বসু, মেরী, লরি প্রভৃতি (কলিকাতা); সুজনকুমার ও চিন্ময়ী দাস (কলিকাতা); ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী); সত্যচরণ দত্ত (ভবানীপুর); সুমুখনাথ মিত্র, রাণী, হরি প্রভৃতি (দিনাজপুর); মাখনচন্দ্র বাগচী, অজয়, বড়মামা প্রভৃতি (লক্ষ্মণপুর); লতিকা, লখাই ও সবাই (রাজসাহী); মলয় আঢ্য ও মুকুল আঢ্য (কর্ণেলগোলা); রণেন্দ্রকুমার মিত্র (পাটনা); শান্তিময়, রেণুময়, কাননবালা প্রভৃতি (কলিকাতা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা—হাওড়া); বিমল, অমল, নির্ম্মল মিত্র প্রভৃতি (বারাকপুর); নিতু, বিনু, সতু প্রভৃতি (আন্দুলমৌড়ী); রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, শিবশঙ্কর প্রভৃতি (বেহালা); গুণদা, রণদা, সারদা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (দিল্লী); পুণ্যব্রত ঘোষ ও পূর্ণিমা ঘোষ (ধুবড়ী); পুলিন, শোভা, সত্য (জামসেদপুর); সুশীল, জিতেন্দ্র, শিশির; নৃপেন্দ্রকুমার ও মণীন্দ্রকুমার সেন রায় (কামারজানি, রংপুর); পুষ্পলতা, বনলতা, প্রীতিলতা প্রভৃতি (বেতিয়া); প্রশান্ত ও মালবিকা (বক্তিয়ারপুর); রণেন্দ্র, গুণেন্দ্র, বিজলীপ্রভা প্রভৃতি (ভবানীপুর), সনু, মনু, মোহন প্রভৃতি (কলিকাতা); বুলি, ময়না, শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (ভাস্তারা—হুগলী); আশা, অমিয়া, হিমানী (নড়াইল); সনৎকুমার গুপ্ত, অনিল, শান্তি

প্রভৃতি (জিয়াগঞ্জ); রমা রায়, রমা নন্দী, বেবী প্রভৃতি (নিউদিল্লী); পাঁচুগোপাল, যামিনীকান্ত (শ্যামনগর); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু প্রভৃতি (চুঁচুড়া); শরদিন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী (শ্রীগৌরী); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী প্রভৃতি (জামালপুর); তরুণকুমার রায় (শাঁখারিটোলা); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী (মালদহ); অমল, খোকা, প্রতুল গুপ্ত প্রভৃতি (মালদহ); কমল, অমিয়, বিমল প্রভৃতি (জলপাইগুড়ী); রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (রংপুর); ইয়াহুল্লা, সেরাজ, কানাই প্রভৃতি (তাহিরপুর); 'চিলমারী এম্, ভি, স্কুলের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (চিলমারী); নিতাই, মণ্টুদা', খোকা প্রভৃতি (কলিকাতা); হাবুদা', আবন, অনু প্রভৃতি (পাবনা); রামেন্দু, দিব্যেন্দু, যোগজীবন ও নির্ম্মলেন্দু সেন (ভবানীপুর); জেবউন্নিসা, রওসন আরা, বেলকিস মিনা (জামালখাঁ); আর্য্যকুমার দত্ত (মজঃফরপুর); অমলচন্দ্র দাস (লাহোর); বিদ্যুৎ, অনু ও উমা (ছাপরা); 'মণিদাস (লখিমপুর); প্রমীলা, অপর্ণা, পিনু (পালং); জ্যোৎস্না নাহা, জামাইবাবু, রসরাজদা' প্রভৃতি (রাজাপুর, চট্টগ্রাম); সুধীরকুমার দাস ও অনিলকুমার দাস (ভবানীপুর); হেরম্বলাল সান্যাল, মামা, তারাদা' প্রভৃতি (ভবানীপুর); অজিত, কল্যাণী ও ঢিবা (পাবনা); শৈলেন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র (সরস্বতী পাঠাগার—শ্রীরামপুর); অরুণকুমার গোস্বামী, অশ্বিনী, অমিয় প্রভৃতি (মুন্সীগঞ্জ); প্রতিমা, রমা, পূর্ণিমা প্রভৃতি (হাজারীবাগ); সুকুমার সেনগুপ্ত (চাইবাসা); হেমপ্রভা দেবী (রাঁচী); খুকুরাণী, ডলি, অশোকরঞ্জন দত্ত প্রভৃতি (সিংরৈল); ইতু ও প্রশান্ত (সন্তোষ); গৌরী ও মাধুরী দত্ত (পূর্ণিমা); বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর); বখতিয়ার হোসেন (বর্দ্ধমান); ভারতলক্ষ্মী দেবী (ঢাকা); সুপ্রভা সেন (কানপুর); বিপদভঞ্জন গোস্বামী (হবিগঞ্জ); মনোতোষ রায় (ভবানীপুর); শঙ্করনারায়ণ কুমার, মিলনদা', গৌর প্রভৃতি (পূর্ণিয়া); মান্তা, ছবি, সৌদামিনী প্রভৃতি (ছবিরন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়—মাথাভাঙ্গা); কিরণ, মতি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি (সুন্দরঘাট); বিজয়, বিনয়, কালিদাস (কুড়িগ্রাম); সুষমা, আঙ্গুর, বিমলা প্রভৃতি (কর্পোরেশন বিদ্যালয়, টালা); জ্যোতির্ম্ময় বসু (রাজসাহী); অমিয়কুমার ঘোষ, অজিতকুমার সাহা (রাণাঘাট); ডলি, তুলতুল, অন্তকণা প্রভৃতি (ভবানীপুর); শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা); ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন, চট্টগ্রাম); ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (ঢাকা); শৈলেশ, নিরু, প্রভা, বিভা (জলপাইগুড়ী); ঊষা, অনিল, নিখিল (জলপাইগুড়ী); রথীন্দ্র, বীরেন, অমিয় (ভবানীপুর); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা); পরেশ, ভোলা, চৈতন্য প্রভৃতি (ফরিদপুর); সুধাংশুকুমার ভৌমিক (বিলাসীপাড়া); সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাতিহাল); অনিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট); অশোকরাণী মিত্র (কলিকাতা); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর); দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গোবরদি);

কমলারাণী, শান্তি, উষা প্রভৃতি (হাইলাকান্দি); পদ্মরাণী দেবী, নান্থু, ভবু প্রভৃতি (কলিকাতা); সত্যকুমার, সবু, পকু প্রভৃতি (বালীগঞ্জ); পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবর্গ (পানিহাটী); তুষারকণা পাল (শ্যামবাজার); নবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া); মায়া সরকার (রংপুর); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); বিশ্বরঞ্জন সর্ব্বাধিকারী (কলিকাতা); সুধীরচন্দ্র ও অধীরচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ী); কমলকৃষ্ণ, পশুপতি, গিরিজা প্রভৃতি (যতীন্দ্র পাঠাগার—শ্রীরামপুর); বেণু, টুকু, মণি; রুণু, অমর, ইন্দু, প্রভৃতি (টাকী); পঙ্কজকুমার ভৌমিক (উত্তরপাড়া); সমীরেশচন্দ্র দে (বেনারস); বলরাম দে; হরিপদ, অমরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র (মালখানগর); ননীগোপাল, অবনী, সত্যেন্দ্র (মালখানগর); হরি, অংশু, সুশান্ত প্রভৃতি (সাধনপাড়া—নদীয়া); অনিকা, কণিকা, তরেন প্রভৃতি (নিউদিল্লী); শান্তিময়ী, মৃন্ময়ী, সুনীল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি (সীতামাঢ়ি); বিপুল, পাঁচু, ক্ষীরোদ প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); নির্ম্মল-কুমার দাস (ক্লার্ক ষ্ট্রীট); সুললিত, অমর, প্রতিভা (মুড়াগাছা); শক্তি মৈত্র, অসিত, নৃপেন প্রভৃতি (পূর্ণিয়া); নির্ম্মল, উষা, অমলচন্দ্র মুস্তফী (মাথাভাঙ্গা); বোচা, খোকা, সুরেন প্রভৃতি (ঢাকা); জীবন, বলাই, বিশ্বনাথ (-টপুর); মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (মাথাভাঙ্গা)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীঅধীরচন্দ্র রায়)

এক ভদ্রলোক মৃত্যুকালে তাঁর বড় ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "আমার আস্তাবলে যে ক'টি ঘোড়া আছে তার ১/২ তুমি নিও, ১/৪ তোমার মেজ ভাইকে দিও, ১/৫ তোমার ছোট ভাইকে দিও। এই ব'লে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিলেন।

শ্রাদ্ধশান্তির পর বড় ছেলে আস্তাবলে গিয়ে দেখে সেখানে ১৯টি ঘোড়া আছে। ১৯টি ঘোড়াকে সে অনেক ভেবে-চিন্তেও তার বাপের আদেশ মত ভাগ করতে পারল না। তোমরা তাকে একটা উপায় বা'লে দাও দেখি।

ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ্   সাম্রাজ্ঞী মেরী

সম্রাটের রাজত্বকাল পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায় গত ৬ই মে সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া মহা সমারোহে রজত-জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। ('রজত-জুবিলী' প্রবন্ধ দেখ)

['হানাফী'র সৌজন্যে]

৮ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ | ৫ম সংখ্যা

সবুজ পাতার পরী

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

সবুজ পাতার পরী—তাদের কোন্ দেশেতে ঘর ?
ফুলের মাসে তারা হাসে সবুজ শাখার পর।
তারা   রামধনুকে থাকে,
মেঘে   রঙিন ছবি আঁকে ;
তাদের   পুলকরাশি ঝরণা হয়ে
ঝরছে ফুলের পর।
তাদের   ফুল-দেশে কি ঘর ?

খুকুর বুকের স্নেহটুকু, খোকার ঠোঁটের হাসি—
ওদের সবুজ দেশের থেকে এল কি আজ ভাসি ?
ওরা নাচ্ছে আঙিনায়—
রাঙা ডালিম-বনের ছায়,
রাতে ঘুমের কাঠি যায় ছুঁইয়ে
খোকার চোখের পর।
ওদের ঘুম-দেশে কি ঘর ?

সবুজ পাতার পরী ওরা পারুল চাঁপার বোন্,
দখিন্ হাওয়ার দোদুল দোলায় তুল্‌ছে অকারণ।
ওদের সবাই বাসে ভালো,
রাতে নিঝুম চাঁদের আলো
ওদের ঘরের কাছে এসে নাচে
গন্ধে ভর ভর।
ওদের চাঁদের দেশে ঘর ?

সবুজ পাতার পরী ওরা অচিন দেশের সুখ—
ভালবাসায় সবুজ হ'য়ে উঠ্‌ল ওদের বুক।
খুকুর খেলা-ঘরের পাশে
ওরা খেল্‌তে বুঝি আসে,
কাঁপে তালে তালে অস্ত রবির
রাঙ্গা রোদের পর ;
ওদের সোনার দেশে ঘর ?

সিংহের খপ্পরে

(শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে)

পশুর রাজা সিংহকে তোমরা কে না জান ? তার কথা তোমরা বইএ, ছবিতে অনেক—অনেক শুনেছ এবং দেখেছ। কিন্তু চাক্ষুষ বোধ হয় সকলে দেখ নি ; অবশ্য যারা যারা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কিংবা বড় সার্কাসে গিয়েছ, তাদের কথা আমি বল্‌ছি না। কিন্তু খাঁচার ভিতরে সিংহ এক জিনিষ, আর খাঁচার বাইরে অন্য জিনিষ। অমন ভীষণ চীজ্ ছুনিয়ায় তুমি ছু'টি পাবে না ; একবার শিকারী ইসাডোর ম্যাটিয়ান সাহেব আফ্রিকার জঙ্গলে এ হেন পশুর রাজার কবলে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ছু'টী লোক। সিংহের সম্মুখে তাঁদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল সেই সত্য কাহিনীটুকুই তোমাদের বল্‌ব।

খাঁচার বাইরে সিংহ কি ধরণের চীজ্

আফ্রিকার ছুর্গম বনপথ দিয়ে ইসাডোর সাহেব আর তাঁর ছু'জন অনুচর অগ্রসর হচ্ছিলেন। অনেকখানি পথ পার হবার পর সহসা তাঁরা বনের মাঝে এক বিকট হৃদ্‌কম্পকারী গর্জ্জন শুনতে পেলেন। ইসাডোর থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ চারি দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তেই আবার তাঁর পিছনে সেই ভীষণ ধ্বনি! পিছন ফিরে দেখেন একটা প্রকাণ্ড সিংহ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি তাঁদের

দিকে এগিয়ে আসছে। সাহেব বেশ খানিকটা ভয় পেলেও একটু সাহসও তাঁর ছিল এই মনে করে যে তাঁরা তিন তিনটে লোক—আর প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে বর্শা। যেমন ক'রে হোক্ সিংহটাকে কোন প্রকারে ফাঁকি-টাকি দিয়ে হয়ত রক্ষা পেতে পারেন।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে অদূরে তিনি যে দৃশ্য দেখ্‌তে পেলেন তা'তে তাঁর আক্কেল একেবারে গুড়ুম্ হয়ে গেল। দুই চোখ কপালে উঠবার জোগাড়! সামনে লতা-গুল্মের আড়ালে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পর পর নানা বিকট গর্জ্জন আরম্ভ হ'য়ে গেল। দেখা গেল, সিংহ তো একটা-দু'টো নয়—একেবারে এক পাল। ইসাডোর সাহেবের চার দিকে তারা যেন বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছে! অতগুলো ক্ষুধার্ত্ত মুখের সামনে তাঁরা তিনটি মাত্র মানুষ—তাঁদের অবস্থাটা তোমরা নিজেরাই একবার বুঝে দেখ।

পূর্ব্বেই বলেছি ইসাডোর সাহেব ও তাঁর সঙ্গী দু'জনের প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে বর্শা ছিল। তাঁরা তিন জনেই নিজ নিজ হাতের বর্শা বেশ শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে চারি দিকে নজর রেখে অপর পাশের লতাগুল্মের খানিকটা সরিয়ে সামনের একটা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

পাহাড়ের প্রায় কাছাকাছি এসে তাঁরা দেখতে পেলেন একটা শুক্‌নো মরা গাছ। যেই সেদিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন অমনি দেখ্‌লেন কয়েক হাত মাত্র দূরে আর একটা সিংহ! হায় রে! মনে মনে সাহেব ভাব্‌লেন, এবার আর রক্ষা পাবার কোনও আশা নেই—জীবনের শেষ এখানেই হয়ে যাবে। দেহের রক্তগুলো তখন তাঁদের ছলাৎ ছলাৎ করছে—ক্ষুধার্ত্ত সিংহটার আগুনের ভাঁটার মত চোখ দু'টো কট্‌মট্ ক'রে এদিক্ পানে তাকিয়ে,—ভাবখানা তখনই যেন লাফ দিয়ে তাঁদের উপর পড়বে।

সাহেব ও তাঁর অনুচরদের শরীরের লোম ততক্ষণে খাড়া হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেই নিদারুণ সময়েও ইসাডোর সাহেব তাড়াতাড়ি নিজেকে চাঙ্গা ক'রে নিলেন, তার পর বর্শা বাগিয়ে তিন জনেই সামনের দিকে সিংহের মস্তিষ্ক লক্ষ্য ক'রে

ঝাঁপ দিলেন। পরক্ষণেই সাহেবের মাথায় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগ্‌ল, মুহূর্ত্ত মধ্যে হতচেতন হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

খানিকক্ষণ পরে কোথা থেকে যে তাঁর চেতনা ফিরে এল, তা' যেন স্বপ্নের মত রহস্যে ভরা।…চেতনা পেয়েই তিনি দৃঢ় হস্তে বর্শা চালাতে লাগলেন। সিংহটা ছিট্‌কে অনেকখানি দূরে পড়ে গেল।

ইসাডোর সাহেবের সামনেই কতকগুলো শুক্‌নো লতাপাতা জড় হ'য়ে পড়েছিল—তাই দেখে সাহেবের মাথায় চট্ ক'রে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের ক'রে সেই শুষ্ক পত্র-পল্লবের উপর ফেলে দিলেন, অমনি তা' দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে আরম্ভ কর্‌ল। সে আলোকে সহসা সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

আগুন দেখে সিংহটা বিস্ময়ে একেবারে থ' বনে গেছে। তখন তার মনের ভাবখানা এই—'এ কি কাণ্ড! লোকটা তো কম ভেল্কি জানে না!'

এদিকে ঐ সময়টুকুর মধ্যে ইসাডোর সাহেব সেই অগ্নিচক্রের মাঝে দাঁড়িয়ে সামনের সেই মরা গাছটায় বর্শা দিয়ে দু'তিন ঘা লাগাতেই একটা শুক্‌নো শাখা মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল। তখন তিনি সেটায় আগুন লাগিয়ে নিয়ে সিংহটাকে তাড়া করলেন। কি চমৎকার বুদ্ধিটাই না তিনি খাটালেন!

ওদিকে সাহেবের সঙ্গে যে দু'জন লোক ছিল, কোন্ ফাঁকে যে তারা সরে পড়েছে তার কোন হদিস্‌ই মেলে নি।

জ্বলন্ত ডালটা নিয়ে খানিকটা এগিয়ে আসতেই সাহেব দেখেন দু'দিকে পাহাড়ের প্রস্তরময় প্রাচীর। অতএব সেটা সাহেবের পক্ষে বেশ নিরাপদই মনে হ'ল—অর্থাৎ এ দু'টো দিক্ দিয়ে যে তাঁর উপর আক্রমণ চল্‌বে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু আলোয় তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর কাছ থেকে খানিকটা দূরে একেবারে সিংহের গহ্বর—তাদের স্থায়ী আস্তানা। আর ওখানে শুধু একটা সিংহই নেই, তার পেছনে একটা সিংহী, তার পর একটা বাচ্চা! সাহেব ভাব্‌লেন 'সর্ব্বনাশ—একেবারে তো সিংহের বিবরে এসে পড়েছি, এখান থেকে কি রক্ষা পাওয়া যাবে?' তখন তাঁর কেবল একটি মাত্র ভরসা, হাতে তখনও তাঁর আগুন আছে।

কিন্তু তা' হ'লে কি হবে—সে আগুন বড় জোর এক ঘণ্টা জ্বলবে। এর মধ্যে তিনি আর কদ্দূর যেতে পারবেন ? তবে যেমন ক'রে হোক ওটুকু সময়ের ভেতরই তাঁকে অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছাতেই হবে। নইলে বাঁচ্‌বেন কি ক'রে ?

তোমরা বোধ হয় সবাই জান, যে আগুন দেখ্‌লে সমস্ত জানোয়ারই ভয় পায়—তা' সে যত বড় হিংস্র এবং দুর্দ্দান্তই হোক্ না কেন। তাই ইসাডোর সাহেবের হাতের দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুনের শিখা দেখে সিংহ, সিংহী ও তাদের বাচ্চা—সকলেই বেশ ভয় পেল। সাহেবের পালাবারও হ'ল চূড়ান্ত সুযোগ। কারণ আক্রমণের জন্য সিংহগুলো তখন আর তত ব্যস্ত নয়।

তার পর ইসাডোর সাহেব বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে সম্মুখে পতিত একটা বড় শুক্‌নো বৃক্ষ-শাখায় আগুন লাগালেন এবং তার প্রান্তভাগ জ্বলে উঠ্‌তেই সেটা হাতে নিয়ে সিংহ ও সিংহীর আক্রমণের প্রতীক্ষা না ক'রে তড়িৎবেগে উল্টে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হ'লেন।

এই না দেখে সিংহগুলো যেন হতভম্ব হয়ে গেল। সাহেব তখন সেই হতভম্ব, ভয়বিহ্বল সিংহের মুখে অগ্নি-শাখা দিয়ে মারলেন এক খোঁচা। খোঁচা খেয়ে সিংহটা এক বিরাট্ গর্জ্জন তুলে মার্‌ল এক লাফ।

তৃণ-জ্বলা অগ্নিরাশি তখন ঊর্দ্ধে শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠেছে, অনেক দূর যুড়ে অগ্নির লক্‌লকে শিখা সাপের মত কিল্‌বিলিয়ে চারি দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ইসাডোর সাহেব হাতে সেই জ্বলন্ত শাখা নিয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নটরাজের মত ভীষণ, প্রমত্ত ভাবে অগ্রসর হ'লেন।

আর কথা নয়, শাবক সমেত সিংহ-সিংহী এবার নিতান্ত 'কাপুরুষের' মত পশুরাজের সম্পূর্ণ অনুচিত ভাবে লেজ তুলে প্রান্তরের দিকে ছুটে পালাল।

সাহেব সেই শাখা হাতে বহু দূর অগ্রসর হ'য়ে এলেন। তার পর দেখতে পেলেন অদূরে তাঁর অনুচর দু'জন অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। কিন্তু তখন আর প্রয়োজন ছিল না—কারণ তখন তিনি নিরাপদ স্থানেই এসে পৌঁছে গেছেন।

কাব্যলোকে

দুপুর রাত। লাটু বাবু বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন, হঠাৎ ঘরের কোণায় একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে উঠে বসলেন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ওখানে ?" লোকটা চোর, সে ভয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লাটু বাবু উঠে আলো জ্বাললেন, তার পর চোরের কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ তাকে নিরীক্ষণ করে বল্লেন, "আরে, আমি দিনের আলোয় হাজার বার খুঁজেও যেখানে একটা আধলা পাই না, তুমি রাতের অন্ধকারে সেখানে কি হাতড়াচ্ছ বাবা ? অন্যত্র চেষ্টা দেখ।" চোর তো একেবারে থ।

শুশুকের স্যাঙ্গাৎ

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

“ওরে ভোঁদড়, ফিরে চা…”

কিন্তু ভোঁদড় ফিরবে কি ক’রে? খোকার নাচন দেখে ত আর তার পেট ভরবে না! তার এখন পেয়েছে ক্ষিদে। এখন কি আর নাচন দেখা যায়! তা খোকার ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ের নাচন যত মিষ্টিই হোক্।

ভোঁদড়ের ক্ষিদে অবশ্য রাক্ষুসে। অরুচি কাকে বলে সে জানে না। খেতে পেয়ে সে ‘না’ বলেছে এ কথা অতি বড় শত্তুর যে ‘ভাম’ সেও বলবে না।

ভামের মুখে ভোঁদড়ের নিন্দে লেগেই আছে, ভোঁদড়ের হুটো কেচ্ছার কথা না বলে ভাম হাই পর্য্যন্ত তোলে না।

“আরে ওটা আবার জানোয়ার নাকি! চারটে পা আছে বলে ভোঁদড় যদি জানোয়ার হয়, দাঁতের জোরে ‘বরা’ও তা’ হ’লে হাতী!”

কখনও বা গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভ্যাঁস করে হেঁচে ভাম ব’লে, “আরে হোঃ, আঁশটে-গন্ধে ত্রিসীমানায় যাওয়া যায় না—ও শুশুকের স্যাঙ্গাতের ডাঙ্গায় আবার কিসের খাতির! গায়ে আঁশের বদলে লোম কেন হ’ল তাই ভাবি।”

এ সব নিন্দে-অপবাদ ভোঁদড়ের কানে যায় না এমন নয়। জঙ্গলে কান-ভাঙ্গানির ত অভাব নেই। জলের ইজারা ভাগাভাগি ক’রে নিতে হয় বলে সিড়িঙ্গে বকের আক্রোশটা কিছু বেশী ভোঁদড়ের ওপর। ভামের সঙ্গে দাঁতাদাঁতি হয়ে তার ভালো-মন্দ কিছু হ’লে বকের আশা মেটে। সুবিধে পেলেই তাই সে রঙ ফলিয়ে ভামের গালাগালগুলো শোনাতে ছাড়ে না।

জলের ধারে ধ্যানস্থ হয়ে হয়ত সে বসে আছে, নজর আছে গুড়জাওয়ালি ছা’টার ওপর। এমন মিঠে মাছ বহু দিন তার ঠোঁটে পড়ে নি, একবার নাগাল পেলে হয়। হঠাৎ জলের ওপর একটা ঢেউ দেখা গেল। তার পর খানিকটা তোলপাড়। জলের ভেতর সাদা একটা বিহ্যুৎ যেন খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে

আর কতক্ষণ! হঠাৎ জল ফাঁক করে গোঁফ সমেত একটা থ্যাবড়া মুখ বেরোল। গুড়জাওয়ালির ছা ধরা পড়েছে।

এমন ঠোঁটের গ্রাস ফস্কালে হাড়-পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে কিনা? কিন্তু সিড়িঙ্গের মুখ দেখে বোঝবার যো নেই কিছু। বক নয়, একেবারে পরমহংসের মত উদাসীন ভাবে বল্লে,—“কি ধরলে ওটা? গুড়জাওয়ালি বুঝি! বলে মিষ্টি মিষ্টি! আমার ত অরুচি ধরে গেছে!”

গুড়জাওয়ালিটাকে এক গ্রাসে গিলে আবার ভোঁদড় জলে বুঝি নেমে যাচ্ছিল। সিড়িঙ্গে গলা খাঁকারী দিয়ে উঠ্‌ল—“কক্। জান ত ভাই এর কথা ওকে লাগান, ওর কথা একে লাগান—এ সব আমি পছন্দ করি না মোটেও। আমি কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। হক্ কথা কয় ব’লে বকের বনে না কারুর সঙ্গে। আজ তাই বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি…”

ভোঁদড় গলা খাঁকারী শুনে একবার ফিরে তাকিয়েছিল। কিন্তু বকের কথা শেষ না হ’তেই আবার জলের ভেতর একটা ডিগবাজী খেয়ে গেল তলিয়ে। এ সব কথায় তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

এমন ভনিতাটা নষ্ট হ’লে রাগ ত হবারই কথা।

রাগে নিশ্‌পিশ্ ক’রে বক নিজের মনেই বলে—“দেমাক! একেবারে ফেটে পড়ছে! ধেড়ে কুমীর সেদিন গো-বাঘটাকে ধর্‌ল আর এটাকে দেখতে পায় না, গা!”

কিন্তু মিছে রাগে ত লাভ নেই। কাদা বাঁচিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে সিড়িঙ্গে আবার আর এক জায়গায় জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। জলের ওপর ছোট ঢেউএর দোলা দেখে ভোঁদড় কোথায় আছে জানতে তার বাকী নেই।

খানিক বাদেই ভোঁদড় আবার জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠে। এবার মুখ তার খালি।

সিড়িঙ্গে দরদের সুরে বলে,—“আহা, ফস্কে গেল বুঝি?”

ভোঁদড় গা ঝাড়া দিয়ে জল ছিটিয়ে বলে—“উঁহুঃ, ধর্‌ব কি! খালি কুচো মাছ এখানটায়!”

"যা বলেছ! নদীর জল বেড়ে অবধি মাছের আর সুখ নেই! হুঁঃ, তখন কি যেন বলছিলুম! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হাঁড়িমুখো ভামের কথা। আস্পর্দ্ধাটা শোনো একবার। আমায় ডেকে সেদিন বলে কি না, 'কি গো জেলে মাসি, তোমাদের শুশুকের স্যাঙ্গাতের গায়ে নাকি আঁশ বেরিয়েছে!' আমিও ছেড়ে কথা কইব কেন? হাজার হলেও তোমায় আমায় এক জলে ঘর করি ত। ভামের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিসের? বল্লাম তাই—"আঁশ কি কাঁটা একবার শুঁকে এস না নিজে গিয়ে। সে মুরদ ত নেই!"

ভোঁদড় কিন্তু এ সব কথা গায়েই মাখে না। জঙ্গলের এ সব ঘোঁট-ঘাঁটের মধ্যে সে নেই। পেটটা ভরা থাকলেই হ'ল। নেচে কুঁদে, স্ফূর্ত্তি করে সে দিন কাটায়। সব কথা কানে গেল কি না গেল। ডাঙ্গায় দু'বার গড়াগড়ি দিয়ে দু'টো ডিগবাজি খেয়ে সে বল্লে—"যে যা বলে বলুক না মাসি। গালাগালিতে গায়ে ত আর ফোস্কা পড়বে না, নদীর মাছও কমে যাবে না।"

"তা ত বটেই, তা ত বটেই! আমিও ত তাই বলি! তবে কি জান, ছোট মুখের বড় কথায় গা জ্বালা করে। কার ডিম কার ছানা চুরি করে ত দিন চলে, উনি আবার নাকি বড় ঘরোয়ানা, মস্ত কুলীন। কেঁদো বাঘের কোন সইএর বোনের বকুল ফুলের বোনঝি-জামাই বলে গুমর আর ধরে না..."

কিন্তু বকের ঠোঁট নাড়াই সার। ভোঁদড় তখন অনেক দূরে।

আজ ভোঁদড়ের ক্ষিদে পেয়েছে একটু বেশী। কিন্তু ক্ষিদের চেয়ে বেশী হয়েছে ভাবনা। সারাদিন নদীতে বলতে গেলে দাঁতে একটা কাঁটা কাটে নি। নদী উঠেছে ফুলে। দারুণ টান। মাছ কি উঠেছে যে ধরবে? তাই এখন ভোঁদড় চলেছে শালুক-ডোবায়। সেখানে মাছ ধরে সুখ নেই, খালি শোল আর চূনোপুঁটি। কিন্তু সৌখীন হবার সময় ত এ নয়।

ফি বছর বাদলার দিনে নদী এমন বেড়ে ওঠে। কিন্তু এবারের ব্যাপার একটু আলাদা। জলের ধারে ব্যাঙের পাড়ায় সব চুপচাপ; সেখান থেকে মাঠে

উঠে দেখে একেবারে অবাক্ কাণ্ড। মেঠো ইঁদুরের দল বাচ্ছাকাচ্ছা সমেত বাসা ছেড়ে কোথায় চলেছে।

না, আজ সেরেফ উপোস। দিনের বেলা একটা মেঠো ইঁদুর দেখলেই বলে দিন খারাপ যায়, আর এ একেবারে ইঁদুরের ঝাঁক!

কিন্তু ব্যাপারটা কি! মেঠো ইঁদুর সব দল বেঁধে দেশান্তরী হচ্ছে কোন দুঃখে? নাঃ, ভোঁদড়কে কথাটা জানতেই হয়।

পথে যেতে সবাইকে সে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁগা, ব্যাপার কি?" কিন্তু মেঠো ইঁদুরের কথা কইবার ফুরসৎও যেন নেই। পড়ি কি মরি করে তারা ছুটেছে সব এক দিকে। উত্তর কেউ দেয় না। দিলেও দাঁত খিঁচিয়ে বলে,—"আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এস্বেছেন ব্যাপার শুধোতে!"

লিক্‌লিকে এক লম্বা ল্যাজের শেষকালে বুঝি দয়া হল, "আহা কে না বাপু বলে! ভোঁদড় যাই বল বাপু, ভালো মানুষের পো। আমাদের ক্ষতি কোন দিন করে না।"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত ভোঁদড় শুন্‌ল। অত্যন্ত ভাবনার কথা, কিন্তু মেঠো ইঁদুরের ভুলও ত কখন হয় না।

শালুক-ডোবায় যাওয়া এখন থাক। ভোঁদড়কে তাড়াতাড়ি জঙ্গলে গিয়ে খবরটা দিতেই হয়। এই বেলা বাসা-টাসা না সামলালে আর সময় হবে না।

কিন্তু খবর দেওয়া আর হ'ল না। খানিক দূর যেতেই সজারুর সঙ্গে দেখা। গায়ে কাঁটা হলে কি হবে, মনটা একেবারে সাদা। নেহাৎ ভালো মানুষ।

বার দুয়েক নাকের আওয়াজ করে অত্যন্ত 'কিন্তু' হয়ে বল্লে,—"তোমার কাছেই আসছিলাম। ওরা পাঠালে ভাই।"

"কেন বল ত?"

সজারু প্রথমটা বলতেই চায় না। তার পর অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। জঙ্গলের ছোট দলের আজ পঞ্চায়েত বসেছে। ভোঁদড়কে একঘরে করা উচিত কি না তারই বিচার হবে।

"কেন, অপরাধটা কি?"

"কি জানি ভাই, ঘোঁটটা ভালই পাকিয়েছে বকের সঙ্গে জোট করে। জল না ছাড়লে তোমায় নাকি ডাঙ্গায় আমল দেওয়া হবে না।"

ভোঁদড়ের চোখ দুটো রাগে চক্ চক্ করে উঠ্‌ল। গোঁফটা উঠ্‌ল ফুলে। "বটে! আচ্ছা চল যাচ্ছি।"

কাঁটানটের জঙ্গলে খেজুর গাছের কোলে আসর বসেছে মস্ত। বনের হোমরা-চোমরা বাঘ-ভালুক বাদে আসতে আর কারুর বাকী নেই। ধেড়ে কুমীর সভাপতি। খেজুর-গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসেছে সে।

ভোঁদড় যেতেই বেশ একটু সোরগোল উঠে হঠাৎ থেমে গেল। চুপ চুপ। ভাম অনেকক্ষণ ধরে তৈরী হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠে এবার বল্লে,—

"জঙ্গলী ভাই সব!" তার পর একটু থেমে বল্লে,—"তোমাদের সকলকে ভাই বলতে পারলে আমি খুসী হতাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমার তা বলবার উপায় নেই। আমাদের ভেতর এমন অনেকে আছে যাদের ভাই বল্লে জঙ্গলের অপমান করা হয়। তারা জলের নয়, জঙ্গলেরও নয়…"

কে একজন চাপা গলায় বল্লে, "আমাদের সভাপতিটি কি?"

মাটিতে লেজের এক প্রচণ্ড বাড়ি মেরে—কুমীর চার পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।"

সবাই একেবারে থ। সভা বুঝি এইখানেই পণ্ড হয়। খেঁকশেয়ালী অনেক কষ্টে সভাপতিকে ঠাণ্ডা করলে।

"যত সব চ্যাংড়ার কাণ্ড। আপনার কি ওসব কথায় কান দিতে আছে?"

কোন রকমে আবার সভা শান্ত হ'ল। ভামের বক্তৃতা চল্‌ল।

একটানা একঘেয়ে বক্তৃতা। সভাপতির পর্য্যন্ত হাই উঠছে। শেষকালে খেঁকশেয়ালী গিয়ে ভামের কানে কানে কি বলতে তবে সে থামে। তার আসল কথাটা তখন কি ভাগ্যি বলা হয়েছে। আসল কথা আর কিছু নয়। ভোঁদড় যদি জল না ছাড়ে তা হ'লে ডাঙ্গায় তাকে একঘরে করা হবে।

সজারু হঠাৎ ভালো মানুষের মত বলে ফেল্লে,—"ভোঁদড় ত জল ছাড়বে, কিন্তু ঘোঁটের সর্দ্দার বক! তার বেলা কি হবে?"

বক এতক্ষণ মাথা গুঁজে চোখ বুঁজে চুপটি করে বক্তৃতা শুনছিল। এবার চট্ করে গলা বাড়িয়ে পাখার ঝাপটা দিয়ে খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।

"হুঁ, বকের পেছনে না লাগলে সুখ হবে কেন! বকের দোষটা কোন্‌খানে শুনি? ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমার নেই ত। জলের মাছ ধরে খাই সে কথা দেশে জানে, দশে জানে। কিন্তু বলুক দেখি দ্মি কেউ কখনও গা ডুবিয়েছি জলে! তার আগে যেন গায়ে আঁশ্‌ বেরোয়। আমি ত আর পানকৌটি নই, ভোঁদড়ও নয়।"

সভাপতি লেজঝাপটা দিয়ে এবার বল্লে—"চুপ চুপ! ভোঁদড়ের এখন কি বলবার আছে শোনা যাক।"

ভোঁদড় এতক্ষণ বক্তৃতা কিছু শোনে নি বল্লেই হয়। সে কান খাড়া ক'রে ছিল অন্য কিছুর আশায়।

এবার সে উঠে সবাইকে অবাক্ করে দিলে। "ভাই সব, তোমরা আমায় জল না ডাঙ্গা দু'টোর একটা বেছে নিতে বলেছ। কিন্তু তার আগে আমিই তোমাদের সেই প্রশ্ন করছি। জল না ডাঙ্গা কি তোমরা বেছে নিতে চাও?"

সবাই একেবারে হতভম্ব। খেঁকশেয়ালী সবার আগে বুঝি নিজকে সামলে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠ্‌ল—"ভাঁড়ামি করবার আর জায়গা পাও নি। না!"

ভোঁদড় গম্ভীর ভাবে বল্লে,—"বাজে তর্ক করবার সময় আমার নেই। তোমাদের জবাব আমি এক্ষুণি চাই।"

ভামের গোঁফ রাগে ফুলে উঠ্‌ল, খেঁকশেয়ালীর লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড বুঝি এখানেই বাধে।

ভোঁদড় তবু শান্ত ভাবে বল্লে,—"ডাঙ্গা যদি চাও ত জেনো আর সময় নেই!"

এবার সবাই যেন একটু ভয় পেয়েছে মনে হ'ল। ভোঁদড়ের হেঁয়ালির মানে কি!

হঠাৎ খরগোসের দল চনমন করে উঠ্‌ল। তারা শুনতে পেয়েছে। দূর থেকে কিসের ভয়ঙ্কর আওয়াজ।

দেখতে দেখতে সবারই কান খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। সবাই সরে পড়বার জন্যে ব্যস্ত।

বক পাখা নেড়ে সবাইকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে। "কিছু নয়, ভয় পাবার কিছু নেই। এ শুধু সবাইকে বোকা বানাবার ফিকির ভোঁদড়ের।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আওয়াজ এবার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

খরগোসের দল আগেই সরতে আরম্ভ করেছে। খেঁকশেয়ালী লেজ গুটিয়ে পাশ কাটাচ্ছে।

সভা ছত্রভঙ্গ। ভাম পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করছে পালাবার জন্যে। সিড়িঙ্গে বকের চোখকে যা লজ্জা।

কিন্তু সে লজ্জাও আর বেশী ক্ষণ রইল না। এবার আর বুঝতে কিছু বাকী নেই। জলের ভয়ঙ্কর আওয়াজ। নদীতে বান আসছে জঙ্গল ভাসিয়ে। ভাম তিন লাফে কাঁটানটের জঙ্গল পার হয়ে একেবারে দূরের মাদার গাছের আগডালে।

পেছন থেকে ভোঁদড় চীৎকার করে বল্লে,—"আহা চললে কোথায়! শুশুকের স্যাঙ্গাতের জবাবটা নিয়ে গেলে না?"

কান্তিকুমারের শেষ পরীক্ষা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

আমাদের কান্তিকুমার দু' বোতল ফস্‌ফোলেসিথিন কিনে আনলো। ওষুধ, বিলেতে তৈরী, বেজায় দামী। খেলে হজম হয়, ঘুম হয়, শরীরে রক্ত হয়, গায়ের জোর বাড়ে, মাথা ঠাণ্ডা থাকে, স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও মননশক্তি গভীর হয়, বুদ্ধি নতুন-শান-দেয়া ছুরির মত ঝক্‌ঝক্‌ করে। বিজ্ঞাপনে লেখে এ-কথা। বিজ্ঞাপনে আরো যা লেখে সব বলতে গেলে পাতা অমনিতেই ভ'রে যাবে, গল্প বলা হবে না।

এমন যে শক্তিশালী ফস্‌ফোলেসিথিন, আমাদের কান্তিকুমার কিনে আনলো

তারই দু' বোতল। কেন? না সে এবার একটা পরীক্ষা দেবে। এবং পরীক্ষার সময় শরীর যদি ভালো না থাকে—কে জানে, হয় তো বইগুলো সব চিবিয়ে গুলে খেয়েও শেষ পর্য্যন্ত চিৎপটাং। আমাদের কান্তিকুমার বোকা নয়, সে কোন রিস্‌ক্‌ নেবে না। এমনিতেই তার শরীর ভাল নয়। ঘুম হয় না রাত্রে। কি ঘুম হ'ল তো কেবলই ঘুম, দুপুরবেলা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার রাত দশটা বাজলো কি ধুপ্‌! এক ভাবে বেশীক্ষণ বস্‌তে পারে না, ঘরে পাঁচটা চেয়ার থাকলে আড়াই মিনিট পর পর জায়গা বদল করা চাই, কেউ কিছু বলতে আরম্ভ করলো কি কান্তিকুমারের মুখ দিয়ে ছুটলো কথা—কার সাধ্য ঠেকায়? এগুলো হচ্ছে খুব শক্ত একটা ব্যামোর লক্ষণ, কান্তিকুমার বলে। বই পড়ে দেখেছে সে। অনেক বই পড়েছে সে, অনেক-কিছু জানে সে। এই যে সে কোন বাড়ীর ঠিকানা মনে রাখতে পারে না, চিঠি লিখলে ভুলে যায় খামের উপর ঠিকানা লিখতে, এর জন্যে দায়ী তার শরীরের সূক্ষ্ম কলকব্জার এমন একটা গোলমাল—সাবধান না হ'লে যার ফল নাকি মারাত্মক হ'তে পারে। আমাদের কান্তিকুমার তাই বেছে-বেছে নানা রকমের ওষুধ খায়—আশ্চর্য্য ফল নাকি পায় ভিতরে-ভিতরে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা না-ই বা গেল? কতগুলো মূর্খ ফাজিল আছে, যারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না—তারা কি জানে ক্যালশিয়ম ক্লোরাইডের বড়ি খেয়ে আমাদের কান্তি-কুমারের হাত-পা ছোঁড়া দস্তুরমত কমে গেছে—এখন শুধু সে মেঝেতে দমাদম্‌ পা ঠোকে, আর টেবিলে পা তুলে দিয়ে কাচের পেপার-ওয়েট্‌ নিয়ে ফুটবল খেলে, আর হাতের কাছে দু' একটা কুশান পেলে ভিজে গামছা নিঙরোতে থাকে, আর—যাক্‌ গে, এগুলো মোটে আমলে আনবার মত নয়, মোটের উপর সে এখন অনেক স্থির, প্রশান্ত—নয় তো অতগুলো ক্যালশিয়ম ক্লোরাইডের বড়ি সে খেলো কী করতে? সায়ান্স্‌ তো আর ভুল করতে পারে না, বরঞ্চ মানুষেরই দেখবার কি বোঝবার ভুল হ'তে পারে। এই তো কোন্‌ মূর্খের পাল্লায় প'ড়ে দ্বিতীয় বার এম্‌-এ. পরীক্ষার সময়ে সে পঁচিশ বোতলের জায়গায় মাত্র সাড়ে উনিশ বোতল ফস্‌ফো-লেসিথিন খেয়েছিলো—তাই না ঐ কাণ্ডটা হ'ল। আরে মশাই, সমস্ত একেবারে নখদর্পণে, তবু কিনা লেখবার সময় কী রকম গুলিয়ে গেলো, মনে হ'ল কিছুই

জানে না! দাদা বৃত্তান্ত শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন—তিনি তো আর জানেন না যে এটা একটা অসুখ যার নাম হচ্ছে ব্রেইন-ফ্যাগ এবং যার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে ভালো চিকিৎসা দরকার। নেপোলিয়নের এ রোগ হয়েছিল শেষের দিকে, তাই তো ইংরেজরা তাঁকে আটকে রাখতে পেরেছিল। থাকতো তখন আজকালকার সায়ান্স, এল্‌বা থেকে ছ' মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন চম্পট। আমাদের কান্তি-কুমার জীবনে আর কোন নির্ব্বোধ গর্দ্দভের দুর্ব্বুদ্ধি শুনবে না—আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে শুনেই সে ব্রেইন-ফ্যাগের বৈজ্ঞানিক প্রতিষেধক কিনে এনেছে। এ পরীক্ষায় উপরের দিকে হ'লে হাতে-হাতে চাকরি মিলবে—দাদা ব'লে দিয়েছেন, 'আর যা-ই করিস্, পড়িস্ একটু কম'। ওঃ, ভারী তো পরীক্ষা, তার জন্যে আবার পড়া! এ পর্য্যন্ত যত শক্ত-শক্ত পরীক্ষা সে পাশ করেছে, যে রকম বিদ্যেবুদ্ধি তার, সে তুলনায় এ পরীক্ষা তো জল। পড়াশুনো করবার কিছু নেই, শুধু মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে স্বাভাবিক ও সক্ষম অবস্থায় রাখা। ঐ তো অঙ্ক আর ভূগোল আর পলিটিক্স আর ফিজিয়লজি—গোটা পাঁচেক পেপার বুঝি সবশুদ্ধ—আঠারো বছর বয়েস থেকে ও-সব জানে সে। তার পক্ষে ও পরীক্ষা দেওয়া দস্তুর মত নিজেকে ছোট করা—কিন্তু চাকরির যা অবস্থা আজকাল, আত্মসম্মান বজায় রাখার কি আর উপায় আছে!

সুতরাং আমাদের কান্তিকুমার অন্য সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিয়মিত ফস্‌ফো-লেসিথিন সেবন আরম্ভ করলো। তুচ্ছ পরীক্ষা, পাঁচ বোতল খেলেই যথেষ্ট। শরীরটাকে যত দূর সম্ভব বিশ্রাম দিতে হবে, এনার্জির বাজে খরচ করা বোকামি। দীর্ঘ বিশ্রামের পরে মস্তিষ্ক সতেজ হয়—আধুনিক বিজ্ঞানের এ আবিষ্কার কখনো ভোলবার নয়। গ্রীষ্মকাল, শরীরটা এমনিতেই সব সময় ক্লান্ত, তার উপর বিশ্রামের মাত্রা কম হ'লে কি আর উপায় আছে! আমাদের কান্তিকুমার তাই তে-তলার ঘরে বিছানায় শুয়ে রাত এগারোটার সময় চীৎকার ক'রে ডাকে—'ভুবন!'

ভুবন ছুটে আসে নীচে কলতলা থেকে, বাসন মাজতে যাচ্ছিলো সে।

—'আলোটা নিবিয়ে দাও তো, ভুবন।'

ভুবন আলো নিবিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। কান্তিকুমার জড়িতস্বরে বলে—'আটটার আগে আমার চা এনো না।'

ভুবন আদর্শ ভৃত্য, আটটার বেশ কিছু পরে সে কান্তিকুমারের চা এনে শিয়রে রাখে। চোখ বুজে একটু একটু ক'রে চা খেয়ে কান্তিকুমারের ঘুম ভাঙে। গ্রীষ্মকালে বেশী ক'রে ঘুমোতে হয়—সুতরাং আরো আধ ঘণ্টা বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ; কান্তিকুমার আস্তে আস্তে ওঠে। হাত-মুখ ধোয়া, আর এক প্রস্থ চা, তার পর ওষুধ খাওয়া। তা-না-না-না ক'রে এগারোটা বাজে। আধ চৌবাচ্চা জল ঢেলে স্নান—গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান তা-ই বলে। একটুখানি ভাত, পাৎলা মাছের ঝোল, কাঁচা আমের টক, দই, গোটা চারেক টোম্যাটো—এই গরমে বেশী পেট ভ'রে খেলে ফাঁপর হ'য়েই মরবে। আদর্শ ভৃত্য ভুবন আগে থেকেই তার ঘরের জানলা বন্ধ ক'রে বিছানায় চিকণ-পাটি পেতে রাখে—খাওয়ার পরে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চোখ কেমন আপনা থেকেই বুজে আসে—সে আশ্চর্য্য! অথচ এই সেদিনও সারাটা দুপুর ছট্‌ফট্ করেছে—কোথায় ঘুম! সত্যি, আশ্চর্য্য গুণ ফস্‌ফোলেসিথিনের। তিনটে নাগাদ একবার যদি ঘুম ভাঙে, সে উঠে আর এক ঢোঁক খায়, ফের শোয়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে পাঁচটা।

২

এমনি ক'রে কান্তিকুমার ছ' বোতল টনিকের সঙ্গে দীর্ঘ বিশ্রাম হজম করলো। রোজ আয়নার দিকে তাকায়, তাকিয়ে মুচকি হাসে। তার শরীরের সূক্ষ্ম কলকব্জার গোলমাল এইবার বোধ হয় সেরেছে। তার গাল লালচে হয়েছে, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল। হাত-পাগুলো নিজের বশে এসেছে যেন; রাস্তার গোলমাল আর হয় না, সমস্ত কলকাতার ম্যাপ চোখের সামনে দেখতে পায়। টেলিফোনের এক-একটা নম্বর মাত্র তিন বার পড়েই মনে রাখতে পারে—এটা সে রোজ প্র্যাকটিস্ করে—রোজ পনেরো মিনিট। নানা রকম ছোটখাটো ভুলচুক প্রায়ই তার হ'ত, তার ফলে অসুবিধে হয়েছে ঢের। আর সে ও-সব হ'তে দেবে না। ভালো হ'য়ে উঠেছে সে। রোজ আয়নার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলে, 'আমি ভালো

হ'য়ে উঠছি, আমি ভালো হ'য়ে উঠছি।' এ রকম বলবার ফলে অনেক অদ্ভুত রোগ অদ্ভুত ভাবে সেরে গেছে, বইয়ে পড়েছে সে।

তার পর এক দিন, আমাদের কান্তিকুমার যখন আরো এক বোতল ওষুধ কিনতে বেরুচ্ছে, তার দাদা তাকে ডাকলেন।

—'কোথায় যাচ্ছিস, কান্তি ?'

—'এই ঘুরে আসি একটু'। ওষুধ খাবার কথাটা প্রথম থেকেই সে চেপে গিয়েছিলো।

—'তোর পরীক্ষার য়্যাডমিট-কার্ড্ এনেছিস ?'

—'আনবো'খন, তার জন্যে কি ?' কান্তিকুমার উদাসভাবে বললে।

—'কবে আর আনবি ! পরীক্ষা যে তোর কালই আরম্ভ সে খেয়াল আছে ?'

—'য়্যাঁ ! হঠাৎ কান্তিকুমার আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। আর কোন কথা বললে না সে, কোনদিকে তাকালো না, হুড়দাড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো পাগলের মত। তাই তো, কালকেই তো সাতাশে মে! সেই যে সে ধারণা ক'রে রেখেছিলো পরীক্ষার দেরি আছে, সে ধারণা এখনো চলছে মগজে। একবার ক্যালেণ্ডারের দিকেও তাকায় নি—কখন্ তাকাবে, আর কেনই বা তাকাবে!

ঘণ্টাখানেক পর রোদে টকটকে মুখ নিয়ে সে ফিরে এলো। দাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এনেছিস কার্ড্ ?'

কান্তিকুমার হাঁপাচ্ছিলো, কথা না ব'লে পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার ক'রে দাদার হাতে দিলে। দাদা খুলে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে :

The City Pharmacy
Cash Memo
1 Bot. Phospho···

কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই তিনি কান্তিকে সেটা ফিরিয়ে দিলেন।—'ফের খাচ্ছিস ঐ ছাইভস্মগুলো!'

ও, তাই তো, তাই তো, ভুল হ'য়ে গেছে। কান্তিকুমার এ-পকেট খুঁজলো,

ও-পকেট খুঁজলো, ভুরু কুঁচকালো, ঠোঁট ওল্টালো, কোঁচা ঝাড়লো, পায়চারি করলো, বসলো, উঠলো, তার পর আবার ব'সে পড়লো।

—'ক্যাশ মেমো মনে ক'রে ওটা ফেলে দিস্ নি তো ?'

তা-ই! তা-ই! তা-ই হবে। ওষুধের বোতলটা কিনে ক্যাশ মেমোটা ফেলে দিয়েছিলো রাস্তায়, এটুকু মনে আছে। ভাবতে-ভাবতে আসছিলো, ভুল হ'য়ে গেছে। ফেলে দিতে হবে, এইটুকু সে ভেবে রেখেছিলো, কোনটা ফেলবে তা ভেবে দেখে নি। সেইজন্যেই ভুল। দাদা বললেন, 'তা ব'সে থাকলে চলবে কেন এখন ? যা, একটা ডুপ্লিকেট নিয়ে আয়।' যা না করলেই নয়, তা করতেই হবে। আবার সেই রোদ্দুরে বেরিয়ে নিয়ে এলো ডুপ্লিকেট।

৩

রাত্রে খাওয়ার পর কান্তিকুমার বই নিয়ে বসলো। কী মুস্কিল—আগে কেউ বলে নি কেন পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে! পাতা উল্‌টিয়ে গেলো বইগুলোর, কিন্তু পড়বার আছে অনেক, সময় মোটে একটা রাত্রি, কী ক'রে কী হবে! যা-কিছু সে জানতো, সব যেন 'ক্লীন্' মুছে গেছে মন থেকে। চোখ বুজে সে মনে করবার চেষ্টা করলো, কিছু মনে পড়লো না। নাঃ, দেবে না পরীক্ষা, লোক হাসিয়ে লাভ কি? কিন্তু পরীক্ষা না দিলে দাদা কি বলবেন? না, দেবে, দেবে—দিতে তাকে হবেই, যা থাকে কপালে।

আলো নিবিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না অনেকক্ষণ। সর্বনাশ, আবার ধরলো বুঝি ইনসম্‌নিয়া। কিন্তু ছটফট্ করতে-করতে কখন্ সে ঘুমিয়ে পড়লো, আর—আশ্চর্য্য!—উঠলো ঠিক ভোরবেলায়, কারুর ডাকতে হ'ল না। উঠেই আবার গত রাত্রির ছড়ানো বইগুলো নিয়ে বসলো—আশ্চর্য্য, জল! যেখানে খোলে সেখানেই জল। ফূর্ত্তিতে কান্তিকুমার শিষ দিয়ে উঠলো। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বইগুলো একটু ঝালিয়ে যেতে লাগলো—বাজলো আটটা, সাড়ে আটটা, বৌদি এসে হু'বার তাড়া দিয়ে গেলেন, খেয়ালই নেই। পরীক্ষা হবে প্রেসিডেন্সি কলেজে, দশটার সময় আরম্ভ। তারা থাকে অখিল মিস্ত্রীর গলিতে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে, যেতে তো দশ মিনিট, ভাবনা কী?

ন'টার সময় সে উঠলো, স্নানাহার সেরে ঠিক পৌনে দশটায় বেরলো বাড়ী থেকে। মনটায় বেজায় ফূর্ত্তি লাগছিলো তার। মির্জ্জাপুর রোড দিয়ে যেতে-যেতে অঙ্কের এক-একটা মস্ত ফর্মূলা মনে-মনে আউড়ে যাচ্ছিলো—নিশ্চিত মনে হচ্ছিলো তার যে এ পরীক্ষায় সে নির্ঘাৎ ফার্স্ট্ হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই কোত্থেকে এক খোট্টা দরোয়ান এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে—'ক্যায়া মাঙ্তা বাবু?'

ক্যায়া মাঙ্তা বাবু?

ক্যায়া মাঙ্তা! কান্তিকুমার দস্তুর মত চ'টে উঠলো।—'কুচ নেই মাঙ্তা। ছোড়ো।'

—'পেশেন্ট্ হুয় ইধার?'

—'পেশেন্ট্! পেশেন্ট্মে হম্ ক্যায়া করতা? তুম বকবকাও মৎ।' তার পর ফূর্ত্তিসে বললে, 'একঠো এগজামিন্ হোতা, নেই জানতা?'

—'এগজামিন্? এগজামিন্ ক্যায়া?'

—'এগজামিন্ নেই জান্তা?' কান্তিকুমারের বড় মজা লাগলো। তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজকা দরোয়ান হুয় তো এগজামিন্ নেই জান্তা!

—'পেরসিডান্সি কলেজ!' ই তো মেটিয়া কলেজ হুয়—আই-ওয়ার্ড্!'

বলে কি লোকটা! কান্তিকুমার চার দিকে তাকিয়ে দেখলো—তাই তো,

তাই তো। ঐ তো দেখা যাচ্ছে সারি-সারি সাদা লোহার খাট। এতক্ষণ তার খেয়াল হয় নি কেন? প্রেসিডেন্সি কলেজ সাদা দালান, আই-ওয়ার্ড্টাও সাদা—সেইজন্যেই ভুলটা হয়েছিলো। কলেজ ষ্ট্রীটে প'ড়ে ডান দিকে মোড় না নিয়ে বাঁ দিকে নিয়ে ফেলেছিলো—অল্পের জন্যে ভুলটা হ'য়ে গেছে।

এ-সব ভাবতে কান্তিকুমারের অবশ্যি আধ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে নি। কেননা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখলো দশটা বেজে দু' মিনিট। এক লাফে পড়লো রাস্তায়, তার পর যে বেগে হাঁটতে লাগলো, সাবালক মানুষের পক্ষে তাকেই দৌড় বলে। উর্দ্ধশ্বাসে ঢুকলো প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরীক্ষার হলে গার্ডের হাত থেকে একখানা প্রশ্ন-পত্র ছিনিয়ে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে গিয়ে বসলো পাখার নীচে। প্রশ্ন খুলে দেখলো—জল। দাঁড়াও না, আজ কেল্লা ফতে। পকেট থেকে কলম বার ক'রে নিয়ে সে—

লিখতে যাবে, এমন সময় চমকে উঠলো। তার জামার বুক-পকেট, সমস্তটা বুক কালিতে কালিময়, কলমে নেই এক ফোঁটা কালি। ওঃহো! সেই যে সে খাওয়ার পর কালি ভ'রে রেখেছিলো কলমে, তার পর সেফ্টি-কলমের ক্যাপ্টা খুলে লাগাতে আর মনে ছিলো না। আসবার সময় তাড়াতাড়িতে উল্টো ক'রে কলমটা লাগিয়ে এসেছে পকেটে!

হঠাৎ সেই গরমেও কান্তিকুমারের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় শির্-শির্ ক'রে উঠলো।

* * *

দাদা বললেন—'তা আর কারো কাছ থেকে একটা কলম কি পেন্সিল চেয়ে নিলি না কেন?'

—'গার্ডের ফাউন্টেন পেন্টা চেয়েছিলুম—বললে, কলমটা আমার স্ত্রীর, অন্য কেউ একটা কথা লিখলেও তিনি আর লিখতে পারেন না। বললুম, তা হ'লে আমি কি আঙুল কেটে লিখবো? বললে, পয়সা দিলে নিবের কলম আনিয়ে দিতে পারি।'

—'তাই আনালি না কেন?'

—‘একটা পয়সা ছিলো না পকেটে। পার্স্ টা ভুলে ফেলে গেছলুম।’

—‘আহা! তাই ব’লে একটা কলম বুঝি জুটলো না তোর?’

কান্তিকুমার হাই তুলে বললে, ‘মেজাজ খারাপ হ’য়ে গেলো, দাদা, ভাবলুম—দূর ছাই, ভারী তো পরীক্ষা, না দিলে কী হয়? উঠে চ’লে এলুম বাড়ীতে।’

দাদা বললেন, ‘বেশ করেছো। আর কোনদিন তোমাকে কোন পরীক্ষা দিতে হবে না।’

আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

‘আল্ট্রা-ভায়োলেট্’ নামটা বড় খট্মটে, দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া আনিতে চায়। কিন্তু নামটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই একেবারে নতুন বলিয়া মনে হইতেছে না! আজকাল যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে—বিশেষতঃ ডাক্তারদের মুখে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর কথা লাগিয়াই আছে। এক্স্-রে’র মত এ নামটিও আমাদের কানে সহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আল্ট্রা-ভায়োলেট্-রে জিনিষটা আসলে কি, কোথায় পাওয়া যায়, কি তার গুণ—এ সব খবর বোধ হয় অনেকেই জান না?

আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর নিবাস সূর্য্যলোকে—অর্থাৎ এ আলো সূর্য্য-কিরণেরই খানিকটা অংশ। সূর্য্যের আলোকে খালি চোখে দেখিলে সাদা বলিয়া মনে হয় কিন্তু আসলে তা নয়, সূর্য্যের সাদা আলো রামধনুকের মত নানা রং-বেরংএর আলো একত্র মিশাইয়া তৈরী হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন্ প্রথম এ তথ্য আবিষ্কার করেন। সূর্য্যের আলোর সম্মুখে যদি একখানা তিন-কোণা কাচ (ইংরাজীতে যাকে বলে Prism) ধরা যায় তবে দেখা যাইবে সূর্য্যের আলো আর তার ভিতর দিয়া সাদা দেখাইতেছে না—প্রথমে বেগুনী, তার পর গাঢ় নীল,

তার পর নীল, তার পর সবুজ, তার পর হলদে, তার পর কমলা এবং সব শেষে লাল—এই সাত রং-এ সে আলো ভাগ হইয়া গিয়াছে। আলোর একটা স্বভাব এই যে, কোন হাল্কা জিনিষের (যেমন বাতাস) ভিতর হইতে কোন ঘন জিনিষে (যেমন কাচ) ঢুকিবার সময় সে ঠিক সোজা হইয়া ঢোকে না, একটু বাঁকিয়া যায়। যে সব রঙ্গিন আলো দিয়া সূর্য্যের আলো তৈরী বলিলাম সেগুলিও ঐ অবস্থায় অমনি ধারা বাঁকিয়া যায়—কিন্তু তাদের সবগুলি সমান ভাবে বেঁকে না, কোনটা কম বেঁকে, কোনটা বেশী। তিন-কোণা কাচের ভিতর দিয়া এগুলি এমন ভাবে বেঁকে যে বিভিন্ন রংগুলি একেবারে আলাদা হইয়া পাশাপাশি ভাবে দেখা দেয়। তা’তেই আমরা বুঝিতে পারি সূর্য্যের আলোয় সাতটা ভাগ। আমাদের পুরাণেও সূর্য্য ঠাকুরের রথে সাত রংএর সাতটা ঘোড়ার কথা বলা হইয়াছে; সূর্য্যকিরণের সাতটা রংএর কথা বোধ হয় পুরাণকারেরা জানিতেন।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন্

সূর্য্যের সাদা আলো সাতটা আলো মিশিয়া তৈরী হইয়াছে জানিয়াই তোমরা কেউ কেউ বোধ হয় অবাক্ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আরও

যে সব অদ্ভুত তথ্য বাহির করিয়াছেন তার কথা শুনিলে না জানি কেমন আশ্চর্য্য হইবে! তাঁরা বলেন সূর্য্যকিরণে শুধু ঐ সাত রংএর আলোই নাই, আরও অসংখ্য—নানা রকমের—নানা স্বভাবের আলো আছে; সে আলো আমাদের চোখে অনুভব করা যায় না কিন্তু যন্ত্রের ভিতর ধরা পড়ে। আমাদের আশ-পাশে আকাশে-বাতাসে যে ফাঁকা জায়গা দেখিতেছ—যাকে আমরা সোজা কথায় "শূন্য" বলি, পণ্ডিতেরা বলেন সেগুলি কোথাও একদম ফাঁকা নাই—সর্ব্বত্রই ঈথর নামে একটা জিনিষ দিয়া ভর্ত্তি। এই ঈথর চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু এই ঈথর যে আছে সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় নিঃসন্দেহ। আলো জিনিষটা আর কিছুই নয়, এই ঈথরের ঢেউ। ঈথরের মধ্যে যখন নানা রকম ঢেউ উঠে তখনই নানা রকম আলোর সৃষ্টি হয়। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। মনে কর তোমাদের বাড়ীর চৌবাচ্চাটা জলে ভর্ত্তি হইয়া আছে এবং সে জল বেশ শান্ত হইয়া আছে (অর্থাৎ শীঘ্র কেহ সে জল নাড়ায় নাই)। তুমি তার মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিলে—অমনি কি হইবে?—জলের মধ্যে একটা কাঁপুনি আরম্ভ হইবে আর ছোট ছোট কতকগুলি ঢেউ উঠিয়া জলের ভিতর চারদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ঈথরকেও যদি ঐ রকম কোন ভাবে কাঁপান যায় তবে তার মধ্যেও অমনি ধারা ঢেউ উঠে, সেই ঢেউই আমাদের আলো। এখন এই ঢেউ নানা রকম মাপের হইতে পারে—খুব ছোট ছোট ঢেউও হইতে পারে, আবার বেশ বড় বড় ঢেউও হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। কাজেই ঈথরে যদি খুব ছোট ছোট ঢেউ উঠে তবে প্রতি সেকেণ্ডে ঈথর খুব বেশীবার কাঁপিবে, আর যদি ঈথরে খুব বড় বড় ঢেউ উঠে তবে প্রতি সেকেণ্ডে সে তদনুযায়ী কম বার কাঁপিবে। বিভিন্ন আলোর মধ্যে তফাৎ আর কোথাও নয়, তফাৎ শুধু এই ঢেউএর আকারে। (প্রতি সেকেণ্ডে ঈথরের কাঁপুনির সংখ্যার উপরও বলিতে পার)। ঈথর যদি সেকেণ্ডে ৪ কোটি কোটি বার হইতে ৮ কোটি কোটি বারের মধ্যে কাঁপে তবেই সে আলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে—তার চেয়ে কম-বেশী হইলে আর আমাদের চোখ সে আলো ধরিতে পারে না—তখন দরকার হয় যন্ত্রের।

ঈথরের এই ঢেউগুলি এক-একটা কতটা লম্বা তা' মাপিবার কয়েকটা মাপকাঠি পণ্ডিতেরা বাহির করিয়াছেন। একটা মাপকাঠির নাম দেওয়া হইয়াছে 'আর্ম্‌ষ্ট্রং'। এক আর্ম্‌ষ্ট্রং এক ইঞ্চির প্রায় ২৫ কোটি ভাগের এক ভাগ। এই মাপ ধরিলে বলিতে হয় ঈথরের এক-একটা ঢেউ যদি চার হাজার আর্ম্‌ষ্ট্রং হইতে আট হাজার আর্ম্‌ষ্ট্রং-এর মধ্যে থাকে তবেই সে আলো আমরা দেখিতে পাই।

কৃত্রিম উপায়ে আলট্রা-ভায়োলেট্ আলো সেবন

আগে যে বেগুনী হইতে লাল পর্য্যন্ত আলোর কথা বলিয়াছি এদেরও ঢেউএর দৈর্ঘ্য ঐ চার হাজার হইতে আট হাজার আর্ম্‌ষ্ট্রং-এর ভিতরে। (লালের সব চেয়ে বেশী, তার পর কমলার আর একটু কম, এই ভাবে কমিতে কমিতে বেগুনীতে সব চেয়ে কম।)

কিন্তু এর চেয়ে অনেক—অনেক ছোট ঢেউ-এর আলোও আছে, আবার অনেক অনেক বড় ঢেউ-এর আলোও আছে। সে আলো আমরা চোখে দেখিতে পাই না কিন্তু তার কোন কোনটার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এক্স্-রে এই রকম একটা আলো—খুব ছোট ঢেউ-এর। এক্স্-রে'র এক-একটা ঢেউ মাত্র দেড় হইতে সাড়ে তেরো আর্ম্‌ষ্ট্রং লম্বা। আবার বেতার বা রেডিওর যে ঢেউ (বৈদ্যুতিক হইলেও রেডিও কিন্তু আলোরই জাতভাই—ঈথরের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয়) তার এক-একটা অনেক সময়ে ৩০০ গজ—৫০০ গজ—এমন কি কয়েক মাইল লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে।

হ্যাঁ, এইবার যা বলিতেছিলাম—আলট্রা-ভায়োলেট্ আলোর কথা। আলট্রা মানে অতিরিক্ত বা খুব বেশী, ভায়োলেট্ মানে বেগুনী। অর্থাৎ অতিবেগুনী বা বেগুনীর চেয়ে বেশী। ঈথরের কম্পন-সংখ্যা বেগুনী আলোর কম্পন-সংখ্যার চেয়ে

বেশী হইলে অর্থাৎ ঈথরের ঢেউ বেগুনী আলোর ঢেউএর চাইতে (৪০০০ আর্ম্ ষ্ট্রং-এর চাইতে) কম লম্বা এবং এক্স্-রে'র ঢেউএর চাইতে (অর্থাৎ সাড়ে তেরো আর্ম্ ষ্ট্রং-এর চাইতে) বেশী লম্বা হইলে যে আলো পাওয়া যায় তা'কেই বলা হয় আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো। বলা বাহুল্য এ আলোও চোখে ধরা যায় না, ধরিতে হয় যন্ত্রের সাহায্যে।

এই আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো বড় আশ্চর্য্য জিনিষ। আজকালকার পণ্ডিতেরা ইহা লইয়া যতই গবেষণা করিতেছেন ততই ইহার নিত্য নূতন কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছেন। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য সূর্য্যের আলো কি রকম উপকারী তা বোধ হয় তোমরা কিছু কিছু জান। জল, বাতাসের মত আলো না হইলেও মানুষ বাঁচে না। মানুষ কেন—পশুপক্ষী, গাছপালা, কেউই বাঁচে না। আমাদের দেশে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তেল মাখাইয়া রোদে ফেলিয়া রাখিবার নিয়ম আছে তা তোমরা দেখিয়াছ। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে সূর্য্যকিরণের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে—কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, প্রভৃতি অনেক মারাত্মক মারাত্মক রোগ নাকি সূর্য্যকিরণ সেবন করিলে সারিয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিখ্যাত বিখ্যাত সূর্য্য-মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার কারণও হয়ত এই। বিলাতেও প্রতি বছর অসংখ্য নরনারী সুইজারল্যাণ্ড্ প্রভৃতি পাহাড়ে জায়গায় (যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ সূর্য্যালোকে পাওয়া যায়) গিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দেন—সূর্য্য-স্নান নাকি শরীর সারাইবার পক্ষে অদ্ভুত রকম কাজ করে।

আজকালকার এক দল পণ্ডিত বলিতেছেন শরীরের পুষ্টিসাধনে সূর্য্যকিরণের এই সব অদ্ভুত গুণ—এ শুধু সূর্য্যের ভিতরকার ঐ আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোটুকুর জন্য। নানা পরীক্ষা করিয়া তাঁরা এ সব দেখাইতেছেন।

কিন্তু সূর্য্যের কিরণ তো সব সময়ে ইচ্ছা করিলেই হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় না, সময় সময় বেশ দুর্ল্লভই হইয়া পড়ে। তখন উপায়? বৈজ্ঞানিকেরা তা'তে মোটেই ভড়কান নাই। তাঁরা নকল উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো তৈরী করিয়া তাহাই কাজে খাটাইতে সুরু করিয়াছেন। কোয়ার্ট্জ্ দিয়া তৈরী গোলকের মধ্যে পারার বাষ্প ভরিয়া তার ভিতর বিদ্যুৎ চালাইয়া দিলে এই আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো প্রচুর পাওয়া যায়। অন্য উপায়ও আছে।

এই নকল "সূর্য্য"কে ডাক্তারেরা তাঁদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে খাটাইতেছেন আর ফলও নাকি পাইতেছেন অদ্ভুত। বিলাতের এক বড় ডাক্তার—হাচিন্সন্ সাহেব কিছু দিন আগে দুই দল খনির মজুর লইয়া একদলকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কৃত্রিম উপায়ে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো সেবন করাইয়া এবং অপর দলকে কিছু না করিয়া দেখাইয়াছেন গড়ে প্রথম দল ওজনে, দৈর্ঘ্যে এবং শারীরিক বলে অপর দলের চেয়ে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

শিকারী কুকুরকে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো দিয়া বলিষ্ঠ করা হইতেছে।

ঘা, পাঁচড়া প্রভৃতি নানা রকম চর্ম্ম-রোগে, রিকেট (ছেলেমেয়েদের বিশেষ রোগ), ক্যান্সার, হাড়ের ব্যারাম, রক্ত-হীনতা প্রভৃতি রোগে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো একেবারে ধন্বন্তরির মত কাণ্ড করিতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইতেও এ আলোর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়াম্, ফস্ফরাস্ প্রভৃতির অভাব ঘটিলে এ আলো তা পূরাইতে অদ্বিতীয়। নানা রকম জীবাণু নষ্ট করিতেও এর তুলনা নাই। এমন কি অনেক সময়ে স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণের চাইতেও এই নকল আল্ট্রা-ভায়োলেট্-কিরণ নাকি অনেক বেশী কাজ দিতেছে!

কিন্তু শুধু যে ডাক্তারীতেই আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর অদ্ভুত বাহাদুরী দেখা গিয়াছে তা নয়, বৈজ্ঞানিকেরা আরও হরেক রকম ব্যাপারে এ আলোকে লাগাইয়া দিয়াছেন। আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলো একটি পাকা জহুরী, মণিমুক্তা আসল না নকল ধরিয়া দিতে ভারী ওস্তাদ্। নানা জিনিষ বাছাই করিতেও (যেমন ধর তুলা হইতে রেশম) এ আলো কম যায় না।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতেও এ আলোর উৎসাহের অন্ত নাই—বহু প্রাচীন কালের হাতের লেখা, শিলালিপি পণ্ডিতেরা এ আলোর সাহায্যে পড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু সব চেয়ে বাহাদুরী এ আলোর গোয়েন্দাগিরিতে। কোনও দলিলে যদি কোনও সই বা অন্য কোনও লেখা কৌশলে তুলিয়া তার উপর অন্য সই বা অন্য কিছু লেখা হয় তবে সেই নষ্ট-করা লেখা যতই অদৃশ্য হউক্ না কেন, এ আলো এক নিমেষের মধ্যে তা' ধরিয়া ফেলিতে পারে। দলিলের উপর আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলো ফেলিয়া তার ফটো লইলে ফটোর মধ্যেও সেই অদৃশ্য দাগ ফুটিয়া উঠিবে।

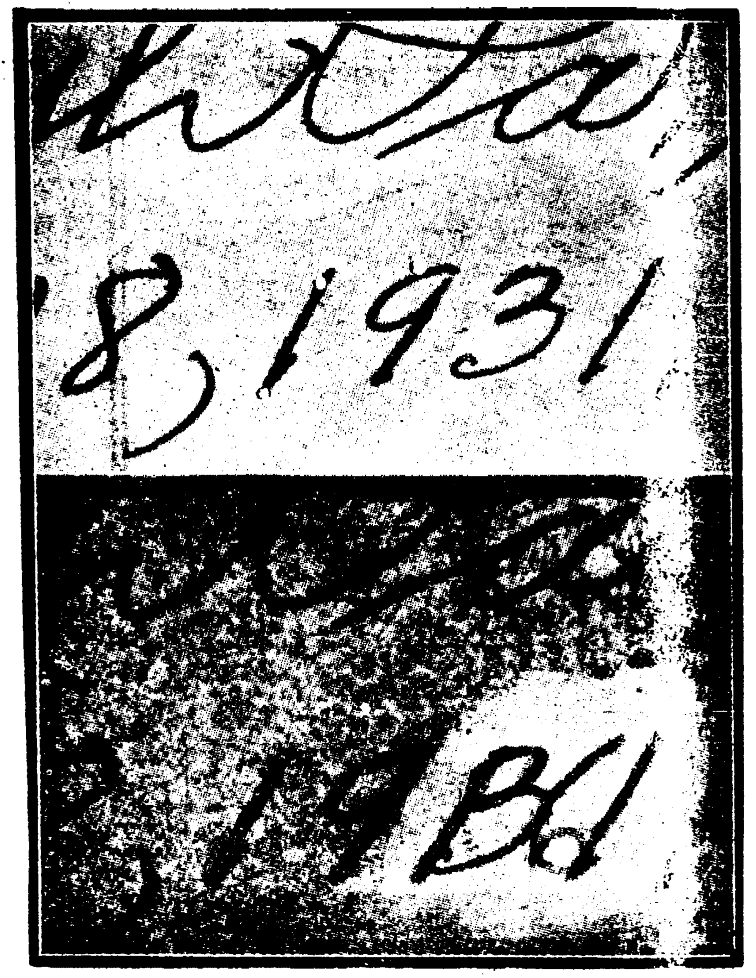

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর গোয়েন্দাগিরি
(উপরের দলিলে তারিখ দেখা যাইতেছে ১৯৩১, নীচে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে দেখা যাইতেছে ১৯২৬ কে বদলাইয়া ১৯৩১ করা হইয়াছে।)

এ আলোর স্বভাবও যেন কেমন একটু বেয়াড়া। মানুষের চোখে এ ধরা পড়ে না—চোখে লাগিলে চোখকে দস্তুর মত ঘায়েল করিয়া ফেলে, তাই চোখে ঠুসি পড়িয়া তার কাছে যাইতে হয়। এত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে অথচ সামান্য খানিকটা ধোঁয়া বা ধূলার রাশি সম্মুখে পড়িল তো গেল থামিয়া! এমন কি, সাধারণ একটা সার্সির কাচের ভিতর দিয়াও এ আলোর যাইবার ক্ষমতা নাই। কোন কিছুর মধ্যে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলো আছে কিনা তা পরীক্ষা করিবার এ একটা মস্ত উপায়।

দি আঙ্গোরা ক্যাট্

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি)

১

অজয় নদীর ধারেই স্কুলের হষ্টেল্। একটি লম্বা খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর, চার কামরায় ভাগ করা। বারো জন ছেলের বাস। আর একটি পৃথক্ ঘরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মুরলী বাবু থাকেন। নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম; হষ্টেলের খড়ো ঘরও তার সঙ্গে বেশ আত্মীয়ের মত মিলিয়াছে। চারি দিকে উলু-বন আর বন-কুলের ঝোপ,—কাঠ-বিড়ালী আর গিরগিটিদের নৃত্যশালা। ছেলেরাও চঞ্চল, দৌড়-ঝাঁপ ও সাঁতারে সুপটু। শুধু মুরলী বাবু একটু রসভঙ্গ করিয়াছেন। বেঁটে, রোগা চেহারা—ভয়ঙ্কর গম্ভীর ও অতিশয় রুক্ষ। খোঁচা খোঁচা গোঁফ; দাড়ির সঙ্গেও বোধ করি ক্ষুরের শত্রুতা আছে। পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গেরুয়া রঙের থ্রি-কোয়ার্টার পাঞ্জাবী, পায়ে সেকেলে চটি। পূর্ব্বে ছুটির দিনেও শূন্য হষ্টেলে বসিয়া তিনি একাই রাজত্ব করিতেন। এখন নাকি কোন কোন শনিবারে নিজের গ্রামে যান। ছেলেরা খোঁজ-খবর লইয়া শেষে জানিতে পারিল যে, তিনি দেশে একটি কলা-বাগান করিয়াছেন, ভবিষ্যতে নকল সিল্কের ফ্যাক্‌টরী খুলিবেন এইরূপ অভিপ্রায়। অর্থাৎ কলাও বেচিবেন, রথও দেখিবেন। ফার্ষ্ট্ ক্লাশের ফাজিল ছেলে নন্দ এক দিন এটি আবিষ্কার করিয়াছিল।

ঐ নন্দই ত হষ্টেলের পাণ্ডা। বিড়ি-খাওয়া এবং সেফ্‌টি ক্ষুরে না-ওঠা দাড়ি কামানো প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ প্রগতিমান্। আড্ডা যা কিছু তাহারই ঘরে। আজ হাফ্-হলিডে-র অবকাশে বেশ ভালো রকম জমিয়াছে। ট্যারা সুরেশ এক চোখ বাহিরে মুরলী বাবুর ঘরের দিকে রাখিয়া, আর এক চোখ আড্ডার তাস-খেলায় ন্যস্ত করিয়া ছিল। এমন সময় তাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া, বাঁ-কানের ধারে আঁচড় কাটিয়া সহসা প্রচণ্ড ধুপ্ করিয়া যে বস্তুটি একেবারে নন্দর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল, সেটি একটি কালো মিশ্‌মিশে বিকটাকৃতি বিড়াল। মুহুর্মুহু মিউ-মিউ

চীৎকারে সমস্ত আড্ডা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া, লাফাইয়া, ছুটিয়া, গায়ে গায়ে থাবা মারিয়া, ল্যাজ পার্পেণ্ডিকুলার (খাড়া) করিয়া বিড়াল মহাশয় এমন একটি রণ-ভঙ্গীতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন যে, ছেলের দল তাস খেলার সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ওদিকে পিছনে র'কের উপর লগুড় হস্তে বৃদ্ধ পাচক বশিষ্ঠ ঘোষাল রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বলিতেছে,—'হতভাগা বেড়ালের নিকুচি করেছে! ব্যাটার ঠ্যাং ভেঙ্গে তবে আমার কাজ। তিনখানা

ধুপ্ করিয়া…ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

ঝোলের মাছ খেয়ে দিলে মশাই! কি ক'রে এখন পরিবেষণ করি বল দেখি তোমরা? সুপারিঠন্ বাবু এখুনি শুন্‌লে আমার বাপান্ত করবেন যে—য়ঁ্যাঃ!…'

ছেলেদের হতভম্ব ভাব কাটিবার পূর্ব্বেই বারো বছরের ছোট্ট সুবল চট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বিড়ালটাকে বগল-দাবা করিয়া দে ছুট্।

'আরে ধর্ ধর্'—শব্দে চীৎকার করিতে করিতে তখন ছেলের দল একেবারে পাশের ঘরে হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। নন্দ বলিল,—'দেখ্ সুব্‌লে, এ সব

কি হচ্ছে শুনি? চালাকি পেয়েছিস্, না? আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়া হচ্ছে? বেড়াল ছেড়ে দিয়ে আমাদের খেলা মাটি ক'রে দেওয়া হ'ল, এর শোধ যদি তোকে আমি না দিয়েছি ত আমার নাম নন্দলাল মুখুজ্যে নয়।'

সুরেশ বলিল,—'এই যে মেসের তিনখানা মাছ গেল হুনো বেড়ালের পেটে, এর দাম কে দেবে শুনি? ঐ মুরলী বাবুর দুখানা, আর তোর ভাগের একখানা—এই তিনখানাই বেড়ালে খেয়েছে—বুঝ্‌লি?'

কিন্তু তখন আর সে ঘরে বিড়ালের কোন চিহ্নই নাই। বেচারী সুবলের মুখ লজ্জায় কালি হইয়া গেছে। সে মাথা চুলকাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—'দেখ নন্দ দা', আমার তেমন দোষ নেই। গেল রবিবার সুপুরে মামার বাড়ী গেছ্‌লুম। সেখানে ছোটমামার দুটো কালো বেড়াল ছিল—বল্লেন আঙ্গোরা ক্যাট্। আমার মা বেড়াল ভালবাসেন ব'লে সঙ্গে একটা জোর ক'রে দিয়ে দিলেন। আস্‌ছে রবিবারেই ওটা আমি বাড়ী দিয়ে আস্‌ব। আমি ত ওটাকে ঐ নটাদের গোহাল ঘরে বেঁধে রেখেছিলুম, কখন দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসে হেঁসেলে ঢুকেছে…'

'গর্‌র্ ম্যাও'—শব্দে চমকিয়া সকলেই ফিরিয়া দেখে, অমাবস্যা রাত্রির মত সেই ঘনকৃষ্ণ নধরকান্তি বিড়াল-শ্রেষ্ঠ তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটি লাল সূতার বল্ থাবায় ধরিয়া খেলা করিতেছে। বলের এক দিকের সূতা ছড়াইয়া গেছে একেবারে মুরলী বাবুর ঘর পর্য্যন্ত।

এই লাল সূতায় মুরলী বাবু নিজের জন্য একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছেন, তাই গুটি পাকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। একটি অদ্ভুত ইঁদুর-জাতীয় জীব বিবেচনা করিয়া বিড়াল সেটিকে পাকড়াও করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সূতা ছাড়িতে ছাড়িতে লইয়া আসিয়াছে। ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেই নজরে পড়িল, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মুরলী বাবু সেই সূতা কুড়াইতে কুড়াইতে ছুটিয়া আসিতেছেন। তাহারই অপকর্ম্মে সহসা চারি দিকে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিয়া বিড়ালটি নিমেষ-মধ্যে বল্ ফেলিয়া গা-ঢাকা দিল। ছেলেরাও তৎক্ষণে যে যার ঘরে গিয়া অত্যন্ত মনঃসংযোগে পড়িতে বসিয়াছে।

ক্রমে বাহিরে চটিজুতার ফট্ ফট্ শব্দ মিলাইয়া যায়। নন্দলাল খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—'ওরে সুরেশ, এ এক মজা মন্দ হবে না। মুরলী বাবু একেই ত দু' চক্ষে বেড়াল দেখতে পারেন না, বলেন,—বেড়াল নাকি ধবল কুষ্ঠের বীজ নিয়ে আসে। তার ওপর এই ভুতুড়ে বেড়াল। ওটাকে মাঝে মাঝে ওঁর ঘরে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখা যাবে'খন। ওটা থাক্ হষ্টেলে।' সুরেশ ট্যারা চোখ বার কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অবশেষে নন্দর উপরে দৃষ্টি ফোকাস্ করিয়া যখন কহিল, 'হুঁ', তখন তাহার ঠোঁটের ফাঁকে বেশ দুই পাটি দন্ত বিকশিত হইয়া গেছে।

অতএব বিড়ালটি রহিয়া গেল। নন্দর রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়া তাহাকে মায়ের কাছে রাখিয়া আসার মত দুঃসাহস সুবলের ছিল না।

হষ্টেলের পাত-কুড়ানো মাছে-ভাতে দুই বেলা তৃপ্তিকর আহার, এবং মাঝে মাঝে বশিষ্ঠ ঘোষালের হাতা-বেড়ির খোঁচা খাইয়াও আঙ্গোরা ক্যাট্ কয়েক দিনেই আরও বেশ নাদুস্-নুদুস্ হইয়া উঠিল।

মুরলী বাবু নন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ওহে, ঐ ভুতুড়ে বেড়ালটাকে তাড়াও শীগ্‌গির, ওটি একটি যমদূত! কালো বেড়াল সত্যিই বড় অশুভ, ওর নখে থাকে যত রাজ্যের বিষ। হয় ওটাকে কোথাও বিদেয় কর, না হয় মেরে ফেল।'

নন্দ মুখ ভারী করিয়া উত্তর দিল,—'জীব হত্যা মহাপাপ, স্যর। ও বাবা, ওর গায়ে হাত দিয়ে শেষে ধনে-প্রাণে মারা যাই আর কি! আমার পিসীমা বলেন,—বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন, মারতে নাই, মারলে অকল্যাণ হয়।' অগত্যা মুরলী বাবু আর কিছু বলিতে না পারিয়া অতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং এমনি সশঙ্কচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন যে, কোথাও কোন ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিলেই শিহরিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যান। মনে মনে বলেন,—'ভ্যালা বিপদে পড়া গেছে! একি আপদ্ জুটলো এসে!'

২

মুরলী বাবুর গ্রামস্থ কলা-বাগানে কাহার একটি পোষা ময়না কোন গতিকে খাঁচা-ছাড়া হইয়া উড়িয়া বসিয়াছিল। একজন মুনিষ সেটিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। 'আহা কৃষ্ণের জীব'! বলিয়া তিনি সেটি সযত্নে এক জীর্ণ

লোহার খাঁচায় পুনরায় বন্দী করিলেন। বুড়া-বয়সের ভীমরতিতে ভরত মুনি যেমন একটি মৃগশিশুর মায়ায় পড়িয়া ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পুত্রকন্যার অবর্ত্তমানে ঐ ময়না পাখীটিই পালন করিবেন স্থির করিয়া সেটিকে বরাবর হষ্টেলে আনিয়া নিজের ঘরে দাওয়ায় খাঁচাটি ঝুলাইয়া দিলেন। নিজের হাতে বেশমের গুলি পাকাইয়া ময়নাকে খাওয়ান, সকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া দেন। আবার বিকালে ছেলেরা মাঠে খেলিতে গেলে তিনি নিভৃতে শিস্ দিয়া দিয়া ময়নার মাষ্টারি করেন। তাঁহার এই নূতন সখ দেখিয়া ছেলেরা গা-টেপাটেপি করে। কেহ বা দুয়েকবার বলিয়া যায়,—'বাঃ, বেশ পাখীটি!

সেদিন ইস্কুলে কিসের মীটিং ছিল। আসিতে দেরী হইবে, তাই তিনি সুবলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, আমার ফিরতে বিলম্ব আছে, তুমি একবার ময়নাটাকে আহার দিও। আমার ঘরের কুলুঙ্গীতে বেশম আছে।'

ঐ মনোহর পাখীটাকে নাড়া-চাড়া করিবার আকাঙ্ক্ষা সুবলের অনেক দিন হইতেই ছিল। মুরলী বাবুর ভয়ে এ পর্য্যন্ত খাঁচায় হাত দিতে পারে নাই। এমন কি অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ পায় বলিয়া খাঁচার নিকট পর্য্যন্ত যায় নাই। আজ এতখানি অধিকারে সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। হষ্টেলে ফিরিয়াই কুলুঙ্গী হাতড়াইয়া বেশম পাড়িল। তার পর খাঁচাটি বারান্দায় নামাইয়া ভিতর হইতে একটি ছোট পিতলের বাটি বাহির করিল। জল দিয়া বেশম গুলিতে গুলিতে সহসা খেয়াল হইল যে, বেশমের সঙ্গে কিঞ্চিৎ লবণ ও সরিষার তৈল সংযোগ করিলে খাদ্য আরও সুস্বাদু ও মুখরোচক হইবে। বরং এ কথাটা ভুলিয়া গেলেই হয়ত মুরলী বাবু আসিয়া তাহাকে গাধা বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন। কিন্তু অত বোকা সুবলচন্দ্র নয়! নুন-তেল থাকে বশিষ্ঠের ভাণ্ডারে সে কথা কে না জানে? বশিষ্ঠ না থাকিলেও চাবি কোথায় থাকে সে খবর সুবল রাখে। অতএব সুবল দৌড়াইয়া ভাঁড়ারে গেল। তার পর চাবি আবিষ্কার, তৈলাদি সংগ্রহ ও প্রত্যাবর্ত্তন। মাত্র তিন মিনিট সময় ইহাতে লাগিয়াছে। এত শীঘ্র কাজ হাসিল করিতে আর কেউ পারিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ফিরিয়াই সুবলের চক্ষুস্থির! খাঁচায় পাখী নাই। বারান্দায় পড়িয়া

আছে কেবল কয়েকখানি রক্তাক্ত পালক, আর অর্দ্ধচর্ব্বিত ময়না-মস্তক! রেশম-পাত্র উল্টানো, খাঁচা গড়াগড়ি। সুবলের শিরদাঁড়া বাহিয়া যেন একটা বরফের প্রস্রবণ বহিয়া গেল। রক্ত হিম হইয়া গেছে। এখনি যেন সে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইবে। বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে—ধড়াস্ ধড়্—ধড়াস্ ধড়্! আতঙ্কে শিহরিয়া সে ভাবিল,—এ কি ভৌতিক ব্যাপার? মন বলিল,—নো, নো,—দি আঙ্গোরা ক্যাট্! সুবল বিবর্ণমুখে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অস্থি-চর্ব্বণের দন্তঘর্ষণ-ধ্বনি তখনও কানে আসিতেছে তাহারি খাটের তলা হইতে। ক্রোধে সুবল দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য। এক লাফে খাটের তলায় গিয়া খপ্ করিয়া বিড়ালটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া হিড়্হিড়্ করিয়া টানিয়া বাহির করিল। তাহাকে শূন্যে তুলিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ নিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হতভাগা, পাজী, শূয়ার! বদ্মাইসের ধাড়ী! তোর জন্যে আজ আমায় বেত খেয়ে মরতে হবে। তোকে কাট্‌ব আমি'।

কিন্তু কাটিতে পারিল না। আহা। মায়ের জন্য মামা দিয়াছেন যে! তাই তাহাকে একটা মোটা রসি দিয়া খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া নন্দ-দা'র খোঁজে বাহির হইল। একমাত্র নন্দই এখন তাহাকে উদ্ধারের পরামর্শ দিতে পারে।

নন্দর নানাবিধ সুপরামর্শ সত্ত্বেও সেদিন সন্ধ্যায় সুবলের ডাক পড়িল মুরলী বাবুর খাস কামরায়। তাহার পিছনে জোড়া খুঁটির মত আসিল নন্দ ও ট্যারা সুরেশ। পুত্রের মৃত্যুতে পিতার বিষণ্ণতা লইয়া মুরলী বাবু একটি টুলের উপর চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন। বালক তিনটির শ্রীমুখ দর্শনে মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়িল। প্রচণ্ড জোরে হুঙ্কার করিলেন,—'সুবল, আমি কোন কথা শুনতে চাই না—নিয়ে এস তোমার বেড়াল।'

'নন্দ মৃদুকণ্ঠে কহিল,—'বাপ্স্। তাকে ধ'রে আনে কার সাধ্যি!'

'চোপ্‌রাও, তোমাকে জ্যাঠামি করতে হবে না। সুবল, যাও—বেড়াল নিয়ে এস।'

সুবল দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল তাহার কোলে সন্ধ্যার অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া আছে, এবং তাহার মাঝখানে দুইটা অগ্নিকুণ্ডের মত গোল চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

মুরলী বাবু বলিলেন, 'ওটাকে এই খাঁচার ভেতর পোরো।'

সুবল তাহাই করিল। তাহার সঙ্গীদ্বয় অবাক্ হইয়া এ উহার মুখে চাহিল। নন্দ কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, 'স্যর কি তবে ঐ বেড়ালটাই পুষবেন?' সুবলের কান্নার মধ্যেও হাসি পাইল।

'চোপ্! ইয়ার্কি করতে হবে না।' বলিয়া মুরলী বাবু বিড়াল সমেত খাঁচা তুলিয়া নিয়া নদীর দিকে রওয়ানা হইলেন।

এইবার ছেলেগুলির চমক ভাঙিল। বিড়ালের আসন্ন ভাগ্যে শিহরিয়া তাহাদের মুখ শুকাইল। সুরেশ এক চোখ ময়নার ছিন্ন পালকের উপর, আর এক চোখ মুরলী বাবুর দিকে স্থাপন করিয়া কহিল, 'স্যর, এ ঠিক হচ্ছে না বলে দিচ্ছি। মা ষষ্ঠীর বাহনকে ডুবিয়ে মারলে বংশ নাশ হয়।'

নন্দ বলিল, 'ও ম'রে আবার ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে কিন্তু। তখন আমাদেরও এ হষ্টেল্ ছাড়তে হবে। জানেন না সেই ভোলা নাপিতের কি হয়েছিল?......'

কিন্তু কথা বলিতে বলিতে ছেলেরাও তখন অজয় নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। চারি দিক্ থম্ থম্ করিতেছে—কেবল একটানা ঝিঁঝির সুর শোনা যায়। মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকিয়া ওঠে, হুতোম প্যাঁচারা চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে সহসা এক ডাল হইতে আর এক ডালে উড়িয়া বসে। তাহারই মাঝখানে শব্দ হইল—ঝপাং। ছেলেরা বুঝিল, সব শেষ। সুবল ভয়ে নিজের চোখে হাত চাপিয়া ধরিল। নন্দ তাহাকে ঠেলা মারিয়া বলিল, 'ওরে চল্। ও যদি না ভূত হয় ত আমার নাম নন্দলাল মুখুয্যে নয়।'

মুরলী বাবু পিছনে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া গেছেন। সুবল যাইতে যাইতে আর একবার ফিরিয়া চাহিল,—মনে হইল অজয়ের স্রোতের কল্লোল-ধ্বনির

সঙ্গে একটা অস্ফুট মিনতিময় করুণ মিউ মিউ-ধ্বনি গুমরিয়া মিশিয়া যাইতেছে, যেন সেই অগ্নিকুণ্ডের মত চোখ দুইটা কালো জলে আর একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই চিরতরে নিভিয়া গেল।

৩

কুসংস্কার বলিয়া মুরলী বাবুর কিছুই ছিল না। তবু মন কেন যেন খচ্ খচ্ করে। কালো বিড়ালটাকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছেন। যতই হোক্ হত্যা ত বটে! তিনি নরক বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহলোকেই নাকি মানুষকে নানা পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এ শিক্ষা তিনি নিজেই ছেলেদের দিয়াছেন। আগে দুপুর রাত্রিতে উঠিয়া আকাশের তারা দেখা তাঁর অভ্যাস ছিল। আজকাল আর উঠিতে সাহস হয় না, গা ছম্ ছম্ করে। কোথাও কিছু কালো দেখিলেই চম্‌কাইয়া উঠেন। এমন কি কালো রঙের চটি জুতা ত্যাগ করিয়া এইবার তিনি এক জোড়া ব্রাউন্ এলবার্ট্ স্লিপার কিনিলেন। সন্ধ্যায় একা থাকিতে আর তেমন ভালো লাগে না। অতএব সঙ্গীপ্রাপ্তির আশাতেই হউক, অথবা শিক্ষকতার অতিশয় আগ্রহেই হউক, সুবলকে ডাকিয়া সন্ধ্যার সময় পড়াইতে বসেন। ক্রমে সাহস পাইয়া নন্দর দলও কাছে ভিড়িতে লাগিল।

সেদিন সোমবার। সকালে সাতটায় আসিয়া নন্দ তাঁহার কাছে একটি অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'স্যর, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

মুরলী বাবু চমকিয়া বলিলেন, 'কেন? সে খবরে তোমার প্রয়োজন?'

নন্দ কোন মতে আধ-ফোটা হাসিটা চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, তাই শুধোচ্ছিলাম। আপনি যাই বলুন না, সেই বেড়ালটা কিন্তু সত্যিই ভূত হয়েছে। কাল রাত্রিতে আমি দেখেছি,—অবিকল সেই মিশ্‌মিশে চেহারা……'

এ সব তাঁহাকে ভয় দেখাইবার ফন্দী। জোরে ধমক দিয়া মুরলী বাবু বলিলেন, 'দেখ নন্দ, ফাজ্‌লেমি কোরো না এখানে। ভূত হয়েছে, বেশ হয়েছে—তোমাদেরই ঘাড় মটকাবে।'

ঠিক সেই সময়ে জানালার ধারে সুরেশের ছায়া আর অঙ্গুলি-সঙ্কেত। নন্দ

উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, 'সত্যি, আমরা ছোট ছেলে, বড় ভয় করে স্যর।'

সুবলের ঘরে দুই বন্ধুতে প্রবেশ করিল। সুবল এ শনিবারে মামার বাড়ী গিয়াছিল, এই মিনিট দশ হইল ফিরিয়াছে। সে প্রতি সপ্তাহান্তে বাড়ী যাইবার সময়ে কাঁধে একটি ছোট চটের থলি লইয়া যায়, এবং ফিরিয়া আসে সেটিকে মুড়িতে পরিপূর্ণ করিয়া। সাত দিন ধরিয়া তাহাতেই বৈকালিক জলযোগ চলে। আজও সেই থলি যথারীতি পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া কাহাকেও দেখা গেল না। সুরেশ বলিল, 'সত্যি সে থলি ভর্ত্তি করে এনেছে,—এবার মুড়ির সঙ্গে লাড়ু যদি না থাকে ত আমার কান কেটে ফেল্‌ব।…'

নন্দ ঘরের এধার ওধার চাহিয়াই চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, 'এই যে!' সুবলের খাটের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিল থলি।

কিন্তু ভিতরে হাত পূরিয়াই দেখে গোটা পঁচিশ সুডোল বেগুন। সুবল তখন পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। দুই বন্ধু বিষম চটিয়া বলিল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে, না? তুই যে বলে গেলি এবার মুড়ির সঙ্গে লাড়ু আনবি?'

সুবল কাঁচুমাচু মুখে বলিল, 'কি কর্‌ব, মামা যে মায়ের জন্যে বেগুন দিলেন। আচ্ছা, আসছে সপ্তাহে চেষ্টা কর্‌ব।'

লাড়ু চুরি নামক মস্ত একটা কীর্ত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুই বন্ধু মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দেখিতে পাইল না যে, তাহাদের পিছনে বক দেখাইয়া বারো বছরের সুবল মস্ত একটা ভেংচি কাটিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময়। এই সবে মাত্র লণ্ঠনটি জ্বালিয়া মুরলী বাবু একখানি গ্রামার-বই খুলিয়া পড়িতে বসিবার যোগাড় করিতেছেন। হঠাৎ মনে হইল দূরে যেন কোথায় একটা চাপা কান্নার ধ্বনি গুমরিয়া উঠিল—মানুষের কান্না নয়, বিড়ালের করুণ ক্রন্দন! ঠিক সেই স্বর! যেন অজয়ের জলরাশির তলা হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। ভয়ে তাঁহার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। পরক্ষণেই ভাবিলেন, বিড়াল ত দুনিয়ায় আরও অনেক আছে, কত বিড়াল-

শাবকই ত ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া কান্নাকাটি করে। তাঁহার নিজেরই হাসি পাইল। তথাপি বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে।

নন্দ একা আসিল অঙ্ক কষিতে। বলিল, 'সুবলের শরীর ভালো নেই, শুয়ে শুয়ে ট্রান্স্লেশান্ করছে।' মুরলী বাবুর শুষ্ক গলায় বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি নীরবে দুইটা অঙ্ক কষিতে দিয়া নিজে গ্রামার-বই পড়িতে লাগিলেন।

সহসা শব্দ হইল—ঝুপ্! চমকিয়া মুরলী বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হইয়া উঠিল,—থর থর করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, চোখ দুইটা যেন কোটর হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে, মুখে আর রক্তের লেশ মাত্র নাই। পাষাণ-প্রতিমার মত তিনি রকের দিকে চাহিয়া আছেন—আব্ছা আলোকে এক ছায়া-মূর্ত্তির পানে। তেমনি ভীষণ মিশ্মিশে কালো, তেমনি বিকট হিংস্র! সেই কালো বিড়াল! যেন এখনই অজয়ের স্রোত হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া আসিয়াছে প্রতিহিংসার রুদ্র-মূর্ত্তিতে!

নন্দও শিহরিয়া উঠিল।—বলিল, 'ও কি স্যর! ও যে ভূত!—আমি ত বলেছিলাম।—'

নন্দর আর কথা বাহির হইল না। তাহার পরিহাসের ভূত যে সত্যই তাহাকে দেখা দিতে আসিবে, এ কথা কে জানিত?

সত্যই কি ইহা বিড়াল, না চোখের ধাঁধা?—কল্পনার প্রেতমূর্ত্তি? কিন্তু ঐ যে সে ছায়া ক্রমেই সজীব হইয়া ওঠে, ঐ যে সে সম্মুখের দুই থাবা বাড়াইয়া দিয়া, পিছনে ল্যাজটিকে খাড়া করিয়া ফেলে,—যেন এখনই লাফ দিয়া মুরলী বাবুর টুঁটি চাপিয়া ধরিবে; যেন তীক্ষ্ণ নখরে তাঁহার কণ্ঠ-নালী কাটিয়া, ছিঁড়িয়া, হাড়গুলাকে চিবাইয়া চিবাইয়া মহানন্দে রসপান করিবে! কী বীভৎস দৃশ্য!

তার পর সেই বিড়ালাকৃতি প্রেতমূর্ত্তি সত্যসত্যই ডাকিয়া উঠিল,—'ম্যাও!' কী অদ্ভুত সে স্বর, কী সাংঘাতিক সত্য! 'ও নন্দো-ও-ও—' বলিতে বলিতে মুরলী বাবু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নন্দ তখন খাটের তলায়।

হয়ত খাট হইতে গড়াইয়া একেবারে মেঝের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেন,

কিন্তু সুবল ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যখন তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন চোখ মেলিয়াই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, দুই জন পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। ভাবিলেন, ব্যাপারটা তিনি যতখানি ভীতিপ্রদ মনে করিয়াছিলেন, হয়ত ততটা নয়। কি যেন একটা রহস্য আছে! কী যেন প্রচ্ছন্ন আমোদ ছেলেরা উপভোগ করিতেছে! মনে মনে লজ্জিত হইলেন, ছেলেদের সাম্নে এতখানি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই।

নন্দ বলিল,—'স্যর, ওটা ভূত নয়, সত্যিই আর একটা বেড়াল,—সেই আগেকারটার যমজ ভাই, সুবল আজই ওর মায়ের জন্যে নিয়ে এসেছে বেগুনের থলিতে পূরে। সেটাকে আপনি ডুবিয়ে দিলেন, তাই ওর মামাবাবু দ্বিতীয়টাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

মুরলী বাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'তবে তুমি আমাকে বল নি কেন তখন?'

—'আজ্ঞে, আমি কি জান্তাম ছাই!' বলিয়া নন্দ মাথা চুলকাইতে লাগিল।

সে যে সত্যই একথা জানিত না, সুবল যে তাহার উপরেও টেক্কা দিয়াছে, মুরলী বাবুর ইহা বিশ্বাস হইল না। তিনি পাশ ফিরিয়াই দেখিলেন, সুবল সেই কালো বিড়ালটিকে কোলে করিয়া দিব্যি আদর করিতেছে। সেটি কেমন মধুর আরামে চুপটি করিয়া শুইয়া আছে!

সুবল বলিল, 'স্যর, এটা নটাদের গোহালে বাঁধা ছিল, কখন আপনার ঘরে ইঁদুরের সাড়া পেয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে—'

মুরলী বাবুর পাংশু মুখে একটি মৃদু হাসির ক্ষীণরেখা ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

কিন্তু এ কথা শোনা যায় যে ইহার পর মুরলী বাবু ক্লাশে "দি ক্যাট্" বিষয়ে রচনা লেখাইবার সময়ে প্রায়ই একটি বাক্য দিতেন—'দি আঙ্গোরা ক্যাট্ ইজ্ এ ডেন্জারাস্ টাইপ্' (আঙ্গোরা-দেশীয় বিড়াল অতি ভয়ানক)।

আজকে ছুটি চাই

(শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ)

গুরুমশাই, আজকে পড়া লাগছে না আর ভালো,
আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছে, ধূসর দিনের আলো।
মেঘের দলে ভিড় জমেছে, খেলছে কতই খেলা
পাঠশালাতে টি঑কছে না মন কালবোশেখীর বেলা;
আজ দিদিমার গল্প কত শুনবো ঘরের কোণে
পড়ার সময় সেই কথাটি পড়ছে কেবল মনে;
দোহাই ওগো গুরুমশাই, আজকে ছুটি চাই,
এক দৌড়ে ফিরবো ঘরে—আজকে তবে যাই?

টুপটুপাটুপ্ পড়বে ঝরে আমের মুকুল পথে,
আমরা সবাই কোঁচড় ভরে ফিরব সেখান হ'তে;
শালিখ ছানা পড়বে কত কালবোশেখীর ঝড়ে
আমরা তাদের খাঁচার ভেতর রাখবো যতন ক'রে;
ঐ দেখ না দস্যি যেন বইছে হু হু হাওয়া—
নামতাতে তাই বসছে না মন, আজকে যে চাই যাওয়া;
দোহাই ওগো গুরুমশাই, তোমার পড়ি পা'য়,
ঝড়ের দিনে এমন মজা আসবে না আর হায়!

কালকে থেকে সাহিত্য আর নামতা ভূগোল যত
মুখস্থ আর হাতের লেখা করবো নিয়ম মত।
আজকে শুধু দাওগো ছুটি একটি দিনের তরে
মেঘলা ধূসর আকাশ দেখে মন যে কেমন করে;

নতুন নতুন গল্প বলায় নেই দিদিমার জোড়া—
পঞ্চদল আর সহস্রদল, পক্ষীরাজের ঘোড়া,
রূপবতী রাজকন্যা পাতালপুরীর মাঝে
ঘুমায় অঘোর; রাক্ষসীরা আসবে আঁধার সাঁঝে।

শুনবো কত ভীষণ ভীষণ রাক্ষসেদের খেলা,
ঝাঁকড়া মাথা অশথ-বনে ভূতপেত্নীর মেলা;
শুনবো মোরা চুপটি করে বিছানাটিতে শুয়ে,
বৃষ্টিধারা ঝরবে অঝোর মেঘলা আকাশ ধুয়ে।
আমার মনে জাগবে—করে রাজপুত্রের মত
রাক্ষসীদের কাটবো মাথা ঘোড়ায় চড়ে কত?
দোহাই ওগো গুরুমশাই, আজকে ছুটি চাই,
শান্ত হ'য়ে ফিরবো ঘরে—আজকে তবে যাই?

রজত-জুবিলী

সম্প্রতি কয়েক দিন হইল সমস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্য যুড়িয়া মহা সমারোহে যে জুবিলী উৎসব হইয়া গেল তার খবর তোমরা ভাল করিয়াই জান। এই জুবিলীর নাম রৌপ্য জুবিলী অর্থাৎ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকাল পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায় এই উৎসব। ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক বছর আগে—(তোমরা কেউই তখনও হও নাই) আর একবার বৃটীশ সাম্রাজ্য যুড়িয়া এই ধরণের উৎসব হইয়াছিল—তখন সাম্রাজ্ঞী ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সে জুবিলীর নাম ছিল হীরক-জুবিলী অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় সে উৎসব হইয়াছিল।

বৃটীশ সাম্রাজ্য বড় কম নয়—পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ। কবির ভাষায়—"যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনো অস্ত নাহিক' যায়।" কাজেই এই জুবিলী

উৎসব যে খুব ঘটা করিয়াই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তা ছাড়া সম্রাট্ জর্জ্জ্ বড়ই জনপ্রিয়—রাজোচিত অনেক সদ্‌গুণে বিভূষিত। সম্রাটের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে তোমাদের একটু শুনাইতেছি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন্ রাজকুমার জর্জ্জের জন্ম হয়। রাজকুমার জর্জ্জ্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের বড় ছেলে ছিলেন না, তাঁর বড় আর একটি ভাই ছিলেন; কাজেই তাঁর রাজা হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য ভাবী রাজার জন্ম হইলে রাজ্যে যে রকম উৎসবটা হয় রাজকুমার জর্জ্জের বেলা ততটা হয় নাই।

সম্রাট্ (৫ বছর বয়সে)

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অত বড় রাজার ছেলে, তাঁর ছেলেবেলাটা না জানি কি আরামেই কাটিয়াছে! কিন্তু রাজকুমার জর্জ্জ্ মোটেই সে ভাবে পালিত হন নাই—অত্যন্ত সাধাসিধা ভাবে তিনি মানুষ হইয়াছেন, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালকসুলভ চাপল্য—গাছে চড়া, সাঁতার কাটা—সবই করিয়াছেন; দুষ্টুমি করিলে তোমার-আমার মতই শাস্তি পাইয়াছেন। তোমাদের মধ্যে অনেকে ডাকটিকেট সংগ্রহ করিতে ভালবাস—রাজকুমার জর্জ্জেরও ডাকটিকেট সংগ্রহ করা একটা মস্ত বাতিক ছিল।

একটু বড় হইলে রাজকুমার জর্জ্জ্ ও তাঁর দাদা এল্‌বার্ট্ ভিক্টরকে ব্রিটানিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—নাবিকের কাজ শিখিতে। নাবিকের কাজে রাজকুমার জর্জ্জের ভয়ানক উৎসাহ ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁর শিক্ষককে বলিতেন—"দাদা তো ভবিষ্যতে রাজা হবে, ওর জন্য অত মাথা ঘামিয়ে কি লাভ ? আমাকে ভাল ক'রে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে দিন—আমি বড় হয়ে সারা জীবন জাহাজেই কাটাব।" নাবিক অবস্থায় তাঁরা সাধারণ নাবিকের মতই থাকিতেন—সেই রকম কঠোর

পরিশ্রম করিতেন, কয়লা ঘাঁটিতেন, রাজার ছেলে বলিয়া তাঁদের কোন রকম তফাৎ করা হইত না। একবার কি একটা ব্যাপারে শাস্তি স্বরূপ রাজকুমার জর্জ্জ্‌কে সাত দিনের জন্য কোনও ছুটী দেওয়া হয় নাই—তিনি উপরওয়ালার সে আদেশ হাসিমুখে পালন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একখানা জাহাজ পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হয়, রাজকুমার জর্জ্জ্ ও তাঁর দাদা এই জাহাজে নাবিক হইয়া পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ঘুরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে রাজকুমার এল্‌বার্ট্ ভাবী রাজা হইবার জন্য তৈরী হইতে কেম্ব্রিজ চলিয়া গেলেন, রাজকুমার জর্জ্জ তখনও নাবিকের কাজে হাত পাকাইতেছেন—ক্রমে তিনি 'থ্রাস' নামে একখানা জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হইলেন।

নাবিকবেশে রাজকুমার জর্জ্জ্

১৮৯২ সনে এক দারুণ অঘটন ঘটিল। রাজকুমার এল্‌বার্ট্ হঠাৎ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। রাজকুমার জর্জ্জ্‌কে ফিরিয়া আসিতে হইল—তাঁর নাবিক-জীবনও শেষ হইল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরীর সহিত রাজকুমার জর্জ্জের বিবাহ হইল। তার কয়েক বছর পরে ১৯০১ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইল, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ হইলেন রাজা, রাজকুমার জর্জ্জ হইলেন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ (যুবরাজ)।

১৯০৫ সনে যুবরাজ জর্জ্জ্ একবার ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন। তার পর ১৯১০ সনে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে যুবরাজ জর্জ্জ্

ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু তিনি তো শুধু ইংলণ্ডের রাজা নন, ভারতেরও সম্রাট্, তাই ১৯১১ সনে তিনি মহারাণী মেরীকে লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের বিখ্যাত দরবারের কাহিনী তোমাদের বাড়ীর একটু বয়স্ক লোক মাত্রেই ভাল করিয়া জানেন।

ইহার পর সব চেয়ে বড় ঘটনা ১৯১৪ সনের পৃথিবীব্যাপী মহা সমর। সম্রাট্ এই যুদ্ধে প্রজাদের সঙ্গে নিজের দুই ছেলেকেও পাঠাইয়াছিলেন। নিজেও তিনি মহারাণী ও রাজকন্যাকে লইয়া আহত, দুঃস্থ সৈনিকদের সাহায্যের জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ নিজগুণে শুধু তাঁর নিজের প্রজাদের নয়, অন্যান্য দেশের লোকেদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁর রাজত্বের এই জুবিলী উৎসবে তাই আজ সমস্ত পৃথিবীই আনন্দিত—উল্লসিত।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

'এগ্‌জামিনে'র পরে

(কুমারী সুজাতা গুপ্ত)

(১)

একটা কথা বলি শোন "রামধনু" গো ভাই,
মোর খুসীর ঝরণা মনের কোণে পাচ্ছে নাকো ঠাঁই।

তাই তো তোমায় আপন জেনে
খাতা, কলম, ছন্দ এনে
মনের কপাট খুলে তোমায় সব জানাতে চাই ;
শোন "রামধনু" গো ভাই।

(২)

পরীক্ষা মোর হয়ে গেল উনিশে "মার্চ্"-এ
এখন আমি "য়্যাজ্ ক্রি য়্যাজ্ এয়ার" হলাম যে।
"ডেসিমেল" আর "ফ্যাক্টর" ছেড়ে
দিবানিদ্রা লাগাই তেড়ে,
"আইভ্যান্‌হো য়্যাণ্ড্ আদার" পড়া বন্ধ "ক্রম্ টুডে,"
এখন আমি "য়্যাজ্ ক্রি য়্যাজ্ এয়ার" হলাম যে!

(৩)

জীবন আমার নতুন হ'ল—আকাশ বাতাস সবি,
সারা জগৎ আমার চোখে লাগ্‌ছে যেন ছবি।
কভু নাচি ঘুরে ঘুরে,
কভু বা গান দিচ্ছি জুড়ে—
কভু হাসি হি হি ক'রে, হচ্ছি ভেবে কবি ;
জীবন আমার নতুন হ'ল—আকাশ বাতাস সবি।

(৪)

যাবার বেলা একটি কথা যাচ্ছি ব'লে আমি
"এন্‌জয়মেণ্ট্" মোর "মার্ডার" হবে না এলে ভাই তুমি।
চিরদিনটি সাথী ভেবে
মনে রেখো ; আসি তবে,
দীর্ঘ জীবন চেয়ে তোমার দেব্‌তা-পদে নমি,
যাবার বেলা এই কথাটি যাচ্ছি বলে আমি।

ছোটদের চিত্রশালা

উপরে—আলিপুর চিড়িয়াখানার একটি দৃশ্য

নীচে—উইলিংডন্ সেতু, বালী

আলোকচিত্র-গ্রহীতা—
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

রঙ্গ-কণা

(শ্রীপাঁচুগোপাল ঘোষ)

শিক্ষক—কিরে, ক্রিকেট ম্যাচের 'এসে' লেখা হ'ল ?

ছাত্র—না স্যর।

শিক্ষক—আচ্ছা, আরও পাচ মিনিট সময় দিলুম।

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ছাত্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর কি লিখিল এবং বলিল—স্যর হয়েছে।

শিক্ষক—কি, পড় ?

ছাত্র— বৃষ্টি হচ্ছে, আজ আর খেলা হবে না।

চিঠি-পত্র

"বৈশাখের রামধনুতে প্রকাশিত ধাঁধাটি গত ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসের মৌচাকে 'ভাগাভাগি' নামে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে বাহির হইয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীঅধীরচন্দ্র রায়ের মতামত কি জানাইলে সুখী হইব।"

—জনৈক গ্রাহিকা

[আরও কয়েক জন গ্রাহক-গ্রাহিকা আমাদের নিকট অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। আশা করি শ্রীঅধীরচন্দ্র রায় আগামী বারে ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবেন।

—রাঃ সঃ]

সন্দেশ

জাপানে আজকাল এমন সব শক্তিশালী কাপড়ের কল ব্যবহার করা হয় যা দিয়া ৫ হাজার গজ কাপড় বুনিতে মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টা সময় লাগে।

* * *

পৃথিবীতে প্রায় এক হাজার আগ্নেয়গিরি আছে, তার মধ্যে মাত্র ত্রিশটি জীবন্ত—অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাত করে।

* * *

ভারতবর্ষে মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেগুলি এই—কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, ঢাকা, এলাহাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, আলিগড়, কাশী, নাগপুর, মহীশূর, ওসমানিয়া, রেঙ্গুন, অন্ধ্র, আন্নামালী।

* * *

লর্ড ডালহৌসীর সময় হইতে আমাদের দেশে রবিবার ছুটীর দিন বলিয়া ধরা হয়।

আমাদের দেশে প্রথম রেল লাইন খোলা হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। সে লাইন ছিল ১২০ মাইল লম্বা—কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ। তখন ট্রেনে এই পথটুকু যাইতে সময় লাগিত সাত ঘণ্টা।

* * *

লিখিতে পড়িতে জানে এমন লোকের সংখ্যা এখন—জাপানে শত করা ৯৭·৮ জন, ইংলণ্ডে শত করা ৯৭·৫ জন, আমেরিকায় শত করা ৯৪·৪ জন, বাঙ্গালায় শত করা ৯·৭ জন।

* * *

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে "ব্ল্যাক্ উইডো" নামে এক রকম বিষধর মাকড়সার উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের কামড় খাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ডাক্তারেরা এর বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

আল্-হজ্ সেখ জালাল কোয়ারেসি নামে এক জন ভদ্রলোক নানা রকম গন্ধদ্রব্য তৈরীতে বিশেষজ্ঞ। তাঁর ঘ্রাণশক্তিও নাকি অদ্ভুত। এত অদ্ভুত যে তিনি নাকি তাঁর নাক দু' হাজার পাউণ্ডে বীমা করিয়া রাখিয়াছেন।

—রাঃ সঃ

* * *

নানা দেশ হইতে যে সব বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য গত বৎসর বিলাতে আমদানী হইয়াছে তাহার বাবদ 'ডিউটী' আদায় হইয়াছে মোট তিন কোটী বত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার তিন শ' পাউণ্ড।

* * *

এ বৎসর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসে ১৬৪ খানি জাহাজ জলে ডুবিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪০ জন লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। এই ১৬৪ খানি জাহাজের মধ্যে ৬৫ খানি জাহাজ বৃটীশদের অধিকৃত।

* * *

অন্ধদিগের শিক্ষাবিধানের উদ্দেশ্যে এক রকম টকি-বই তৈরী হইয়াছে—দশখানি রেকর্ডে এই বই সম্পূর্ণ। রেকর্ডের প্রতি পিঠ চলে আধ ঘণ্টা ধরিয়া। এই দশখানি রেকর্ডে নব্বই হাজার বাক্যসম্বলিত এক-একখানা বই অনায়াসে সঙ্কুলান হয়।

শ্রীরামপ্রসাদ সিং

* * *

বিলাতে 'কুইন মেরী' নামে একটা প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে বারোটি ডেক থাকবে। তার মধ্যে একটা ডেক ৭৫০ ফিট লম্বা।

* * *

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে নাকি প্রত্যেক দিন প্রায় ১৬০০০ খানা চিঠির শুভাগমন হয়। এই সব চিঠি পড়ে তার জবাব দেওয়া যে কি ভীষণ ব্যাপার তা বোধ হয় একটু আন্দাজ করাও কঠিন।

শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

* * *

চীন দেশে একটা খুব ছোট (?) অভিধান লেখা হয়েছে। তা'তে পাতা আছে মাত্র ৯১৭০০০টী এবং শব্দ আছে মোটে ৩৬৭০০০০০০টী। ছাপার খরচ দারুণ হবে বলে মাত্র তিনখানা কপি হাতে লেখা হয়েছে।

শ্রীঅতুলানন্দ দাশগুপ্ত

স্থানাভাবে এ মাসে "সোনার হরিণ" প্রকাশিত হইল না, ভবিষ্যতে যাহাতে নিয়মিত ভাবে বাহির হয় তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রতিবেশীর কাছ থেকে আর একটি ঘোড়া চেয়ে আনতে হবে, তা' হ'লে সব শুদ্ধ ২০টা ঘোড়া হ'ল। এখন, বড় ছেলে পাবে $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ ১০টা ঘোড়া, মেজ ছেলে $\frac{1}{4}$ অর্থাৎ ৫টা এবং ছোট ছেলে পাবে $\frac{1}{5}$ অর্থাৎ ৪টা ঘোড়া—সব শুদ্ধ ১৯টা হ'ল। এবার বাকী ঘোড়াটা যার তাকে ফিরিয়ে দিলেই আর কোন গোল থাকে না।

উত্তরদাতাদের নাম

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্); স্মৃতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্); শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর); বিমল, অমল, কমল মিত্র (বারাকপুর); নারায়ণ, বিজয়, সোমনাথ (পুরুলিয়া); সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ফেণী); অধীররঞ্জন দে (চুঁচুড়া); নির্ম্মলকুমার দাস (ক্লাক্ স্ট্রীট্); গৌরীপ্রসাদ রায় (চাইবাসা); প্রশান্ত ও মালবিকা (বক্তিয়ারপুর); ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন—চট্টগ্রাম); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী (মালদহ) শোভন, অমল, অরুণ প্রভৃতি (ভাগলপুর); গুণদা ও পূর্ণদাপ্রসাদ (দিল্লী); মলয় ও মুকুল আঢ্য, অনিন্দ্য (কর্ণেলগোলা); রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র প্রভৃতি (মধুবাণী); প্রফুল্ল হাজরা, বিমল, অশোক প্রভৃতি (মধুপুর); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী প্রভৃতি (জামালপুর); শম্ভুনাথ [illegible], বুলি, ময়না (ভাস্তারা); নিখিল চৌধুরী ও সুনীল বিশ্বাস (জলপাইগুড়ী); অরুণকুমার গোস্বামী, অশ্বিনী, অমিয় প্রভৃতি (বাণীগ্রাম); বিদ্যুৎ, অম্বু ও উমা (ছাপরা); নীলাদ্রিশেখর, শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রভৃতি (মজঃফরপুর); সান্ত্বনা, সুশোভন ও অজয় (বালীগঞ্জ); মণি দাস (উত্তর লক্ষ্মীপুর); নবকুমার কুণ্ডু, সুধীর, বঙ্কিম প্রভৃতি (কালনা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); নৃপেন্দ্রকুমার সেন রায় (কামারজানি); অনিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট); সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিপাঠাগারের সভ্যগণ (পানিহাটী); লিপি মুখোপাধ্যায়, লেখা মুখোপাধ্যায় (যোধপুর); শচীন্দ্রচন্দ্র সেন (ভবানীপুর); জেবউন্নিসা, খালেদা, জয়নাল আবেদিন (জামালখাঁ); অনিমেশচন্দ্র দাশ (কুমিল্লা); রামপ্রসাদ, কাটু, সুধীর প্রভৃতি (বেহালা); ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া—হুগলী); পুষ্প, যূথিকা, অরুণ মজুমদার (কলিকাতা); অনিল ও অরুণ (রাজসাহী); বাসন্তী পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শ্রীরামপুর); নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (শিলং); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (সুন্দরঘাট); শৈলেশ, আনন্দ, নিখিল

(জলপাইগুড়ী); নিরু, প্রভা, বিভা, উষা (জলপাইগুড়ী); গণেশচন্দ্র কুনাল (মেমিও); দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গজারিয়া); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); বাণীমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মূড়াগাছা); রামপ্রসাদ, কাটু, সুধীর প্রভৃতি (বেহালা), বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর); আবতুল মতিন (কুমিল্লা); সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাতিহাল); ছবিরাণী রায় (নিউদিল্লী); রাজেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); সরস্বতী দেবী (হাজারিবাগ); অমিতাভ, স্নেহমুকুল, বুলবুল (কুতুবপুর); সাধনা দাস (মধুবনী); অশোকরাণী মিত্র (কলিকাতা); অমল, খোকা, প্রতুল গুপ্ত প্রভৃতি (মালদহ); অংশু, সুশান্ত, শান্তিকুমার প্রভৃতি (সাধনপাড়া); পারুল গুহ (কলিকাতা); সন্তোষ বসু (রাণাঘাট); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যগণ (সালকিয়া); জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); নবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া); নন্দতুলাল ঘোষ (কুসুগুা); নীলু ও অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরাইল); বলরাম দে, হরিপদ, খগেন্দ্র; ধীরেন্দ্র, অমরেন্দ্র সত্যেন্দ্র; ননীগোপাল, অবনী (মালখানগর); অমল, ভোলা, বিমল প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); হীরেন্দ্র, হিরণ, হেমেন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি (ভবানীপুর); শান্তি, মান্তি, কাটু প্রভৃতি (সীতামাঢ়ি); ছবিরন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মাথাভাঙ্গা); অমিয়কুমার ঘোষ, অজিত, হরিসাধন প্রভৃতি (রাণাঘাট); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)।

নূতন ধাঁধা

(Cross word puzzle)

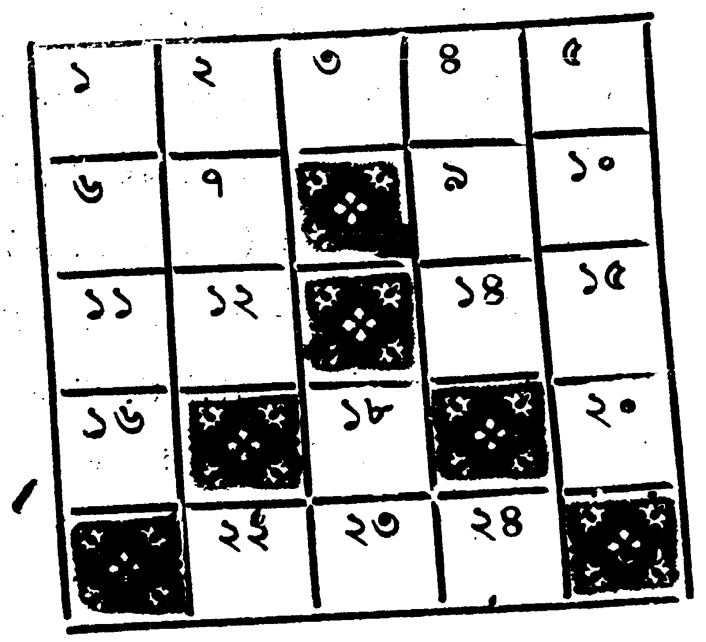

পাশাপাশি

১—৫ অপর্য্যাপ্ত
৬—৭ পক্ষের এক ভাগ
৯—১০ প্রাণী বিশেষ
১১—১২ পক্ষী বিশেষ
১৪—১৫ শস্য বিশেষ
২২—২৪ সূর্য্য

উপর—নীচে

১—১৬ বিশালাকৃতি
২—১২ পান্থ
৪—১৪ অনুনয়
৫—২০ পদার্থের একটি অবস্থা
১৮—২৩ সরীসৃপ বিশেষ

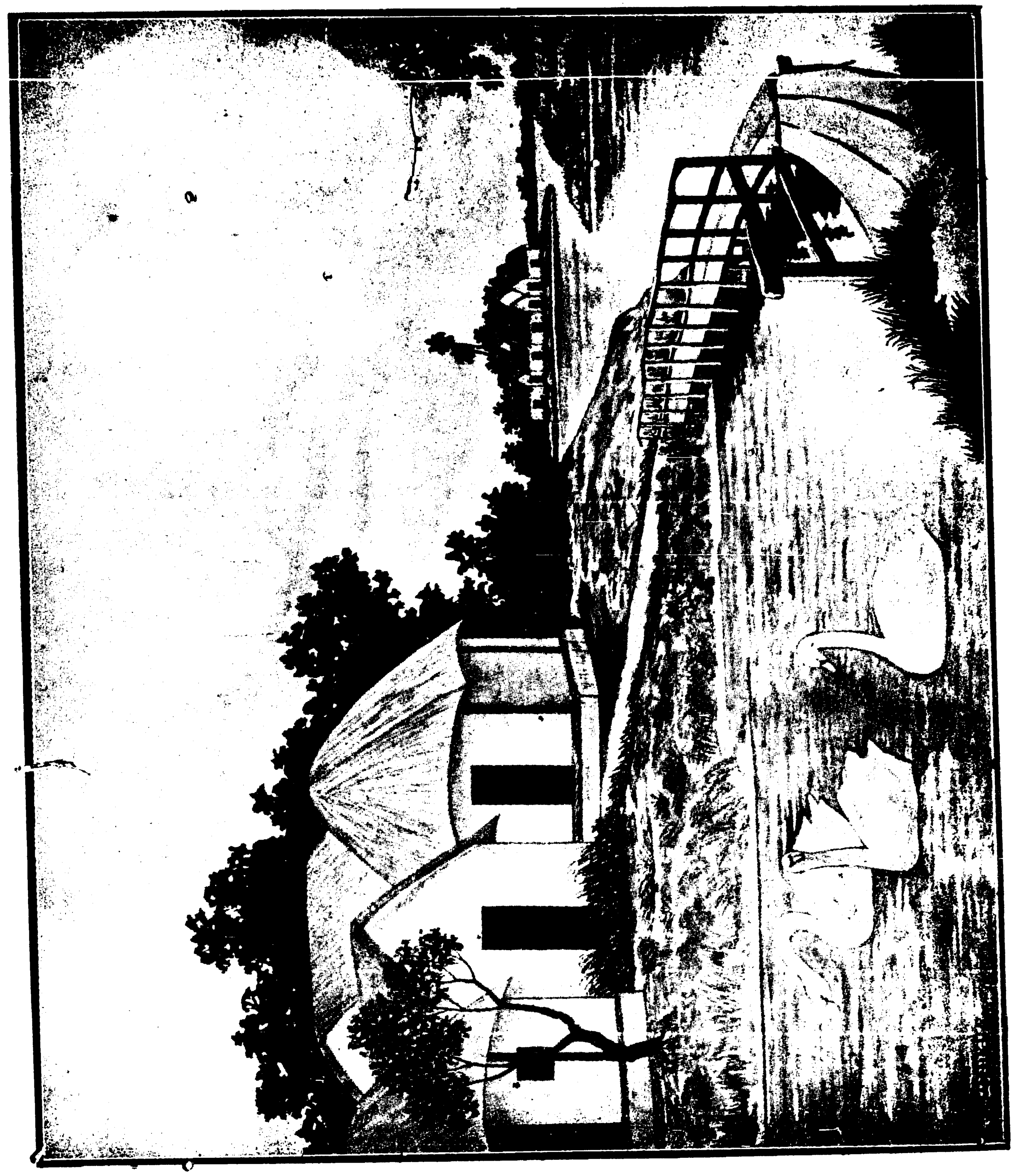

পল্লী-শ্রী

শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ মিত্র

৮ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

খোকনমণি

(শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ)

দুষ্টুর শিরোমণি
ঝগড়ায় ওস্তাদ,
বায়নার শেষ নেই
চীৎকারে বাড়ী মাৎ।

শুধু এক ভালবাসে
ঠাকুমার কোলটি,
পেত্নীর গল্পেতে
মুখে নেই বোলটি।

বর্ষায় শুন্‌লেই
বৃষ্টির ঝুপ্‌ঝাপ্‌,
মা'র কোলে খোকামণি
অম্‌নিই চুপচাপ্‌

আধ আধ কথা কয়
ঠোঁট দু'টি রক্তিম
মর্ত্ত্যের পারিজাত
স্বর্গের পিদ্দিম্‌।

"বল না গো থাকুমা
কোথা লাজকন্যা ?"
প্রশ্নের শেষ নেই
ব'য়ে যায় বন্যা।

স্বরগের ইঙ্গিত,
ভাসা দু'টি চক্ষে
সীমাহীন কল্পনা
জাগে ছোট বক্ষে।

ভয় পেয়ে আঁৎকায়
ঘুমে করে দেয়ালা
চুম্বনে নেশা লাগে
যেন মধু-পেয়ালা!

আকাশের চাঁদ এসে
টিপ্‌ দিয়ে যায়রে,
খোকাধন আমাদের
তবে দুধ খায়রে!

কত কথা বলে যায়
কে বুঝিবে অর্থ ?

মধুমাখা ভাষা করে
মুখরিত মর্ত্ত্য।

দিনরাত দেখে হিয়া
মানে নাকো তৃপ্তি,
চোখে মুখে ভাসে তা'র
অপরূপ দীপ্তি!

বুকে করে নিলে যেন
প্রাণ যায় জুড়িয়ে
ধরণীর দুখ-জ্বালা
দেয় যে রে ভুলিয়ে।

মা'র কোলে খোকনের
দেখেছ কি স্ফূর্ত্তি!
যশোদার কোলে যেন
গোপালের মূর্ত্তি!

অকপট চোখ দু'টি
যেন কালো ভোম্‌রা!
এতখানি সরলতা
দেখেছ কি তোম্‌রা ?

একখানি ছন্দ সে
একখানি গীতিকা!
ছোট ছোট বাহু দু'টি
যেন চারু লতিকা!

হে ঠাকুর, খোকামণি
তোমারি গো সৃষ্টি,
যেন কভু শত্রুর
লাগে নাকো দৃষ্টি।

ঢেকে রেখো তা'রে তব
অক্ষয় বর্ম্মে,
তুলো নাকো হাহাকার
জননীর মর্ম্মে।

বিজ্ঞাপন

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

যজ্ঞেশ্বর নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে, সহরের হালচাল তার মোটেই জানা নাই। কিন্তু নাই বলিলেই তো আর চলে না, লোকে যে শুনিলে হাসি-টিটকারিতে অস্থির করিয়া তুলিবে। তাই এ অপবাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার সঙ্কল্প লইয়া সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে একবার নগর-ভ্রমণে বাহির হইল। ট্রাম-রাস্তার মোড়ে গিয়া দেখে একটা বাড়ীর ছাদে ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখান হইতেছে। পাড়াগাঁয়ে কোথাও ম্যাজিক-লণ্ঠন হইলে আশপাশের গ্রামশুদ্ধ সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িত অথচ, যজ্ঞেশ্বর লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইল, এখানে একটি লোকও দাঁড়াইয়া দেখিতেছে না। কাজেই, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞেশ্বর বোকা সাজিবার ভয়ে সেখানে দাঁড়াইতে সাহস পাইল না, ধীরে ধীরে 'বাসে'র উদ্দেশে আগাইয়া গেল। কিন্তু বাসে প্রচণ্ড ভিড়। অগত্যা সে একখানি প্রথম শ্রেণীর ট্রামেই উঠিয়া বসিল।

উঠিয়া দেখে, বাঃ, কি চমৎকার! গাড়ী বলিয়া তো মনে হয় না—তাদের পাড়ার ব্যারিষ্টার সাহেবের বৈঠকখানা যেন! কেমন সোফার মত গদীওয়ালা বসিবার জায়গা, মাথার উপর বোঁ বোঁ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে!—দেয়ালে কত রং-বেরংএর ছবি আঁটা—তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'-এক লাইন ইংরাজীতে

লেখা—বোধ হয় ছবিরই পরিচয়। যজ্ঞেশ্বর ইংরাজী জানে না, কাজেই তার মানে বুঝিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে ট্রাম ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। যজ্ঞেশ্বর অবাক্ হইয়া দেখিল একটা বাড়ীর ছাদের উপর আলো দিয়া কি চমৎকার সাজাইয়াছে! আলোগুলি একবার জ্বলিতেছে, একবার নিভিতেছে। একটু নজর করিয়া দেখিতে আরও জানা গেল আলোগুলি শুধু আলোই নয়, আলো দিয়া নানা রকম লেখা হইয়া যাইতেছে—এমন কি ছবি শুদ্ধ। ব্যাপার কি! জ্যৈষ্ঠ মাস, অর্থাৎ কালীপূজার দিনও নয়, ওদিকে সম্রাটের জয়ন্তী-উৎসবও অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে একি কাণ্ড!

রাত্রে খাওয়ার মজ্‌লিসে যজ্ঞেশ্বর তার সদ্যলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিল—ম্যাজিক-লণ্ঠন, ট্রামের ভিতরকার রকমারি চিত্র, অকালের দেয়ালী উৎসব—কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্য, শুনিয়া কেহই অবাক্ হইল না, বরঞ্চ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বাড়ীর কর্ত্তা বুঝাইয়া দিলেম ও ম্যাজিক-লণ্ঠন, ট্রামের ছবি, আলো—আর কিছুই না, সবই নানা জিনিষের বিজ্ঞাপন। এখানে আজকাল ঐ ভাবেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

যজ্ঞেশ্বর যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। বিজ্ঞাপন? বলে কি? বিজ্ঞাপন কা'কে বলে তা কি আর সে জানে না? বাংলা খবরের কাগজে কত দেখিয়াছে। পঞ্জিকারও তো বারো আনাই বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপনের ছবি তার মধ্যে সে অনেক দেখিয়াছে। সে ছবি বাহির হইতে দেখিলে কিসের ছবি কিছুই বুঝা যায় না, বুঝিতে হইলে তলার লেখাগুলি ভাল করিয়া পড়িতে হয়। তলায় যদি সালসা-জাতীয় কোনও ওষুধের কথা লেখা থাকে তবে বুঝিতে হইবে ছবিটি কোনও পালোয়ানের; ঘি কিংবা মাখন কিংবা ঐ রকম কোনও গব্য পদার্থের কথা লেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে ছবিটি গো-মাতার; আর কোনও মাথার তেলের কথা লেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে ছবিটি কোনও কেশবতী রাজকন্যার—ঐ তেল মাখিয়া তাঁর অত বড় চুল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের ছবি সে চেনে না! অমন সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান রঙ্গিন ছবি—যার একখানা তাদের গ্রামের বাড়ীর বৈঠকখানায়

টাঙ্গাইয়া রাখিলে গাঁ শুদ্ধ লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিবে তাহাই কিনা একটা তুচ্ছ বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হইয়াছে! নাঃ, এ আজব সহরই বটে। আর আলোর কথা! অমনি করিয়া বিজ্ঞাপনের খাতিরে কেউ নাকি বারোমাস দেয়ালী-উৎসবকেও হার মানাইয়া দিতে পারে! নাঃ, যজ্ঞেশ্বর চোখে দেখিলেও এ কথা বিশ্বাস করিতে রাজী নয়।

তোমরা হয় ত মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছ এবং বেচারা যজ্ঞেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছ কিন্তু আমি যদি তোমাদের কাহাকেও লইয়া আমেরিকার কিংবা ইয়োরোপের কোনও আধুনিকতম সহরের মধ্যে ছাড়িয়া দিই, তবে তার অবস্থাও বোধ হয় যজ্ঞেশ্বরের চেয়ে বেশী সুবিধার হইবে না।

রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছ, হঠাৎ দেখিলে হাউই বাজীর মত কি একটা জিনিষ আকাশে উড়িয়া গেল। পরক্ষণেই দেখিলে খণ্ড খণ্ড হইয়া তা হইতে আলোর ফুল ঝরিতেছে এবং সে ফুলে একটা বড় দোকানের নাম লেখা হইয়া গেল। ছাদে বসিয়া আছ, হঠাৎ দেখিলে দূর আকাশে মেঘের গায়ে যেন একটা তীব্র সার্চ্চ্ লাইট্ গিয়া পড়িয়াছে। একটু পরেই, দেখিলে মেঘের গায়ে আলো দিয়া লেখা বিরাট্ বিরাট্ অক্ষরে বিজ্ঞাপন লেখা হইতেছে। তার এক-একটা অক্ষর প্রায় ১৫০' ফিট্ লম্বা, আর যে মেঘের গায়ে লেখা পড়িতেছে সে মেঘও মাটী হইতে ৬।৭ হাজার ফিট্ উঁচুতে। কোথায় লাগে দেয়ালী-দিনের বাজী!

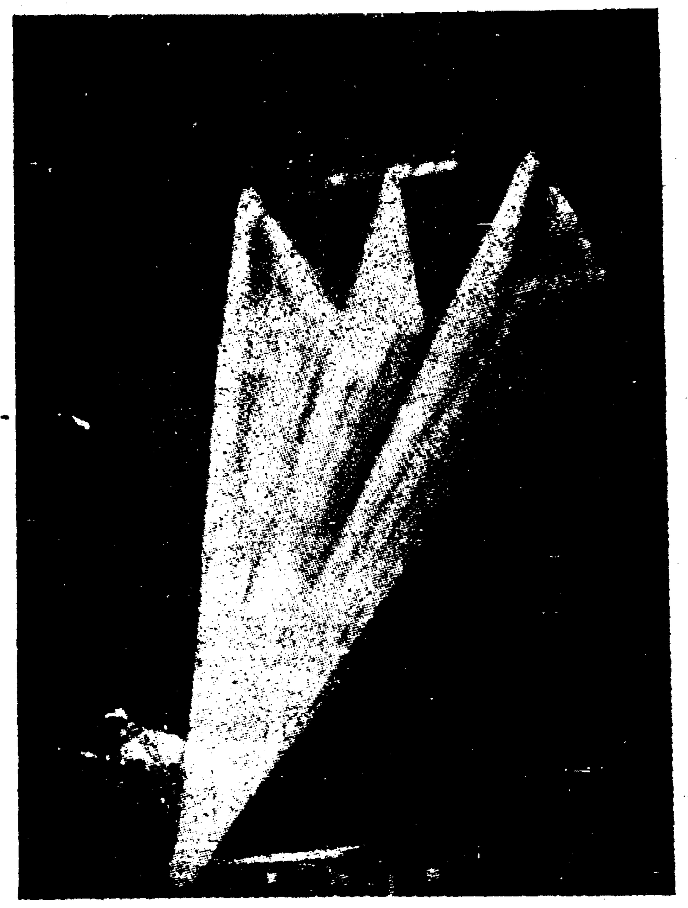

মেঘের গায়ে বিজ্ঞাপন

বাস্তবিক এটা যেমন বিজ্ঞানের যুগ তেমনি বিজ্ঞাপনেরও যুগ। পৃথিবী যেমন নানা বিষয়ে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি সমান তালে বাড়িয়া চলিয়াছে। সেকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এখনকার চাইতে অনেক

কম ছিল, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তেমন ছিল না। ব্যবসাদারেরা জানিত, লোকে কিনিবার প্রয়োজন বোধ করিলে আপনা হইতেই তাদের কাছে আসিবে। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। রেষারেষির পাল্লায় পড়িয়া এখন ব্যবসাদারদের খরিদ্দার যোগাড় করিতে হইলে তাদেরকে নানা ভাবে লোভ দেখাইতে হয়,—তার নিজের পরিচয় দিতে হয়,—তার নিজের জিনিষপত্রের গুণাবলী জোর গলায় জানাইতে হয়। এইজন্যই বিজ্ঞাপনের দরকার।

একটা চলতি কথা আছে—"টাকায় টাকা টানে"। বিলাতের ব্যবসাদারেরা তা বুঝিয়াছেন এবং ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপনের জন্য এক-একটা কোম্পানী প্রতি বছর কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তা ভাবিলেও তাক্ লাগিয়া যায়। পথ-ঘাট, গাড়ী-ঘোড়া, দালান-কোঠা—বিজ্ঞাপন দিয়া তারা মুড়িয়া দিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। মাথার উপর একটু খোলা আকাশ ছিল, তাও এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের নজরে পড়িয়াছে। এরোপ্লেনের সাহায্যে, বেলুনের সাহায্যে এবং নানা রকম বাজীর সাহায্যে এখন আকাশেও বিজ্ঞাপন ছড়ান সুরু হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনের প্রধান বাহন অবশ্য বরাবরই খবরের কাগজ এবং মাসিকপত্র। এই ধরণের বিজ্ঞাপন আমাদের দেশেও চলিতেছে কিন্তু বিলাতের তুলনায় সে কিছুই নয়। কত রকম অদ্ভুত ছবি, কত রকম অদ্ভুত ভাষা, কত রকম অদ্ভুত ভঙ্গীর সাহায্যে যে এ সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় তা একটা দেখিবার জিনিষ। শুধু এরই জন্য কত মোটা মোটা মাহিনা দিয়া বিশেষজ্ঞ লোক—বিশেষজ্ঞ শিল্পী রাখা হইতেছে! তাঁদের জিনিষ যে বাজারের মধ্যে সব চেয়ে ভাল, সব দিক্ দিয়া লাভজনক এবং প্রত্যেকেরই কেনা উচিত এই কথাটাই তাঁরা কেমন কায়দা করিয়া জনসাধারণকে জানাইতেছেন, বুঝাইতেছেন। "কায়দা করিয়া" বলিলাম এইজন্য যে সোজাসুজি নিজেকে বড় বলিলে আজকালকার চালাক লোকেরা তা আর বিশ্বাস করে না—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঠককে তার নিজের সম্পূর্ণ অগোচরে সে কথা জানাইয়া দিতে হয়। এইখানেই বিজ্ঞাপনদাতাদের কৌশল বা "কায়দা"। বিজ্ঞাপন শুধু দিলেই হয় না, বিজ্ঞাপনটি দেখিতে সুশ্রী হওয়া দরকার; চট্ করিয়া যাহাতে পাঠকের চোখে পড়ে তাহাও করা চাই। তা' ছাড়া বিজ্ঞাপন দেখিয়া

পাঠকদের যাহাতে কোন রকম অবিশ্বাস বা বিরক্তি না আসে কিংবা হাস্যোদ্রেক না হয় সেদিকেও নজর রাখিতে হয়। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন্ শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপনের একটি নমুনা

(একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন। পাঠককে জানান হইতেছে ইচ্ছা করিলে সেও ছবির ভদ্রলোকের মত কণ্ঠস্বর লাভ করিতে পারে।)

বৈজ্ঞানিক কাগজে গল্প-উপন্যাসের বিজ্ঞাপন কাজে আসে না, আবার গল্প-উপন্যাসের কাগজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপন দিতে হইলে উহা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় দিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে অনেকে ইতস্ততঃ করে—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে অনেক বাড়ীতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বাড়ীতে—অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ ছেলেরাই কিনিয়া থাকে এবং তাদের প্রিয় বইএর পাতায় তারা যে বিজ্ঞাপন পড়িবে দোকানে গিয়া সেইটাই আগে চাহিবে। ছেলেদের জন্য বিজ্ঞাপন তাদের উপযুক্ত ভাষাতেই লিখিতে হইবে; রং-চংএ কালিতে ছবিটবি দিয়া ছাপিলে তো কথাই নাই। আমেরিকার কোনও কোনও জায়গায় আজকাল দস্তরমত ক্লাস্ করিয়া বিজ্ঞাপন দিবার এই সব কৌশল শেখান হয়। সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য এক-একটা কোম্পানী কি অজস্র টাকা খরচ করে তা শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার নাকি কোন্ এক কোম্পানী একখানি খবরের কাগজে মাত্র এক সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রঙ্গিন কালি আর রঙ্গিন ছবি দিয়া ভরাইয়া দিতে এই খরচ।

শুধু সাময়িক পত্র নয়, আরও কত রকম ভাবে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা আর কি বলিব! ট্রামের টিকেটে, অম্‌নিবাসের টিকেটে, চিঠির খামে, পোষ্ট-অফিসের সীলে, রাস্তার নেমপ্লেটের সঙ্গে, বড় রাস্তার মোড়ে ঘড়ির গায়ে, গাড়ীর ভিতর সীটের গায়ে—কত নাম করিব?

অদ্ভুত ধরণের বিজ্ঞাপনই কি কম দেওয়া হয়? নীচের ছবিখানা দেখ।

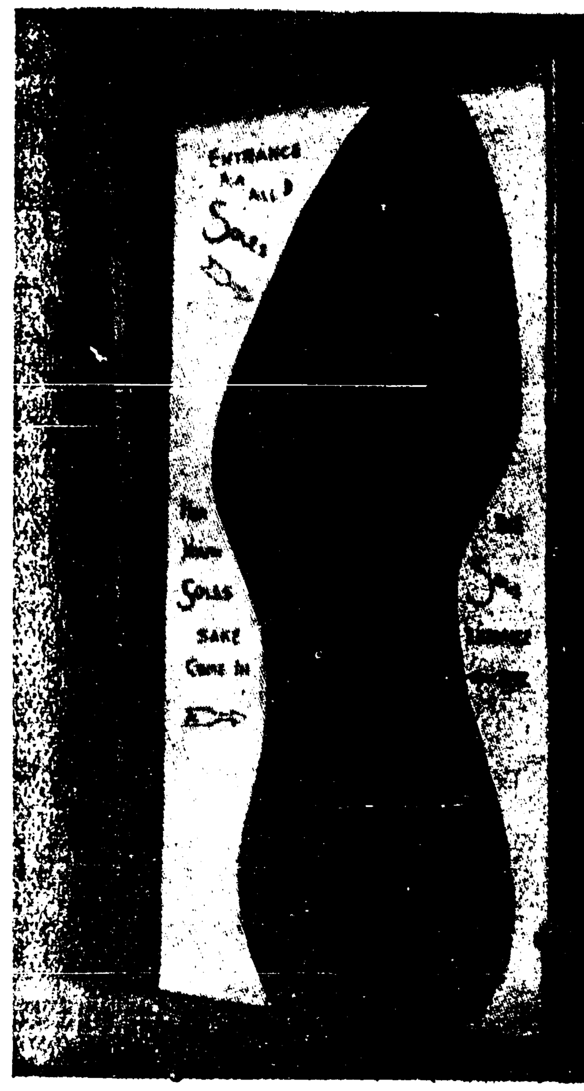

জুতার দোকানের অদ্ভুত বিজ্ঞাপন

একটা দোকানে ঢুকিবার দরজা, কিন্তু হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে একখানা বিরাট্ জুতার সুকতোলা। বলা বাহুল্য, দোকানটি জুতার। ক্রেতাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই এই ধরণের দরজার সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। আর একবার এই ধরণের একটি পানশালার (যেখানে পানীয় দ্রব্য পাওয়া যায়) ছবি দেখিয়াছিলাম। দোকান-ঘরটি এমন ভাবে তৈরী যে দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে যেন ইটের তৈরী একটা বিরাট্ সোডা-লেমনেডের বোতল দাঁড়াইয়া আছে। লোকের নজর উহার উপর না পড়িয়া পারে না। আর একবার এক্‌জিবিশনে একটা কাগজের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। দোকানটি আগাগোড়া কাগজ ও পেষ্টবোর্ড্ দিয়া তৈরী—কোথাও এতটুকু ইট-পাথর, চুণ সুরকী বা অন্য কোন কিছুর বালাই নাই। ছাদ, দরজা, জানালা—সব পেষ্টবোর্ড্ ও কাগজে তৈরী। জল-কাদায়ও নাকি সে বাড়ীর কোনও ক্ষতি হয় না। এই ধরণের বিজ্ঞাপন খরচসাপেক্ষ হইলেও কাজ দেয় অদ্ভুত রকম। বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী লিপ্‌টন্ সাহেব প্রথম যখন দোকান খোলেন তখন তাঁর দোকানের দরজায় দু'খানা আয়না লাগাইয়া

রাখিয়াছিলেন। একখানিতে মানুষের যে ছায়া পড়িত সেটি দেখাইত অত্যন্ত কৃশ, তার গায়ে লেখা ছিল 'লিপ্‌টনের দোকানে ঢুকিবার সময়'। অপর আয়নাটিতে ছায়া পড়িত অস্বাভাবিক রকম মোটা—তার গায়ে লেখা ছিল 'লিপ্‌টনের দোকান হইতে বাহির হইবার সময়'। ভাবখানা এই, লিপটনের দোকানে খাদ্য-গ্রহণ করিলে তোমার শরীরের আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হইবে। সে দোকানে শুধু চা নয়, অন্যান্য খাবারও পাওয়া যাইত।

আমাদের দেশেও আজকাল অদ্ভুত অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখা যাইতেছে। আমাদের পাড়ায় প্রায়ই এক জন লোক সংএর মত পোষাক পরিয়া, নকল দাড়ি, গোঁফ ও গাধার টুপি আঁটিয়া নাচিতে নাচিতে এবং গান গাহিতে গাহিতে দাঁতের মাজন বিক্রী করে। সে যেখানে যায় ছোট ছোট ছেলের দল তাকে ঘিরিয়া থাকে এবং তাদের মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ বিত্তশালী তারা মাঝে মাঝে ২।৪ প্যাকেট্‌ মাজন কিনিয়া নিজ নিজ উদারতার পরিচয় দেয়। (ফ্রান্সে একবার একটি টেকো লোকের মাথায় বিজ্ঞাপন লিখিয়া ফুট্‌পাতে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। সে ভদ্রলোক নিজের মনে খবরের কাগজ পড়িতেছে আর তার চারি পাশে বিপুল জনতা অট্টহাসি সহকারে বিজ্ঞাপন-সনাথ টাকটি নিরীক্ষণ করিতেছে। অবশ্য টাকের অধিকারী এজন্য বহু টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানীর লাভও কম হয় নাই, কেননা দাবানলের মত তাদের নাম সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল নিশ্চয়ই।) গান বা কবিতা আওড়াইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন বড় কোম্পানী আবার বিজ্ঞাপন অবলম্বন করিয়া গল্প লিখিয়া সে গল্প বায়স্কোপের ফিল্‌মে তুলিতে সুরু করিয়াছেন। সান্‌লাইট্‌ সাবান লইয়া এই ধরণের গল্প আমরাই বায়স্কোপে দেখিয়াছি।

হর্ষবর্দ্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন !*

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তাঁর খেয়াল হয়েছে নিজের মথ্‌ প্লেনে ইটালী যাবেন—একেবারে নন্‌-ষ্টপ্‌-ফ্লাইট্‌, কলকাতা থেকে ইটালী এবং ইটালী থেকে কলকাতা।

বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

তিনি চেয়েছিলেন দু'জন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশী বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট ক'রে সে কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বয়সের কোন লোক যে সম্প্রতি বাংলাদেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের অভ্যন্তরে তার কোন প্রমাণ তিনি পাচ্ছে না।

তিনি পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই ; আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাসুট্‌ আছে। কিন্তু বয়স্ক বাঙালীরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয় স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশীর মধ্যে একজনও না।

---

* হর্ষবর্দ্ধন আর গোবর্দ্ধন আসামের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করেন—ব্যবসার জায়গাটুকু ছাড়া পৃথিবীর কোন খবরই তাঁরা রাখেন না। সম্প্রতি তাঁরা দুনিয়ার হালচাল্‌ দেখ্‌তে কল্‌কাতা এসেছেন। তাঁদের কি রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে শিবরাম বাবু এক একটি গল্প লিখ্‌ছেন। আজ আবার আর একটি নতুন গল্প তিনি তোমাদের শোনাচ্ছেন। রাঃ সঃ

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুল্‌ছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—"হ্যাঁ, এই সব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড় হবে কিন্তু ততদিন—? নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশী বছর অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।"

একটি ছেলে লিখেছে—"দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি কিন্তু একটা সর্ত্তে। আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন্ বিকল করতে হবে, যেমন বায়স্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চল্‌বে; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কেবল আমাকে প্যারাশুটে নাম্‌বার সুযোগটা দিতে হবে। অজানা দেশে অচেনা লোকদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নাম্‌তে ভারী মজা কিন্তু—!"

আর একটা চিঠির বক্তব্য—আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটা মুস্কিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখ্‌তে ভারী ছোট দেখায়। দেখ্‌লে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গণ্ডগোল। এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নীচু কেলাসে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বল্‌ছি আমার আটাশ বছর বয়স—সবে আটাশ পেরলাম সেদিন। আপনি আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

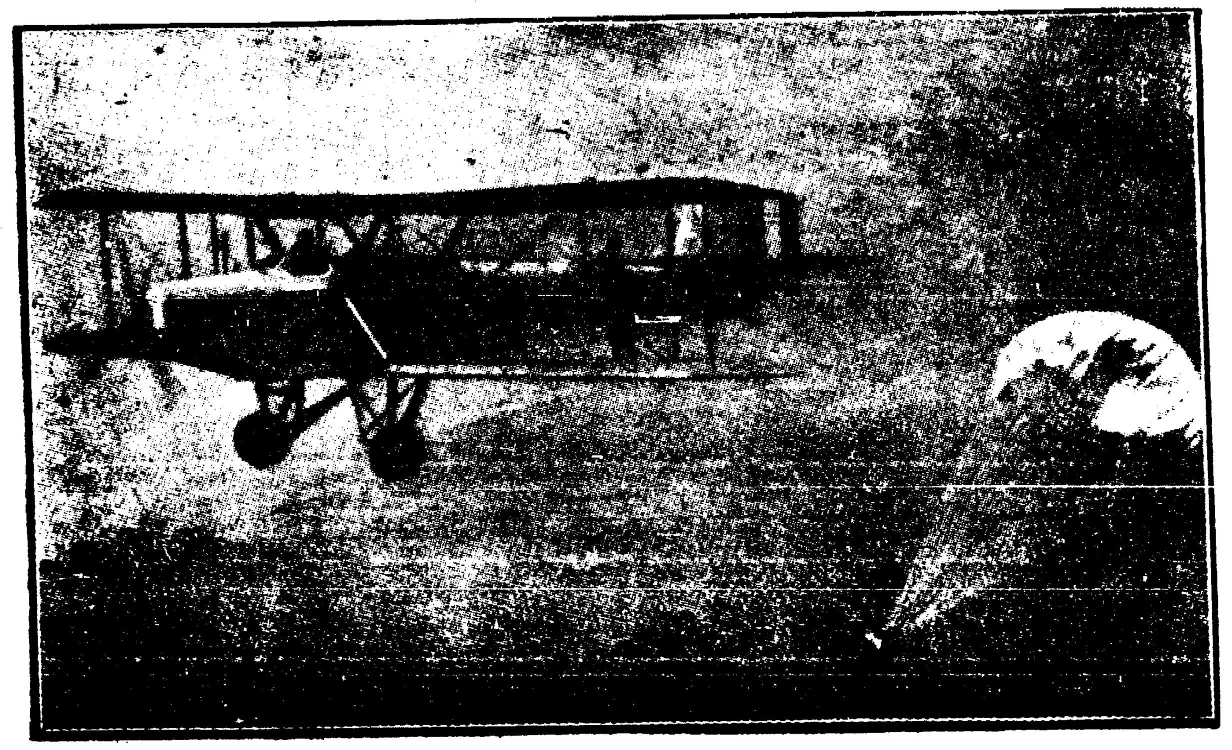

ভারী মজা কিন্তু!

এই দু'টি আবেদন-সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন এমন সময়ে দু'টি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন—"কে আপনারা?"

এক নম্বর ভদ্রলোক দু' নম্বরকে দেখিয়ে বল্লেন—"উনি হচ্ছেন হর্ষবর্দ্ধন। আমার দাদা।

দু' নম্বর বল্লেন—"আর ওর নাম গোব্‌রা।"

এক নম্বর সংশোধন ক'রে দিলেন—"উঁহু। গোবর্দ্ধন।"

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন—"তা, কি চাই আপনাদের?"

হর্ষবর্দ্ধন বলেন—"আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আস্‌তে চাই।"

গোবর্দ্ধন আবার সংশোধন করে—"উঁহু। উড়ে আস্‌তে।"

"ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালী যাবেন? বেশ ত, বেশ ত। তা আপনাদের বয়েস?"

হর্ষবর্দ্ধন ভাল ক'রে গোঁফ চুম্‌রে নেন,—"আটাশ থেকে আটাশীর মধ্যে।"

গোবর্দ্ধনও প্রয়োজন মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়—"হুঁ, তার থেকে একদিনও কম না।"

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না, পৃথ্বীশ রায় বলেন—"তবে দশটার সময় হাজির থাক্‌বেন দমদমে। দম্‌দম এরোড্রোম্, বুঝলেন?"

হর্ষবর্দ্ধন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন—"তা ভাড়া কত? খুব বেশী নয় ত?"

গোবর্দ্ধন বলে—"দশ হাজার পর্য্যন্ত আমরা উঠ্‌তে পারি। বেশী টাকা তো সঙ্গে আনা হয় নি।"

"হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেত যাওয়ার মৎলব আগে ছিল না তো। তা' আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আন্‌বেন—"

গোবর্দ্ধন মধ্য পথে বাধা দেয়—"উড়িয়ে আন্‌বেন।"

"হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আন্‌বেন তখন আমরা ভাব্‌লাম মন্দ কি? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক্।"

পৃথ্বীশ রায় বলেন—"আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য। এক পয়সাও লাগ্‌বে না আপনাদের।"

গোবর্দ্ধনের চোখ কপালে ওঠে—"য়্যাঁ, বলে কি দাদা! বিনে পয়সায় বিলেত!"

হর্ষবর্দ্ধনও কম অবাক্ হন না—"ওম্‌নি ওম্‌নি নিয়ে যাবেন?"

"নিয়ে যাব আবার নিয়ে আস্‌ব—একদম মুফ্‌ৎ। বরং আপনারা দাবী করলে কিছু ধ'রে দিতে রাজি আছি।"

হর্ষবর্দ্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—"না, আমরা কিছু চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসি নি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।"

"কিন্তু দেখ্‌ছ ত দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে।" গোবর্দ্ধন যোগ করে, "আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়।"

হর্ষবর্দ্ধন পিছ্‌পা হবার পাত্র নন্—"তা বেশ বিনে পয়সায় বিনে পয়সায় সই, ওম্‌নিই যাব বিলেত। তার কি হয়েছে?"

পৃথ্বীশ রায় বলেন—"একটু ভুল করছেন। বিলেত নয় ইটিলি।"

"ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটিলি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটিলিই কি আর আন্দামানই কি।"

হর্ষবর্দ্ধন অমায়িক ভাবে হাসতে থাকেন। "ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।"

পৃথ্বীশ রায় বল্‌তে সুরু করেন—"দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোন ভয় নেই তবুও—"

হর্ষবর্দ্ধন বাধা দেন—"আমরা জানি। আকাশে আবার ভয় কিসের? এ তো রেল গাড়ী নয় যে কলিশন্ হবে? আর আকাশে এন্‌তার্ ফাঁকা, কোথায় বা ধাক্কা লাগ্‌বে, বলুন? তুই কি বলিস্ গোব্‌রা?"

গোব্‌রা জবাব দেয়—"তুমিই বল না, কোন পাখীকে কি কখনো মরতে দেখা গেছে? মানে খাঁচার পাখী নয়, আকাশের পাখীকে? আকাশে যারা ওড়ে

তাদের মরণ নেই দাদা। আর উড়োজাহাজ তো বল্‌তে গেলে পাখীর মতই। সেদিন দেখ্‌লে না—ইয়া বড় বড় তুই পাখা?"

পৃথ্বীশ রায় তথাপি চেষ্টা করেন—"তা বটে, পাখা থাক্‌লেই পাখী হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি তবু আমি বল্‌ছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ্ ইন্‌সিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদিই একটা বিপদ্ আপদ্ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম্ দেয়া থাক্‌লে আত্মীয়-পরিবার টাকাটা তখন পাবে।"

হর্ষবর্দ্ধন ঘাড় নাড়েন—"হ্যাঁ, লাইফ্ ইন্‌সিওর জানি বই কি। আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বল্‌ছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা ক'রে ফেলা যাক্! তা আমার নামেই করুন, ওর নামে ক'রে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি ম'লে টাকাটা যেন গোব্‌রাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন, যদিই দৈবাৎ উড়োকল বেগ্‌ড়ায়, বলা যায় না ত! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড়্ একদম ছাতু! তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—"ও, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে?"

"নিশ্চয়ই যাচ্ছে। যাচ্ছে না কে বল্‌ল? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজি নই।" হর্ষবর্দ্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন—"বিলেত তো বিলেত!"

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালীর এরোড্রোমে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা শেষ হ'লে হর্ষবর্দ্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন—"দেখছিস্ গোব্‌রা, বাংলাভাষাটা কি রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজ কাল!"

"হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি!"

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোষাক হ'লেও

আসলে তাঁরা বাঙালী, ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা পড়াশুনার ব্যাপারেই এঁদের বিদেশ-বাস; বাঙালী বলেই বাঙালীকে সম্বর্দ্ধনা করতে এঁরা সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুর মত অবাক্ হয়ে যায়। "বটে? বুঝেছি তা'হলে, কাঠের কারবার নিয়েই এঁদের এখানে থাকা।" হর্ষবর্দ্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

"তা আর বল্‌তে!" গোবর্দ্ধন যোগদান করে, "কাঠের জন্য আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেত যাবে এ আর বেশী কি!"

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন; এঞ্জিনের অবস্থা ভালো নয় এইজন্য সমস্ত দিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে। হর্ষবর্দ্ধন বলেন, "তা হ'লে এই ফাঁকে এই বিলিতি সহরটা দেখে নেওয়া যাক্ না কেন?"

গোবর্দ্ধন সায় দেয় "হুঁ, যখন পুরো একটা দিন পাওয়া যাচ্ছে।"

মুকুল ব'লে একটি বছর পনের ষোলোর ছেলে এগিয়ে আসে, "আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।"

হর্ষবর্দ্ধন অবাক্ হন, "য়্যাঁ, এইটুকু ছেলে, তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ? এই বয়সেই?"

মুকুল বলে "না, আমার বাবা ডাক্তার।"

গোবর্দ্ধন ব্যাখ্যা করে, "তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ।"

হর্ষবর্দ্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন, "বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার, এর চেয়ে লাভের কি আছে? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল্ লাভ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোব্‌রা?"

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন, "আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।"

"সে আর বলে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে! এখান থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরা আমাদের কর্ম্ম নয়।"

গোবর্দ্ধন মিনতি জানায় "দোহাই, তা যেন যাবেন না। দেখ্‌ছেন তো

দাদা যা মোটা, একটু হাঁটলেই ওর হাঁপ্ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।"

হর্ষবর্দ্ধনের আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে, "হুঃ! দাদা পারবে না। নিশ্চয় পারবে, আলবৎ পারবে, দাদার ঘাড় পারবে। হেঁটে দেখিয়ে দেব?" গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

"আসুন, আপনারা আমার মোটরে।" হর্ষবর্দ্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়। "ঐ যে আমার বেবি কার্ ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ্ করি।"

কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণ সুরু হয়েছে। গোবর্দ্ধন সভয়ে দাদার বিরাট্ পদক্ষেপ দেখ্‌তে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয় তো একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা নিরস্ত হচ্ছেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্দ্ধন সটান্ মোটরে পৌঁছে গ্যাঁট্ হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্দ্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন ভায়ের দিকে দৃক্‌পাত করেন না, ভয়ানক তিনি চটে গেছেন, তিনি নাকি বেজায় মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ্ ধরে যায়—দেশে হলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু বিলেতে এনে তাঁকে এমন ধারা অপমান, সব বাঙালী সাহেবের সাম্‌নে, ছি ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। "এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখ্‌ছেন এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিষ্ট।"

"য়্যাঁ, বল কি? আমাদের মাইকেল? বিলেতে ছবি আঁক্‌তো সে, বটে?" হর্ষবর্দ্ধনের বিস্ময় ধরে না।

"মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জান্‌লেন কি করে?"

"মাইকেলকে জানি না! তুমি অবাক্ করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড়নি?"

মুকুল ঘাড় নাড়ে "না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা; দেশে তো যাইনি কখনো!"

"বল্‌না গোব্‌রা, বল্‌না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে ?"

গোবর্দ্ধনও সহজে দম্‌বার নয়—"হুর্‌রে, হুর্‌রে হুর্‌রে করি গর্জ্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—"

হর্ষবর্দ্ধন বিরক্ত হয়ে বাধা দেন—"উঁহু, উঁহু। ওযে মিলে গেল। মাইকেলের মেলে না। তোর কিচ্ছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একেবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস্ হাঁট্‌তে পারে না।"

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্দ্ধন একটু খুসি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন, "তুমি মাইকেল পড়নি ত? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।"

গোবর্দ্ধন বলে, "পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়াই শক্ত। দাঁতভাঙ্গা ব্যাপার।"

হর্ষবর্দ্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন "পড়্‌লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস্ মাইকেলের? বল্ দেখি 'হস্তী নিনাদিল'—এর মানে কি?"

বার বার অপমানে গোবর্দ্ধনও গরম হয়, "তুমি বল দেখি?"

"আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস্ করছি বুঝি?" হর্ষবর্দ্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আম্‌তা আম্‌তা করেন, "এমন কি শক্ত মানেটা শুনি? হস্তী নিনাদিল? এ তো জলের মত সোজা। 'নিনাদিল'র 'নি' বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা 'হস্তিনী নাদিল' তাও করা যায়।" গোবর্দ্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি নিজের গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন—"হুঁঃ, এই তো তোর বিদ্যে! তবু 'হ্রেষাধ্বনি' এখনো জিজ্ঞাসাই করিনি!"

গোবর্দ্ধন এবার ভীত হয়, 'হ্রেষাধ্বনি' চাপা দেবার জন্য বলে—"মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?"

"বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওঁর পদ্য ভালো ঢের।"

মুকুল ওদের আরো অনেক কিছু দেখায়, মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্ত্তি,

মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরো কত কি কারুকার্য্য! মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু' ভাই কম অবাক্ হয় না! বল্‌তে গেলে গোটা ইটালীটাই গড়ে পিটে দিয়ে গেছে মাইকেল।

হর্ষবর্দ্ধন মাইকেল-গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে ওঠেন, "মাইকেলের বাড়ী কোথায় ছিল জানিস্ গোব্‌রা?"

"যশোরে কি খুল্‌নায় যেন।"

"উঁহুঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাট্‌তে পারে? কি রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে!"

"হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী।" গোবর্দ্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। "ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাট্‌তে পারে কেউ?"

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান্ ফোরাম্ দেখায়; হর্ষবর্দ্ধন প্রশ্ন করেন—"এও আমাদের মাইকেলের তো?"

"না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরী।"

"ওঃ!" হর্ষবর্দ্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তরস্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্দ্ধন আবার প্রশ্ন করেন—"মাইকেলের?"

"এ তাঁর জন্মানোর দু' হাজার বছর আগেকার।"

হর্ষবর্দ্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট্ প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"ওটা কার মূর্ত্তি জানেন?"

হর্ষবর্দ্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান—"মাইকেলের বোধ হয়?"

"উঁহু। ভাস্কো ডা গামা; নাম শোনেন্ নি?"

"গামা, গামা—নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি ক'রে বেড়াত লোকটা না?"

"ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়ি নি।"

"ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল! তুমি অবাক্ করলে বাপু! এই মাত্র আমরা তো ভারতবর্ষ থেকেই আস্‌ছি, কিন্তু কই এ রকম কথা তো শুনি নি। অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পারলাম না!"

গোবর্দ্ধন বলে, "তুমি ভুল পড়েছ, 'ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভালো রকম জানি।"

"কি গামা বল্‌লে? ভাস্কো ডা গামা? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে?"

"অনেক দিন! চার শ' বচ্ছরেরও আগে!"

"চার শ' বচ্ছর! বল কি! তা কিসে মারা গেল?"

"তা কি জানি?" মুকুল মাথা নাড়ে।

"বসন্ত, বোধ হয়?" হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

"বইয়ে তো পড়িনি, জানি না।" মুকুল আরো জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্দ্ধন বলে, "হামও হতে পারে?"

"হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।" মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

"বাপ মা আছে?"

"অসম্—ভব!" প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। "ছেলেপুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা!"

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সব চেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি! মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, "দেখ্‌ছেন?—মামি! মামি!"

হর্ষবর্দ্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে লক্ষ্য করেন—"কি বল্‌লে? কি নাম ভদ্রলোকের?"

"নাম? ওর কোন নাম নেই—জিপ্‌সিয়ান্ মামি!"

"মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক বোধ হয়? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম?"

"না,—জিপ্‌সিয়ান্ মামি।"

"আমাদের বাংলা দেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে?"

"না, না, বল্‌ছি তো জিপ্‌সিয়ান্!" মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

"ও, তাই বলো! এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ!"

"না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্ম্মান্ নয়, ইটালীর লোকও নয়, এমন কি বাঙালীও নয়—ইজিপ্টায় এর জন্ম।"

"ইজিপ্টায় জন্ম! ইজিপ্টা ব'লে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনি নি।" হর্ষবর্দ্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন। "ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে? তুমি ঠিক জানো?" গোবর্দ্ধন প্রশ্ন করে।

"ইজিপ্টা কোন বিদেশ-টিদেশ হবে। গোব্‌রা, তলায় কি লেখা রয়েছে পড়ে দেখ্‌তো।"

"এফ-আর-ও-এম্—ফ্রম্ ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম্—ফ্রম্ মানে 'হইতে' আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি?"

"এগ্‌ওয়াইপ্‌ট্। এগ্‌ওয়াইপ্‌ট্ হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধ হয় কোন ডিমের আড়ৎদার-টাড়ৎদার।"

"মামী—মামী!" গোবর্দ্ধন প্রশ্ন ক'রে, "তা এর মামা কোথায়?"

মুকুলের ঘাড় টন্‌টন্ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

"দেখ্‌ছিস্ গোব্‌রা, কি রকম মজা ক'রে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব!"

গোবর্দ্ধন মুকুলের মুখে তাকায়—"এ কি—য়্যাঁ—এ কি মারা গেছে?"

"নিশ্চয়! তিন হাজার বছর!"

হর্ষবর্দ্ধন চম্‌কে ওঠেন—"য়্যাঁ বল কি? তিন হাজার বছর ধ'রে এম্‌নি ম'রে রয়েছে?"

গোবর্দ্ধনের বিশ্বাস হয় না—"তিন হাজার বছর! হতেই পারে না! তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে আর এ কিনা তিন হাজার—"

হর্ষবর্দ্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়—"শোন ছোক্‌রা, তুমি কী বল্‌তে চাও বল দেখি? বাংলা দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমাদের বাঙাল্‌ পেয়েছ? যা খুসি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ ব'লে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলি নি; তা বিলেতের ছেলে ব'লে কি তোমাকে ভয় ক'রে চল্‌তে হবে? অত ভীতু নই আমরা। তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভালো!"

গোবর্দ্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—"হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা। আমরা ভয় খাই না। নিশ্চয় ভালো, হাজার হাজারগুণ ভালো। অত বোকা পাও নি আমাদের, যে যা খুসি তাই বুঝিয়ে দেবে। তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে। টাট্‌কা মড়া থাকে তো নিয়ে এসো—টাট্‌কা চমৎকার খাসা একখানা লাশ্‌! আমাদের আপত্তি নেই।"

তিন জনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্দ্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়—"মশাই, চলুন। আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত্ত না! এই আপনার বিলেত্‌? দূর্‌ দূর্‌! সারা সহরটায় দেখ্‌বার মত কিচ্ছু নেই। এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ঢের ঢের ভালো! হ্যাঁ ঢের ঢের ভালো!"

পরিশ্রমের পুরস্কার

"আগুন-পোহাবার কাঠ নিজে হাতে কাট; তা' হলে সে কাঠ তোমায় দ্বিগুণ উত্তাপ দেবে"—হেন্‌রি ফোর্ড

তিনটি

প্রশংসনীয় তিনটি—শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা, তৎপরতা।

ঘৃণার্হ তিনটি—নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা, ঔদ্ধত্য।

অভ্যাসের তিনটি—সৎসাহস, স্নেহশীলতা, শিষ্টতা।

পেটে খেলে পিঠে সয়!

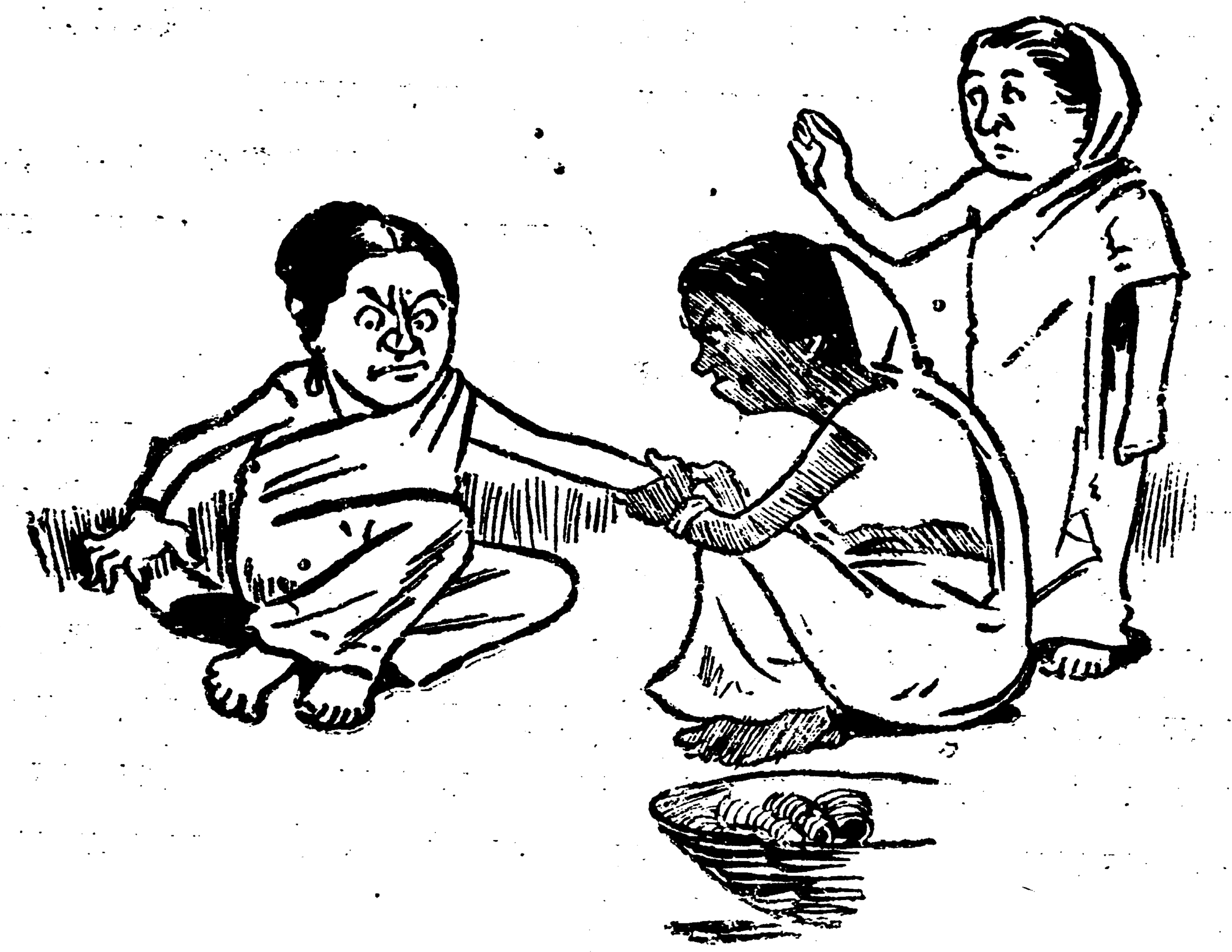

চোখ দু'টি ছানাবড়া, কব্জিটি গেল যে!
"আর একটু সহ মা, এই হয়ে এল যে!"

সেয়ানে-সেয়ানে

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্‌-সি.)

তখনও ভোর হতে অনেক দেরী—বোধ হয় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাকী।

আদিত্য এরই মধ্যে উঠে সকলকে ব্যস্ত করে তুলেছে। শীতকাল—লেপের মধ্যে সকলে আরামে ঘুমুচ্ছে, বাইরে তখনও অন্ধকার কাটেনি, এমন সময় আদিত্য সুরু করলে সকলের লেপ ধরে টানাটানি। সকলেই বেশ একটু বিরক্ত যেন॥

নির্ম্মল নিজের লেপটাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে 'এর মধ্যে কি আদিত্যদা? এখনও রাত রয়েছে যে!'

সমর জড়িতস্বরে বল্লে 'আদিত্যদা ভাই, কাল চৌদ্দ মাইল ঐ পাহাড়ের পথে হেঁটে আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয়েছে—আমি আজ আর যাব না তোমাদের সঙ্গে?'

সুনীল বল্লে, 'আদিত্যদা'র যত পাগ্‌লামি! সাত মাইল দূরে প্রকাণ্ড শালবন, তাই যেতে হবে দেখ্‌তে! পাহাড়গুলো ত শেষ হয়ে গেল, এখন বন সুরু হ'ল! একদিন একটু সহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেই ত হয়।' '

এমনি আরও দু' একজন আপত্তি জানাল, বাকী সব লেপের মধ্যে নিশ্চল হয়ে রৈল পড়ে, কিন্তু কারো কোনও আপত্তিই টিকল না। আদিত্যকে খুব ভালবাসে সবাই, শ্রদ্ধাও করে একটু, আর তার উপর আদিত্যের অমায়িক মিষ্টি প্রাণখোলা ব্যবহারে সকলেই ওর বশীভূত। অমন আমুদে স্ফূর্ত্তিবাজ ছেলে, ওর জন্যেই ত এবার এদের পূজার ছুটীটা এত জমে উঠেছে। ও যে কোন জায়গায় যে কোনও একটা কিছু নিয়ে অসম্ভব রকম জমিয়ে তুল্‌তে পারে; ওর প্রতি কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটে ছেলেদের মধ্যে; দুষ্টুমি বুদ্ধিতেও ওর জোড়া মেলা ভার।

সমরদের বাড়ীতে ওরা সবাই অতিথি। সমরের মা ত বলেন, আদিত্যর মত ভাল ছেলে নাকি হয় না। আদিত্য এই ক'দিনের মধ্যে সমরদের বাড়ীর একেবারে আপনার জন হয়ে উঠেছে।

ও এরই মধ্যে প্রত্যেকের জন্য এক কাপ চা, প্রত্যেকের জন্য দুটো করে ডিমসিদ্ধ আর রুটী-মাখন সব প্রস্তুত করে প্রত্যেকের কাছে হাজির করে দিল। সকলে বেশ খুসী মনে হ'ল, আস্তে আস্তে লেপের মায়া ছেড়ে সবাই উঠে পড়্‌ল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই রেডি। যখন সকলে এক সঙ্গে বার হ'ল তখনও একেবারে ভোর হয় নি, শীতের আমেজও বেশ দিচ্ছে ঘরের বাইরে। কিন্তু এখন সকলের মধ্যেই মহা উৎসাহ, যেন সবাই যুদ্ধজয়ে চলেছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাত মাইল পথ শেষ হয়ে গেল। ওরা যখন সেই প্রকাণ্ড শাল-বনটায় পৌঁছাল তখন সবে সূর্য্য উঠেছে দূরে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে। খুব আনন্দের সঙ্গে ওরা ঘুরে বেড়াল সমস্ত বনটার ভেতর; প্রায় মাইলখানেক ধরে বন—মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা কোথায় যেন চলে গেছে। ওরা সমস্ত বনটা ঘুরে যখন বাড়ীর দিকে রওনা হচ্ছে তখন হঠাৎ দূরে একটা মোটারের আওয়াজ শুনতে পেল। সবাই বেশ একটু অবাক্ হ'য়ে গেল—এই বনের মধ্যে এত দূরে মোটার এল কোথা থেকে? হয় ত বা কেউ মোটারে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যে দেখা গেল যে একটা মোটার বাস বনের ভিতর দিয়ে সকলের সামনে হাজির। বাসখানা যে কবে তৈরী হয়েছিল তা' তা'র চেহারা দেখে বলা কঠিন; ভিতরে মাত্র

কয়েকটী লোকের বস্‌বার জায়গা আছে, বাকী লোক সব দাঁড়িয়ে। বাস্‌খানা অতগুলি লোক দেখে কি রকম একটা আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল; এরা প্রথমে চম্‌কে উঠেছিল ভীষণ, পরে বুঝ্‌ল যে বাসের ব্রেক কসা হ'ল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা কর্‌ল "যায়ে গা?" এরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কোথায়?" সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের পাশ থেকে একটা লোক খান কতক ছাপান কাগজ উড়িয়ে দিল ওদের দিকে। ঘুড়ি-লোটার মত করে যে যা পারল একখানা কাগজ লুফে নিল; পড়ে দেখ্‌ল, কোন্ এক ঝর্‌ণা পর্য্যন্ত নাকি সে বাস যায়—আশ্চর্য্য সে ঝর্‌ণার জল—সাদা জল বার হচ্ছে ঝরণা থেকে, তার পর একটু দূরে গিয়ে সে জলের রং হয়ে যাচ্ছে সবুজ, তার পর আর একটু দূরে গিয়ে হল্‌দে এবং শেষে রক্তের মত লাল হয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সজোরে নীচে পড়্‌ছে। বৈজ্ঞানিকেরা এ নিয়ে নাকি অনেক গবেষণা করেছেন। কেউ কেউ বল্‌ছেন যে যে জায়গা দিয়ে আসে সেই জায়গার গুণে জলের রং বদ্‌লায়, কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত হ'তে পারেন নি। একটা দেখবার জিনিষ। বাসটা আসে কাছাকাছি আর একটা সহর থেকে। এ শালবন থেকে সে ঝর্‌ণা প্রায় পঞ্চাশ মাইল। ঝর্‌ণায় পৌঁছাতে প্রায় বেলা তিনটা বাজে—সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরে আসা যায়। তবে যে পথে বাস যায় সে পথে ফেরে না, একটু ঘুরে নামে পাহাড় থেকে। ভাড়া প্রতি জনের দু' টাকা করে।

কাগজটার উল্টো দিকে আবার আর একটা ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন। ছবিটি একটী সুন্দর রেস্তরাঁর (Restaurant); তার নীচে লেখা, ঝর্‌ণার পথে এখানে নেমে বেশ করে ক্ষুধা মিটিয়ে যাবেন—মাত্র আট আনা পয়সায় খেতে দেওয়া হয়:—

ফাউল কাট্‌লেট—২ খান
ফাউল-কারী—২ ডিস্ (বড়)
মাটন-কারী—১ ডিস্ (বড়)
চিংড়ীর কাট্‌লেট্—২ খান
মাট্‌ন চপ্—৪ খান
মামলেট—২ পিস্
ডেভিল—২টা
কোর্ম্মা—২ ডিস্
চীজ—যতখানি দরকার

এমনি আরও কত কি! অর্থাৎ কলকাতার কোনও রেস্তরাঁতে বোধ হয় চার টাকার খাবার।

আদিত্য বল্‌লে, "যাবে সব কালকে?"

ভীমটা ভয়ানক কঞ্জুস, সে একবার যেন ঢোক গিল্‌ল মনে হ'ল কিন্তু আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে রেস্তরাঁর খাওয়ার চার্টটা তার চোখের সামনে ধরল। ভীম বেশ যেন একটা উৎসাহ পেল মনে হ'ল। ও বিষয়ে ওর বিশেষ একটু দুর্ব্বলতা আছে; ভাল এবং বেশী খাওয়ার কথা শুনলে ওর আর নিজের উপর কোনও যেন কর্ত্তৃত্ব থাকে না।

যাই হোক্, ঠিক হ'ল পর দিন সকালে এইখানে বাস ধর্‌তে হ'বে। সকলের মনেই একটা মহা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে অমন একটা আশ্চর্য্য রকমের ঝরণা দেখ্‌বার জন্য—দেশে গিয়ে এক হাত গল্প করার মত। ভীমের কিন্তু ঝরণা-টরণা সব মন থেকে কোথায় চলে গেছে—ও ভাব্‌ছে খালি সেই রেস্তরাঁর কথা—আট আনা পয়সায় কত খাবার রে বাবা! একবার রেস্তরাঁয় ঢুকলে হয়।

আবার পরদিন সকাল—আবার আদিত্যের সেই ডাকাডাকি। কিন্তু আজ আর কা'কেও বেশী তাড়া দিতে হ'ল না, সকলেই খুব শীঘ্র শীঘ্র উঠে পড়ল—অত দূর গিয়ে যদি আবার বাস্ চলে যায়! ভীমটা অন্য দিন ওঠে সকলের পরে, আজ একেবারে সবলের আগেই সে রেডী।

সাত মাইল পথ হেঁটে এসে তারা অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণের মধ্যেই সেই বাসখানা এসে হাজির। আদিত্য হাত তুল্‌লো, বাস্‌টা আবার সেই রকম আর্ত্তনাদ করে থেমে গেল। ওরা চৌদ্দ জন কোনও রকমে উঠে পড়্‌ল। আবার একটা বিকট রকম শব্দ করে বাস চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

ক্রমশঃ বেলা বেড়ে চলেছে, ক্ষিধেতে সকলের পেটের মধ্যে 'প্রলয়-নাচন' সুরু হয়ে গেছে। তখন সকলেরই মনের ভাব, কখন রেস্তরাঁয় পৌঁছুবে। বেলা তখন প্রায় একটা হবে, দূরে একটা ছোট্ট বাড়ীর মত দেখা গেল। সকলে এক সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল মহানন্দে, "ঐ যে রেস্তরাঁ দেখা যাচ্ছে"। ক্ষিধের চোটে ঝরণার কথা সবাই যেন একেবারে ভুলেই গেছে।

রেস্তরাঁ এসে গেল। বাসটা সেখানে দাঁড়াল, সকলেই তখন হৈ হৈ করে পড়্‌ল নেমে—প্রায় জন পঞ্চাশ ষাট হবে। ড্রাইভার বল্‌লে, "জল্‌দি কোরো বাবু, বাস আভি ছোড়্ দেগা।"

ড্রাইভারটা আবার য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্—ভীষণ জোয়ান, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল; তার দিকে তাকালে ভয়ে মুখ আমসী হয়ে ওঠে।

যাই হোক্, তখন ক্ষিধের চোটে সবাই অস্থির, ছুট্‌ল রেস্তোরাঁর দিকে। কেবল এক জন ভদ্রলোক বাস থেকে নাম্‌লেন না। সকলে তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌তে তিনি সেই যমদূতের মত চেহারাওয়ালা ড্রাইভারটার দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে অতি আস্তে আস্তে বল্লেন, "মশাই, ও রেস্তরাঁটা ভয়ানক জোচ্চোরের আড্ডা। অতগুলো খাবারের নাম করা

আছে, ভেবেছেন আপনারা যে আট আনা পয়সায় তিন চার টাকার খাবার খেয়ে আসবেন; কিন্তু সে গুড়ে বালি মশাই! আট আনা পয়সা ছেড়ে দিন, আট পয়সার খাবার খাওয়ারও সময় পাবেন না। দেখবেন যেই সামান্য কিছু খেতে সুরু করবেন আর এই বেটা ড্রাইভার হর্ণ দিতে আরম্ভ করবে। যদি তাড়াতাড়ি আসেন ভালই, নৈলে বাস ছেড়ে দেবে।"

এক জন হঠাৎ প্রতিবাদ করে বল্লে, "তাতে এ ড্রাইভারের লাভ?"

ভদ্রলোক একটু হেসে বল্লেন, "এ আর বুঝলেন না? হোটেলওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে; ওর যা লাভ হয় তার ভাগ পায় এই ড্রাইভারটা।"

ভীম হঠাৎ চটে উঠে বল্ল, "যান, মশাই যত গাঁজাখুরী কথা।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "না হে ছোকরা যাও না, দেখে এস একবার, দেখলে ত ও বেটা প্রথমেই বলে দিল 'জলদি কোরো, বাস আভি ছোড় দেগা।' অত খাবারের নামই লেখা আছে, কখনও তৈরী করে না। কেবল মাঝে মাঝে সাহেব দু' চার জন যায়—তাই দু' চার জনের মত ঐ সব তৈরী করে রাখে।"

"আপনি জানলেন কি করে এত সব মশাই?" সুনীল বল্লে।

"আমার এক মামা একবার ঠকে গেছেন। তিনিই আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন—"

ভীম আর থাক্‌তে পার্‌ছিল না ক্ষিধের চোটে—বল্লে, "চলুন, চলুন মশাই যত সব পাগলামি—"

সবাই গেল রেস্তরাঁতে। বেশ চমৎকার সাজান, পরিষ্কার রেস্তরাঁটা। বনের ভিতর যেন অমরাপুরী। বেশ বড় ঘর, প্রায় ষাট সত্তর জনের জায়গা আছে। প্রত্যেক জনের আলাদা আলাদা ছুরী, কাঁটা, চামচ—সব যেন নূতন। এক পাশে চার পাঁচটা টেবিল আরও ভাল করে সাজান, বোধ হয় সাহেব-মেমদের জন্য। তার ছুরী কাঁটা চামচগুলি আবার রূপার। বাইরে দুটো সুন্দর ঘোড়া বাঁধা। বোধ হয় হোটেলওয়ালা আর তার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেই ঘোড়া করে যাতায়াত করে।

যাই হোক, সবাই ত এক একটা 'সীটে' বসে পড়্‌ল; প্রত্যেকে যেন এক একটা দুর্ভিক্ষের ছারপোকা। ভীমটা ত ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। খালি আদিত্য হঠাৎ খানিকক্ষণ থেকে গম্ভীর হয়ে গেছে! মনে হচ্ছে সে যেন মহা চিন্তান্বিত। খালি রেস্তরাঁর এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে—আবার কি ভাব্‌ছে।

একটু পরেই ভদ্রলোকটী যা বলেছেন তাই। সেই যমদূতাকৃতি ড্রাইভার দু' দু'বার অতি জোরে দিল হর্ণ। সকলে তখন কতটুকুই বা খেয়েছে! কিন্তু এই বনের মধ্যে তাদের ফেলে রেখে বাস চলে যাবে ভাবতেই সব ভয়ে শিউরে উঠ্‌ল—উঠে পড়্‌ল সব প্রায় না খেয়েই।

ভীমটা ত কেঁদেই ফেল্লে! সে কাল থেকে এই খাওয়ারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে—আর আজ কিনা এই রকম জোচ্চোরি। সে মাত্র সবে দু'খান চপ খেয়েছে!! কিন্তু যেতেই হবে, সবাই যখন চলে যাচ্ছে। সবাই উঠে পড়্‌ল, কিন্তু আদিত্যর উঠ্‌বার নাম নেই।

সুনীল ডাক্‌ল "আদিত্যদা, চল বাস ছেড়ে দেবে যে।"

আদিত্য গম্ভীর ভাবে বল্ল, "তা দিলে কি কর্‌ব, নগদ আট আনা পয়সা দিয়ে খেতে বসেছি, না খেয়ে ত আর উঠ্‌তে পারিনে।"

সকলেই অবাক্—লোকটা পাগল নাকি! হোটেলের সে য়্যাসিষ্টাণ্ট ছোক্‌রাটা পর্য্যন্ত অবাক্। বাস চলে যাবে; ও এই বনের মধ্যে থাকবে পড়ে, তবুও 'না খেয়ে উঠ্‌বে না, বল্‌ছে।

আবার একবার হর্ণ—সবাই ব্যস্ত, হয়ত দিল বাস ছেড়ে।

হোটেলের বুড়ো ম্যানেজার পর্য্যন্ত তার ছোট্ট কামরাটী ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এত দিন এই জোচ্চোরি ব্যবসা চালাচ্ছে, কিন্তু এ রকম লোক ত কখন দেখেনি। অন্য দিন এ রকম সময় ম্যানেজারটী থাকেন আড়ালে, কারণ যাত্রীদল যখন নিরুপায় হয়ে না খেয়েই উঠে যায় তখন যথেষ্ট গালাগালি করে; কারণ পয়সাটা নিয়ে নেয় আগেই যে।

ম্যানেজার বল্লে, "মশাই, আপনি সমস্ত খাবার খাবেন সে ত ভালই, কিন্তু ঐ বেটা যে বদমায়েসি করে বাস ছেড়ে দিচ্ছে, তা নৈলে আমার আর আপত্তি কি?"

আদিত্য বল্লে, "তবে দিয়ে যেতে বলুন খাবার, আপনাদের লিষ্ট্ মত।"

ম্যানেজার বল্লে, "কিন্তু মশাই বাস চলে গেলে যাবেন কি করে? আমাদের হোটেল ত সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সন্ধ্যার পর দু' একটা বাঘ ভালুকের দেখাও মিল্‌তে পারে—"

আদিত্য কিন্তু অটল, বল্লে, "অত কথায় দরকার কি মশাই, দিতে বলুন না—'কৈ কাটলেট্ দিন!" বলে সে হাতের সেই ছাপান কাগজটার দিকে তাকাল একবার—

এবার বাসে ষ্টার্ট্ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। অন্য সবাই ছুট্‌ল, আদিত্যর দল আদিত্যকে পীড়াপীড়ি টানাটানি কর্‌তে লাগল, সবাই বল্লে, "পাগল হলে নাকি, আট আনা পয়সার জন্যে বাঘ-ভালুকের পেটে যাবে? আর তাও যদি না যাও ত সারা রাত এখানে একা কাটাবে কি করে?"

আদিত্য বল্লে "বাঘ-ভালুকের পেটেও যাব না, সারা রাত একাও থাক্‌ব না, ঝরণার কাছে তোমাদের সঙ্গেই দেখ্‌তে পাবে।"

সকলে নিরুপায় হয়ে ছুট্‌ল বাসের দিকে। আদিত্যকে যতই ভাল বাসুক, তা বলে তার জন্য সারা রাত্রি ধরে এই বনের মধ্যে পড়ে থাকতে কেউ রাজি নয়; আর বিশেষতঃ আদিত্য যখন ইচ্ছা করেই এ পাগ্‌লামি কর্‌ছে। কেন, তাদেরও ত আট আনা পয়সা গেছে! তাদের পয়সা কি পয়সা নয়? সকলে যেন একটু বিরক্তও হয়েছে। যাক্ আদিত্যকে ফেলে রেখে বাস ত গেল চলে।

আদিত্য এবার বেশ জেঁকে বস্‌ল, হাঁকল, "ও ম্যানেজার মশাই, ফাঁউল-কারী কই? ২ ডিস্—হ্যাঁ, আর মাট্‌ন, এক ডিস্।"

সর্ব্বনাশ! ম্যানেজার ত চোখে সরষে ফুল দেখ্‌ছে। এই রকম যাত্রীদের জন্য ত সব রকম খাবার এ পর্য্যন্ত তৈরী করা হয়নি! আজকে রেলের তিন জন সাহেব যাবে এখান দিয়ে, তাদেরই কয়েক জনের জন্য মাত্র তৈরী আছে। সে সব একে দিলে তাদের কি দেবে? কিন্তু ম্যানেজারের কিছু বলতেও সাহস হচ্ছে না। আদিত্যর ঐ যোয়ান চেহারা, পরনে হাফপ্যাণ্ট আর হাফশার্ট, হাতে একটা হাণ্টার। তার উপর আদিত্যর মেজাজ একেবারে আগুন; যারা ওকে আগে দেখেনি তারা এখন ওকে দেখ্‌লে ভাব্‌বে যে ভীষণ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক—রেগে গেলে হয়ত খুনও কর্ত্তে পারে।

আদিত্য কড়া গলায় মাঝে মাঝে হাঁক্‌ছে "কৈ হে ছোক্‌রা, কাট্‌লেট্ নিয়ে এস, কারী, ডেভিল কৈ?"

ম্যানেজার ভাবলে যে সে নিজেও বুড়ো আর ঐ য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ত একটা ছোকরা! দু'জনকে হয়ত ও এক থাপ্পড়ে দেবে শেষ করে। যা কিছু জোর তা ত' ঐ যমদূতাকৃতি ড্রাইভারটার সাহসে! সেও ত চলে গেছে।

ম্যানেজার ছোক্‌রাটাকে বল্লে—"দে, ঐ সাহেবদের খাবারগুলিই দে—এখন এর হাত থেকে ত বাঁচা যাক!"

কিন্তু সাহেবদের জন্যও অত জিনিষ তৈরী ছিল না—দু' একটা কম ছিল। আদিত্য ছাড়বার পাত্র নয়, মহা হৈ চৈ লাগিয়েছে।

ম্যানেজার তখন নিজেই য়্যাসিষ্টাণ্টকে নিয়ে লেগে গেল তৈরী কর্ত্তে। একটু পরে তৈরী করে এনে দিল।

আদিত্য এতক্ষণ একা বসে থেকে যেন বিশেষ বিরক্ত, বল্‌লে, "মশাই, আমার এ ছুরীটা ভাল নয়, আর একখান ছুরী দিন ত।"

ছোকরাটা অন্য টেবিল থেকে ছুরী দিতে গিয়ে দেখে কোনও টেবিলে একখানিও ছুরী কাঁটা বা চামচ—কিচ্ছু নেই। এমন কি ওদিকের রূপোর ক'খানাও নেই। সে ত অবাক্—

ম্যানেজারকে আন্‌ল ডেকে। ম্যানেজার এবার প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি? এ যে বিপদের উপর বিপদ্। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আদিত্যর দিকে তাকাতে লাগ্‌ল।

আদিত্য যেন নিজে মনেই বল্ল "হুঁ, হয়েছে, ঠিক হয়েছে, করুন মশাই জোচ্চুরী! সব

ম্যানেজারকে দেখ্‌লে তখন দুঃখ হয়।

সরিয়েছে ত? ভয়ানক ছেলে মশাই, আপনার অনেক দিনের লাভে জল ঢেলে দিল—কি বলেন? কত টাকা হবে দাম?"

ম্যানেজার বল্লে, "তা ঐ রূপোরগুলো নিয়ে প্রায় তিন শ টাকা হবে; সত্তরখান টেবিলের ছুরী কাঁটা চামচ, তার উপর আবার রূপোর—"

"যাক্ গে মশাই, এখন আমাকে খেতে দিন—"

আর খেতে দিন! ম্যানেজারকে দেখ্‌লে তখন দুঃখ হয়। বুড়ো কাঁদতেও পার্‌ছে না, অথচ চোখ ফেটে জল আস্‌ছে তার, বল্লে, "কে নিয়েছে, জানেন আপনি?"

আদিত্য বল্লে, "নিশ্চয়; ও যে নেবে এ খুব স্বাভাবিক, জীবনে কারো কাছে ঠক্‌ল না, আর আপনি ঠকাবেন মশাই?"

ম্যানেজার ভাব্‌ল কতক্ষণ বাস চলে গেছে—ঘোড়ায় করে পাঠালে হয়ত এখনও ধর্‌তে পারে; পাহাড়ের উঁচু পথ মোটারে উঠ্‌তে দেরী হবে। কতক্ষণ গেছে দেখ্‌তে দেওয়ালে

ঘড়িটার দিকে তাকাল। কিন্তু ঘড়ি কৈ? ঘড়িও ত নেই, ঘড়িটা শুদ্ধ নিয়ে গেছে! ওঃ আরও পয়তাল্লিশ টাকা। ম্যানেজার এবার স্রেফ ক্ষেপে উঠেছে, ছোকরাটাকে গিয়ে কি বল্লে, ছোকরাটা তক্ষুণি ঘোড়া চড়ে ছুট্‌ল পাহাড়ের পথে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে ফিরে এল—আর ফিরে এল লোকজনসমেত সেই বাসখানা।

বাসের লোকজন কেউ বুঝ্‌তে পারেনি কেন ঐ যমদূতটা তা'দের ফিরিয়ে নিয়ে এল ছোক্‌রাটার কথা শুনে। বাসখানা ফিরে আস্‌তেই আদিত্য হেসে বল্লে, "এইবার আমার খাওয়া হয়েছে চল, এবার যাচ্ছি।

যমদূত-ড্রাইভারটাকে কাছে পেয়ে ম্যানেজারের সাহস অনেকটা ফিরে এসেছে। সে বল্লে "কই মশাই, কে নিয়েছে এদের মধ্যে—দেখিয়ে দিন।"

আদিত্য একটু হেসে বল্লে, "আজ্ঞে এঁদের কেউই ত নেননি।"

ম্যানেজার এবার বোমার মত ফেটে উঠ্‌ল, চীৎকার করে বল্‌ল, "চালাকী পেয়েছেন নাকি? এক্ষুণি বল্লেন যে যে নিয়েছে আপনি তাকে জানেন!" আদিত্য অতি ভালমানুষের মত বল্লে, "তা' ত অস্বীকার কর্‌ছি না, যে আমি বলেছি যে কে নিয়েছে জানি, তবে এরা কেউ নিয়েছে এ কথা ত আমি বলিনি!"

"কে নিয়েছে তবে?"

"আজ্ঞে আমি—"

"আপনি নিয়েছেন? কখন নিলেন, আর কোথায়ই বা রেখেছেন? অতগুলি ছুরী কাঁটা কি পকেটে রেখেছেন নাকি? চালাকীর আর জায়গা পান নি? ঠিক করে বলুন, ভাল হবে না বল্‌ছি—"

"আজ্ঞে আমিই নিয়েছি যখন আপনারা ঘরে কেউ ছিলেন না—এবং রেখেছি ঐ দেখুন—বলে ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড 'ওয়েষ্ট পেপার' বাস্‌কেট ছিল, তার দিকে আঙ্গুল দেখা'ল। সকলে কাছে গিয়ে দেখে সেইটার মধ্যে ছুরী কাঁটা চামচ স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে রয়েছে—এমন কি ঘড়িটা পর্য্যন্ত তার মধ্যে পড়ে টিক্ টিক্ কর্‌ছে। সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠ্‌ল, বুড়ো ম্যানেজার পর্য্যন্ত একটু বোকার হাসি হাস্‌ল, বল্লে, "আচ্ছা লোক মশাই, আমি বলি বুঝি এরাই কেউ নিয়ে সরে পড়েছে, তাই ত বাস ফিরিয়ে আনালাম।" আদিত্য দাঁত বার করে একটু কেঠো হাসি হেসে বল্লে, "আজ্ঞে, তা আন্‌বেন বই কি, নৈলে আমাকে ত হেঁটে যেতে হ'বে—বুঝছেন না—বনের মধ্যে রাত কাটাতে হ'বে ভেবেছিলুন!"

বাস আবার চল্‌ল। আদিত্য বল্লে, "দেখলে ত; বনের মধ্যে রাত কাটাতেও হ'ল না—অথচ সমস্ত কিছু খেয়ে তবে ছাড়লাম। সবাই এই মজার ব্যাপারে প্রচুর আনন্দ উপভোগ

কবুল। কেবল ভীমেরই মহা দুঃখ, ভাবলে, আদিত্য সব খাবার খেয়েছে আর সে কিনা শুধু দু'খান মাত্র চপ্। তার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

ওপারের ঢেউ

মার্শাল পিল্‌সুড্‌স্কিস্থ

(শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন)

বর্ত্তমান ইউরোপের ম্যাপখানি খুলিলে দেখিতে পাইবে, জার্ম্মানীর উত্তর পূব কোণ জুড়িয়া রহিয়াছে প্রকাণ্ড একটা দেশ—নাম তার পোল্যাণ্ড। বিগত ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের আগে এ দেশটির কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া খুসীমত পোল্যাণ্ডকে বার বার ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছিল। পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তাদের এই অধীনতা কোন দিন নির্ব্বিবাদে মানিয়া নিতে পারে নাই। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী পরাজিত হইবার পর বিজয়ী জাতি-মণ্ডলী পোলিশ জাতির অনেক দিনের কামনা সার্থক করিল—ছত্রভঙ্গ পোল্যাণ্ডকে এক সঙ্গে গাঁথিয়া নূতন একটা স্বাধীন দেশ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ দিল। এই গড়িয়া তোলার পেছনে পোল্যাণ্ডের যে ব্যক্তি কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন—সেই মার্শাল পিলসুড্‌স্‌কি গত ১২ই মে মারা গিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা পিল্‌সুড্‌স্কি

নূতন পোল্যাণ্ডের বয়স হইয়াছে মাত্র ১৫ বছর—একটা জাতির পক্ষে এ কিছুই না। যিনি ইহাকে দ্রুতগতিতে বড় হইবার পথে নিয়া চলিয়াছিলেন—যাঁর বুদ্ধি ও বাহুবলে পোলিশগণ চিরস্থায়ী জাতিরূপে জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি

ক্ষমতাশালী জাতিগণের সঙ্গে একাসনে বসিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল, সেই মার্শাল পিলসুড্‌স্‌কি তাঁর কাজ শেষ না হইতেই চলিয়া গেলেন, পোল্যাণ্ডের অনেক ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

মার্শাল পিলসুড্‌স্‌কি ১৮৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন—পোল্যাণ্ডের যে অংশ রাশিয়ার দখলে ছিল, তাহাই তাঁহার দেশ। বড় হইয়া দেশের দুর্দ্দশা তাঁহার চোখে পড়িল। ক্র্যাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন তিনি, দেশ তাঁহার পরাধীন এ চিন্তা তাঁহার পরম মনোবেদনার কারণ হইল। তিনি দেখিলেন পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব বৈভব ফিরাইয়া আনিতে হইলে একটি দল গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নবগঠিত 'পোলিশ সোসিয়ালিষ্ট পার্টির' একজন প্রধান সভ্যরূপে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন। রাশিয়ার গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এ ঔদ্ধত্য সহ্য করিবেন কেন? তিনি বন্দী হইলেন। ওয়ার্‌স, যাহা আধুনিক স্বাধীন পোল্যাণ্ডের রাজধানী হইয়াছে, তাহারই দুর্গে তাঁহাকে রাখা হইল।

পিল্‌সুড্‌স্কি পালাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ভারতের ইতিহাসে তোমরা পড়িয়াছ, মোগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বন্দী মহারাষ্ট্র জাতির জন্মদাতা মহাবীর শিবজী অসুখের ভাণ ও তার পর আরোগ্য লাভের ভোজ দেওয়ার অছিলায় সম্রাট্‌কে ভুলাইয়া কি ভাবে পালাইয়াছিলেন। পিলসুড্‌স্‌কিও সেই রকম এক চাল চালিলেন—পাগলের ভাণ করিয়া চারি দিক্‌কার পাহারাওয়ালা ও দুর্গের কর্ম্মচারীদের একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। এই বিষম পাগলকে নিয়া তাহাদের থাকা হইল অসম্ভব। 'পাগল-সাজা' পিলসুড্‌স্‌কিকে অগত্যা রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট্‌পিটার্সবার্গে (এখন ইহার নাম লেনিনগ্রাড্) চিকিৎসার জন্য চালান দেওয়া হইল। সেখান হইতে একজন তরুণ পোলিশ ডাক্তারের সাহায্যে তিনি চম্পট্ দিলেন। এই ডাক্তারটি পিলসুড্‌স্‌কিরই দলের লোক—কৌশলে রাশিয়ার রাজকর্ম্মচারীদের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহার চিকিৎসার ভার নিয়াছিলেন।

এইবার পিলসুড্‌স্‌কি দেশের কাজে একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন। মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়িল; তিনি প্রথমে জার্ম্মানীর পক্ষ নিলেন। গত যুদ্ধে তাঁহার কার্য্যবিধি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, একমাত্র দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ

মঙ্গল ও পোলিশ জাতির স্বাধীনতাই ছিল তাঁর জীবনের কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি জার্ম্মানীর পক্ষ অবশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীও তাঁহাকে পরম বিরোধী জ্ঞানে বন্দী করিল। যাহা হউক্, জার্ম্মানীর পরাজয়, ভার্সাইর সন্ধি প্রভৃতির পরে পোল্যাণ্ড ১৯১৯-২০ সনে নূতন স্বাধীন জাতিরূপে নিজেকে স্থাপন করিল। পিলসুড্স্কি দেশের প্রধান নায়ক হইয়া বসিলেন। এই নায়কত্ব প্রায় একটানা ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বজায় ছিল।

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স' আজ ইউরোপের প্রধান সহরগুলির মধ্যে একটি। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অঙ্গই ওয়ার্স' গ্রহণ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর ড্যানজিগ্ বাল্‌টিক সাগরের পাড়ে। বাণিজ্যেও পোল্যাণ্ড খুব অগ্রসর হইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে পোল্যাণ্ড গণতন্ত্র (সর্ব্ব-সাধারণের প্রতিনিধিগণের মত নিয়া যে শাসন-প্রণালী) স্থাপন করিয়া ভিতরকার গঠন-কার্য্যে মন দিয়াছে। অবশ্য এই গণতন্ত্রের অন্তরালে পিলসুড্স্কিই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। বাহিরের শত্রুর আক্রমণ ও অনিষ্ট-সাধনের বিরুদ্ধেও পোল্যাণ্ড সর্ব্বদা সজাগ রহিয়াছে। এ বিষয়ে মার্শাল পিলসুড্স্কির নীতি ছিল—প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে পরস্পর স্বার্থের সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও যথাসম্ভব মিতালী স্থাপন করা। এই কার্য্যে তাঁহার সাফল্যও হইয়াছে খুব। পোল্যাণ্ডের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আজকাল আর বিশেষ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে পোল্যাণ্ডকে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী করিয়া তোলার পেছনে পিলসুড্স্কির অসাধারণ কৃতিত্ব রহিয়াছে। তাঁহার অসমাপ্ত কাজের ভার তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থায় বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত লোক পোল্যাণ্ডে আছে কি না, তাহাই এইবার আমাদের দেখিবার সময় আসিয়াছে। পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে বাস্তবিকই পিল্‌সুড্স্কির চেয়ে বড় নাম আর নাই।

ওড়া-পথে দুর্ঘটনা—'ম্যাক্সিম গোর্কি'র পরিণাম

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্)

ওড়া-পথে দুর্ঘটনার কথা আজ কিছু নতুন নয়। মানুষের উড়ে বেড়াবার

পুরানো সখটা যে কত রকম বাধাবিপদ্‌কে অগ্রাহ্য ক'রে সফল হ'য়েছে, তা' তোমরা বঙ্কিম বাবুর লেখা সেই চমৎকার প্রবন্ধটীতে পড়েছ—আর যদি এখনও না প'ড়ে থাক তা' হ'লে নিশ্চয় প'ড়ে নিও। বঙ্কিম বাবুর লেখ্‌বার পর অনেক দিন হ'য়ে গেছে। এখন উড়োকলের অনেক উন্নতি হ'য়েছে আর সেই সঙ্গে উড়ে বেড়ানোর বিপদ্‌ও অনেকখানি ক'মে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছেই। ছোট ছোট বিপদের কথা ছেড়েই দিলাম। এই ত' ১৯৩০ সালে R-101 নামে একখানা প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ বিলেত থেকে আমাদের দেশে আসবার পথে আটচল্লিশ জন লোকশুদ্ধ ফান্সের একটা গ্রামে প'ড়ে গিয়ে চূরমার হ'য়ে যায়। তা'র পর রাশিয়াতে একখানা খুব বড় এরোপ্লেন তৈরী করা হয়, তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছিল K-7; এত বড় প্লেন আর তৈরী হয় নি। এক শ' আটাশ জন লোকের বসবার ব্যবস্থা তা'তে ছিল। সেখানাও প্রথমবার উড়বার মুখেই খার্টভ্ নামে একটা জায়গায় প'ড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যায়, আর চৌদ্দজন লোক তা'তে মারা পড়ে।

এতেও না দমে রাশিয়া আবার একখানা এরোপ্লেন তৈরী করেছিল, আর তা'র নাম দিয়েছিল "ম্যাক্সিম্ গোর্কি"। তোমাদের মধ্যে যা'রা "দাদার মত বড়" হ'য়েছ তা'রা নিশ্চয় শুনেছ যে এ নামটী রাশিয়ার

"ম্যাকসিম্ গোর্কি"

এক জন প্রসিদ্ধ লোকের। আর যা'রা আর একটু বেশী খবর রাখ' তারা হয় ত' বিখ্যাত বই "মা" যে তাঁরই লেখা তা'ও জান। গোর্কির জন্য একটী "জয়ন্তী"সভা ক'রে তা'তেই এই এরোপ্লেনখানা তৈরী করবার কথা প্রথমে ঠিক হয়। উদ্দেশ্য ছিল যে দেশের ভিতর শিক্ষা-প্রচারের কাজে এই এরোপ্লেন খানাকে লাগান হ'বে। এই বিরাট্ ব্যাপারে এবং ভাল কাজে গোর্কির নাম যোগ ক'রে তাঁকে সম্মান করবার

কথা হয়। তৈরী করবার খরচ দেওয়া হয় চাঁদা তুলে, প্রায় আশী লক্ষ রুব্‌ল্। রুব্‌ল্ রাশিয়া দেশের "টাকা", এক রুব্‌ল্ আমাদের প্রায় দেড় টাকার সমান। ত্রিশটা কারখানায় এর সব অংশগুলি তৈরী হয়, রাশিয়া গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে।

জিনিষ খানাও হ'য়েছিল সেই রকম। এরোপ্লেনটাকে একটা উড়ন্ত পাখী মনে ক'রে নাও। এই কলের পাখীটির এক ডানার আগা থেকে আর এক ডানার আগা পর্য্যন্ত ২১০ ফীট্, আর ঠোঁট থেকে লেজ পর্য্যন্ত ১০৭ ফীট্, অর্থাৎ শরীরটা প্রায় কলকাতার অক্টারলোনি মনুমেণ্টের সমান আর পাখাটা শরীরের প্রায় দ্বিগুণ। সত্তর জন লোকের বসবার, শোবার, স্নানের, রান্নার আর খাবার জায়গা—এমন কি কাপড় ছাড়বার ঘর পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নি। এরোপ্লেনখানার ঠোঁটের দিক্ থেকে যদি দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌তে, তা' হ'লে প্রথমেই দেখ্‌তে পেতে পরিচালকের ঘর, তার পর ক্রমে বৈঠকখানা এবং বেড়াবার জায়গা। তার পরেই ডানার ভেতর যে লম্বালম্বি বারান্দা আছে সেটা পার হ'য়ে খাবার ঘর, রান্নার ঘর, নক্‌সার জায়গা, স্নানের ঘর। ডানার মধ্যে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, মিস্ত্রীদের ঘর, এমন কি নিজেদের যে বিদ্যুৎ দরকার তা তৈরী করার যন্ত্রও ছিল। আর, ঘরে ঘরে কথা বলবার জন্য টেলিফোন তো প্রায় সব বড় এরোপ্লেনেই থাকে, এটা তো বড়দেরও বড়।

রাশিয়ার গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল যে এই এরোপ্লেন খানাকে শিক্ষাপ্রচারের কাজে ব্যবহার করা হ'বে। প্রচারের কাজে এরোপ্লেনের খুব সুবিধে, কারণ এর জন্য রেল-লাইন পাত্‌তে হয় না, পাহাড় কাট্‌তে হয় না, নদীর স্রোত ঠেল্‌বারও দরকার নেই, আকাশের পথ দশদিকেই খোলা এবং একই রকম। চলাফেরাও করা যায় খুব তাড়াতাড়ি, কারণ একখানা সাধারণ এরোপ্লেন যত তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারে, ষ্টীমার বা সাধারণ কোন রেলগাড়ী অত জোরে যেতে পারে না। কাজেই ঠিক করা হয় যে এই এরোপ্লেনখানা নিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানকার লোকজনের মধ্যে ছোট ছোট কাগজ এবং খবর বিলি করা হ'বে, "জাহাজে" উড়তে উড়তেই খবর ছাপবার সুবিধের জন্য ছাপাখানা ছিল একটা ঘরে। একটা ঘরে বায়স্কোপে নানারকম শিক্ষাপ্রদ ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়, সেই ঘরের একটা দিক্ খুলে দিলে তার সামনে

মাঠে ব'সে দশ হাজার লোক ছবি দেখতে পার্‌ত'। এরোপ্লেন থেকে বক্তৃতা দিয়ে খুব জোরালো লাউড্-স্পীকার যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে এক মাইল দূরে পর্য্যন্ত তা' শোনাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। এ ছাড়া টাট্‌কা খবর দেবার জন্য বেতার যন্ত্র, ফটো তোলবার কামরা, এবং ল্যাবরেটরী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদের কাজ করবার ঘর ইত্যাদি আরও কত কি ছিল, তা' আর বলবার নয়।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এরোপ্লেনখানা এই মোটে ক'দিন হ'ল তৈরী করা শেষ হ'য়েছে, তাই যাঁরা তৈরী ক'রেছেন তাঁরা কয়েকজন তাঁদের কয়েকটী আত্মীয় ও বন্ধুকে নিয়ে গত ১৮ই মে তারিখে মস্কো সহরের এরোপ্লেনের মাঠের উপর "ম্যাক্‌সিম্ গর্কি"-তে চ'ড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। আর একখানা ছোট এরোপ্লেন কাছেই উড়্‌ছিল'। সেখানা হঠাৎ টাল সাম্‌লাতে না পেরে এই বড় এরোপ্লেনে এসে ধাক্কা মারে। তৎক্ষণাৎ দুখানা প্লেনই পড়ে চূরমার হ'য়ে যায়। আঠারটা মনুমেণ্ট্ মাথায় মাথায় সাজালে যত উঁচু হয় প্রায় ততটা উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে সব শেষ হ'য়ে গেল! ১১ জন লস্কর, ৩৬ জন আরোহী আর ছোট প্লেনখানার চালক একজন, এই মোট আটচল্লিশ জনের মধ্যে কেউই বাঁচে নি।

সেদিন আমাদের এখানেও ঐরকম একটা দুর্ঘটনা হ'য়ে গেছে। কল্‌কাতার কাছে দমদমের এরোপ্লেনের মাঠে দু'খানা ছোট এরোপ্লেনে ধাক্কা লেগে চা'র জন মারা গেছেন। ভারতবর্ষে এতবড় এরোপ্লেন দুর্ঘটনা আর হয় নি' বটে, কিন্তু সব দেশেই মানুষের বড় হ'বার ইচ্ছা তা'কে এই ভাবে মরণের পথে বার বার টেনে নিয়ে গেছে এবং নিচ্ছে। তা'তে মানুষের উৎসাহ গিয়েছে বেড়ে। হার সে মাথা পেতে মেনে নেয় নি', এই তার বাহাদুরী আর এরই জন্য মানুষ এত বড় হ'তে পেরেছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

বেহালা এইচ., ই স্কুল হইতে প্রকাশিত শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামপ্রসাদ সিং সম্পাদিত হাতে লেখা পত্রিকা "শকুন্তলা" এক সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। পত্রিকাখানির অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ সুন্দর। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৫

কাশী বনাম কলিকাতা

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে বড় রাস্তা ধরিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের দিকে আগাইতে বাঁ হাতে একখানি পানের দোকান পড়ে; বিদেশী যাত্রী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী বাবুদের ভীড় সেখানে লাগিয়াই আছে। পানের জন্য যতটা না হোক্, বিখ্যাত জর্দ্দা এবং সুর্ত্তির জন্য এ দোকানখানি কাশীধামে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। দোকানের মালিক ধনপৎ কাজেরিয়া একটা ফিন্‌ফিনে কাপড়ের টুপি মাথায় গোঁফে তা দিতে দিতে সম্মুখের জনসমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে, বোধ করি "ভারীগোছে"র খরিদ্দার কে হইতে পারে মনে মনে তাহারই গবেষণা করে। গত কুড়ি বছর ধরিয়া কাশীবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক ধনপৎকে ঠিক এই একই ভাবে দেখিয়া আসিতেছে।

তিনটি বাঙ্গালী ছোক্‌রা আসিয়া দোকানখানির সাম্‌নে দাঁড়াইল। একটু মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে এটা বুঝিতে কারো'ই কষ্ট হইত না যে কাশীতে তারা এই সবে প্রথম আসিয়াছে। কোন্ কোন্ জায়গা দেখা হইল, কোন্ কোন্ স্থান দেখিতে এখনও বাকী, আজ বিকালের প্রোগ্রাম কি করা হইবে—আলাপটা চলিতেছিল সেই সব সম্পর্কেই। এক জন তাঁদের মধ্যে ধনপতের সাম্‌নে আসিয়া কহিল, "দেখি হে পয়সা তিনেকের পান! বেশ ভা—লো করে মশ্‌লা-টশ্‌লা দিয়ে আমাদের সাম্‌নে সেজে দাও দেখি!"

ধনপৎ পান বিক্রী করে একখানা টুলের উপর বসিয়া, তার সাম্‌নে হাল-ফ্যাসান-দুরস্ত দোকানের মত একটি কাউণ্টার রহিয়াছে; ফলে রাস্তা হইতে নজরে আসে কেবল তার ভুঁড়িটুকু পর্য্যন্ত—শরীরের আর সমস্ত অংশই কাউণ্টারের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। আগন্তুক ছেলে তিনটির বোধ হয় লক্ষ্যে আসিল

না যে ধনপৎ কাজেরিয়া দুই হাতে পানের মশলা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে বোতামের মত ছোট অথচ উঁচু কি একটা জিনিষ বার তিনেক টিপিয়া ছাড়িয়া দিল। তার পরেই পান সাজিতে সে হঠাৎ অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আরও এক জন নূতন খরিদ্দার আসিয়া জুটিয়াছে; এ ব্যক্তি-টিও বাঙ্গালী, তবে বয়স্ক, এবং বহুদিন কাশীবাসের ফলে বেশভূষায় একটু হিন্দুস্থানী ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মুখবিলাস সূর্ত্তি হ্যায় শেঠ্‌জি?"

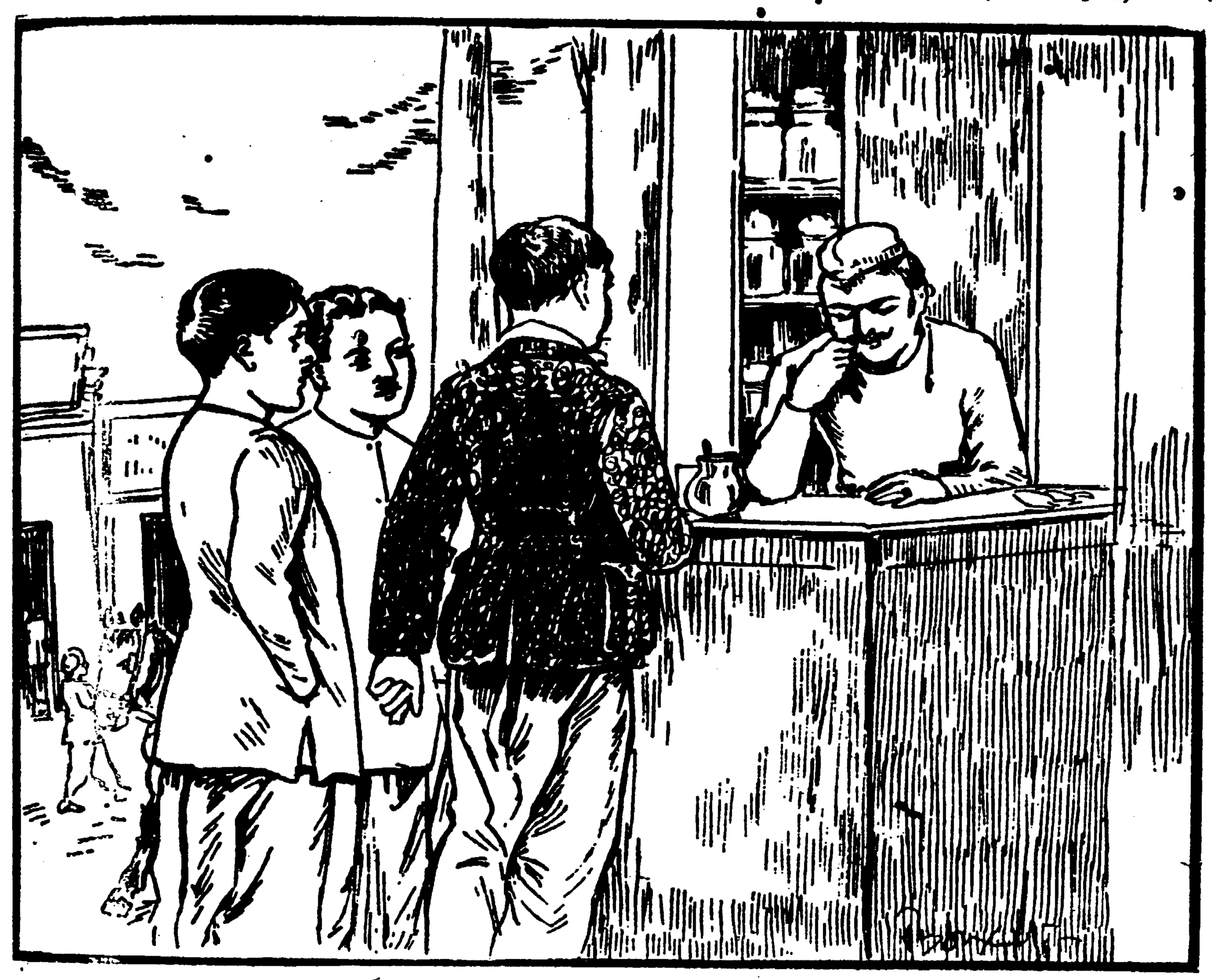

দেখি হে পয়সা তিনেকের পান!

"কতে লিবে?"

"পা'ভর"

চোখের তারা দুইটি উপরে তুলিয়া ধনপৎ মনে মনে একটু ধ্যান করিল, তার পর কহিল, "বল্‌নে নেই শক্‌তা! দেখ্‌নে হোগা হ্যায় কি নেহি।" যে ছেলেটি পান চাহিয়াছিল তার দিকে তাকাইয়া কহিল, "মেহেরবানি কর্‌কে এক মিনিট্ মাফ্ কীজিয়ে বাবু সাব্।"

দোকান ঘরটিকে আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করিয়া মধ্য খানে একখানি কাঠের পার্টিশন; তার অপর দিকে ধনপতের জর্দ্দা-সূর্ত্তির ভাণ্ডার। ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে ধনপৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "অন্দরমে আ কর্ সূর্ত্তিকা ওজন দেখ্‌লি জিয়ে।"

আহ্বান শুনিয়া নবাগত খরিদ্দারও ধনপতের অনুসরণ করিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই জন একত্র হইতেই খরিদ্দার ফিস্‌ফিস্ করিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি সর্দ্দার, কলিং বেল্ টিপে ডেকে পাঠালে যে! অশনি বাবুর চিঠি…"

সর্দ্দারের ললাটে তখন চিন্তার চিহ্নস্বরূপ তিনটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে কহিল, "কল্‌কাত্তার কথা পরে হোবে রামদয়াল—রাৎরে ; আগে হাঁথের চিড়িয়াটা পাকড়া। টঙ্গা কোথা ? ফুকন সিং কী করিয়ে এল ?"

"ফুকন সিং তো তোমার হুকুম মত ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারীটাকে নিয়ে সারনাথ দেখাতে গেছে, এখনো ফেরে নি তো! অবশ্য ফের্‌বার সময়ও হয় নি।"

"আচ্ছা, এক্কা ঠিক আছে ? শিউরতনকে বোলায় দিতে পার্‌বি ?"

"তা বরং সম্ভব।"

"বহুৎ আচ্ছা। হামার দুকানে যে তিনঠো বংগালী বাবু পান কিন্‌বার লেইগে দেঁড়িয়ে আছে তুই ভালু করে ওদের চিন্‌হিয়ে রাখ্। বেলা পাঁচ্‌টার সময় ওরা রামকিষেণ মিশন থেকে আন্‌ওয়ারসিটি দেখ্‌তে নগুয়া যাবে। পাঁচ্‌টার সময় শিউরতন ওহি জায়গায় হাজির থাক্‌বে, ওদের সওয়ারী করে লেবে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌ওয়ারসিটি দেখ্‌লাবে, ঘোঁড়াকে দানাপনি খিলাবে, সাড়ে আটটার আগে আন্‌ওয়ারসিটির ফটকসে বাহার হোবে না। নওটার কুছু আগে তুই পাঁচ সাতঠো আদ্‌মি লিয়ে রাস্তার মধ্যি লুকিয়ে থাক্‌বি, এক্কা হাজির হলেই ছোরা দেখ্‌লায়ে ওদের সব চীজ্ কেড়ে লিবি। পিড়হানে সোনার বোতাম আছে, হাঁথে দামী ঘড়ি আছে, আংটিভি আছে। চশ্‌মাগুলো বিল্‌কুল্ রোল্‌গোল্—তবু ছিনিয়ে লিবি, আঁখসে কুছু দেখ্‌তে পাবে না। হোটেলে উঠেছে, রূপেয়া উপেয়া লোট-টুট সমুচায় পাকিটে পাকিটেই ঘুর্‌বে।"

শিষ্যকে যথোচিত উপদেশ দিবার পর ধনপৎ ঠোঙ্গায় মোড়া খানিকটা ভাঙ্ তার হাতে তুলিয়া দিল, কয়েকটা টাকাও দিল—উদ্দেশ্য বাহিরের লোকে বুঝিবে রামদয়াল ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকান হইতে মুখবিলাস স্ফূর্ত্তি কিনিয়া বাহির হইতেছে। টাকাটা রামদয়াল দোকান হইতে বাহির হইবার সময় মূল্যস্বরূপ

ধনপতের হাতেই ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। কাশীতে এই ধরণের খরিদ্দার ধনপতের আরও অনেক আছে।

রাত্রি এগারটার সময় দোকানের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ধনপৎ যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল সেটাকে তার বাড়ী বলিলে যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হইবে না, বলা উচিত আস্তানা।

কাশীর গলির তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করিবেন, তবে এ কথা নিশ্চিত যে, এ আস্তানাটি যে অঞ্চলে সেখানকার গলির উপমা পৃথিবীতে নাই। একটা গোলকধাঁধা বলিলেই হয়, এরোপ্লেন হইতে ফটো তুলিয়া 'রামধনু'র ধাঁধা বিভাগে ছাপাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যারা কাশীতে আজন্ম কাটাইয়াছে তাদেরও কয়েক জনকে এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে সারাদিনেও পথ খুঁজিয়া পাইবে কিনা, ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

আস্তানাটি একটা বহু পুরাতন বাড়ীতে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যখন কাশীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁরই কোন প্রজা এটি তৈরী করিয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় সমস্তটা জায়গা জুড়িয়া ফরাস পাতা, তারই উপর দশ বারো জন লোক—কেউ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে, কেউ বা ঘুমাইতেছে, বাকী কয় জন হামান্‌দিস্তার মত বিরাট্ পাত্রে এক মনে সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, ধনপৎ বার কয়েক করাঘাত করিল। এ করাঘাতের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে যাহাতে ভিতরের লোকে বুঝিতে পারে যে আগন্তুক তাদেরই গোষ্ঠীর কেউ, দরজা নির্ভাবনায় খোলা যাইতে পারে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ধনপৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল ; ফরাসের এক ধারে অনেকগুলি টাকা ও নোট স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, তারই পাশে একটু দূরে কতগুলি সোনা ও রূপার অলঙ্কার। এগুলি আজ সারা দিনের লুণ্ঠিত 'লভ্য'। ধনপৎ মনে মনে খুসী হইয়া এক জন স্যাকরেদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "রামদয়াল কোথা রে ?"

যাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, সে রামদয়ালেরই কনিষ্ঠ, উত্তর করিল, "দাদা তো ফেরে নি এখনও, সর্দ্দারজি!"

"আভিতক্ ফির্‌ল না? নওটার সময় নাগুয়ামে লুট্ সারার কথা, সাড়ে গ্যারা হয়ে গেল যে!" ধনপৎ বিস্মিত, একটু বুঝি চিন্তান্বিতও হইয়া পড়িল। "শিউরতন? উ কোথায়?"

"সেও তো ফেরে নি!"

ঠিক এই সময় দরজায় আবার করাঘাত পড়িল, পরিচিত, কিন্তু একটু যেন দুর্ব্বল করাঘাত। ধনপৎ নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে উঠিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—রামদয়াল টলিতে টলিতে কোন মতে ঘরে ঢুকিতেছে, তার পরনের জামা-কাপড়গুলি কে যেন কাদা-গোলা জলে ছোপাইয়া দিয়াছে, ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে রক্তের দাগ আর কপালটি ফুলিয়া হইয়াছে ঠিক যেন একটা দু'পয়সা দামের মার্ব্বল্। তার পিছনে শিউরতনের অবস্থাও খুব সুবিধাজনক নয়, সেও খোঁড়াইতেছে।

ধনপৎ প্রথমে মনে করিল, রামদয়াল বোধ হয় টাকা হাতে পাইয়া একটু অতিরিক্ত রকম নেশা করিয়াছে, তারই ফলে ড্রেনে গড়াইয়া পড়িয়া তার এ অবস্থা। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই বুঝিল তার সে অনুমান ঠিক নয়—রামদয়ালের কথায় জড়তা বা চলনে মত্ততা নাই, আছে কেবল প্রচুর অবসাদ। ঘরে ঢুকিয়াই সে মেঝের এক কোণে বসিয়া পড়িল, কহিল, "ডাকাত, সর্দ্দার, স্রেফ্ ডাকাত, একেবারে শয়তানের চেলা। আমাদের সব ক'জনাকেই মেরে পাট পাট করে দিয়েছে!"

"ওই তিন্‌ঠো বংগালী ছোক্‌রা, কাশীর গুণ্ডাদের ঠুকে পাট পাট করিয়ে দিল!"

"শুধু তিন জন হলে তো ভাব্‌নাই ছিল না, সর্দ্দার, দলের ভেতর ছিল আরও জনা পঞ্চাশেক। একেবারে বাছা বাছা যোয়ান, অসুরের মত কব্জির জোর। ব্যাপারটা কি রকম ঘট্‌ল বলি শোন।…ঝোপের আড়ালে আমরা ওৎ পেতে বসে আছি, ঠিক ন'টার সময় শিউরতন একায় ক'রে ওদের এনে হাজির কর্‌ল। আমি লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার রাশ চেপে ধর্‌লাম, গিরিধারী ছোরা বার করে এগিয়ে

যেতেই ওরা চীৎকার করে উঠ্‌ল। তার পরেই ঘট্‌ল একেবারে অবাক্ কাণ্ড! প্রথমে শুন্‌লাম ঝড়ের মত একটা হু হু শব্দ, তার পরেই চেয়ে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী ছোক্‌রা সাইকেল হাতে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে আর কিছু নেই, শুধু এক-একটা করে সাইকেলের পাম্প্। বিষ্টির ফোঁটার মত সেই পাম্পের বাড়ি অনবরত আমাদের মুখে, কপালে ঘাড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল—উঃ ব্যাটাদের কব্জি নিশ্চয়ই ইস্পাতের তৈরী—গিরিধারীর হাতে এক্ মোচড় দিয়ে কি ভাবে ছোরাটা ছিনেয়ে নিলে! দেখ সর্দ্দার, কি অবস্থা করেছে" বলিয়া রামদয়াল ললাটের স্ফীতি, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

"আমরা বুঝ্‌লাম," রামদয়াল আবার কহিতে লাগিল, "এখানে বাধা দেওয়ার মানে নির্ঘাৎ মারা পড়া, তাই যে যেদিকে পারি ছিট্‌কে পড়্‌লাম। 'ডাকু'গুলো তবু কি রেহাই দেয়? পেছন পেছন তেড়ে এল। জঙ্গলে ঢাকা একটা খানা দেখ্‌তে পেয়ে তারই ভেতর তখন নিজেকে টান টান শুইয়ে দিলাম। সেই নোংরা, গন্ধ-ধরা পাঁকের ভেতর এক ঘণ্টা নরকবাস করে যখন দেখ্‌লাম গণ্ডগোল থেমে গেছে তখনই কেবল বাড়ীমুখো রওনা হতে পেরেছি। তবু সোজা পথে আসতে ভরসা পাই নি, কি জানি, ব্যাটারা যদি থানা-পুলিশ কাণ্ড করে থাকে! অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে ঘুরে তবে এয়েছি।"

শিউনন্দন কহিল, "ম্যায়নে তো হল্লা দেখ্ কর্, গাছ পর চড়্ গয়া, উৎরানেকো বখৎ গির্ গয়া!"

ধনপৎ শিউনন্দনের ক্রন্দন কানে তুলিল না, রামদয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাত নওটার সময় নাগুয়ার পথে পচাশঠো সাইকেল! এ তো বড় তাজ্জব কথা আছে রে রামদয়াল!"

রামদয়াল সংশোধন করিয়া কহিল, "তাজ্জব নয় সর্দ্দারজি, ভয়ের কথা। ঘোড়ার রাশ ধর্‌বার সময় সওয়ারীদের আলাপ আমার কানে এসেছে—ওদের মুখে অশনি বাবুর নাম শুনেছি।…তোমার দোকানে পান কেন্‌বার সময় যত ন্যাকা ওদের ঠাউরেছিলে আসলে তত ন্যাকা ওরা নয়। সোনার হরিণ নিয়ে তলে তলে মস্ত একটা ব্যাপার চল্‌ছে।"

যাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, সে রামদয়ালেরই কনিষ্ঠ, উত্তর করিল, "দাদা তো ফেরে নি এখনও, সর্দ্দারজি !"

"আভিতক্ ফির্‌ল না ? নওটার সময় নাগুয়ামে লুট্ সারার কথা, সাড়ে গ্যারা হয়ে গেল যে !" ধনপৎ বিস্মিত, একটু বুঝি চিন্তান্বিতও হইয়া পড়িল। "শিউরতন ? উ কোথায় ?"

"সেও তো ফেরে নি !"

ঠিক এই সময় দরজায় আবার করাঘাত পড়িল, পরিচিত, কিন্তু একটু যেন দুর্ব্বল করাঘাত। ধনপৎ নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে উঠিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—রামদয়াল টলিতে টলিতে কোন মতে ঘরে ঢুকিতেছে, তার পরনের জামা-কাপড়গুলি কে যেন কাদা-গোলা জলে ছোপাইয়া দিয়াছে, ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে রক্তের দাগ আর কপালটি ফুলিয়া হইয়াছে ঠিক যেন একটা দু'পয়সা দামের মার্ব্বল্। তার পিছনে শিউরতনের অবস্থাও খুব সুবিধাজনক নয়, সেও খোঁড়াইতেছে।

ধনপৎ প্রথমে মনে করিল, রামদয়াল বোধ হয় টাকা হাতে পাইয়া একটু অতিরিক্ত রকম নেশা করিয়াছে, তারই ফলে ড্রেনে গড়াইয়া পড়িয়া তার এ অবস্থা। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই বুঝিল তার সে অনুমান ঠিক নয়—রামদয়ালের কথায় জড়তা বা চলনে মত্ততা নাই, আছে কেবল প্রচুর অবসাদ। ঘরে ঢুকিয়াই সে মেঝের এক কোণে বসিয়া পড়িল, কহিল, "ডাকাত, সর্দ্দার, স্রেফ্ ডাকাত, একেবারে শয়তানের চেলা। আমাদের সব ক'জনাকেই মেরে পাট পাট করে দিয়েছে !"

"ওই তিন্‌ঠো বংগালী ছোক্‌রা, কাশীর গুণ্ডাদের ঠুকে পাট পাট করিয়ে দিল !"

"শুধু তিন জন হলে তো ভাব্‌নাই ছিল না, সর্দ্দার, দলের ভেতর ছিল আরও জনা পঞ্চাশেক। একেবারে বাছা বাছা যোয়ান, অসুরের মত কব্জির জোর। ব্যাপারটা কি রকম ঘট্‌ল বলি শোন।...ঝোপের আড়ালে আমরা ওৎ পেতে বসে আছি, ঠিক ন'টার সময় শিউরতন একায় ক'রে ওদের এনে হাজির কর্‌ল। আমি লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার রাশ চেপে ধর্‌লাম, গিরিধারী ছোরা বার করে এগিয়ে

যেতেই ওরা চীৎকার করে উঠ্‌ল। তার পরেই ঘট্‌ল একেবারে অবাক্ কাণ্ড ! প্রথমে শুন্‌লাম ঝড়ের মত একটা হু হু শব্দ, তার পরেই চেয়ে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী ছোক্‌রা সাইকেল হাতে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে আর কিছু নেই, শুধু এক-একটা করে সাইকেলের পাম্প্। বিষ্টির ফোঁটার মত সেই পাম্পের বাড়ি অনবরত আমাদের মুখে, কপালে ঘাড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল—উঃ ব্যাটাদের কব্জি নিশ্চয়ই ইস্পাতের তৈরী—গিরিধারীর হাতে এক মোচড় দিয়ে কি ভাবে ছোরাটা ছিনেয়ে নিলে ! দেখ সর্দ্দার, কি অবস্থা করেছে" বলিয়া রামদয়াল ললাটের স্ফীতি, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

"আমরা বুঝ্‌লাম," রামদয়াল আবার কহিতে লাগিল, "এখানে বাধা দেওয়ার মানে নির্ঘাৎ মারা পড়া, তাই যে যেদিকে পারি ছিট্‌কে পড়্‌লাম। 'ডাকু'গুলো তবু কি রেহাই দেয় ? পেছন পেছন তেড়ে এল। জঙ্গলে ঢাকা একটা খানা দেখ্‌তে পেয়ে তারই ভেতর তখন নিজেকে টান টান শুইয়ে দিলাম। সেই নোংরা, গন্ধ-ধরা পাঁকের ভেতর এক ঘণ্টা নরকবাস করে যখন দেখ্‌লাম গণ্ডগোল থেমে গেছে তখনই কেবল বাড়ীমুখো রওনা হতে পেরেছি। তবু সোজা পথে আসতে ভরসা পাই নি, কি জানি, ব্যাটারা যদি থানা-পুলিশ কাণ্ড করে থাকে ! অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে ঘুরে তবে এয়েছি।"

শিউনন্দন কহিল, "ম্যায়নে তো হল্লা দেখ্ কর্, গাছ পর চড়্ গয়া, উৎরানেকো বখৎ গির্ গয়া !"

ধনপৎ শিউনন্দনের ক্রন্দন কানে তুলিল না, রামদয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাত নওটার সময় নাগুয়ার পথে পচাশঠো সাইকেল ! এ তো বড় তাজ্জব কথা আছে রে রামদয়াল !"

রামদয়াল সংশোধন করিয়া কহিল, "তাজ্জব নয় সর্দ্দারজি, ভয়ের কথা। ঘোড়ার রাশ ধর্‌বার সময় সওয়ারীদের আলাপ আমার কানে এসেছে—ওদের মুখে অশনি বাবুর নাম শুনেছি।...তোমার দোকানে পান কেন্‌বার সময় যত ন্যাকা ওদের ঠাউরেছিলে আসলে তত ন্যাকা ওরা নয়। সোনার হরিণ নিয়ে তলে তলে মস্ত একটা ব্যাপার চল্‌ছে।"

"তবে তো আমাকে, তোকে, সব চিন্‌হিয়ে রেখেছে!"

"খুব সম্ভব। আমাদের বোধ হয় এখন পিছিয়ে পড়াই ভাল।"

ধনপৎ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—সোনার হরিণের জ্যোতির্ম্ময় রূপ স্মরণ করিয়া লোভীর দুই চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, কহিল, "চিন্‌হিয়েছে তো চিন্‌হুক, হামিও চাল্‌বাজী কুছু কম জানি না। হামার নাম ধনপৎ কাজেরিয়া—দেখি কাশীবালা গুণ্ডাই বড়, না কল্‌কাত্তাবালা বড়!"

(ক্রমশঃ)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

দিনের মত দিন

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

একটা ভাল দিন দেখে কয়েক জন মিলে একটা পিক্‌নিকের বন্দোবস্ত পাকা করে নিলুম। ভাল নাম বাদ দিয়ে সকলে তাকে তেলোদা' বলেই ডাকৃত, কাজেই আমরাও; তিনিই হলেন আমাদের দলের 'লিডার', আর সুনীল ব্যানার্জ্জি তাঁর সহকারী। সটান্ ট্রামে চড়ে আসা গেল গঙ্গানদীর চাঁদপাল ঘাটে। এখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে হ'লে হয় ষ্টিমারে নয় নৌকায় যেতে হয়। তেলোদা'র কথামত ষ্টিমারের টিকিটই কাটা হ'ল। এর আগে আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাই নি কোন দিন, এমন কি তেলোদা'ও না, তবু তিনি দলের লিডার, কাজেই 'গেছি গেছি' মুখে তাঁকে বসে থাকতে হ'ল। বোটানিক্যাল গার্ডেন মানে

শিবপুর বাগান এবং যেখানে নামতে হয় সেই ঘাটের নামও শিবপুর বাগান। আমরা এই প্রথম যাচ্ছি, এবং তেলোদা' ভাবছেন আমরা এবং তিনি শিবপুরেই যাচ্ছি, শিবপুর বাগান বলে যে কোন ঘাট আছে সেটা তেলোদা'র জানা ছিল না, সুতরাং আমাদেরও না। খানিক পরে চোখে পড়্‌ল শিবপুর ঘাট, ব্যতিব্যস্ত হয়ে তেলোদা' আমাদের নামতে ইসারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুনীল ব্যানার্জ্জিও। আমরা তাড়াতাড়ি খাবারের নানা রকম সরঞ্জাম সামলে সুনীল এবং তেলোদা'র কথামত পড়লাম নেমে। পরক্ষণেই ভ্রম বুঝতে পারলাম। তেলোদা' চীৎকার ক'রে খালাসীকে বল্লে, "এই রোকো, রোকো।" খালাসী দাঁত বের্ করে বল্লে, "কাল রোক্‌কে আপ্‌লোগকা উঠায় লেগা।" খালাসীর ওপর রেগে আমাদের লক্ষ্য করে তেলোদা' বল্লেন, "কুছ্ পরোয়া নেই, শর্ট্ কাট্ ক'রে বাগানে যাব।" অনেক অলি গলি পেরিয়ে সত্যিই এক সময়ে শিবপুর বাগান অথবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে পড়লাম। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা এতটা হেঁটে এলেন কেন?" হাসি চেপে তেলোদা' উত্তর দিলেন, "আরে মশাই, বুঝলেন না, শিবপুরে নামলে শর্ট্ কাট্ হয়।"

নানা রকম গাছগাছড়ায় ভর্ত্তি এই বোটানিক্যাল গার্ডেন। দেড়শ' বছরের পুরানো বটগাছের নাম সব চেয়ে আগে উল্লেখযোগ্য। এই গাছের নীচে বসলাম আমরা। এবার খাবার পালা, তবুও খাবারের পাহারায় তেলোদা' এবং সুনীলকে রেখে আমরা সারা বাগানটা একবার ঘোরবার বুদ্ধি করলাম। ঘুরে এসে দেখি দুই 'লিডার' বটগাছের নীচে দিব্যি জোরসে নাক ডাকিয়ে ঘুম মারছেন এবং একটা রুগ্ন কুকুরশাবক টানাটানি করছে আমাদের খাবারের সরঞ্জাম নিয়ে। পরিমল নস্যির টিপ একটু নাকে ঢুকিয়ে দিতেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করতে করতে উঠে বসলেন দুই লিডার। কিন্তু খাবারের বাক্স খুলে আমাদের চক্ষু স্থির! দুই লিডার ভাগাভাগি ক'রে সমস্ত খাবার খেয়ে অতি সামান্য আমাদের জন্য রেখেছেন দয়া করে। পিক্‌নিকের ফাঁড়া কাটল, আধপেটা খেয়ে ফিরলাম বাড়ী। তোমরা যদি শর্ট্ কাট্ ক'রে শিবপুর থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে চাও তা হ'লে সুনীল এবং তেলো ব্যানার্জ্জিকে সঙ্গে নিও। রামধনু অফিসের কাছেই তেলোদা' থাকেন; নম্বরটা ঠিক মনে নেই তবে গেটের দু পাশে দুটো বড় গাছ দেখলেই বাড়ী চিনতে পারবে এবং তেলোদা' তখন সুনীল ব্যানার্জ্জির বাড়ী দেবে দেখিয়ে।

আমাদের দেহের শিরা-উপশিরা দিয়া রক্ত গড়ে প্রায় ঘণ্টায় ৭ মাইল চলাচল করে। এই হিসাব মত আমাদের শরীরের রক্ত প্রতি বছর ৬০ হাজার মাইল চলাচল করে।

এপারে ও ওপারে

(শ্রীভারতী দেবী)

মাঝে ছোট নদী, এপারে তাহার ধূ ধূ করে বালুচর,
ওপারের চরে দেখা যায় ক'টি জেলেদের ছোট ঘর।
ঝক্ ঝক্ করে রাঙ্গা মাটীতে নিকানো ছোট্ট দাওয়া,
চার পাশে তার আম কাঁঠালের গহিন বনেতে ছাওয়া।
নদীর বুকেতে জেলেডিঙিগুলি বেয়ে যায় পাল তুলে,
রৌদ্রদীপ্ত বালুচর পরে খেলা করে ছেলে দলে।
এপারের চরে সারা বেলা ফেরে চখাচখী গান গেয়ে;
ওপারের চরে সাঁঝ নেমে আসে সারাটী আকাশ ছেয়ে।

ছোটদের চিত্রশালা

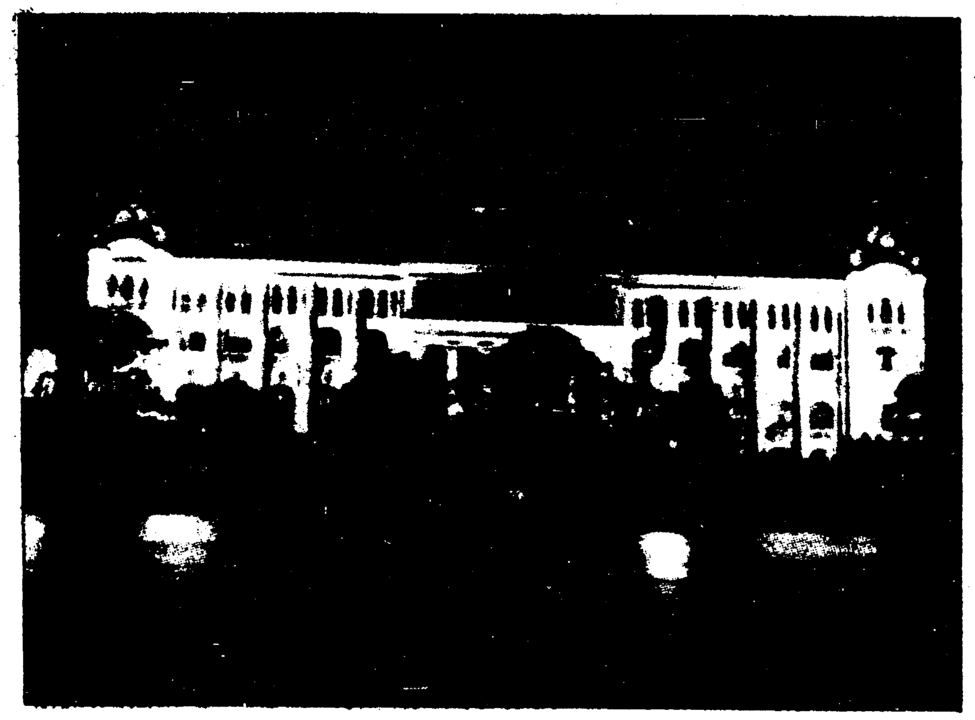

বেঙ্গল ক্লাবের আলোক-সজ্জা
(কলিকাতা)

রজত-জুবিলীর দিন রাত্রি ৯-২০ মিনিটের সময়ে তোলা।

আলোক-চিত্রগ্রহীতা—
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

চিঠি-পত্র

চৈত্র মাসের গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন শ্রীমান্ অনিলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটির নাম "দরিদ্রের ব্যথা।" দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ বক্সী—"বিদ্রোহী" শীর্ষক গল্পটী লিখে। শ্রীটীকেন্দ্রজিৎ ঘোষ লিখিত "জীর্ণ দিনে ছিন্ন ক্ষণে একতারাতে আধখানি গান গাওয়া" এবং শ্রীঅচল (গ্রাহক নং C 27) লিখিত "মাণ্‌কে" আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। শ্রীমান্ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (গ্রাহক নং ৩৭২) "তালিয়াৎ" আমাদের খুব হাসিয়েছে।

১ শ্রীনবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বৈশাখ মাসের ধাঁধা সম্বন্ধে শ্রীঅধীর-রঞ্জন রায় জানাইয়াছেন যে ধাঁধার প্লটটি তিনি একটি ইংরাজী গল্প হইতে লইয়াছেন। সম্ভবতঃ মৌচাকের লেখকও ঐ একই গল্প হইতে ধাঁধাটি লইয়াছিলেন। ধাঁধাটি যে ইংরাজী গল্প হইতে লওয়া সে কথা গোপন না করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগকে জানান উচিত ছিল। —রাঃ সঃ

সন্দেশ

২৬শে মে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-দিবস। আশুতোষ বাংলা দেশের কি ছিলেন, বাংলার ছাত্রসমাজের কি ছিলেন—তা তোমাদের কাছে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই মহাপুরুষের স্মৃতি-দিনে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে ভুলিও না।

* * *

বছর দেড়েকও হয় নাই, সমস্ত বিহার প্রদেশ যুড়িয়া কি প্রচণ্ড ভূমিকম্পটা না হইয়া গেল! ভারতমাতা সে আঘাত সামলাইবার পূর্ব্বেই এই সেদিন আবার বেলুচিস্থানে কোয়েটায় ও তার কাছে ঠিক তেমনি প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা কোয়েটা সহর একেবারে ধ্বংস হইয়া

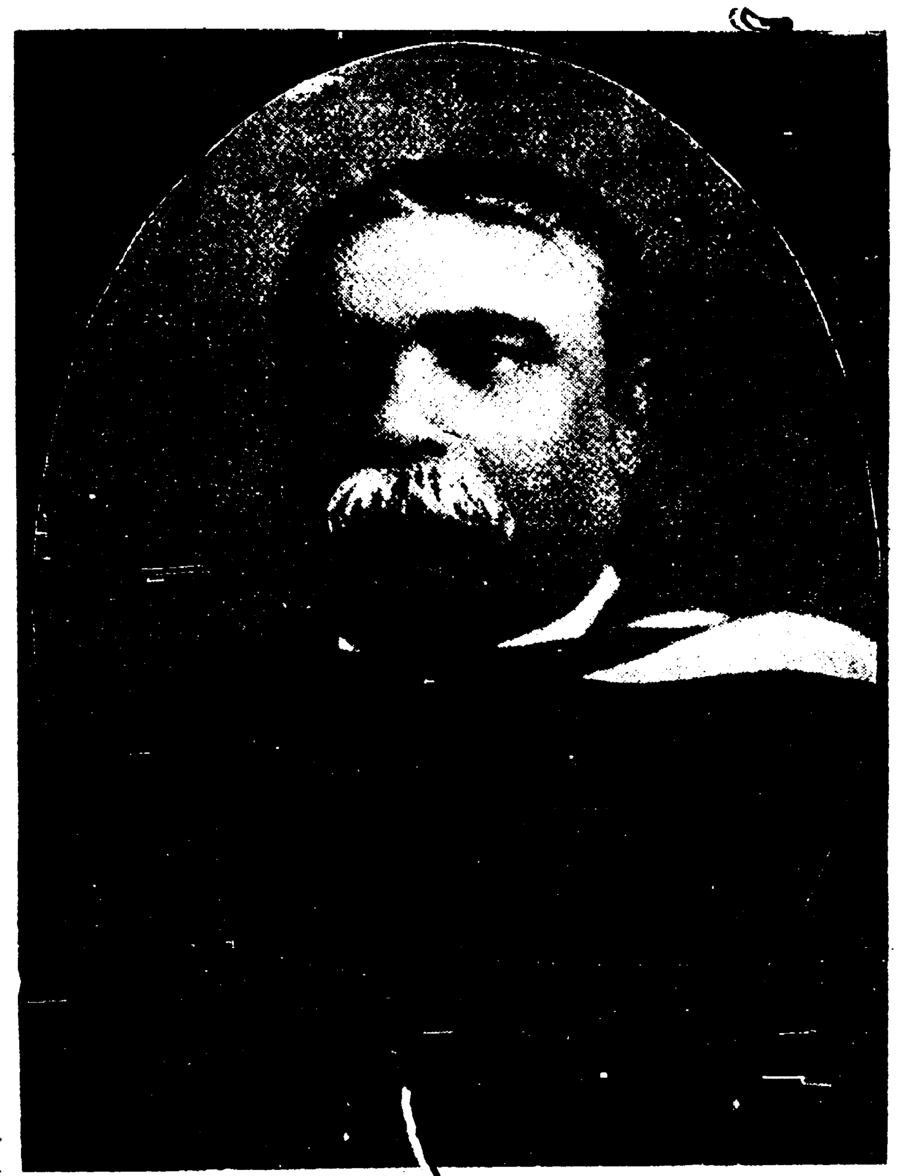

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গিয়াছে—আশপাশেও যে কত ক্ষতি হইয়াছে তার হিসাব নাই। কত হাজার হাজার লোক যে মারা পড়িয়াছে আজও তাদের খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কোয়েটায় বহু সৈন্য বাস করিত, তারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বিহারের ভূমিকম্পের চেয়ে এবারকার ভূমিকম্প কোন অংশেই কম নয়। দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি বিধাতার বারে বারে এ কি নিদারুণ বিধান!

* * *

প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানা দেশে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ মুদ্রা রূপে ব্যবহার করা হইত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখনও নারিকেল টাকা-পয়সার বদলে ব্যবহার করা হয়।

* * *

১৩৪০ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ব্ল্যাঙ্কেট নামে বেলজিয়ামের এক ভদ্রলোক বিলাতে আধুনিক ধরণের কম্বলের প্রচলন করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী কম্বলের নাম ইংরাজীতে ব্ল্যাঙ্কেট হইয়াছে।

* * *

রুষিয়া দেশের নানা কল-কারখানায় আজকাল প্রায় ৩৭ লক্ষ মেয়ে কাজ করে। কৃষিকার্য্য করে প্রায় ৫০ হাজার মেয়ে; বিজ্ঞান-চর্চ্চায়ও প্রায় সাড়ে বারো হাজার মেয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তা ছাড়া প্রায় কুড়ি লক্ষ মেয়ে শরীর-চর্চ্চায়ও যোগ দিয়াছে।

* * *

বোম্বাই প্রদেশের রাজকোটের একটি লোক গত ২৬ বছর ধরিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া আসিতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাশ করিতে পারে নাই। লোকটির অধ্যবসায় যেমন অদ্ভুত, মস্তিষ্কও তেমনি দেখা যাইতেছে!

* * *

এক জন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হিসাব করিয়া বলিয়াছেন—পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র হইতে লবণটুকু তুলিয়া লইয়া সে লবণ যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে সমস্ত দেশটা যুড়িয়া দেড় মাইল উঁচু একটা লবণের পাহাড় দেখা যাইবে।

* * *

সমস্ত পৃথিবীতে গড়ে ৪ মিনিট অন্তর একটি করিয়া লোক খুন হয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(Cross word puzzle)

অ	প	রি	মি	ত
তি	থি		ন	ব
কা	ক		তি	ল
য়		অ		তা
	মি	হি	র	

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর পাঠাইয়াছেন:—

রামেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর, কলিকাতা); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড, কলিকাতা); স্মৃতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড, কলিকাতা); গুণেন্দ্র ও রণেন্দ্রনাথ রায় (ভবানীপুর); বিজয়, বিনয় ও মঙ্গল (কুড়িগ্রাম); ডলি, তুলতুল, অন্তকণা (ভবানীপুর); শান্তি, শুভেন্দু, শান্তনু প্রভৃতি (বাসন্তী পাঠাগার, শ্রীরামপুর); কমল, অশোক ভট্টাচার্য্য ও পুষ্প হাজরা (মধুপুর); বুড়ী, জগা, খুসী ও মোহন (কলিকাতা); কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, শেফালিকা, বেলা, পঞ্চানন ও জুবিলী (কলিকাতা); বেগম শামসুন্নাহার (কাঞ্চনপাড়া, নিল্‌ফামারী); পঙ্কজকুমার ভৌমিক (উত্তরপাড়া); অমিতাভ, মুকুল, বুল্‌বুল্ (কুতুবপুর, রংপুর); কুমারী চিণ্ময়ী দাস ও সুজনকুমার দাস (কলিকাতা); সুধীর, মুকুল সুবোধ, বুচি, অঞ্জলি প্রভৃতি (ফেণী); বিদ্যুৎ, অনু ও উমা (ছাপরা) শংকরনারায়ণ কুমার, মিলনদা, গৌর, প্রভাত, রেণু, মনু, ফুটু, ভীম (ভাট্টা—পূর্ণিয়া); কল্যাণ, অজিত, অমল ও অসিত (কাঁকে); সুরেশচন্দ্র পাল (জলপাইগুড়ি); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); সুমুখনাথ মিত্র (দিনাজপুর); অংশু, সুশান্ত, পিকাটিরাণী (সাধনপাড়া); নারাণদাস, ধর্ম্মদাস (পুরুলিয়া); জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); প্রশান্ত ও মালবিকা (বক্তিয়ারপুর); মাখনচন্দ্র বাগ্‌চী, অজয়, দাদাবাবু, বড়কাকা, নারায়ণ, মাণিক, অরুণা, চিণ্ময়ী (লক্ষ্মণপুর); ইস্‌লামকাটি সাধারণ পাঠাগারের কিশোর সভ্যগণ (খুলনা); ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন—চট্টগ্রাম); শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); সুললিত, অমর-প্রতিমা (বাণীমন্দির, মুড়াগাছা); সনৎকুমার গুপ্ত (জিয়াগঞ্জ); সুপ্রভা, প্রতিভা, সাবিত্রী, মঞ্জু, মণিকা, শান্তিকণা ও অমল সেন (কানপুর); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা, হাওড়া) মানবেন্দ্র, মলয়েন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, অমূল্য, কালিদাস ইত্যাদি (মুক্তাগাছা বড় হিস্যা বড় তরফ); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, অশোক, বীণা, রথী ও লীলা (জামালপুর গ্রাঃ নং ১৩৭৪); বেণু, অতুল, তারণ (ইদিলপুর); সুকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); সমরেন্দ্র চৌধুরী (কুমিল্লা); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর); জাগরণ সমিতির মেম্বারগণ (কালিগ্রাম, মালদহ); অমল, অরুণ, নির্ম্মল, শোভন, বিকাশ, অপূর্ব্ব, স্বর্ণ (ভাগলপুর); সুরমা, প্রতিমা, নীলিমা, সতী, তমাল (পাঁতিহাল, হাওড়া); রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র ও সৌরেন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী); জগদীশচরণ বক্সী (তুলুবাবু—করকেন্দ কলিয়ারি); জলধর, বরু, নবু নামঞ্জু, গদাইকাকা প্রভৃতি (মণিহারী); নরকুমার, সুধীর, বঙ্কিম, সমরেন্দ্র, অনিল (কালনা); অনিল, হাবু গান্ধী (মধুতটী, মানভূম), আভা, অরুণ, বিমান (হাস্‌নাবাদ);

অমিয় চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ) ; বিষ্ণুপদ মতিপাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা, হাওড়া) ; শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি, বুলি, ময়না (ভাগুয়া অগর্) ; বোচা খোকা, সুরেশ, মেরী, রেণি, কানু, ডলি (ঢাকা) ; ছবিরাণী রায় (সিমলা পাহাড়) ; ক্যাপ্‌টেন কৃষ্ণদাস সরকার ও মাষ্টার পাঁচুগোপাল ঘোষ (নওপাড়া, শ্যামনগর) ; ননীবা. সুধীর রায় ও অধীরচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি) ; অমিয় ঘোষ, অজিত সাহা, বিমল পাত্র ও হরিসাধন বাগ (রাণাঘাট) ; বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর) ; গৌরীপ্রসাদ রায়, রমা, চিনু, মনু, কাচু (চাইবাসা) ; রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর) ; সুশোভন, সান্ত্বনা, অজয় (বালীগঞ্জ) ; অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য (হবিগঞ্জ) ; দেবব্রত সেন (গোয়ালপাড়া) ; কুমারী অণিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট) ; শ্রেণী ৬ এর ছাত্রবৃন্দ (কোকড়হরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুল) ; কুমারী তুষারকণা পাল (কলিকাতা) ; সুনীপ ও নীতিপ দাশগুপ্ত (হ্যালে লুইয়া স্পোর্টিং) ; সন্তোষ, অরুণা দে ও সরস্বতী গাঙ্গুলী (রাণাঘাট) ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর) ; অরুণকুমার সেন ও মার্টিন গোমেজ্ (বরিশাল) ; কুমারী লিপি মুখোপাধ্যায় ও লেখা মুখোপাধ্যায় (যোধপুর) ; অরুণকুমার গোস্বামী, অমিয়, অনিল, অজিত অসিত প্রভৃতি (বালীগ্রাম) ; নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অতুলকুমার দাশগুপ্ত (শিলঙ্) ; সত্যেন্দ্র. অজিত, সুনীল, শৈলসুতা ও অনিল (হিজলী) ; অসিতকুমার সরকার (পুরুলিয়া) ; বেণু, মনু, অনু, রুণু, ইলা, দুর্গা (বেলেঘাটা—কলিকাতা) ; কেরামউদ্দীন আহমদ (যশোহর) ; বলরাম, সত্যেন্দ্র, খগেন্দ্র, অমরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ননীগোপাল (মান্মথানগর) ।

নূতন ধাঁধা

নীচে একখানি সাঙ্কেতিক চিঠি দেওয়া আছে। ব্র্যাকেটের ভিতরকার কথাগুলির বদলে তাহাদের এক-একটি অর্থ বসাইতে পারিলেই চিঠিখানা পড়া যাইবে।

(মঙ্গল)(পাত্র)—

মা (বন্ধু)নেক (অশ্ব) তো(অনৈক অপদেবতা) সং(বর্জ্জন) (অঙ্গবিশেষ)ই (প্রত্যঙ্গ বিশেষ) (যাযাবর জাতি বিশেষ)শে (ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়)(সংখ্যাবিশেষ) (সম্মতি)(রঘুবংশধর) (গুল্মের পরিচর্য্যা)ও বু (নদী বিশেষ) না। এদিকে জ(মাখন) শো(চুল)য্যা (পৃথিবীর জাতভাই)ণ করিয়াছেন। তাঁহার (প্রত্যেক)ও কি এ(স্বাদ বিশেষ) (আমার)তা নাই ? (নক্ষত্র)(স্বামী)ও (লক্ষ্মী)(হাটে) গিয়াছে। তা(অলঙ্কার বিশেষ)ও আ(উর্ব্বরতাবর্দ্ধক) (একটি পরিচয়) (প্রত্যঙ্গ বিশেষ)।

[দ্রষ্টব্য :—ধাঁধার উত্তর সম্পূর্ণ পাঠাইতে হইবে, আংশিক উত্তর পাঠাইলে চলিবে না।]

সুরের পরশ

শিল্পী—শ্রীমান্ সুমুখনাথ মিত্র
(রামধনুর গ্রাহক)

৮ম বর্ষ { শ্রাবণ, ১৩৪২ } ৭ম সংখ্যা

আমার বাড়ী

(জসীম উদ্‌দীন)

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
বস্‌তে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে কর্‌তে দেব
শালী ধানের চিঁড়ে।

শালী ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ীর গাছের কবরী কলা,
গামছা বাঁধা দই।

আম কাঁঠালের বনের ধারে
শুইও আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করবে সারা রাতি।

চাঁদ্‌মুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি'
জড়িয়ে দেব বুকে।

গাই দোহনের শব্দ শুনি'
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।

আমার বাড়ী ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি'।

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

ক্ষতি-পূরণের দাবী

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

কেউ যদি তোমার কোন রকমের ক্ষতি করে তো তুমি তার কাছে ক্ষতি-পূরণের দাবী করতে পার—এ কথা আইন-আদালতও মানে। এমন সব অদ্ভুত ক্ষতি-পূরণের কাহিনী আছে যার কথা শুনলে কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসবে, কেউ বা দস্তুরমত বিস্মিত হবে।

১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে হারে দৈহিক ক্ষতি-পূরণ করা হ'ত তার একখানা 'ছক্' পাওয়া গেছে; তা'তে দেখা যায় যে একটা ঘুঁসি মারলে প্রায় আধ পেনী ক্ষতি-পূরণ দিতে হ'ত, কিন্তু রক্তপাত হ'লে দিতে হ'ত পাঁচ পেন্স; গলা টিপে দিলে আড়াই পেন্স, লাথি মারার জন্য পাঁচ পেন্স। কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দিলে আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তি সাত পাউণ্ড্—অর্থাৎ তখনকার তুলনায় বেশ মোটা অর্থ—ক্ষতি-পূরণ লাভ কর্‌ত।

রেলওয়ে কোম্পানীদের বিরুদ্ধে যে সব ক্ষতি-পূরণের দাবী আসে তাদের সংখ্যা যেমন প্রচুর বৈচিত্র্যও তেমনি যথেষ্ট। বিলাতের বার্মিংহামের একটী কেরাণী একবার মিড্‌ল্যাণ্ড্ রেলওয়ে পরিচালিত একখানা ওমনিবাসের ধাক্কা খান্। সেই আঘাতের ফলে তাঁর ঘ্রাণশক্তি নাকি নষ্ট হয়ে যায়—এই অভিযোগে তিনি দু'শ' পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ লাভ করেন।

আর একবার মাদাম্ কোভাৎ‍স্ নামে একটী মহিলা অষ্ট্রীয়ার এক রেল-কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে তাদের ট্রেনের আরোহী-রূপে তিনি যখন অষ্ট্রীয়ান্ আল্‌প্‌স্-এর একটা সুড়ঙ্গ (টানেল্) অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁর কামরাখানা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়; এর ফলে তিনি যে ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন তা সাম্‌লিয়ে উঠা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। কোম্পানী-পক্ষীয় উকীল নানা রকমে বুঝাতে চাইলেন যে সেই বিশিষ্ট 'টানেল্'টা মাত্র একশ' গজ দীর্ঘ ছিল এবং আইন অনুসারে চারশ' গজ দীর্ঘ 'টানেল' না হলে দিনের বেলায় ট্রেনের কামরায় আলো জ্বালাবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই—ইত্যাদি; কিন্তু জুরীরা

আম কাঁঠালের বনের ধারে
শুইও আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করবে সারা রাতি।

চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি'
জড়িয়ে দেব বুকে।

গাই দোহনের শব্দ শুনি'
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।

আমার বাড়ী ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি'।

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

ক্ষতি-পূরণের দাবী

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

কেউ যদি তোমার কোন রকমের ক্ষতি করে তো তুমি তার কাছে ক্ষতি-পূরণের দাবী করতে পার—এ কথা আইন-আদালতও মানে। এমন সব অদ্ভুত ক্ষতি-পূরণের কাহিনী আছে যার কথা শুনলে কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসবে, কেউ বা দস্তুরমত বিস্মিত হবে।

১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে হারে দৈহিক ক্ষতি-পূরণ করা হ'ত তার একখানা 'ছক্' পাওয়া গেছে; তা'তে দেখা যায় যে একটা ঘুঁসি মারলে প্রায় আধ পেনী ক্ষতি-পূরণ দিতে হ'ত, কিন্তু রক্তপাত হ'লে দিতে হ'ত পাঁচ পেন্স; গলা টিপে দিলে আড়াই পেন্স, লাথি মারার জন্য পাঁচ পেন্স। কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দিলে আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তি সাত পাউণ্ড—অর্থাৎ তখনকার তুলনায় বেশ মোটা অর্থ—ক্ষতি-পূরণ লাভ করত।

রেলওয়ে কোম্পানীদের বিরুদ্ধে যে সব ক্ষতি-পূরণের দাবী আসে তাদের সংখ্যা যেমন প্রচুর বৈচিত্র্যও তেমনি যথেষ্ট। বিলাতের বার্মিংহামের একটী কেরাণী একবার মিড্ল্যাণ্ড্ রেলওয়ে পরিচালিত একখানা ওমনিবাসের ধাক্কা খান্। সেই আঘাতের ফলে তাঁর প্রাণশক্তি নাকি নষ্ট হয়ে যায়—এই অভিযোগে তিনি দু'শ' পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ লাভ করেন।

আর একবার মাদাম্ কোভাৎস্ নামে একটী মহিলা অষ্ট্রীয়ার এক রেল-কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে তাদের ট্রেনের আরোহী-রূপে তিনি যখন অষ্ট্রীয়ান্ আল্প্স্-এর একটা সুড়ঙ্গ (টানেল্) অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁর কামরাখানা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়; এর ফলে তিনি যে ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন তা সাম্লিয়ে উঠা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। কোম্পানী-পক্ষীয় উকীল নানা রকমে বুঝাতে চাইলেন যে সেই বিশিষ্ট 'টানেল্'টা মাত্র একশ' গজ দীর্ঘ ছিল এবং আইন অনুসারে চারশ' গজ দীর্ঘ 'টানেল' না হলে দিনের বেলায় ট্রেনের কামরায় আলো জ্বালাবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই—ইত্যাদি; কিন্তু জুরীরা

এক মত হয়ে মহিলাটীর জন্য চার শ' পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ ও আজীবন ধরে একটা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন।

ফ্রাউ জেঙ্গার বেত্তাচিক নামে একজন গায়িকা এক দিন ব্যাভেরিয়ায় মিউনিকের কাছে কোন এক গেঁয়ো পথে মোটর ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ পথের একটা মোড় ঘুরতেই দেখেন গাড়ীর হাত কয়েক দূরেই এক বন্য বরাহ মোটর-খানাকে আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে! তখন মোটর থামাবার আর অবসর ছিল না, বরাহটাকে চাপা দিয়ে গাড়ীখানা ঘুরে পথের পাশের একটা টেলিগ্রাফ্ পোষ্টে ধাক্কা খেল। পোষ্ট্টা ভেঙ্গে গেল, মহিলাটী ছিট্কিয়ে রাস্তার ধূলায় পড়্লেন এবং অল্পবিস্তর আঘাতও পেলেন। তাঁর গায়ের ব্যথা 'সার্তে না সার্তে এক দিন দু'খানা চিঠি পেলেন—টেলিগ্রাফের কর্ত্তারা পোষ্ট্ ভাঙ্গবার জন্য পনের শিলিং এবং বন-বিভাগের কর্ত্তারা বন্য বরাহের মৃত্যুর দরুণ দু' পাউণ্ড দশ শিলিং ক্ষতি-পূরণের দাবী জানিয়েছেন। মহিলাটীও উল্টে বন-বিভাগের বিরুদ্ধে নিজের আঘাত ও মোটর মেরামতী বাবদ মোটা টাকা দাবী করে বস্লেন; তিনি জানালেন যে বন-বিভাগের অধীনস্থ বরাহের পক্ষে পথে বেরিয়ে নিরীহ পথিকের অসুবিধা ঘটাবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। এর ফল শেষ পর্য্যন্ত কি হয়েছিল তা বলতে পারি না, কারণ ব্যাপারটা আদালতের বাইরেই মিট্মাট্ হয়ে যায়।

আদালতে এমন অনেক দাবী-দাওয়ার মামলা আসে যা শুনলে আজগুবি বলেই মনে হবে। অনেক দিন আগে আমেরিকার শিকাগোয় হেড্ল্যাণ্ড্ নামে এক ছুতোরের ছেলেমেয়েরা সেখানকার তিন জন হোটেলওয়ালার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করে যে তারা তাদের পিতার নেশার খোরাক যোগায়। সাক্ষ্য-তদন্ত থেকে জানা যায় এর পাঁচ বছর আগেও হেড্ল্যাণ্ড্ ছিল মিতব্যয়ী, সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী—দিনে সে পাঁচ ডলার করে উপায় কর্ত। তার পর থেকে নেশা করতে আরম্ভ করে সে এখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে, ছেলেমেয়েরা খেতে-পরতে না পেয়ে অন্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তারা তাদের আশ্রয়দাতা অভিভাবকের সাহায্যে হেড্ল্যাণ্ড্ যে তিন জনের হোটেলে যাতায়াত

কর্ত তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনে। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও হোটেলের কর্ত্তারা রেহাই পেল না—জজ সাহেব তাদের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন হাজার ডলার ক্ষতি-পূরণের ডিক্রি জারি করলেন।

আর একবার মিসেস্ লরা হোসার নামে একটী মহিলা তাঁর ভাইয়ের নেশা ছাড়াবার জন্য একটা ওষুধ সংগ্রহ করে সেটা তার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। দিন কতক এম্নি করবার পর তাঁর ভাইয়ের নেশা সত্য সত্যই ছুটে গেল; কিন্তু ভাইটী এমন অকৃতজ্ঞ যে নেশার রুচি নষ্ট করবার অভিযোগে সে তার দিদির নামে পাঁচ হাজার ডলার ক্ষতি-পূরণের দাবীর নালিশ রুজু করে দেয়।

তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলে ঠকেছ, নীচের ঘটনাটী শুনে তারা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হতে পার। হার্সেন্ট্ কোপ্সন্ নামে এক ভদ্রলোকের, বয়স অল্প হলেও, মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। এক সময়ে কিছু দিনের ছুটী নিয়ে তিনি সমুদ্রের হাওয়া খেতে যাচ্ছেন, নিজের গাঁয়েরই (ওয়াশিংটনের অন্তর্গত হগার্টন) এক ব্যবসায়ী তাঁকে একটা চুলের ওষুধ দিয়ে আশ্বাস দিল যে ওর দ্বারাই তাঁর চুলের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরবে। কিন্তু ওষুধটার মধ্যে এমন একটা রাসায়নিক জিনিষ মিশান ছিল যা সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে এসে অদ্ভুত কাণ্ড কর্ল; ভদ্রলোক স্নান করে উঠে আর্শীতে মুখ দেখতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর মাথার সাদা চুল টক্টকে সবুজ হয়ে উঠেছে! ফলে কেশ-বিশারদের নামে ক্ষতি-পূরণের মামলা!

দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধের সময়ে এক চাষার কতকগুলো মুর্গী সৈন্যেরা চুরি করে নিয়ে রেঁধে খেয়ে ফেলে। সে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তাদের একখানা মূল্য-তালিকা দাখিল করে; তাতে বলা হয় যে প্রতি মুর্গীর জন্য সাত শিলিং এবং তারা থাকলে যে সব ডিম দিত তাদের মূল্য বাবদ পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড্ কর্ত্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য।

বুয়রদের মত ন্যায়-বিচার-প্রীতি দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে। গাবুন নামে এক গাঁয়ের আমেরিকান্ মিশনের পাদ্রী ওয়াকার সাহেবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক রাত্রে একটী চিতাবাঘের শুভাগমন হয়—উদ্দেশ্য সাহেবের নধর

বাছুরটিকে জলযোগ করা। ওয়াকার সাহেব কিন্তু সজাগ ছিলেন, বাঘ এসেছে জানতে পেরেই তিনি বন্দুক নিয়ে গুলী চালালেন। বাঘের পো কোন রকমে আত্মরক্ষা করে পলায়ন কর্‌ল। পর দিন ভোর হ’তে-না-হ’তে একজন দেশীয় সর্দ্দার পাদ্রীর কাছে হাত পেতে দাঁড়াল, কারণ, কয়েক ঘণ্টা আগে তার একটা পুষ্ট শূয়র চিতাবাঘে খেয়ে গেছে। সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, “আরে, তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আছে?” সর্দ্দার তখন বিনীত ভাবে বুঝিয়ে দিল যে সাহেব যদি কাল রাত্রে চিতাটাকে না তাড়িয়ে দিতেন তো সে সাহেবের বাছুর ছেড়ে গরীবের শূয়রে লোভ কর্‌ত না! সুতরাং সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষতি-পূরণ করে দিলে গরীব সর্দ্দার বাধিত হয়।

এর চেয়েও অদ্ভুত দাবীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিখ্যাত পর্য্যটক ও আবিষ্কারক ক্যামারন্ সাহেবকে। তাঁর বন্দুক ও কয়েকটা অস্ত্রের উপর একজন কাফ্রী সর্দ্দারের লোভ জন্মেছিল; কিন্তু নিজে চুরি করতে সাহস না পাওয়ায় একজন সহকারীকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে সে কাজ হাসিল করতে পাঠায়। কিন্তু সাহেবের জিনিষপত্র সব বাক্স-বন্দী থাকায় চোরের মতলব ব্যর্থ হয়। সর্দ্দার তখন ঘুষের টাকা ফেরৎ চাইতেই সহকারীটি তা’ স্রেফ্ অস্বীকার করে সরে পড়ে। শেষকালে নিরুপায় হয়ে সর্দ্দার ক্যামারন্ সাহেবকে গিয়ে ধর্‌ল, “তোমারই জন্য আমার টাকাগুলো নষ্ট হ’ল, কর ক্ষতি-পূরণ!” হাস্‌তে হাস্‌তে সাহেবের চোখ দিয়ে যে জল বেরিয়ে পড়্‌ল সর্দ্দার তার মধ্যে আর আশার কোন কূল-কিনারা দেখতে পেল না।

অগ্নি-বীমা কোম্পানীগুলোর কাছেও অনেক বিচিত্র দাবী উপস্থিত হয়। এ বিভাগে নীচের ঘটনাটার বোধ করি যুড়ি নেই: ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক সমুদ্রের ধারে একটা ঢিপির উপরে বসে ‘পাইপে’ ধূমপান করছিলেন; তাঁর পাৎলুনের পা দু’টো হাঁটুর দিকে খানিকটা গুটিয়ে তোলা ছিল—পায়ে রোদ লাগান হচ্ছিল বোধ হয়। দৈবক্রমে পাইপ্ থেকে একটু জ্বলন্ত ছাই পাৎলুনের একটা পা’য়ের ভাঁজের মধ্যে পড়ে যায়। এটা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন জায়গাটায় ছোট্ট একটা ফুটো হয়ে গেছে। যে কোম্পানীতে তাঁর অগ্নি-বীমা করা ছিল

তিনি তাদের কাছে এ সংবাদ জানিয়ে ক্ষতি-পূরণের দাবী করলেন। তারা একটা নতুন পাৎলুনের মূল্য দিয়ে তবে রেহাই পেল।

একখানি বিখ্যাত ছবি

সেলাই-এর মজা
(শিল্পী—M. Wunsch)

জীবন্ত-দেবতা

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

জাপানের ভূমিকম্প চিরপ্রসিদ্ধ। তার ফলে অনির্দ্দিষ্ট যুগ থেকে জাপানের বেলাভূমি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জোয়ারের ঢেউ দিয়ে ধুয়ে যায়। ধুয়ে যায়

বল্‌লে ঠিক্ বলা হয় না, সিন্ধুতটে গ্রাম, গাছপালা প্রভৃতি যা থাকে সমস্তই একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে অসীম সাগর তার বুভুক্ষু জঠরের ভিতর টেনে নিয়ে যায়।

বৃদ্ধ 'হামাগুচি গোহাই'-এর গল্প জাপানের কোনও এক উপসাগরের উপকূলে ঐ রকম একটি ভয়ঙ্কর জোয়ারের ঢেউএর সময়কার।

গ্রামের কর্ত্তা তিনি নিজেই। তার দু'টো কারণ—প্রথমতঃ, বয়সে তিনি বড় এবং পরোপকারী, দ্বিতীয়তঃ, সেই গ্রামের ভিতর তিনিই সব চেয়ে সঙ্গতিপন্ন।

সর্ব্বসাধারণের কাছ থেকে তিনি ভক্তি পেয়ে এসেছেন যথেষ্ট, কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার ভাগ ভক্তির চেয়ে কিছু কম নয়। বয়সে তিনি গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন, তাই গ্রামের সবাই তাঁকে ডাকে 'ওজিসান' অর্থাং ঠাকুরদা' ব'লে।

হামাগুচির বৃহৎ খড়ের চাল-ওয়ালা বাড়ীটি সমুদ্র-তটস্থ একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বাড়ীটি পাহাড়ের একেবারে ধারে, যেন ঝুঁকে প'ড়ে অহরহঃ সমুদ্রের উর্ম্মিমালা গণনা কর্‌তে ব্যস্ত। পাহাড়টির উপর অনেকটা সমতলভূমি—সেখানে হামাগুচির গৃহ এবং একটি দেব-মন্দির ছাড়া আর কোনও বাড়ী ছিল না। সেই সমতল জায়গাটির উপর ধান চাষ হয়ে থাকে সব চেয়ে বেশী। তিন দিকে তার নিবিড় বন, সমুদ্রের সাম্‌নের চতুর্থ ধারটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে বেলাভূমির উপর গড়িয়ে পড়েছে। একটি আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ এই সবুজ ঢালু জায়গাটির বুক চিরে বঙ্কিম গতিতে চলে গিয়েছে।

গ্রামটি ছোট। ছোট ছোট নব্বইটি কুঁড়ে আর তাদের মাঝে একখানি 'শিণ্টো'-মন্দির—এই হচ্ছে তার পুঁজি। গ্রামটি পাহাড়ের কোলে, উপসাগরের উপকূলে। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই চাষা।

শরতের একটি শান্ত সন্ধ্যা। হামাগুচি তাঁর বারান্দার উপর ঝুঁকে প'ড়ে নীচে গ্রামটির দিকে চেয়ে আছেন। ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে, তাই গ্রামের লোকেরা নবান্ন উৎসবে ব্যস্ত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সরলপ্রাণ চাষাদের উল্লাসপূর্ণ নৃত্য—'উজিগামী'র প্রাঙ্গণে।

বৃদ্ধ হামাগুচি চাষাদের সেই উৎসব-আয়োজন লক্ষ্য কর্‌ছিলেন। নানা রঙের পতাকা বাড়ীর ছাদের উপর উড়্‌ছে, লাল-নীল কাগজের ঝালর রাস্তায় রাস্তায় ঝুলে রয়েছে, গ্রামবাসীরা রঙ্-বেরঙের সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে ঘোরাঘুরি কর্‌ছে। তিনি অসুস্থ থাকায় এদের উৎসবে যোগদান কর্‌তে পারেন নি, তাঁর বাড়ীর আর সবাই অনেক আগে গ্রামে চলে গিয়েছে, উৎসবে যোগদান কর্‌তে। শুধু তাঁর দশ বছরের পৌত্র 'টাডা' বাড়ীতে রয়েছে।

সমুদ্রের বাতাস বন্ধ। চারদিকেই একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব। জাপানী চাষীদের জ্ঞানে এটা ভূমিকম্পের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

সত্যিই অবশেষে ভূমিকম্প সুরু হ'ল। কম্পন খুব জোরে নয়, তাই গ্রামের কেউ সে কম্পনে ভয় পায় নি। কিন্তু হামাগুচির কাছে এটা কি রকম অদ্ভুত, কি রকম নতুন বলে মনে হ'তে লাগ্‌ল। তিনি জীবনে অনেক কম্পন অনুভব করেছেন, কিন্তু এ রকম কম্পন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব কর্‌লেন। এটা একটা বহুক্ষণ স্থায়ী ধীর মৃদু কম্পন! ঘর-বাড়ী, পাহাড় কয়েক বার ধীরে শব্দ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, কিন্তু তার পরেই আবার সমস্ত স্থির, নিস্পন্দ!

কম্পন থেমে গেলে হামাগুচির উৎসুক চোখ গ্রামের উপর গিয়ে পড়্‌ল। সেদিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল কি যেন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁর দর্শন-শক্তির বাইরে হচ্চে! বিপদের ছায়াপাত অনেক আগেই অনেকের মনে হয়। তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ তাঁর উৎসুক চোখ উপসাগরের উপরে পড়্‌ল। উত্তেজনায় তিনি নিজের দুর্ব্বলতার কথা ভুলে গিয়ে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আশ্চর্য্য!

সমুদ্র হঠাৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে—কা'র যেন যাদুকাঠির স্পর্শে! কালো বিপদ্ তার ভিতর যেন হঠাৎ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমুদ্রটি হঠাৎ পেছন দিকে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে!

অল্প কিছু কালের মধ্যেই গ্রামের সবাই এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য কর্‌ল।

তারা বিস্মিত হয়ে ছুটে বেলাভূমিতে উপস্থিত হ'ল আর সমুদ্রকে পেছনে হটে যেতে দেখে তারাও আনন্দে ছুট্তে ছুট্তে এগিয়ে চল্ল।

সমুদ্রে এই রকম অদ্ভুত ভাটা পড়্তে এর আগে সেই সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ দেখে নি। তাই তারা কৌতূহলী হ'য়ে ছুটে চল্ল, আসন্ন বিপদের বার্ত্তা তারা কেউ কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ল না।

সমুদ্র ক্রমশঃ পেছিয়ে যেতে লাগ্‌ল; সাম্‌নে পড়ে রইল বালির চর, নানা আকারের ঝিনুক, নানা জলজ উদ্ভিদ্ গায়ে মেখে সিন্ধুর ভিতর লুকান ছোট-বড় উপলখণ্ড।

সমুদ্রের এই অভাবনীয় নগ্ন সৌন্দর্য্য গ্রামবাসীদের আত্মহারা ক'রে তুল্‌ল। কিসের নেশায় তারা যেন বিভোর হ'য়ে, কি যেন একটা অপার্থিব জিনিষের আকর্ষণে নিজেদের কথা একেবারে ভুলে গেল।

বৃদ্ধ হামাগুচিও এ রকম ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। কিন্তু ছেলে-বেলায় তিনি তাঁর পিতামহের কাছে এ রকম ভয়ঙ্কর ভাটা পড়ার অনেক গল্পই শুনেছিলেন। সমুদ্রের ঐ রকম পিছু হটার অর্থ তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন। তিনি বুঝতে পার্‌লেন, একটা ভয়ঙ্কর বিপদ্ আসন্নপ্রায়।

গ্রামবাসীদের সেই বিপদ্ থেকে সাবধান করে দেবার জন্য তিনি অধীর হ'য়ে উঠলেন। তাদের সাবধান কর্‌তে হ'বে, যত শীগ্‌গির সম্ভব। এক মুহূর্ত্তের দেরীর জন্য হয় ত' চার শ' লোকের প্রাণ ইহলোক ছেড়ে চলে যাবে!

তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। গ্রামবাসীদের সাহায্য কর্‌বার অন্য কোনও উপায় না দেখে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "টাডা, টাডা, শীগ্‌গির, খুব শীগ্‌গির আমাকে একটা মশাল জ্বালিয়ে দাও..."

পাইন গাছের মশাল ঝড়ের রাতে ব্যবহারের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাক্‌ত। টাডা তক্ষুণি একটি মশাল জ্বেলে তাঁর হাতে দিল।

হামাগুচি সেই মশাল হাতে ছুট্‌লেন বাড়ীর বাইরে—যেখানে তাঁর শত শত গোলা ভর্ত্তি ধান রপ্তানির জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। ঐগুলি তাঁর সারা বছরের পরিশ্রমের পুরস্কার। তিনি দ্বিধা কর্‌লেন না মোটেও। সব চেয়ে কাছে যে

গোলাটিকে পেলেন সেটি থেকে আগুন লাগাতে আরম্ভ কর্‌লেন, আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সব শেষটিতে পৌঁছুলেন ততক্ষণ থাম্‌লেন না।

শুক্‌নো ধানের গোলার ভিতর থেকে অগ্নির ক্ষুধার্ত্ত লোল জিহ্বা আকাশের দিকে চেয়ে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌ল...কুণ্ডলীকৃত ধূসর ধূম আকাশের বুকে লুটিয়ে পড়্‌ল।

টাডা ভয়ে আর বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হ'য়ে থেকে কাঁদতে কাঁদতে তার পিতামহের কাছে ছুটে গেল। "দাহু, কেন? দাহু, কেন—কেন—কেন?..." ঐ ছাড়া তার মুখ থেকে আর অন্য কথা বেরুল না।

কিন্তু হামাগুচি তার কথার কোনও উত্তর দিলেন না, কারণ উত্তর দেবার সময় তাঁর নেই। তিনি তখন চার শ' লোকের বিপন্ন জীবনের ভাবনাতে বিভোর।

টাডা ভাব্‌ল, দাহু তার পাগল হয়ে গেছে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সে বাড়ীর ভিতর ছুটে চলে গেল। পাহাড়ের উপরকার মন্দিরের পূজারী আগুন জ্বল্‌তে দেখেই বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণায় কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনাই এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী।

গ্রামের লোকেরা বিপদের ঘণ্টা শোনা মাত্র উপর দিকে চাইল। সেখানে তারা অগ্নির লোল-জিহ্বা দেখে একটুও অপেক্ষা কর্‌ল না,—সবাই ছুট্‌ল হামাগুচির বাড়ীর দিকে, তাঁকে সাহায্য কর্‌বার জন্য।

সূর্য্য দিক্‌চক্রবালের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল। সাম্‌নের সমুদ্রে এক বিন্দুও জল নেই...ধূঁ, ধূ কর্‌ছে বালি আর বালি আর বালি! সূর্য্যের শেষ কয়েকটি রশ্মি মেখে সেগুলি চিক্ চিক্ ক'রে উঠ্‌ছে। দূরে, যেখানে আকাশের সঙ্গে ধরণীর মিলন হয়েছে, সমুদ্রের জল গুটিয়ে গুটিয়ে প্রায় সেখান পর্য্যন্ত চ'লে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য, তবুও সে থামে নি! কেবল পেছু হট্‌ছে, ফিরে আস্‌বার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না!

খানিক বাদেই গ্রামের সমস্ত লোক এসে হামাগুচির বাড়ীর সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল আর তখনই সেই আগুনকে আক্রমণ কর্‌তে গেল। কিন্তু হামাগুচি হাত তুলে

তাদের নিবৃত্ত করলেন। তিনি চীৎকার ক'রে আদেশ দিলেন, "আগুন জ্বল্‌তে দাও, আমি প্রত্যেক লোককে এখানে চাই···একটা ভয়ঙ্কর বিপদ্ এগিয়ে আস্‌ছে!"

গ্রামের সমস্ত লোক ক্রমশঃ এসে উপস্থিত হ'ল। হামাগুচি তাদের সবাইকে গুণে দেখ্‌লেন। সমস্ত ধানের গোলাগুলিকে আগুনের বুকে আহুতি দেবার অর্থ কেউ বুঝ্‌ল না, সবাই পরস্পরের মুখের দিকে বিস্ময়ে এবং দুঃখে চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। হামাগুচির মুখ কিন্তু নির্ব্বিকার—ভাবনার লেশ মাত্র সেখানে নেই।

সূর্য্য অস্ত গেল।

অনেকের উদ্‌গ্রীব প্রশ্নে টাডা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উত্তর কর্‌ল, "দাদু পাগল হয়ে গেছে; সে ইচ্ছে ক'রে আগুন লাগিয়েছে, আমি নিজে দেখেছি!"—সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌ল না, মুখে হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

হামাগুচি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ধানের বিষয়ে শিশুর কথাই সত্যি, আমি ইচ্ছে ক'রে আগুন লাগিয়েছি। কিন্তু সবাই কি এখানে উপস্থিত?"

চাষাদের কয়েকজন উত্তর কর্‌ল, "সবাই এখানে উপস্থিত কিংবা এখনই সবাই এসে পড়্‌বে। কিন্তু আমরা ঐ বিষয়ে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

বৃদ্ধ হামাগুচি যথাশক্তি জোরে চীৎকার করে উঠলেন, "চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ। এসে পড়েছে। আমি পাগল কি না এখনই তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সবাই বিস্মিত হ'য়ে পশ্চিম দিকে চাইল আর ধূসর দিক্‌চক্রবালের কাছে একটা পাৎলা কালো রেখা দেখ্‌তে পেল—যেন একটা বেলাভূমির ছায়া, যেখানে কোন কালে সমুদ্রের কোন উপকূল ছিল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ক্ষীণ রেখাটি ফুলে বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল! এক দল নাবিক জাহাজ থেকে যখন প্রথম তটভূমি দেখ্‌তে পায় তারা তখন সেটিকে একটি ক্ষীণ রেখার মতই দেখে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন তারা তীরের দিকে এগিয়ে আসে ততই সেই ক্ষীণ রেখাটি তাদের চোখের সাম্‌নে প্রস্থে বড় হ'তে থাকে। সমস্ত গ্রামবাসী নাবিকদের মতই ক্ষীণ রেখাটিকে লক্ষ্য কর্‌ল কিন্তু তাদের চোখের সাম্‌নে সেটি নাবিকেরা যেমন দেখে তার চেয়ে হাজার গুণ তাড়াতাড়ি ফুলে আকৃতিতে বড় হ'তে লাগ্‌ল।

সেই সুদীর্ঘ অন্ধকারের মত জিনিষটি কিন্তু সত্যিই কোনও উপকূল নয়, সেটি সমুদ্র—যে সমুদ্র কিছু আগে পেছিয়ে গিয়ে দিক্‌চক্রবালকে আলিঙ্গন করেছিল। সেই সমুদ্রই এখন ফিরে আস্‌ছে। যে শক্তিতে সেটি পেছিয়ে গিয়েছিল তার চেয়ে সহস্র গুণ জোরে এবার সেটি ফিরে আস্‌ছে—পর্ব্বত-শৃঙ্গের মত উঁচু হয়ে!

"ঐ যে ভয়ঙ্কর ঢেউ, ঐ যে ভয়ঙ্কর ঢেউ।"—সবাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

তার পরের মুহূর্ত্তেই সমস্ত চীৎকার, সমস্ত শব্দ শ্রবণ কর্‌বার সব শক্তি ডুবে গেল একটা ভয়ঙ্কর ধাক্কার শব্দে, সহস্র সহস্র বজ্র-নিনাদের চেয়েও সে শব্দ ভয়ঙ্কর! অত্যন্ত জোরে ছুটে এসে ঢেউটা তীরে আছ্‌ড়ে পড়ায় জলের স্তূপ ফেটে চৌচির হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেল; চার দিক্ শুধু সাদায় সাদা; হঠাৎ যেন একটা চোখ-ঝল্‌সান সাদা আলো জ্বলে উঠ্‌ল—নিষ্ঠুর, অসহ্য যার জ্যোতিঃ!

যখন তারা আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল তখন দেখ্‌ল যে সাদা সমুদ্র তাদের গ্রামের উপর তাণ্ডব নৃত্যে ব্যস্ত, ঢেউগুলো যেন বড় বড় হাতীর মত আকার নিয়ে তাদের সেই ক্ষুদ্র গ্রামটিকে দলিত, পিষ্ট কর্‌ছে। উন্মত্ত জলের স্রোত গড়িয়ে আবার পেছিয়ে গেল, আবার এসে তীরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফেটে পড়্‌ল, কিন্তু এবার যেন আগের চেয়ে জোর কিছু কমে এসেছে। আরও বার কয়েক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঢেউ এসে পাহাড়ের কোলে ধাক্কা খেল, কিন্তু ক্রমশঃ তাদের জোর কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। আরও খানিক বাদে সমুদ্র যেন হাঁপিয়ে পড়্‌ল; মনে হ'ল এবার সে তার আগেকার বিছানায় শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই মহা-প্রলয় ঘটে গেল। গ্রামের চিহ্ন মাত্রও নেই; কে যেন এসে সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে চলে গেছে! কারো মুখেই কথা নেই, সবাই যেন কথা বল্‌তে ভুলে গেছে। হামাগুচিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্‌লেন, বল্‌লেন, "বন্ধু, এই বিপদ্ থেকে বাঁচাবার জন্যই আমি ধানের গোলায় আগুন দিয়েছিলাম।"

হামাগুচির ঐশ্বর্য্যই সেই গ্রামের ভিতর সব চেয়ে বেশী, আর তাঁর ঐশ্বর্য্য ছিল ঐ সমস্ত শত শত ধানের গোলা, যেগুলিকে তিনি নিজের হাতে ক্ষুধার্ত্ত

আগুনের লেলিহান জিহ্বায় আহুতি দিয়েছেন গ্রামবাসীদের প্রাণ রক্ষার জন্য। তিনি এখন নিঃস্ব, দরিদ্র গ্রামবাসীদেরই এক জন।

পাহাড়ের উপর বাসোপযোগী মাত্র ছুটি বাড়ী ছিল, একটি হামাগুচির এবং আর একটি তাঁর বাড়ীর নিকটস্থ মন্দিরটি। পাহাড়ের উপর থাকায় সেগুলির কোন ক্ষতিই হয় নি। হামাগুচি গ্রামবাসীদের ডেকে বল্‌লেন, "আমার বাড়ীও যা তোমাদেরও তাই; তোমাদের ভিতর অনেকেরই থাক্‌বার স্থান আমার বাড়ীতেই হ'বে, আর যাদের এখানে কুলুবে না তারা ঐ মন্দিরের ভিতর আশ্রয় পা'বে।"

কিছু কাল বাদে আবার গ্রামটি যখন পুনর্গঠিত হ'ল তখন কৃষকেরা সেই গ্রামের মাঝখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্‌ল, আর সেই মন্দিরের ভিতর হামাগুচির আত্মাকে পূজো করবার ব্যবস্থা কর্‌ল। এদিকে হামাগুচি তাঁর পুত্র-প্রপৌত্রদের নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন।

* * *

বহু কাল হ'ল হামাগুচি ইহলোক ছেড়ে কোন্ এক অজ্ঞাত জগতে চলে গেছেন, কিন্তু আজও জাপানে তাঁর পূজো চলে আস্‌ছে। এখনও চাষারা প্রার্থনা করে যে, তাদের বিপদের সময় তিনি যেন আবার তাদের সাহায্য করেন।*

স্বপ্ন না সত্য ?

(শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্‌-সি)

অজয় যে চিরকালই একটু ভাবুক প্রকৃতির ছেলে এ ত' সবাই জানে—কিন্তু তাই ব'লে সে যে ও রকম পাগলের মত কথা বলবে তা' কে জান্‌ত ? ব্যাপারখানা শুনলে তোমরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে বল্‌বে যে অজয়ের মাথাটা আজকাল বাস্তবিকই কিছু খারাপ হ'তে সুরু করেছে।

* একটি জাপানী গল্প।

সেদিন বিকেলের দিকে অজয় গিয়েছিল পদ্মার চরে বেড়াতে। সেখানে সে নাকি একটা গরুকে ঘাসের সঙ্গে নানা রকম গাঁজাখুরী গল্প করতে শুনে এসেছে!

জলের ধার দিয়ে গরুটা ঘাস খেতে খেতে এগিয়ে চলেছিল—হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। অজয় স্পষ্ট শুনতে পেল, জলের ধারের ছোট্ট একটা ঘাসের মত গাছ বলে উঠ্‌ল—"ভাই গরু, আমাকে খেও না।" গরুটাও নাকি প্রথমে ঠিক মানুষের মতই চম্‌কে উঠেছিল—কিন্তু সে চট্ করে সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কেন ?"

খুব করুণ সুরে সেই গাছটা উত্তর কর্‌লে—"ভাই, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের উপর দিয়ে অনেক অত্যাচার গেছে। তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, এক সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ তাল গাছের মতই প্রকাণ্ড ছিলেন—কিন্তু আজ তাঁদেরই বংশধর আমরা এই নগণ্য ঘাসের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারছি না। এর উপরে যদি তোমরা আমাদের খেতে আরম্ভ কর তবে আমরা দাঁড়াই কোথায় বল ত' ?"

কথাটায় অজয় একটু অবাক্ হ'ল বটে কিন্তু গরুটাও যে তার চেয়ে কম অবাক্ হ'ল তা' মনে হ'ল না। সে বলে উঠ্‌ল—"সে কি! তোমাদের এত দুর্দ্দশা হয়েছে ?"

ঠিক কান্নারই মত সুরে হাস্‌তে হাস্‌তে গাছটা বলে উঠ্‌লে—"তাও ভাই, আমরা কয়েক ঘর ত' কোনও রকমে টিঁকে আছি। আমাদের মধ্যে যাঁদের স্থান ছিল সবার উপরে এ পৃথিবীর বুকে আজ তাঁদের কোন চিহ্নই নেই, পণ্ডিতেরাই শুধু তাঁদের খবর রাখেন। ওঃ, ভুল হ'ল—তাঁদের চিহ্ন আছে বৈকি! আমাদের সকলের পূর্ব্বপুরুষেরা মাটীর তলায় চাপা পড়েই সৃষ্টি হয়েছে আজকালকার কয়লা—যে কয়লা না হ'লে সভ্য মানুষের এক মুহূর্ত্তও চলে না।"

অজয় আর চুপ্ করে থাক্‌তে পার্‌ল না। সে বলে উঠ্‌ল—"বল ভাই গাছ, তোমাদের কথা আমি সব শুন্‌তে চাই।"

গাছ বল্লে—"আচ্ছা, তবে শোন। সে অ—নে—ক দিনের কথা। কত লক্ষ

বছর আগের কথা তা' হিসেব করতে পণ্ডিতদেরও হিম্‌সিম্ খেতে হয়। তোমাদের দেশটা নাকি গরম—কিন্তু এ সমস্ত পৃথিবীটাই তখন ছিল এর থেকে বেশী গরম। সমুদ্রে জল ছিল অল্পই, আকাশ থাক্‌ত সব সময়ে মেঘে ঢাকা, সে মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্য্য-দেবের মুখ অল্পই দেখা যেত—তাই আকাশে বাতাসে কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাঁপ্‌সা গুমোটের ভাব সব সময়েই থাক্‌ত। আজকাল তোমরা বাতাসে যেটুকু কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস্ (Carbon dioxide) দেখ তার চেয়ে ঢের বেশী তখন এই বাতাসেই ছিল।

সেকালের জঙ্গল
(দূরে ইকুইজেটাম আর সাম্‌নে লাইকোপোডিয়ামের পূর্ব্বপুরুষ)

"জন্তু-জানোয়ার তখন ছিল না বল্‌লেই চলে। জলে তখন ছিল বড় বড় শামুক, ঝিনুক আর চিংড়ি। ডাঙ্গার জানোয়ারদের সৃষ্টিই তখনও হয় নি—কিন্তু সেখানে ছিল প্রকাণ্ড এক জাতের ফড়িং—অত বড় ফড়িং তোমরা কল্পনাও করতে পার না। মানুষ, গরুর মত জীবের সৃষ্টির কথা তখন বোধ হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার মাথায়ও ঢোকে নি।

"এই ডাঙ্গায়ই তখন একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল আমাদের—মানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের। সে রকম ঘন জঙ্গল আজকাল আর দেখা যায় না।

"এই জঙ্গলগুলো ছিল বড়ই অদ্ভুত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই এখানে ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। আম-জামের মত মিষ্টি ফলওয়ালা কিংবা ঐ যে ঘাস দেখ্‌ছ

ওর মত ছোট ফুলওয়ালা অথবা গোলাপের মত সুন্দর ফুলওয়ালা গাছের কোন চিহ্নও সে জঙ্গলে ছিল না। ফার্ণ্ গাছের মত সুন্দর সুন্দর পাতাওয়ালা গাছ তুমি অপর্য্যাপ্ত পেতে পারতে—কিন্তু একটিও ফুল বা ফল সে জঙ্গলে ছিল না।

"আজ আমাকে দেখ্‌ছ কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটা ঘাস মাত্র। কিন্তু আমার সঙ্গে ঐ তোমাদের সাধারণ ঘাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি হচ্ছি পরম কুলীন ইকুইজেটাম (Equesetum)—যার পূর্ব্বপুরুষেরা লম্বায় আজকালকার কোনও তাল গাছের নীচে যেত না। আগের পৃষ্ঠার ছবিতে ঐ যে ছাতার শিকের মত ডালওয়ালা বড় বড় গাছ দেখ্‌ছ—বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না—ওই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। আমার দুই নিকট জ্ঞাতিকেও তোমরা খোঁজ করলেই দেখতে পাবে। তোমাদের বাড়ীর কাছে যদি বড় জঙ্গল থাকে তবে সেখানে জলা জমির পাশে, কিংবা ফুলের বাগানে দেখবে আর এক রকমের আমাদের মতই ছোট গাছ—যাকে বলা হয় সেলাজিনেলা (Selaginella)। এর দুর্দ্দশাও আমাদেরই মত।

ম্যাঞ্চেষ্টার মিউজিয়মে লাইকোপোডিয়ামের পূর্ব্বপুরুষের গুঁড়ি ও শিকড়

"পাশের ছবিতে দেখ কেমন একটা প্রকাণ্ড গাছের মোটা গুঁড়ি। এও হচ্ছে আমাদেরই এক জ্ঞাতির পূর্ব্বপুরুষের গুঁড়ি। এদেরই বংশধরকে খুঁজে পাবে তোমরা সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে—পাহাড়ে—দার্জ্জিলিংএ বা শিলংএ। একে তোমরা বল লাইকোপোডিয়াম্ (Lycopodium) এবং ঘাসের চেয়ে বেশী

মর্য্যাদা তোমরা একে দেও না, কেননা এ দেখতে ঘাসের চেয়ে বড় নয়। কিন্তু ৩২০ পৃষ্ঠায় জঙ্গলের ছবিতে ঐ যে কাঁটা কাঁটা পাতাওয়ালা মস্ত মস্ত গাছগুলি দেখ্‌ছ—ওই তাদের পূর্ব্বপুরুষ।

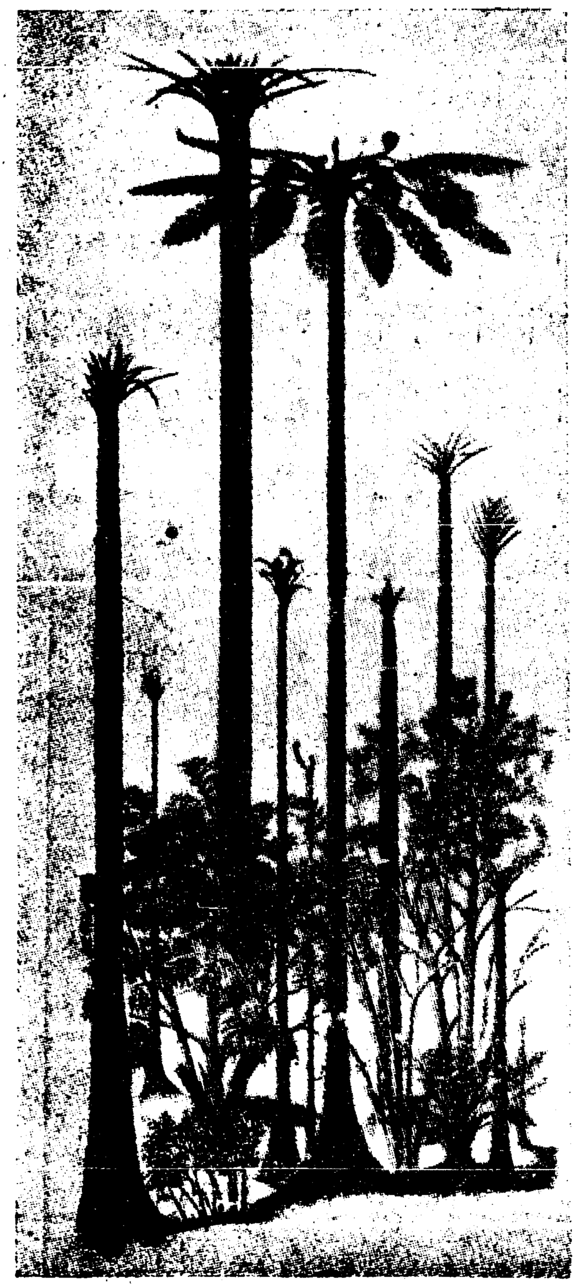

সেকালের বন

(ফার্ণ্‌ ও টেরিডোস্পার্ম্‌। ঐ তালগাছের মত ফার্ণ্‌ গাছেরই আজকালকার বংশধর হচ্ছে ঢেঁকী শাক—কিংবা যে ফার্ণের পাতা দিয়ে তোমরা ফুলের তোড়া তৈরী কর।)

"আমরা তো তা'ও টিঁকে আছি, কিন্তু আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে বেশীর ভাগই টেঁকার সুযোগটুকুও পায় নি। এই সেকেলে জঙ্গলে সব চেয়ে বেশী ছিল আজকালকার ফার্ণেরই মত এক রকম গাছ—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে টেরিডোস্পার্ম্‌ (Pteridosperm)। এই প্রকাণ্ড বংশের একটী গাছও আজ বেঁচে নেই।

"আজকালকার বড় গাছদের মধ্যে এক মাত্র পাইনের জ্ঞাতিদের সামান্য দু'-একজন তখনও ছিল। আমাদের এই পূর্ব্বপুরুষেরাই তখন মহানন্দে পৃথিবীতে রাজত্ব করতেন।

"তার পর আমাদের দুঃখের দিন এল। যে সমস্ত সামান্য আগাছা তখন এই জঙ্গলের মধ্যে জন্মাতে লাগ্‌ল তারাই ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পিষে মারতে লাগ্‌ল। নানা রকম জীবজন্তুর সৃষ্টি ও তাদের অত্যাচার আরম্ভ হ'ল, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত আবহাওয়াও এঁদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগ্‌ল। যেখানে ছিল প্রকাণ্ড বন হঠাৎ হয়ত সেখানে একটা বরফের নদীর সৃষ্টি হ'ল—আবার তার পরেই হয়ত সেখানে একটা প্রকাণ্ড শুক্‌নো মরুভূমি দেখা দিল। এ খাম্‌-খেয়ালীর সঙ্গে আর কত লড়াই করা যায় বল! যুগ যুগ ধরে এই সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ল'ড়ে ক্রমে

ক্রমে এঁরা নির্ম্মূল হয়ে যেতে লাগ্‌লেন। মাটী চাপা প'ড়ে সেই জঙ্গলেরই কতক অংশ আজ কয়লা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"এখন বল ভাই, তোমরা কি চাও যে তোমাদের অত্যাচারে আমরা যে কয়টী এখনও অবশিষ্ট আছি, আমরাও নির্ম্মূল হ'য়ে যাই?"

অজয়ের এই গাঁজাখুরী গল্প শোনার পর আমরা অজয়েরই একখানা বইএ দেখলাম ইকুইজেটামের এই আত্মকথার মধ্যে একটুও বানানো নেই। কিন্তু তা' হলেও——।

বাক্যবাগীশ

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

এই ছেলেটা! নামটা কি তোর? কি খাস্ ওটা—পেয়ারা?
হাঁ ক'রে যে রইলি চেয়ে—তুই তো ভারী বেয়াড়া!
দেখ্'সে কোথা কাকটা ব'সে, থাকিস্ নে আর হাঁ ক'রে,
শেষটা যদি ঘটায় প্রমাদ মুখের মাঝেই ধাঁ ক'রে?
তখন তো ছাই রইবি চেয়ে বোকার মত নীরবে,
হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদবি শুধু—"হায় গো আমার কি হবে!"
নামটা কি তা বল্‌লি না তো—বক্কেশ্বর না বিরিঞ্চি?
বকাস্ কেন—বল্ না বাপু! ঘণ্টাকর্ণ? গিরীন কি?
পেট জোড়া তোর পিলের বাসা, মারছে ঠেলা লিভারে,
এই বারে ঠিক্ অক্কা পাবি আসাম দেশের ফিভারে।
নাকটা যে তোর চ্যাপ্‌টা হ্যারে, কে মেরেছে হাতুড়ি?
হাত্ দিয়ে আর দেখিস্ কি ছাই, করছি কি আর চাতুরী!
বকের মত বক্র গলা তা'ও পেলি তুই কি ক'রে?
দেহের খাড়াই হার মানা'ল হিমালয়ের শিখরে।

ভেংচি কাটা কেন্ রে বাপু! বলছি কি আর বানিয়ে—
সত্যি কি না দেখ্ গে যা না আর্সীখানা আনিয়ে।
চোখ রাঙান রাখ্ গে যা তোর শিকেয় ক'রে ঝুলিয়ে—
বাঁদরামি ফের করলে পিঠে চড়টি দেব বুলিয়ে।
ভাব্লি বুঝি দাব্ড়ি দিলে ঢুক্ব ইঁছুর-গর্ত্তেতে?—
ক্যাব্লাচাঁদে প্রহার করে নেই হেন লোক মর্ত্তেতে।

বুঝ্লে? এটা ঘোষপাড়া চাঁদ, নয়কো মামার বাড়ী এ—
মারতে আসার রোগটী যাছু, সত্যি দেব ছাড়িয়ে।
প্রাণ বাঁচাতে চাস্ যদি রে—এখনও যা চলিয়া,—
যাবার আগে ভুলিস্নেকো কান ছুটো যাস্ মলিয়া।
আবার যে তুই আস্লি রুখে তালটি ঠুকে এগিয়ে?
আর একটি পা এগুস্ যদি মুণ্ডু দেব বেঁকিয়ে।

ওমা! ওমা! দৌড়ে এস, ফেল্লে মেরে আমারে!
গেলুম্ মরে, শীঘ্র ডাক পঞ্চাকে কি মামারে।
মারিস্ নে ভাই! বল্ দেখি তুই তুষ্ট হবি কি খেলে?
চীনের বাদাম? রাখ্ব কিনে—আসিস্ তবে বিকেলে।

দরদী ভৃত্যের কাহিনী

(শ্রীশকুন্তলা দেবী)

মণিরাম বাবু নতুন ওকালতী আরম্ভ করেছেন। সহরে একা থাকেন—বাড়ীতে লোকের মধ্যে শুধু একটি চাকর। চাকরটি নতুন বহাল হয়েছে।

দিন ছুই হ'ল মণিরাম বাবু রোজ চায়ের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ টের পাচ্ছেন। আজ তাই চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "চায়ের মধ্যে কি দিস্ রে?"

"আজ্ঞে, জল, চিনি, ছুধ, চা সব কুছু দেই।"

"ছাঁকিস্ তো?"

"হেঁ হেঁ, সেইটা আর করি না?" চাকর সলজ্জ ভাবে জবাব দিল।

"কি দিয়ে ছাঁকিস্?"

"আজ্ঞে, ঐ যে আপনার মোজা আছে আলনায়—জালতির মত, ওহি দিয়ে ছাঁকি। না না, আবার ফিন্ আলনায় রেখে দি।"

মণিরাম বাবু আকাশ থেকে পড়লেন, "বলিস্ কিরে! তাই বুঝি আমার মোজাটা অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে!"

"না বাবু, ছুই যোড়া মোজা আছে—শুক্নো যোড়া তো লিই না, যেটা আপনি ছেড়ে দেন—ঘামে-উমে ভিজিয়ে থাকে—সেইটা দিয়ে ছাঁকি। ভাল জিনিষ কেনো নষ্ট কর্ব, মনিবের চীজ্ বলে কি দরদ্ নেই? আর আপনার বিকেলে ফিন্ দরকারও তো হ'তে পারে!—সে রকম লোকটি হামি নই।" চাকর জিভ কেটে, ছু' হাতে কান চেপে চলে গেল। মণিরাম বাবু বমি করবার জন্য বাথরুমে ঢুকলেন।

কি খাওয়া উচিত

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি)

ছেলেবেলা হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি—এটা খাইও না, ওটা খাইও না—এটা খাইলে অমুক হইবে, ওটা খাইলে অমুক হইবে—ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের খাদ্যে কতকগুলি জিনিষ আপাতদৃষ্টিতে অপকারী মনে হইলেও কতক পরিমাণে থাকা আবশ্যক। একটা উদাহরণ দিতেছি। যেমন ধর—কঠিন, সিটা বা অপাচ্য খাদ্য (অর্থাৎ যে সব খাবার হজম করা একটু কষ্টকর)। আমাদের খাদ্য হইতে এগুলি একেবারে বাদ দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়ে—এমন কি তাহাদের পিতামাতারাও এ কথাটি জানেন না। অবশ্য এটা ঠিক যে খাদ্যে এই সব জিনিষের মাত্রা খুব বেশী হইলেও অপকার হয়, পেট কামড়ায় বা পেটের অসুখ হয়; আবার খুব কম হইলেও অপকার হয়। প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মে, এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইতে অন্য নানা রকম পেটের ব্যারাম বা হীন স্বাস্থ্যের জন্য অসুখ হইতে পারে।

কতকগুলি কঠিন খাদ্য সম্পূর্ণরূপে হজম হইতে পারে, যেমন—রুটী, বিস্কুট, মুড়ি, শক্ত করিয়া ভাজা আলু, বড়া প্রভৃতি। অপর কতকগুলি কঠিন খাদ্য আংশিক ভাবে হজম হয়, যেমন—নারিকেল, বড়ি ভাজা, ছোলা ভাজা ও ছোলা ভিজা, পেয়ারা, ডালমুঠ ইত্যাদি। ঐ সকল খাদ্য বেশী মাত্রায় খাইলে পেটের অসুখ হয় কিন্তু অল্প মাত্রায় উহারা উপকারী। দাঁতের সম্যক্‌ পুষ্টির পক্ষে কঠিন খাদ্য সাহায্য করে। ভাত একটু শক্ত রাখাও এই হিসাবে ভাল। এই কঠিন খাদ্য খাইলে দাঁতের পরিশ্রম হয় এবং দাঁতগুলি সুপুষ্ট হইয়া উঠে। নিয়ত নরম খাদ্য খাইলে দাঁত ও দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় না এবং পরবর্ত্তী কালে দাঁত হইতে রক্ত পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অপুষ্ট দাঁত হইতে বহু ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

খাদ্যের যে সকল কঠিন কণা বা সিটা একেবারে হজম হয় না সেগুলিকেও একেবারে খাদ্য হইতে বাদ দিলে চলিবে না। কিছু পরিমাণে এই সিটা অংশ উদরস্থ হওয়া দরকার। এই সকল সিটা বা কঠিন কণা পেটে গেলে তাহার ঘষা

লাগিয়া আমাদের অন্ত্রের গায়ের মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং এই রকম আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। খাদ্যের এই কঠিন ও সিটাময় অংশ যাহারা একবারে বাদ দেয় তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ হয় এবং পরিণামে অজীর্ণ বা অন্য ব্যাধি ঘটিয়া থাকে।

তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে খাদ্যে কঠিন বা সিটাময় অংশ অত্যন্ত বেশী হইলেও পেটের অসুখ হয় ও পেট কামড়ায়। বেশী পরিমাণে ছোলা ভাজা বা কাঁচা পেয়ারা (বীজসহ) খাইলে ছেলেদের অনেক সময়ে পেট কামড়ায়। অতএব অতিরিক্ত সিটাময় অংশ খাওয়া ভাল নহে। যাহারা পেটের অসুখ বা আমাশয় রোগ হইতে সম্প্রতি সারিয়া উঠিয়াছে তাহাদের পক্ষেও বেশী সিটাময় খাদ্য খাওয়া অনুচিত।

যাহারা কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য কষ্ট পায় তাহাদের খাদ্যে সম্যক্‌ মাত্রায় এই কঠিন বা সিটাময় অংশ বাড়াইলে উপকার হয়। যাহারা প্রথম বয়স হইতেই বেগুণের খোলা, আলুর খোলা, পটলের বীজ, শাক, পাতা প্রভৃতি সিটাময় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া খাইতে অভ্যাস করে তাহাদিগকেই মাঝে মাঝে জোলাপ লইতে হয় এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে অজীর্ণ, কলিক্‌, মূত্রনালীর বদ্ধতাজনিত বেদনা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

ঐ সকল কারণে ঝুনা নারিকেল ও মুড়ি খাইয়া অনেকের অম্লরোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ ভাল হইয়া থাকে। ঝুনা নারিকেলের শক্ত আঁশগুলি হজম হয় না; সেগুলি অন্ত্রের মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। ঐ রকম দুধের সঙ্গে কিস্‌মিস্‌ খাইয়াও অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। আপেল, পেঁয়ারা, আম, বেল প্রভৃতি ফলও ঐ কারণে উপকারী। বীজযুক্ত পটোল খাইলে, কিংবা কতকগুলি পলতা কুচি কুচি করিয়া বেগুণের সঙ্গে ভাজিয়া খাইলেও বেশ উপকার হয়। বিলাতী বেগুণের বীজ এবং খোসাগুলিও ঐ কাজ করে। যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য কষ্ট পায় তাহাদের কমলালেবু খাইবার সময় লেবুর কোয়ার শুধু বীচিগুলি বাদ দিয়া ছিব্‌ড়া শুদ্ধ খাইয়া ফেলিলে উপকার হইতে পারে। পর্য্যাপ্তমাত্রায় শাক খাইলেও শাকের আঁশ (Cellulose) অংশ উপকার করে।

আজ শুধু খাদ্যের কঠিন অংশ সম্বন্ধেই তোমাদের কিছু বলিলাম। খাদ্য সম্বন্ধে জানিবার আরও অনেক কিছু আছে। সেগুলি তোমাদের আর এক দিন শুনাইব। আমাদের প্রত্যহ কি কি খাওয়া উচিত তাহারই একটা তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ থাকা দরকার ?

নীচের ছবিতে দেখ—

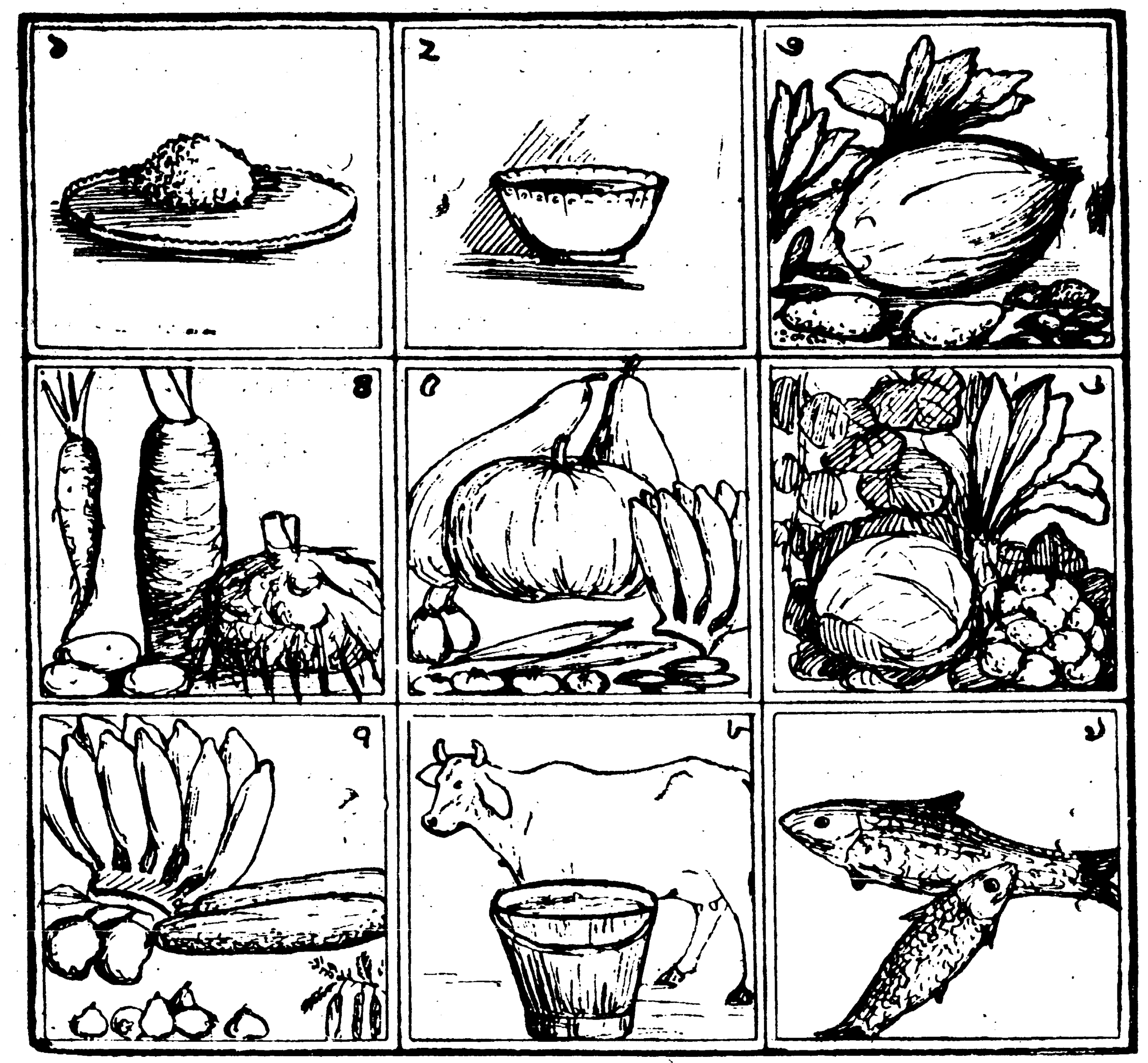

(১) এক বা দুই বাটী ভাত—শরীরের তাপ উৎপাদনের জন্য।

(২) এক বাটী ডাল—ইহাতে আছে ভিটামিন বি ;—শরীরের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। বেরিবেরির মহৌষধ।

(৩) কিছু শক্ত ও সিটাওয়ালা দ্রব্য

—দন্তের ব্যায়ামের জন্য এবং অন্ত্রের উত্তেজক কার্য্যের জন্য—কোষ্ঠবদ্ধতার মহৌষধ।

—ঝুনা নারিকেল, অল্প মাত্রায় ছোলা ভিজা ও ভাজা, পেয়ারা, শাক, পটোল, উচ্ছে।

আনাজ ঃ—(৪) মূল ঃ—আলু, কচু, মানকচু, মূলা

(৫) ফল আনাজ ঃ—কাঁচকলা, ঝিঙে, লাউ, পটোল, কুমড়া, বেগুণ, বিলাতী বেগুণ।

(৬) গাছের পাতা ও ডগা আনাজ ঃ—পালং, নটে, পুঁই, কপি, লাউ, কুমড়া শাক।

—ইহাদের ভিতর হইতে আমরা পাই তিন রকম ভিটামিন—এ, বি, সি (অল্প মাত্রায়) ; ভিটামিন এ ও বি শরীরের বৃদ্ধির জন্য।

বিবিধ লবণ—শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(৭) ফল ঃ—কলা, শশা, জামরুল, আম তেঁতুল ইত্যাদি।

এই সকল হইতে আমরা বিবিধ ভিটামিন—বিশেষতঃ ভিটামিন সি পাই। এই ভিটামিন বিবিধ চর্ম্মরোগের ঔষধ।

(৮) ও (৯) দুধ ও মাছ—এই দুই দ্রব্য শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দুধ মাছের পয়সা না থাকিলে বেশী করিয়া শাক ও আনাজ খাইতে হইবে।

হরিমোহন দা'র অনাথ-আশ্রম

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

হরিমোহন দা' লোকটি বড় পরোপকারী। পরের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই সে এতটা বয়স কাটাইয়া দিল, নিজের কথা কখনও ভাবিতে শিখিল না। কি গ্রীষ্ম,

কি বর্ষা, কি শীত—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় সর্ব্বক্ষণ দেখিবে আধ-ময়লা পাঞ্জাবীর উপর পরিষ্কার একখানি চাদর গায়ে দিয়া হরিমোহন দা' পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—হাতে একখানি মোটা বাঁধান খাতা। বলা বাহুল্য সেটি চাঁদার খাতা। সব সময়ে সে যে একা থাকে তা'ও নয়, প্রায় সময়েই দেখা যায় তার সঙ্গে আরও কয়েকটি অনুচর রহিয়াছে এবং তারা সকলেই পরোপকার-ব্রতে সমান উৎসাহী।

এই পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্য হরিমোহন দা'কে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক সময়ে সেও তোমাদেরই মত ইস্কুলে পড়িত। লেখাপড়া শিখিয়া পাশ-টাশ দিবে এমন ইচ্ছাও সম্ভবতঃ তার মনের কোণে খানিকটা ছিল—অন্ততঃ তার বাবার মনে ছিল। কিন্তু পারে নাই শুধু এই পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্য।

সেবার তাদের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা। পরীক্ষার হলে বসিয়া আর পাঁচ জন ভাল ছেলের মত হরিমোহন দা'ও আপন মনে উত্তর লিখিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ পিছনের বেঞ্চ্ হইতে কে তা'র পিঠে কলমের উল্টা দিক্ দিয়া খোঁচা মারিতে লাগিল। হরিমোহন দা' ফিরিয়া দেখে তার বন্ধু রামগোপাল একটা অঙ্কের উত্তর জিজ্ঞাসা করিতেছে। হরিমোহন দা' সে অঙ্কটা কষে নাই—বাস্তবিকই কষে নাই। সে কথা রামগোপালকে জানাইয়া দিলেই চলিত, কিন্তু হরিমোহন দা'র পরোপকার-প্রবৃত্তি তা'তে বাদ সাধিল। 'ওর যদি একটু উপকার হয় হোক্ না, আমি নিজে তো আর অন্যায় কর্‌ছি না'—এই উচ্চ ভাব মনে পোষণ করিয়া সে অদূরস্থ সত্যহরিকে অঙ্কটির উত্তর জিজ্ঞাসা করিল। আগেই বলিয়াছি হরিমোহন দা'র মনে কোনও কুভাব ছিল না, কাজেই এক্ষেত্রে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল ততটা সে করা আবশ্যক বোধ করিল না। ফলে পরমুহূর্ত্তেই হল্‌শুদ্ধ ছেলে সভয়ে দেখিল যদু বাবু (স্কুল শুদ্ধ ছেলে যাঁর নামে থর থর করিয়া কাঁপে সেই যদু বাবু) ক্যাঁক্ করিয়া হরিমোহন দা'র ঘাড়টা টিপিয়া ধরিয়াছেন এবং হরিমোহন দা' পোষা বিড়ালটির মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হল্ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ মত সে বছর হরিমোহন দা'র আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। হরিমোহন দা' দীর্ঘ দিন ঘরে বসিয়া রহিল, তার পর ঠিক করিল—যে শিক্ষায়তনে হৃদয়ের অমন সুকোমল বৃত্তিরও জায়গা নাই সেখানে তার আর যাওয়া উচিত নয়।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। হরিমোহন দা' এখন বড় হইয়াছে, এখন আর ইস্কুলে পড়িবার মত বয়স তার নাই। ইস্কুলে যারা পড়ে তারা সকলেই এখন তাকে দাদা বলিয়া ডাকে—এমন কি তাদের কেউ কেউ তার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিয়াছে। হরিমোহন দা'ও এখন নিরুপদ্রবে জনসেবা, লোকসেবা প্রভৃতির সাহায্যে হৃদয়ের উচ্চতর প্রবৃত্তিগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছে।

রবিবার দুপুর বেলা হরিমোহন দা'র বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছে। উদ্দেশ্য—পাড়ায় এবার নতুন কি প্রতিষ্ঠান খোলা যাইতে পারে তারই আলোচনা। ফুট্‌বল্ ক্লাব্, সঙ্গীত-সঙ্ঘ, গীতা সোসাইটি, রিফ্রেশিং ক্লাব্—হরিমোহন দা'র চেষ্টায় পাড়ায় কোনটারই অভাব নাই। লাইব্রেরী একটা করিলে মন্দ হয় না, কিন্তু উহাতে নাকি বড় বই চুরি যায় তাই হরিমোহন দা'র ওদিকে বিশেষ আগ্রহ নাই। লাট্টুর সীজ্‌ন্ অনেক দিন হয় শেষ হইয়াছে, সম্প্রতি ঘুড়ির সীজ্‌ন্ আসিয়া পড়িয়াছে। হরিমোহন দা' লক্ষ্য করিয়াছে কতকগুলি ছোটলোকের ছেলে বাঁশের আগায় ডালপালা বাঁধিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় কাটা ঘুড়ি ধরিয়া বেড়ায়। তাদের মুখনিঃসৃত "ভোম্‌মারা" ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া পাড়া কাঁপাইয়া তোলে। কোথায় যে ইহারা থাকে, কোথায়ই বা খায়—তার কোনও হদিস পাওয়া যায় নাই। আত্মীয়স্বজনও যে ইহাদের নাই তা' নিঃসন্দেহ। থাকিলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে একমাত্র ঘুড়ির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে নিশ্চয়ই ইহারা পারিত না। হরিমোহন দা'র ইচ্ছা—এবার এই সব ভবঘুরে অনাথ বালকদের জন্য পাড়ায় একটা আনাথ-আশ্রম খোলা হউক্।

কিন্তু অনাথ-আশ্রমে অনেক টাকার দরকার। এ তো আর 'ক্লাব-ট্লাব' নয় যে ছোট্ট একখানি ঘর আর খুঁটিনাটি কয়েকটা জিনিষ হইলেই চুকিয়া যাইবে!

আগে দস্তুর মত একখানা গোটা বাড়ী চাই। তার পর চাকর রে ঠাকুর রে, খাট রে তোষক রে, ওষুধ রে বিষুধ রে—একেবারে আস্ত একটি বাজার তুলিয়া আনিতে হইবে। এত টাকা কি আর চাঁদা তুলিয়া পাওয়া সম্ভব? হরিমোহন দা' বলিল, "আলবৎ সম্ভব, আমিই দেখাব।" তার পর হরিমোহন দা' চুপি চুপি তিন জন লোকের নাম করিল। তিন জনই এ পাড়ার নতুন বাসিন্দা। ইঁহাদের কাহাকেও একটিবার জপাইতে পারিলেই কেল্লা ফতে।

হরিমোহন দা'র প্রথম লক্ষ্য কিন্তু ভ্রষ্ট হইল,—ভ্রষ্ট বলিয়া ভ্রষ্ট, একেবারে টার্গেটের দশ হাত দূর দিয়া চলিয়া গেল। ব্যারিষ্টার কিউ, আর, ভোস—যিনি আইস্‌ল্যাণ্ডের ভূমিকম্পে, নটিংহামের ডগ্‌-হস্‌পিটালে, মেল্‌বোর্ণের রোয়িং ক্লাবে হাজার হাজার টাকা চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন তিনি হরিমোহন দা'কে একেবারে আমল দিলেন না, বাহির হইতেই খেদাইয়া দিলেন।

হরিমোহন দা'র প্রধান শিষ্য গোপেশ্বর বলিল, "ও সব দিশী সাহেব-টাহেব আমার জানা আছে। ওরা চায় শুধু সাহেবদের কাছে নাম। হ্যাঁ, টাকা দিতে জানে মারোয়াড়ীরা। আজ ধরমশালা বানাচ্ছে, কাল জৈন-মন্দির খুলছে, পরশু—। ও সব ভোস-ফোস দিয়ে কিছু হবে না, চল ঢুঁঢুরিয়ার কাছে।"

ঘনরামদাস ঢুঁঢুরিয়া হরিমোহন দা'দের পাড়ায় নতুন বাড়ী করিয়াছে। পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ী—কি ভীষণ উঁচু! দেখিতেও চমৎকার—আগাগোড়া রংচংএ কাচ আর ঝিলিমিলি দিয়া মোড়া। বাড়ীর গায়ে রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, এরোপ্লেন, পদ্মফুল, রাম-রাবণের যুদ্ধ, 'হনূমানের গন্ধমাদন আনয়ন' প্রভৃতি রকমারি ছবি। দেয়ালের কোথাও এতটুকু সাদা দেখিতে পাইবে না। ভিতরেও ঠিক ঐ রকম। কোন ফাঁক দিয়া যাহাতে এতটুকু আলো কিংবা বাতাস বাড়ীর ভিতরে না ঢুকিতে পারে তা'র জন্য কত না সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।—ইংরাজীতে যাহাকে বলে একেবারে "এয়ার-টাইট্‌"।

হরিমোহন দা' চাঁদার খাতা বগলে কয়েক জন অনুচর সহ গিয়া কড়া নাড়িল। খানিক পরেই একটি বিশালকায় ভুঁড়ি ঘটি হাতে করিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তা'দের দিকে তাকাইল। হরিমোহন দা' জানাইল তারা

শেঠ্‌জির দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ভুঁড়ি তা'দের ঘরের ভিতরে লইয়া একটু বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল। প্রকাণ্ড ফরাস্‌, অনেকগুলি তাকিয়া। হরিমোহন দা' আশান্বিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে পুর্ব্বোক্ত ভুঁড়ি আবার আসিয়া দেখা দিল। এবার আর তা'র হাতে ঘটি নাই, আছে একটি দাঁতন। ভুঁড়ি একেবারে ফরাসের মাঝখানে আসিয়া বসিল, তার পর কহিল, "হামারি নাম ঘনরামদাস ঢুঁঢুরিয়া। বাবুরা কুথা থেকে আসচেন?"

হরিমোহন দা' প্রথমটা একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া

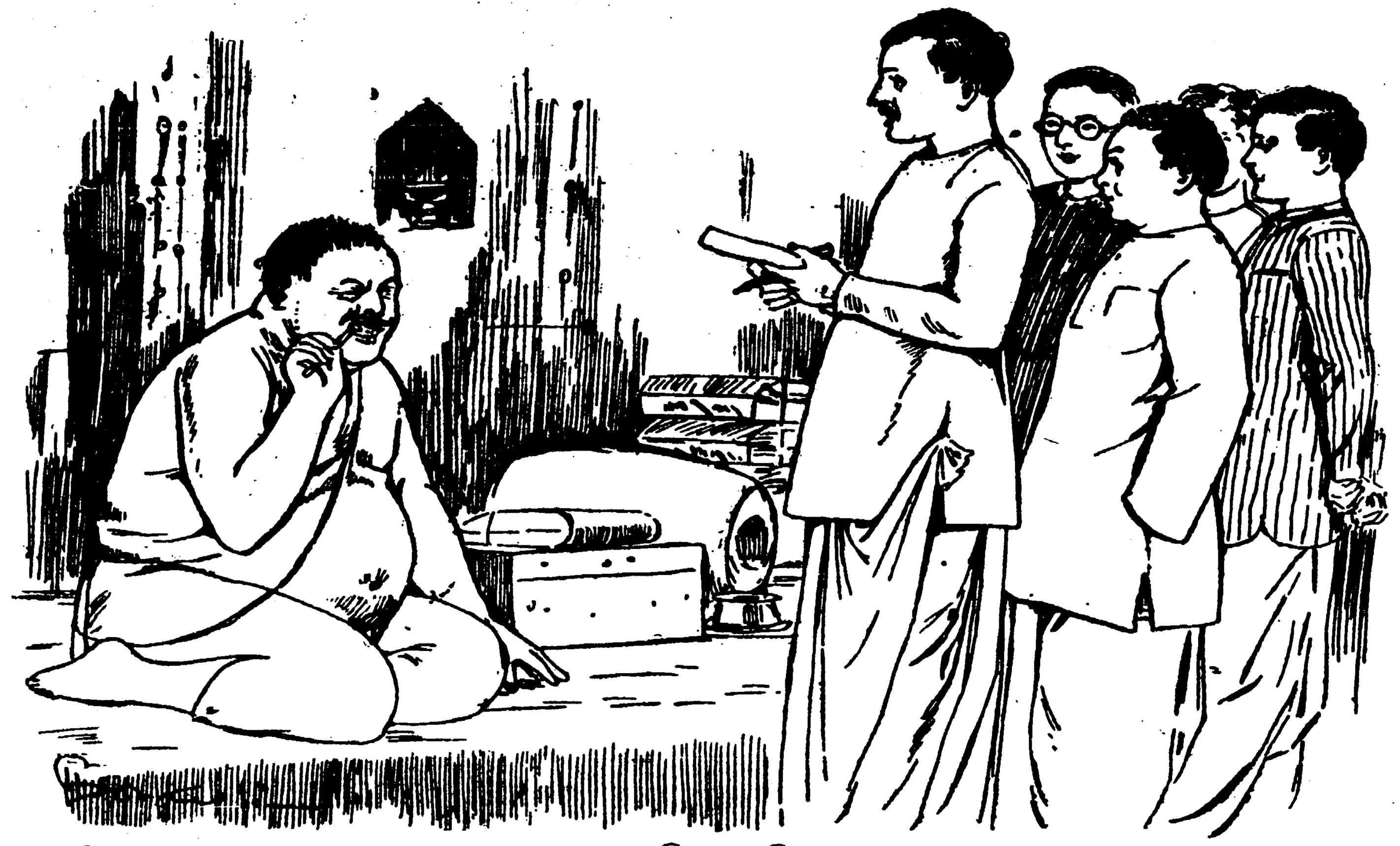

কোতো কোমিসন্‌ লিচ্চেন?

লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আসিবার কারণ জানাইল। বেশ করুণ ভাবে, কণ্ঠে দরদ ঢালিয়া অনাথ-আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিল।

ভুঁড়ি অনেকক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল, আপন মনে কি চিন্তা করিল, মাটীতে আঙ্গুল ঘষিয়া ঘষিয়া কি হিসাব করিল, তার পর কহিল, "আপনারা টাকায় কোতো কোমিসন্‌ লিচ্চেন?"

কমিশন্‌! হরিমোহন দা' আকাশ হইতে পড়িল,—"কমিশন্‌ কিসের?"

ভুঁড়ি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আর চেপে কি হোবে? আপনারা আর কুছু মাগনা এতো খেটে দিচ্ছেন না—চাঁদা যা তুলবেন তার উপোর একটা কোমিসন্ তো আপনারা লেবেন?"

হরিমোহন দা' উত্তেজিত ভাবে জানাইল—সে চরিত্রের লোক তারা নয়, পরোপকার ভিন্ন ইহার মধ্যে অন্য কোনও কদর্থ থাকিতে পারে না। ভুঁড়ি মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আর হামাকে কোতো বখরা দেবেন? যে টাকা খাটা'ব তার সুদের চাইতে বেশী ওয়াশীল তো হওয়া চাই জরুর।" হরিমোহন দা' শিহরিয়া উঠিল। লোকটা বলে কি! একি তারা ব্যবসা করিতে বসিয়াছে যে বখরা দিবে? ভুঁড়ি কিন্তু কিছুতেই মানিতে চাহিল না, বলিল, বারো আনা—চার আনা বখরা করিলে সে ভবিষ্যতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে। হরিমোহন দা' সঙ্গীসহ উঠিয়া আসিল।

অনাথ-আশ্রমের সঙ্কল্প বুঝি শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসিয়া যায়। চাঁদা-আদায়কারীরা বড় দমিয়া গিয়াছে। আজ একবার জমীদার পদ্মলোচন বাবুর কাছে চেষ্টা করিয়া দেখিবে; তাহাতে কাজ হয় ভালই, নচেৎ—নচেৎ হরিমোহন দা' আর ভাবিতে পারে না।

বিকাল পাঁচটার সময়ে পদ্মলোচন বাবুর বাড়ীতে সকলে হাজির হইল। আজ আর কড়া নয়, দস্তুর মত কলিং বেল্। পরক্ষণেই 'ভুঁড়ি'র পরিবর্ত্তে লজেঞ্চুষ চুষিতে চুষিতে একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "এই ঘরে আসুন"। পদ্মলোচন বাবু ঘরেই ছিলেন; অতি অমায়িক লোক; আলবোলা রাখিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনারা——?"

হরিমোহন দা' আসিবার কারণ জানাইল।

পদ্মলোচন বাবু বলিলেন, "বেশ, অনাথ-আশ্রমে সাহায্য, এ তো ভাল কথা—সৎ কথা। প্রত্যেকেরই সাধ্যমত করা উচিত।—বিশেষতঃ যখন পাড়ার মধ্যে, সাহায্য করব বৈকি! আপনারা অন্যান্য আয়োজন আরম্ভ করুন, আমার যা সাধ্য তা অবশ্য দেব। না—না, আপনাদের আর আস্‌বার দরকার নেই, আমিই পাঠিয়ে দেব—আপনাদের চাইতে আমার নিজের গরজ কম নয় জানবেন।"

হরিমোহন দা' অনুচরবৃন্দ সহ গদ্‌গদচিত্তে বাহির হইয়া আসিল। এই বার বঁড়শীতে মাছ গাঁথিয়াছে।

দিন দশ-বারো পরের কথা। পদ্মলোচন বাবুর মত অত বড় একজন জমীদারকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া হরিমোহন দা'র আর নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান নাই; অনাথ-আশ্রমের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করিবার জন্য সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। যেখানে যেখানে ধারে জিনিষ পাওয়া যায় সেখান হইতে সাধ্যমত ধার করিতে কসুর করিল না; একটা গোটা আশ্রমের আসবাব—সহজ কথা নয় ত! উদ্বোধনের দিন কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, কাহাকে সভাপতি করা হইবে, কি কি খাওয়ানো হইবে, কি কি গান গাওয়া হইবে, কে কোন্‌টা গাহিবে—তারও 'লিষ্টি' তৈরী হইয়া গেল। এখন পদ্মলোচন বাবুর সাহায্যটা পাইলেই হয়।

কিন্তু পদ্মলোচন বাবুর সাহায্য এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ইতিমধ্যে তিনি নিজে একবার আসিয়া আয়োজন দেখিয়া তারিফ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু চেক্ এখনও আসে নাই। হরিমোহন দা' রোজই তার জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। সারা দিনমান কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঐ এক আলোচনা—পদ্মলোচন বাবু কত সাহায্য করিবেন, এত দেরী যখন করিতেছেন তখন নিশ্চয়ই একটা মোটা রকম কিছু পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোধ হয় শুধু চেক্ নয়, অন্যান্য সরঞ্জামও পাঠাইবেন—চাই কি, হয়তো একখানা আস্ত বাড়ীই ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আর যে দেরী সহে না, এক বার তাগিদ করিবে কি? না—না, সেটা ভাল দেখায় না, ভদ্রলোক নিজে হইতে বলিয়াছেন—তাঁর গরজ তোমাদের চেয়ে কম নয়; এ অবস্থায়—

অবশেষে সাহায্য আসিল। এক দিন সকাল বেলা দশ-বারো জন ছোট ছোট ছেলে একখানি লেফাফা হাতে লইয়া হরিমোহন দা'র খোঁজ করিল—তারা পদ্মলোচন বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছে। হরিমোহন দা'র অনুচরদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরিমোহন দা' স্নান করিতেছিল, পদ্মলোচন বাবুর নাম শুনিয়া ভিজা কাপড়েই ছুটিয়া আসিল। একটি ছোট ছেলে আগাইয়া আসিয়া হরিমোহন দা'র হাতে খামটা তুলিয়া দিল। অনুচরবৃন্দ তখন স্থাণুর মত নিশ্চল।

হরিমোহন দা' খাম খুলিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল,—এক বার—দু'বার—তিন বার পড়িল। তার পর হঠাৎ ধপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। পদ্মলোচন বাবু অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থে চেক্ পাঠান নাই, কয়েকটী অনাথ বালক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ইঁদুর-চরিতামৃত

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন আসামের বিখ্যাত কাঠের ব্যবসাদার। চিরটা কাল আসামের বন-জঙ্গলে কাটিয়ে কয়েক দিন হল তাঁরা হঠাৎ কল্‌কাতায় বেড়াতে এসেছেন। এ ক'টা দিন তাঁরা অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন, কাজেই কিছু পরিশ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণে সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু'ভায়ের ঘুম ভাঙ্‌তে দেরী হচ্ছিল। অর্দ্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্দ্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, যেমন—কেবল মাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা সম্ভব কিনা, কিংবা যদি এমন হ'ত—রেল্ লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্লাটফর্ম্ম্‌টাই চল্‌তে সুরু কর্‌ত তা হ'লে কি মজাই হ'ত! কেমন প্লাটফর্ম্মে চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিল্লী-মক্কা বেড়ানো যেত! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার অসহ্য!) সহসা হর্ষবর্দ্ধনের মনে হ'ল তাঁর ভুঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুল্‌লে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্দ্ধন চোখ বুঁজেই ডাক্‌লেন—"গোব্‌রা, এই গোব্‌রা!"

"উঁ।"

"দেখ্ তো আমার পেটে কি?"

চোখ না খুলেই গোবর্দ্ধন জবাব দিল—"কি আবার?"

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় ব'লে হর্ষবর্দ্ধনের সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল। ব্যাপার কি? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ ক'রে অকালে চোখ খুল্‌তে হবে? কিংবা, খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাকে বলে "ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা"—তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্ত্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয়ও হচ্ছিল চোখ খুল্‌তে।

"দেখ্ না, নড়ছে যে রে!"

"পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হয় ত!" গোবর্দ্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্দ্ধন ভাব্‌লেন গোব্‌রা ভুল বলে নি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বে কি? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কল্‌কাতায় এসে হাওয়া বদল ক'রে সহরের হাল-চাল দেখে আন্দোলন সুরু করে দিয়েছে—আশ্চর্য্য কিছু নয়! আকস্মিক ভুঁড়ি-কম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্দ্ধন নিশ্চিন্ত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাক্‌তে সুরু কর্‌ল। ভুঁড়ি-কম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই তো, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাক্‌লেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন 'ভৌঁড়িক' বিপর্য্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগ্‌ল।

বর্দ্ধনেরা নিশ্চিন্ত হ'লেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না; হঠাৎ গোবর্দ্ধন অনুভব কর্‌ল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়্‌ল তার পেটের উপর। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কুঁক্‌ড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুল্‌তে সাহস হ'ল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আস্‌বে শরীর-তত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব? সে ভয়ানক ভাবে ভাব্‌তে সুরু কর্‌ল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্ত্তধ্বনি শোনা গেল—"মিঁয়াও"!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্দ্ধনের নিজের পেটের পিলে চম্‌কে গেল; সে ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌ল—"এ যে বেড়াল, ও দাদা!" তার কণ্ঠে আর চোখে বিভীষিকা ফুটে উঠ্‌ল, বেড়ালকে তার ভারী ভয়। হর্ষবর্দ্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্য্যস্ত গোবর্দ্ধনের উদর থেকে সজোরে স্থানচ্যুত ক'রে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। "বেড়াল? বেড়াল এল কোত্থেকে! কী বি—পদ্!"

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ আবার লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠ্‌ল—তার সেই লাফটাকে এক সঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড্ বলা যেতে পারে। মার্জ্জার-মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দুই ভাই দেখ্‌লেন ঘরের কোণে তিন্‌টে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রের ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহার করছে। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কিনা জানা যায় নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে এগুলো হচ্ছে তাই। গোবর্দ্ধন এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে কিন্তু গো-বেচারা বাঙালী বেড়ালকে যে এরা আমলই দেয় না তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মানুষদের এরা কেমন খাতির করবে তাও তো জানা নেই, হর্ষবর্দ্ধন নিতান্ত ভাবিত হয়ে পড়েন।

গোব্‌রা সাহস দেয়—"ভয় কি দাদা, ওরাও তিন জন, আমরাও তিন জন আছি।"

হর্ষবর্দ্ধন হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন—"উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই না! দেখ্‌লে না কি রকম পালাতে ওস্তাদ্? কি রকম লাফখানা দিল—বাপ্‌স্! একটা আস্ত কাপুরুষ।"

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্দ্ধনের মনে আসে—"হুঁ, যাকে ইংরেজিতে বলে 'কাউহার্ড্'। ঠিক বলেছ!"

হর্ষবর্দ্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—"যদি এক-একজন ক'রে আসে আমি ভয় করি না ওদের। তা তো আস্‌বে না, এক সঙ্গে তাড়া করবে!"

তা হলে কি বিপজ্জনক ব্যাপারই না ঘট্‌বে, ভেবে গোবর্দ্ধন শিউরে ওঠে। এক সঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক্, এ রকম বাহন দেখ্‌লে বাবা গণেশকেও পালাতে হ'ত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই? গোব্‌রা বলে—"বুঝেছ দাদা, এ চীজ্ দেখ্‌লে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, আমরা তো ছার।"

"হুঁ", হর্ষবর্দ্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন, "আমি ভাব্‌ছি যদি তাড়া করে তা হ'লে কি কর্‌ব! কড়ি কাঠ ধরে ঝুল্‌তে হবে দেখ্‌ছি। পালাব কোথায়?"

"হ্যাঁ—দরজা তো ওরাই আগ্‌লে রয়েছে!" দুই ভাই কড়ি কাঠ ধরে ঝুল্‌ছেন, বেড়ালটাও দাদার কাছা আশ্রয় ক'রে দোদুল্যমান আর নীচে থেকে ইঁদুরদের ভয়ানক লম্ফ-ঝম্প—এই দৃশ্য কল্পনা ক'রে গোব্‌রার হাসি পেল। "তাই তো, তা হলে তো ভারী মুস্কিল দাদা! তুমি কি ওই ভারী দেহ নিয়ে ঝুল্‌তে পারবে?"

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের বিপুল কলেবর একবার লক্ষ্য কর্‌ল, তার মুখভাব দেখে মনে হ'ল গোবর্দ্ধনের মত সেও এ বিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্দ্ধনের মনকে স্পর্শ কর্‌ল।

"যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি?" হর্ষবর্দ্ধন তাল ঠুকে বেঁড়ালটার লেজ্ মুঠিয়ে ধরেন; "তা হ'লে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধর্‌ব। বেড়ালে ইঁদুর মারে ব'লে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের শেষ কর্‌ব।"

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিত-ভাবে আপত্তি করে—'মিঁউ'।

অনাহুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোব্‌রারও ক্রমশঃ ভালো লাগ্‌ছিল। ভালো লাগ্‌বারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্ত্তে মানুষ আর বাঘ একই খড়ের চাল আশ্রয় ক'রে পাশাপাশি ভেসে চলেছে অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন দুর্ল্লভ)। যাই হোক্, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোব্‌রা ভাব ক'রে ফেল্‌বে এ আর বেশী কথা কি?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—"তা হ'লে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে?"

"হয় হোক্ গে। কথায় বলে, যা শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক্, বেড়ালও যাক্—ওদের কাউকেই চাইনে।"

"আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?"

"কেন, তা আস্‌বে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য?"

"হ্যাঁ, তুলো খায় শুনেছি। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া ক'রে আসে?"

"য়্যাঁ, বলিস্ কি?" হর্ষবর্দ্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, "তা পারে তাড়া করতে, যে রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে। কি হবে তা হ'লে?" হর্ষবর্দ্ধনের হৃদ্‌কম্প হয়।

"তাই তো ভাব্‌ছি।"

"দে ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিক্‌নিক্ ক'রে ফেলুক্। ওর জন্য কি আমরাও প্রাণে মর্‌ব?"

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের ষড়যন্ত্র টের পেয়েছিল, এমন ভাবে গদীতে নখ এঁটে বস্‌ল যে টেনে তোলে কার সাধ্য? বেড়ালের সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন ওদিকে প্রাতরাশ সমাপ্ত ক'রে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিন জনের কেউই এটা দৃকপাত্ করে নি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে গলা পরিষ্কার ক'রে উঁচু খাদের ডাক ছাড়্‌ল—"ম্যাও!"

পর মুহূর্ত্তেই সে বর্দ্ধনদের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্য্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ কর্‌ল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্দ্ধন ঘরের পরিবর্ত্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন—"বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়, কলকাতার হাল-চালই অদ্ভুত!"

"সহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গী দেখ্‌লাম মানুষেরই তোয়াক্কা করে না তো বেড়াল! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ।"

"কিন্তু"—খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়।

"হুঁ।" গোবর্দ্ধন কি'যেন ভাবতে থাকে।

"তুই কি ভাবছিস্?"

"ভাব্‌ছি বেড়ালটা যে সহুরে ইঁদুর দেখে ঘাব্‌ড়েছিল হয় তো তা' নয়।"

"তা নয় তো আবার কি! আমাদের কর্ম্মচারী কি লিখেছিল? কল্‌কাতার হাল-চালই এই রকম। মেশামেশির পক্ষপাতী নয় এরা। বেড়ালরাও।"

"উঁহু। তা নয়, পিলেগের নাম শুনেছ?"

"শুনেছি, কি তা'তে?"

"সহর জায়গায় ভারী হয়।" গোবর্দ্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—"ব্যায়রামটার নাম পিলেগ্ কেন জান? পিলে থেকে লেগ্ পর্য্যন্ত ফুলে ওঠে—তাই পিলেগ্। লেগ্ কি জান তো?"

হর্ষবর্দ্ধন দাব্‌ড়ি দেন্—"যা যাঃ, আর তোকে বিদ্যে ফলাতে হবে না। তোর মাথা!"

"উঁহু, লেগ্ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উল্‌টো। যা'কে বলে গিয়ে পা।"

"জানি জানি, তোকে আর বল্‌তে হবে না। ফীট্ মানেও পা হয়—আবার ফীট্ দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হ'ল গিয়ে আর এক ফীট্।"

"আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট্ হয়। কিন্তু তাতে লেগ্ হয় না—লেগে আর ফীটে এইখানেই তফাৎ।"

হর্ষবর্দ্ধন চটে যান—"বুঝেছি রে বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা বল্।"

"সহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কাম্‌ড়ালেই পিলেগ্। বেড়ালটা কেন ঘাব্‌ড়াচ্ছিল, এখন বুঝলে? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে।"

"য়্যাঁ, বলিস্ কি?" হর্ষবর্দ্ধন একেবারে চম্‌কে ওঠেন।

"সহুরে বিড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ী ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারী কথাবার্ত্তা শোনে, রোগ-ব্যারামের ব্যাপার সব ওর জানা। তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের কিনা বিনাশ নেই।"

"তুই ঠিক বলেছিস্।" হর্ষবর্দ্ধন সোজা হয়ে বসেন। "আজ কিংবা কালই এ বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন কাম্‌ড়ে দেয় কে জানে! কাম্‌ড়ে দিলেই হ'ল।"

"ব্যস্, তা হলেই পিলে থেকে লেগ্ পর্য্যন্ত—"

"আগাগোড়া পিলেগ্!" হর্ষবর্দ্ধন বাক্যটা সম্পুর্ণ ক'রে মুখখানা প্যাঁচার মত বানিয়ে তোলেন। গোবর্দ্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

চিত্রশালা

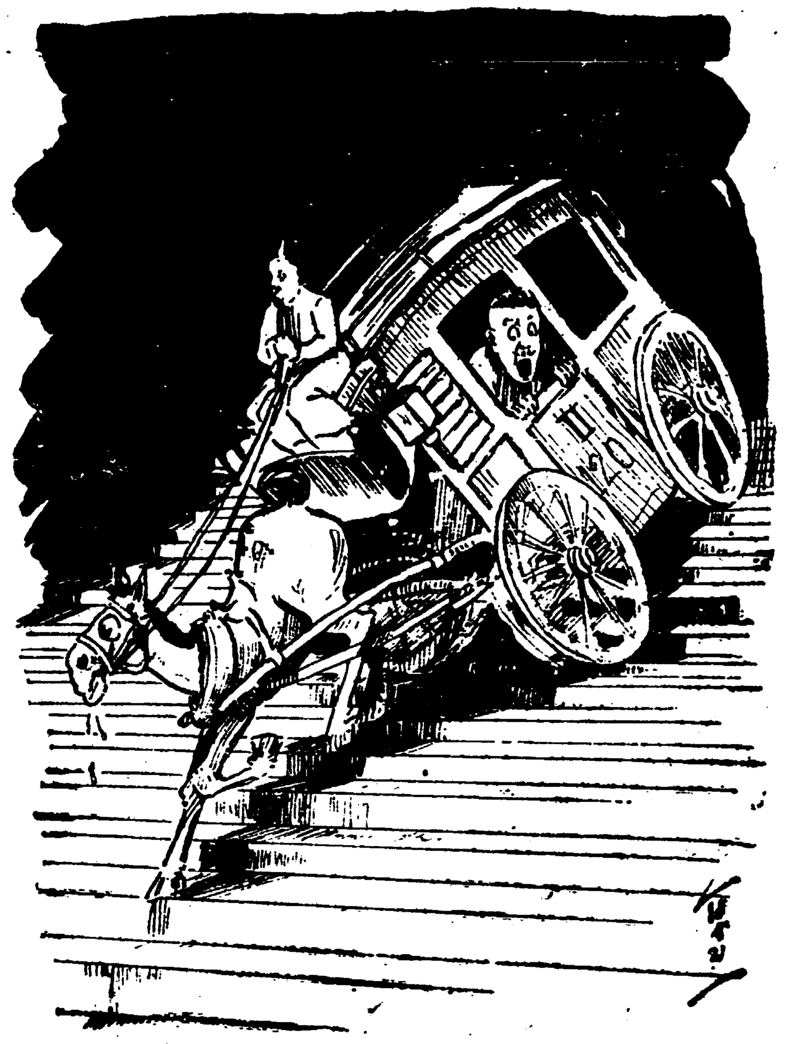

ঘর-মুখো ঘোড়া

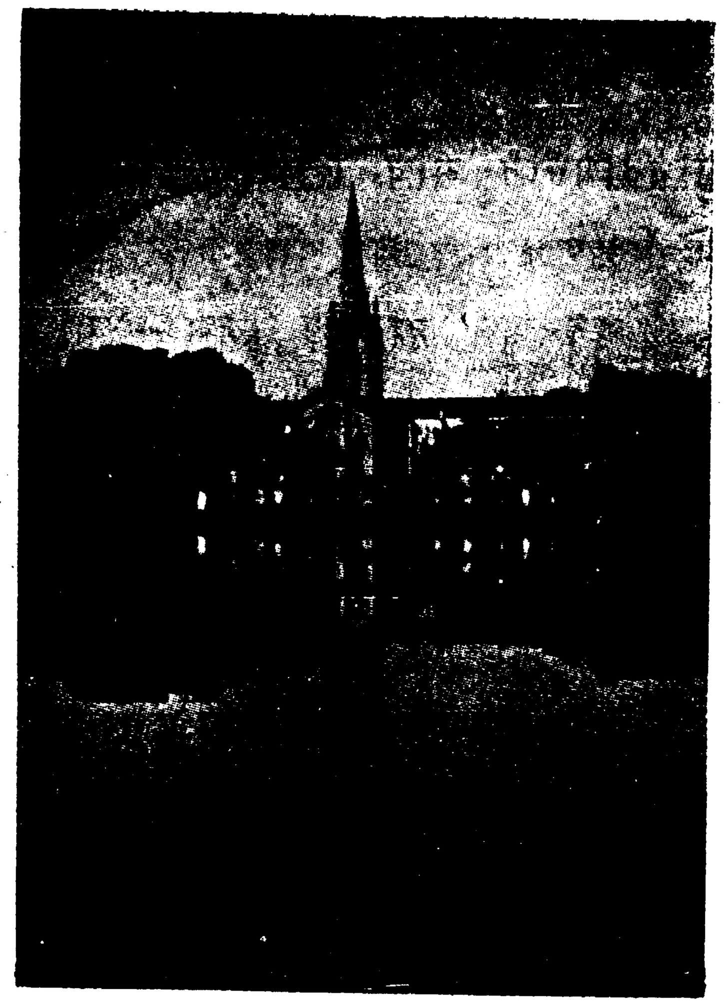

সেণ্ট্পল্স্ গীর্জ্জা (কলিকাতা)

(আলোকচিত্রটি শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত)

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৬

মোধাবী ছাত্র

প্রথম যেদিন হুকা-কাশি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকানাথের বাড়ী যান, সেদিন অত্যধিক বেলা হইয়া পড়ায় তাঁর যত কিছু জ্ঞাতব্য ছিল সমস্তই জানা

সম্ভব হয় নাই। দিন কয়েক পরে খবর পাঠাইয়া আবার তাই এক দিন তিনি শ্রীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্তোষের তত্ত্বাবধানে কয়েক দিন ধরিয়া কারখানার আপিস-ঘরগুলি পরিষ্কার করা হইতেছিল। এত বড় একটা কারবার যিনি চালাইতেছিলেন সেই অহিভূষণ চৌধুরী সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্তর্হিত হইয়া পড়ায় কিছুই তাঁর নিকট হইতে বুঝিয়া লওয়া যায় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র কোথায় কি ভাবে আছে ঠিক-ঠিকানা নাই, কর্ম্মচারীদের প্রতি তাই আদেশ দেওয়া ছিল যেন কুটাটি পর্য্যন্ত কেহ নষ্ট না করে। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী এ ক'দিন ধরিয়া ম্যানেজারের টেবিলের উপর জমা হইতেছে; সলিল এবং সন্তোষ পরীক্ষা করিয়া যেগুলি আবশ্যক বোধ করিবে তুলিয়া রাখিবে, বাকীগুলি আবর্জ্জনার স্তূপে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে।

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিতে সর্ব্বপ্রথমেই টেবিলের উপরকার এই অভিনব "মিউজিয়াম্"টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; নানা রকম জিনিষ পাশাপাশি সাজান রহিয়াছে, একটির সহিত অপরটির কোনই কারণগত সম্পর্ক নাই। হুকা-কাশি সেগুলির দিকে একবার শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ তার মধ্য হইতে, বোধ করি কৌতূহলবশতঃই, একটা জিনিষ হাতে তুলিয়া লইলেন—একখানা সবুজ রংয়ের বাঁধান মোটা এক্সারসাইজ্ বুক্, তার চারি দিকের অনেকটা অংশ আগুনের আঁচে পুড়িয়া গেছে। খাতাখানি হাতে লইয়া এক মনে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সলিলকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের কারখানায় কি পাঠশালা বসে নাকি সলিল বাবু?"

"আজ্ঞে?"

"জিজ্ঞাসা কর্ছি, ছোট ছেলের লেখা প্যারী সরকারের ফাষ্ট্ বুকের কপি চিনির কারখানায় এল কোত্থেকে? মজুরদের জন্যে কি এখানে নাইট্ স্কুলের বন্দোবস্ত আছে নাকি?"

"না তো!" পরম বিস্ময়ে সলিল এবং সন্তোষ এক সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িল, দেখিল, হুকা-কাশি ঠাট্টার ছলে কিছুই অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন নাই, বাস্তবিকই

খাতাখানি একটি অল্পবয়সী ছাত্রেরই বটে, বিশেষ যত্নের সহিত ধরিয়া ধরিয়া গোটা গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই গরুর গল্পটি সে লিখিয়াছে। দুই জনেই যথার্থ বিস্ময়ের সহিত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু হুকা-কাশির সেদিকে কোন লক্ষ্যই দেখা গেল না, অখণ্ড মনোযোগ সহকারে একটি একটি করিয়া খাতাখানার সবগুলি পৃষ্ঠা তিনি উল্টাইয়া অবশেষে কহিলেন, "অদ্ভুত মেধাবী এ ছাত্রটি; এ রকমটি আর কোথাও দেখিনি। এ খাতাখানার সন্ধান কোথায় মিল্‌ল একটু খোঁজ নিয়ে জানাতে পারেন কি?"

সন্তোষ উঠিয়া গিয়া অনুসন্ধান লইয়া আসিল। মাঝে মাঝে কাজকর্মের অত্যধিক চাপ পড়িলে কারখানা অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা রাখা হয়, চা এবং জলখাবার তৈরীর উদ্দেশ্যে তাই একটা স্বতন্ত্র ঘর আছে। তাহারই উনুনের মধ্যে খাতাখানির সন্ধান নাকি মিলিয়াছে। চিনির কারখানায় ছোট ছেলের লিখিবার খাতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্য্যজনক, উনুনের মধ্যে তাহার আবিষ্কারকাহিনী ততোঽধিক অভাবনীয়। এ বিস্ময়কর রহস্যের কোনই কূলকিনারা করিতে না পারিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল হুকা-কাশি ধ্যানস্থের মত অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে দু'তিন টিপ্ নস্য লইলেন।

"আপনাদের আপিসের কাজে মাস মাস মণিহারী জিনিষ—ষ্টেশনারি—যে সব কেনা হয় তার একটা হিসাব নিশ্চয়ই আছে?" হুকা-কাশি হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্নটি সকলের কানেই নিতান্ত অবান্তর বলিয়া বোধ হইল; সোনার হরিণের পুনরুদ্ধারে আপিসের ষ্টেশনারি—দোয়াত-কলম-কালী-পেন্সিলের হিসাব যে কী প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহার অণুমাত্রও কাহারো বোধগম্য হইল না। হুকা-কাশি ব্যতীত অপর কেহ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্তোষ নিশ্চয়ই অপাঙ্গে তার হাত-ঘড়িটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিত—দেখিত কতখানি সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ লোকটির নাকি সবই অদ্ভুত, কোন্ তুচ্ছ প্রশ্ন ভবিষ্যতের কোন্ দুরূহ সমস্যার যে সমাধান করিবে তাহা নাকি কেহই বুঝিতে পারে না। সে কেবল একবার সলিলের দিকে তাকাইল, অর্থাৎ ইঙ্গিতে তাহাকে ড্রয়ারের ভিতর হইতে হিসাবের খাতাখানি বাহির করিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

হিসাবের খাতা আসিলে হুকা-কাশি কিছুক্ষণ বেশ করিয়া সেখানা পরীক্ষা করিলেন, তার পর খোলা পাতার এক জায়গায় ডান হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটি রাখিয়া সলিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ফিতেটা বড্ডই ঘন ঘন এসেছে, নাঃ"

সলিল প্রথমটা এ প্রশ্নের হেতু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু ক্রমেই যেন তার মুখে ভাবান্তর ঘটিতে সুরু করিল—একটু পূর্ব্বের নির্লিপ্ত ভাব কোথায় উবিয়া গেল, তার জায়গায় দেখা দিয়া সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। এতক্ষণ সে ছিল হুকা-কাশিরই পাশে দাঁড়াইয়া, এইবার ধীরে ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তার পা' দুটি কোন মতেই আর তাহাকে স্থির ভাবে বহিতে পারিতেছিল না। হুকা-কাশি খাতা পরীক্ষার ছলে আড় চোখে একবার তার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, সন্তোষ গম্ভীর ভাবে জানালার ধারে উঠিয়া গিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

যেদিন প্রাতঃকালে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটে, সেদিনকারই সন্ধ্যার পরের কথা বলিতেছি।

খগেন্দ্রনাথের বেলেঘাটা বাসাবাড়ীতে রাত পৌনে আটটার সময় সকলে আহারে বসিয়াছে। 'চিত্রা'য় একখানা নূতন ছবি আসিয়াছে, বায়োস্কোপ-রস-রসিকদের সেখানে বেজায় ভীড়। অশনিকান্তের এ বিষয়ে বড়ই উৎসাহ, সে পূর্ব্বাহ্ণেই গিয়া কয়েকখানা টিকেট কিনিয়া আনিয়াছে। কেবল মাত্র গুর্খা দরওয়ানটার পাহারায় বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া সকলের এক সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়া আদৌ নিরাপদ্ নয়, তাই খগেন্দ্রনাথ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছে এ যাত্রা সে বাড়ীতেই রহিয়া যাইবে, ছবিখানা যদি বাস্তবিকই সকলের চোখে ভাল লাগে তবে কাল সে একা গিয়া দেখিয়া আসিবে। ঠাকুরকে বলা হইয়াছে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলে খগেনের শোয়ার ঘরে তার জন্য ভাত ঢাকা দিয়া সে যেন বাড়ী চলিয়া যায়।

একটু পরে সাজসজ্জা করিয়া সকলেই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। এই অবসরে নিরিবিলিতে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খগেন কাগজ কলম

লইয়া বসিল, কিন্তু অনেক কাটা-ছাঁটার পরেও চিঠিখানার ভাব ও ভাষা কোনটাই যখন তার মনঃপূত হইল না তখন বিরক্তচিত্তে লেখার সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিয়া সে আহারে বসিল। আজ সারাদিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, বাতাসের লেশ মাত্র নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর খগেন্দ্রনাথ বসিবার ইজি চেয়ারটাকে বারান্দার কাছে ঠিক জানালার সম্মুখে টানিয়া অনিল, খোলা জায়গায় চিৎ হইয়া যদি কিছু আরাম পাওয়া যায় সেই ভরসায়। ইজিচেয়ারের পাশে টিপয়ের উপর রহিল গুলিভরা একটা পিস্তল। আজকাল সন্ধ্যার পর এক মুহূর্ত্তের জন্যও খগেন এ অস্ত্রটিকে কাছ-ছাড়া করে না।

সারা দিনের ভাপ্‌সা গরমের পর এতক্ষণে ঝির্‌ঝির করিয়া একটু বাতাসের আভাস দেখা দিয়াছে, ইজিচেয়ারের উপর দেহভার এলাইয়া দিতে খগেন যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিল। ঘুমের উপর যাদের এতটুকু আধিপত্য নাই খগেন সে শ্রেণীর লোক নয়, ইচ্ছা করিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু গ্রীষ্মের রাত্রিতে কলিকাতার দক্ষিণের বাতাসে কি যে সম্মোহনী শক্তি আছে জানি না, ধীরে ধীরে খগেনের দুই চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ঠিক কতক্ষণ এ ভাবে কাটিয়াছে সে সম্বন্ধে খগেনের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, হঠাৎ খট্‌ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় সে সচকিত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। ইজিচেয়ারে শুইবার আগে ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোর প্রখর রশ্মিতে সমস্ত ঘরখানা ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল, সে আলো এখন এত মৃদু এবং ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে যে ঘরের সম্পূর্ণ অংশও আর চোখে পড়ে না। পর মুহূর্ত্তেই আলোর রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু সমস্ত ঘরখানা জুড়িয়া নয়, কেবল একটা কোণ হইতে মনে হইল যেন অসংখ্য নক্ষত্রের তীব্র দ্যুতি তীরের ফলার মত তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত খগেন চোখ রগ্‌ড়াইয়া ভাল করিয়া আর একবার তাকাইতেই আতঙ্কে তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—কালো দৈত্যের মত বিশাল চেহারার একটা লোক তারই দেওয়াল-আলমারীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া—তার হাতে দ্বারকানাথের সোনার হরিণ আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত খগেন্দ্রনাথ পাশের টিপয়টির উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সেটি স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেছে। সে ধড়মড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু ইস্পাতের মত কঠিন একখানা হাত পিছন হইতে এমনই জোরে তার কণ্ঠটি চাপিয়া ধরিল যে সে না পারিল নড়িতে, না বাহির হইল তার মুখ দিয়া এতটুকু স্বর। সেই মুহূর্ত্তে সাম্‌নের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল যমদূতের মত চারিটা লোক চারিখানি খোলা ভোজালী তার গায়ে ঠেকাইয়া নির্ব্বাক্‌ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যে লোকটা পিছন হইতে খগেনের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল সে তার দূরবর্ত্তী সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মাল পাওয়া গেছে তো? তবে এবার এটাকে গলা টিপে এখানেই সাব্‌ড়ে দিই, কি বল?" ভোজালীধারীদের মধ্যে এক জনের বোধ করি কথাটা তেমন মনঃপূত হইল না, সে কহিল, "হাত নষ্ট কর্‌তে যাবে কেন দাদা? ভোজালী রয়েছে কিসের জন্যে?"

খগেনের মনে হইল গলার চাপুনি একটু যেন কমিয়াছে, সে অতি কষ্টে বলিল, "তোমরা তবে হুকা-কাশির লোক? আমার বিশ্বাস ছিল তার কাজকর্ম্মের ধারা অন্য রকমের। সবাই দেখ্‌ছি তবে এক!"

"হুঁকা? হুঁকা আমরা কেউ টানি না, আমাদের কাসিও হয় না। তবে তুমি যদি ফের মুখ খোল তবে তোমাকে যে ফাঁসি দেব তাতে ভুল নাই।...আরেঃ, নীচে টর্চ্চ্‌ হাতে ঘুর্‌ছে ও কে রে?" লোকটার শেষ কথাগুলি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

এক জন তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে দেখিয়া আসিতে গেল, কিন্তু কিছুই তার নয়নগোচর হইল না; কহিল, "তোমার বাপু একটু স্বপ্ন দেখার স্বভাব আছে! কই, কোথায় পেলে তুমি টর্চ্চ্‌ হাতে মানুষ? দরওয়ান্‌টার কি আর ওঠ্‌বার অবস্থা রেখেছি?"

"না না, দরওয়ান্‌ নয়, অন্য লোক, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছি। তোরা যা, শীগ্‌গির নীচে গিয়ে কি ব্যাপার দেখে আয়। আমরা এদিক্‌ সাম্‌লাচ্ছি।"

(ক্রমশঃ)

খেলাধূলা

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগে গেল বারের মত এবারেও মহামেডান স্পোর্টিং লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। মহামেডান্ স্পোর্টিং ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় টীম্ এ পর্য্যন্ত লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হয় নি। কাজেই পর পর ছু' বছর এদের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হওয়া খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। এরা ২২টা খেলায় মোট ৩০ পয়েন্ট্ পেয়েছে।

এবারকার লীগ্ খেলায় শেষ পর্য্যন্ত যে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেছে এ রকমটা বড় দেখা যায় না। মহামেডান্ স্পোর্টিং, ইষ্ট বেঙ্গল, ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্, কালীঘাট এবং মোহনবাগান—এই পাঁচটি দলের মধ্যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল যে খেলা শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগেও কেউ আন্দাজ করতে পারে নি কোন্ দল লীগ্ নেবে। শেষের দিকে ই-বি-আরও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়েছিল। ইষ্ট বেঙ্গলের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল সব চেয়ে বেশী—কিন্তু একেবারে শেষ দিকে পর পর ২।৩টা খেলা ড্র করে তারা তাদের সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়েছে। অবশ্য ইষ্ট বেঙ্গলই দ্বিতীয় অর্থাৎ 'রানার্স্ আপ্' হয়েছে (মহামেডানের চেয়ে ১ পয়েন্ট্ কম পেয়ে)।

লীগ্-বিজয়ী একমাত্র ভারতীয় দল—মহামেডান্ স্পোর্টিং (১৯৩৪)

ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্ ও কালীঘাট গোড়ার দিকে খুবই ভাল খেলেছিল কিন্তু শেষ দিকে

হারতে সুরু করে। মোহনবাগানও তার বরাবরকার প্রথানুযায়ী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল টিম্‌দের কাছে পরাজিত হয়ে লীগ্ পাবার আশা বিসর্জ্জন দেয়।

ই-বি-আরও এবার বেশ ভাল খেলেছে; সময় সময় তারা লীগ্ নিতে পারে এমন ভাবও দেখিয়েছে। মহামেডান্ স্পোর্টিং এদের কাছে হেরে গেছে, এরিয়ান্সের কাছেও।

খেলায় সব চেয়ে নীচে হয়েছে হাওড়া ইউনিয়ন্। এরা মোট ১১ পয়েন্ট্ পেয়েছে। আসছে বার এদের দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে।

প্রথম বিভাগে কার কত পয়েন্ট্ হয়েছে দেখ।—

(১)	মহামেডান্ স্পোর্টিং	... ৩০	(৭)	কাষ্টম্‌স্	... ২৩
(২)	ইষ্ট বেঙ্গল	... ২৯	(৮)	ডালহৌসি	... ২০
(৩)	ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্	... ২৭	(৯)	ক্যাল্‌কাটা	... ১৮
(৪)	কালীঘাট	... ২৬	(১০)	এরিয়ান্স	... ১৭
(৫)	ই, বি, আর	... ২৫	(১১)	ডিভন্স্	... ১৪
(৬)	মোহনবাগান	... ২৪	(১২)	হাওড়া ইউনিয়ন্	... ১১

দ্বিতীয় বিভাগে পুলিশ ও রেঞ্জার্স্ সমান সমান পয়েন্ট্ পেয়েছে—২২টা খেলে ৩৬। এদের মধ্যে আবার খেলা হবে; যে জিতবে সে আসছে বার ১ম বিভাগে খেলবে। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটিউট্ তৃতীয় বিভাগে নাম্‌ল, তৃতীয় বিভাগ থেকে ২য় বিভাগে উঠ্‌ল 'ইটালী'। ৪র্থ বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে উঠ্‌ল পোর্ট্ কমিশনার।

ভারতীয় বনাম ইয়োরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক খেলায় এ বছর ইয়োরোপীয়েরা ২—১ গোলে জয় লাভ করেছে।

আই-এফ্-এ শীল্ডে এ বছর বাইরে থেকে অনেক ভাল ভাল টিম্ যোগ দিয়েছে। শীল্ডের খেলাও আরম্ভ হয়েছে। আসছে মাসে তার খবর তোমাদের দেব।

ওদিকে বিলেতেও এখন খুব জোর খেলার ধূম পড়ে গেছে—ফুটবল নয়, ক্রিকেট্। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সাউথ্ আফ্রিকার টেষ্ট্ ম্যাচ্। ২টি টেষ্ট্ ইতিমধ্যে

হয়ে গেছে। ১মটিতে ইংল্যাণ্ড্ খুব ভাল খেলেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিততে পারে নি। খেলার শেষ দিন এমন বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল যে খেলা বন্ধ করে দিতে হ'ল—কাজেই হ'ল ড্র। তা নইলে সম্ভবতঃ সাউথ্ আফ্রিকাকে ইনিংসে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ত।

কিন্তু দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে সাউথ্ আফ্রিকা তার শোধ নিয়েছে। ইংল্যাণ্ড্কে তারা ১৫৭ রানে হারিয়ে দিয়েছে। ২য় টেষ্টের রান্ হয়েছে এই রকম—

সাউথ্ আফ্রিকা ঃ—১ম ইনিংস্—২২৮; ২য় ইনিংস্—২৭৮ (৭ উইকেট)। বি, মিচেল একাই ১৬৪ রান্ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে আউট্ করা যায় নি।

ইংল্যাণ্ড্ ঃ—১ম ইনিংস্—১৯৮; ২য় ইনিংস্—১৫১।

তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ সম্প্রতি সুরু হয়েছে।

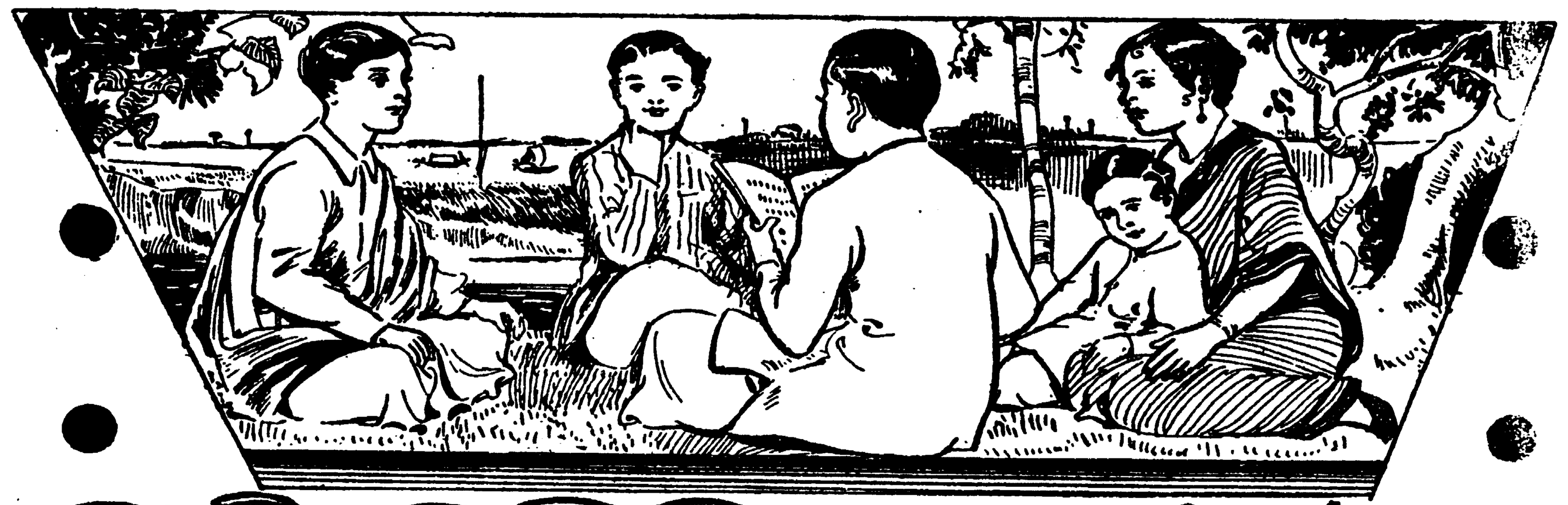

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

পরবাসী

(শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস)

আনমনে আমি বেঁধেছিনু ঘর মধুর পল্লীছায়,
হেন মনোরম ঠাঁই বুঝি আর দু'টি খুঁজে পাওয়া দায়!
আমার চোখেতে সবই যেন সোনা—নহে সে কখনো মাটি,
রেখেছে বিছায়ে তরুতলছায়ে অঞ্চল পরিপাটী।

ভাগ্যহীনের সব-ই দুখময়—তাই আজ পরবাসী;
দুখের মাঝারে সুখ খুঁজে পাই তাই তারে ভালবাসি।
পরদেশী হয়ে বিদেশ-বিভূয়ে যখন যেখানে থাকি
মনে মনে কত মধুর স্বপন, সুখ-কল্পনা আঁকি।
ভাবি মনে ঘরে কবে যাব ফিরে, হবে কি এমন দিন?
মরুমায়া-মোহে গৃহহারা আমি, আশা হয়ে আসে ক্ষীণ।
শূন্য জীবন চায় শুধু মোর স্নেহের একটু দাবী—
নিঠুর সত্য ওঠে চোখে ভেসে, যেন আলেয়ার ছবি।
ধীরে নেমে আসে আঁধার রজনী, কাঁদি আমি শুধু কাঁদি,
অতীতের হারা স্মৃতিটী কুড়ায়ে অঞ্চল-তলে বাঁধি।
কে এক অজানা গাহি চলে গান ভাসিছে বাতাসে রেশ,
মূর্চ্ছনা তার জাগে প্রাণে মোর—রাতি হয়ে আসে শেষ।

হাসির গল্প

(শ্রীমনোতোষ রায়)

পিতা পূজোর ফর্দ্দ তৈরী ক'র্‌ছেন, এমন সময়ে তাঁর ছোট ছেলে এসে বল্লে, "বাবা, আমায় একটী ঢোল কিনে দেবে?" পিতা বল্লেন, "কখ্‌খনো নয়, ঢোল কিনে দিলেই তুমি আমাকে রাত-দিন বিরক্ত কর্‌বে।" ছেলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার সে দৌড়তে দৌড়তে এসে বল্ল, "বাবা, ঢোল কিনে দিলে আমি তোমাকে বিরক্ত কর্‌ব না। তুমি যখন ঘুমোবে শুধু তখন আমি ঢোল বাজাব।"

চিঠি-পত্র

গত চৈত্র মাসের "অমল-স্মৃতি-পদক" পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় ১ম হইয়াছেন শ্রীঅসিত-কুমার দত্ত (বর্দ্ধমান)। কুমারী মীরা মজুমদার, শ্রীরামপ্রসাদ সিং (বেহালা) এবং শ্রীঅনিল-রঞ্জন দে (ঢাকা)—ইঁহাদের কবিতাও বেশ ভাল হইয়াছে। —শ্রীঅধীররঞ্জন দে

"বল্লকী" নাম দিয়ে আমরা একটা হাতে-লেখা মাসিক-পত্র বার করেছি; রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকারা এতে লেখা পাঠালে তা সাদরে গৃহীত হবে। এ সম্বন্ধে চিঠিপত্র এই ঠিকানায় দেবেন—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪৪ নং রিচি রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

সন্দেশ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার নিজস্ব কবি। শুধু লেখায় কবি নয়, তিনি মানুষটিও ছিলেন খাঁটি কবির মত। বাংলা দেশে তাঁর নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতি-দিবস অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

* * *

আজকাল "এন্ডিওরেন্স্ স্থইমিং", "এন্ডিওরেন্স সাইক্লিং", "এন্ডিওরেন্স্ ডান্সিং" প্রভৃতি নানা রকম এন্ডিওরেন্সের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ফ্রেড্ কেজ এবং আল্ কেজ্ নামে দুই ভাই ওড়ার এন্ডিওরেন্সে পৃথিবীর রেকর্ড্ ভাঙ্গিয়াছেন। ইঁহারা একাদিক্রমে ২৭ দিন এরোপ্লেনে বসিয়া আকাশে কাটাইয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বের রেকর্ড্ ছিল ডেল্ ও জ্যাক্সন্ সাহেবের। তাঁরা ৬৪৭ ঘণ্টা ২৮ মিনিট আকাশে ছিলেন।

* * *

আমাদের দেশে বই লিখিয়া বড়লোক হইয়াছেন এমন লোক বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু বিলাতের লেখকেরা বই লিখিয়া কি অজস্র পরিমাণ টাকা আয় করেন তা ভাবিতে পারা যায় না। কয়েক জন বিখ্যাত লেখক মৃত্যুকালে কি পরিমাণ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন শোন।—স্যার ওয়াল্টার স্কট্—৩ লক্ষ পাউণ্ড্, চার্ল্‌স্ ডিকেন্স—১ লক্ষ পাউণ্ড, লর্ড্ লিটন্—৮০ হাজার পাউণ্ড্। আজকালকার তেমন তেমন লেখকদের আয় আরও অনেক বেশী।

* * *

ডক্টর রবার্ট্ হান্‌স্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক এক্স-রের সাহায্যে সাদা আলুকে কালো আর লাল গিনিপিগ্‌কে সাদা গিনিপিগে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইঁদুরগুলির কোন রকম শারীরিক ক্ষতি হয় নাই। হান্‌স্ সাহেব বলেন চেষ্টা করিলে এক্স-রে'র সাহায্যে এ রকম অনেক জিনিষেরই রং বদ্‌লাইয়া দেওয়া যায়। তোমাদের যদি কাহারও ফরসা হইবার সাধ থাকে তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

* * *

মস্কো সহরে "মস্তিষ্ক-সমিতি" নামে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে। দেশের বড় বড় লোকদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের মগজ কিনিয়া লইয়া তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করাই এই সমিতির কাজ। রাশিয়ার বিখ্যাত লেনিনের মগজও এই সমিতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ম্যালেরিয়া রোগীর এক ফোঁটা রক্তে ঐ রোগের তিন লক্ষ বীজাণু পাওয়া যায়।

* * *

তিমির ব্যবসা এখন একটা বেশ লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক-একটা তিমি হইতে গড়ে প্রায় ১১০০ মণ তেল এবং ২০০০ মণ মাংস আর হাড় পাওয়া যায়। একটা তিমির দামও কম করিয়া হাজার তিনেক টাকা।

* * *

কর্ণেল সিউএল ও তাঁর কয়েক জন সঙ্গী মিলিয়া আরব সাগরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পাহাড়ের শ্রেণী অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাপ্তি স্বীকার

সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ খাইয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। "ভীম নাগের সন্দেশ" বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত জিনিষ,—এমন সন্দেশ নাকি আর হয় না। কথাটা বাস্তবিকই সত্য। রসনার আনন্দ দানে ইহার তুলনা নাই। এই মধুময় জিনিষটির আস্বাদ হইতে বাংলা দেশ যেন কোন দিন বঞ্চিত না হয় ইহাই আমরা কামনা করি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(কল্যাণ)(বর)—

মা(সখা)নেক (হয়) তো(মার) সং(বাদ) (পা)ই (নাক)(বেদে)শে (ফিরি)(বার) (মত)(লব) (তা)ও বু(ঝিলাম) না। এদিকে জ(ননী) শো(কেশ)য্যা (গ্রহ)ণ করিয়াছেন। তাঁহার (প্রতি)ও কি এ(কটু) (মম)তা নাই? (তারা)(কান্ত)ও (শ্রী)(হট্টে) গিয়াছে। তা(হার)ও আ(সার) (নাম) (নাই)।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহাদের উত্তর নির্ভুল হইয়াছে ঃ—

জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, লীলা, বীণা প্রভৃতি (জামালপুর); মেজদি, ইলু, শীলু প্রভৃতি (কলিকাতা); জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কোলিয়ারি); রামপ্রসাদ সিং, হিন্দুস্থানী (বেহালা); সুমুখনাথ মিত্র, অরুণেন্দু (দিনাজপুর); বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর); অসিতকুমার সরকার (পুরুলিয়া); অনিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট); সুরমা, প্রতিমা,

নীলিমা প্রভৃতি (পাঁতিহাল—হাওড়া); লতিকা ও মাধুরী (রাজসাহী); কোকজহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, চিত্রা, সবিতা প্রভৃতি (কলিকাতা)।

যাঁহাদের উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় নাই :—

কেরামউদ্দীন আহ্‌মদ (যশোহর); অমিয়, অমিতাভ ও অশোক (বেতিয়া); অমিতাভ দাশগুপ্ত (গৌহাটী); অধীররঞ্জন দে (চুঁচুড়া); চিন্ময়ী ও সুজনকুমার দাস (কলিকাতা); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী (মালদহ); অরুণকুমার সেন ও মার্টিন্ গোমেজ (বরিশাল); সুকুমার মুখার্জ্জি (কলিকাতা); কৃষ্ণদাস সরকার, পাঁচুগোপাল, যামিনী প্রভৃতি (নওপাড়া); অজিত দাদা, তারক, ভবানীপ্রসাদ (বড়া); রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী); সত্যপ্রসন্ন সেন, কালিপদ, দেবব্রত প্রভৃতি (গোয়ালপাড়া); বাণী-মন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); অংশু, সুশান্ত, প্রতিভা প্রভৃতি (সাধনপাড়া—নদীয়া); জ্যোৎস্না নাহা, মুকুল (রাজাপুর—চট্টগ্রাম); খোকা, বুলবুল, উমা প্রভৃতি (চাইবাসা); লক্ষ্মী, রাধা, শক্তি প্রভৃতি (পূর্ণিয়া); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); ছবিরাণী রায় (সিমলা); নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অতুল দাশগুপ্ত (কলিকাতা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা—হাওড়া); শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এক-একটি ফলের নাম দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। (সবগুলির উত্তর চাই।)

—— তুলিয়া নৌকা হেলে-দুলে চলে,
বসিয়া বসিয়া দেখি ——রা সকলে।

এ র——ল ফুল কে দেখেছ কবে ?
ভরিয়া আনিব ——জাটা কি হবে।

——য়াছে পদ্মফুল, গাহিছে ভ্রমর,
সুর নাই ——— নাই তবু কি সুন্দর !

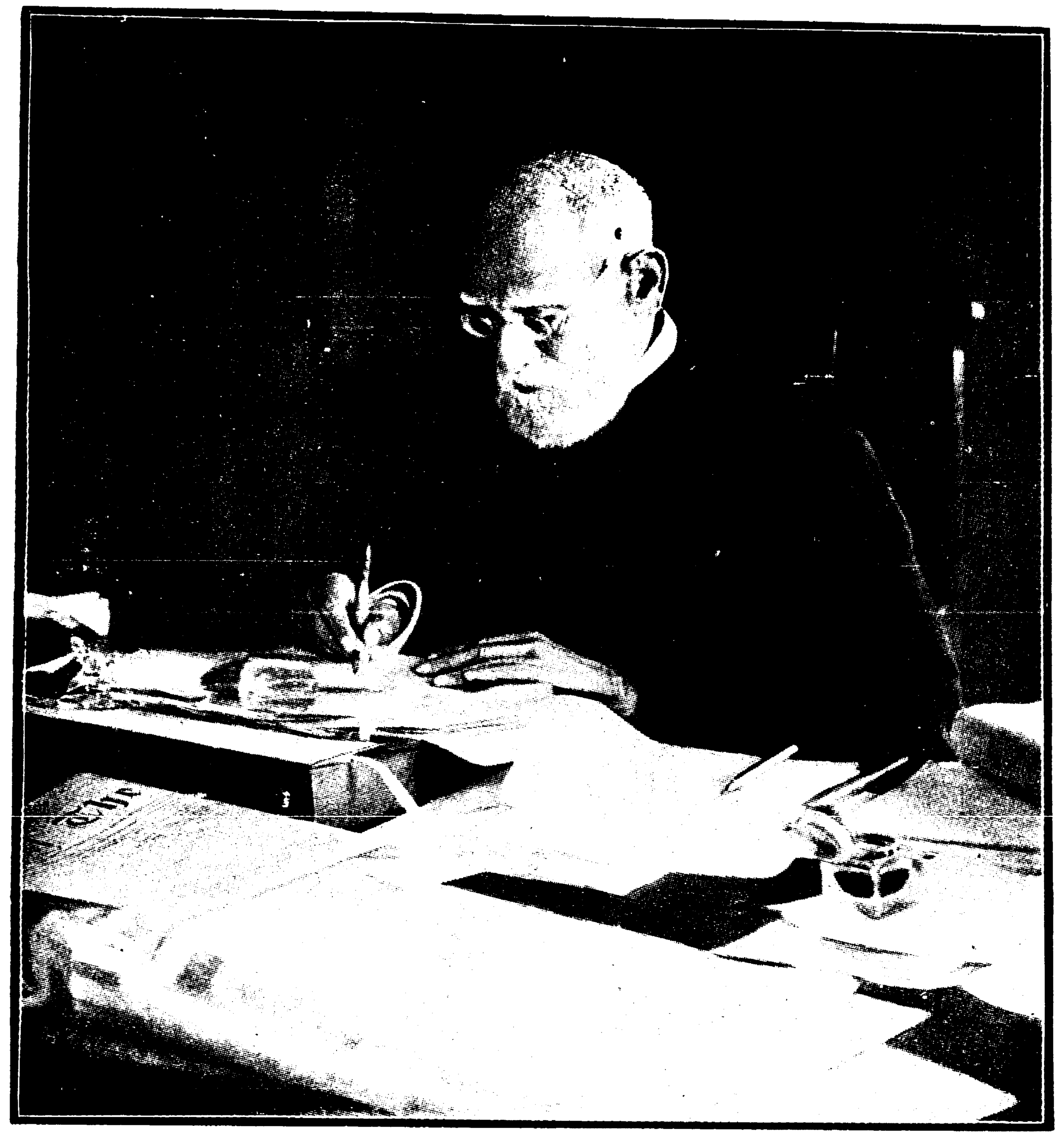

সুরেন্দ্রনাথ

“পাঞ্জাব-সীমান্ত হ'তে চট্টলার চারু শ্যাম তীর
যুগান্তের সুপ্তিভঙ্গে সে কম্পনে উঠিল নড়িয়া,
বজ্রকণ্ঠ-উদ্গীরিত নবমন্ত্রে হে বাগ্মী, হে বীর,
চেতায়ে দেশাত্মবোধ একজাতি তুলিলে গড়িয়া” ।

ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪২ | ৮ম সংখ্যা

বর্ষায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আমাদের অজয়েতে আসিয়াছে ঢল,
ছুটিতেছে চৌদিকে শুধু রাঙা জল ।
বহে বায়ু সন্‌সন্‌,
নু'য়ে পড়ে কাশবন,
শুনা যায় অবিরল জল-কলকল ।

ডাকিতেছে মাছরাঙা, ডাকিছে টিটিভ্‌
কৃষক-বালক ফেরে হাতে ল'য়ে ছিপ্‌ ।

ডুবিতেছে ঘাট মাঠ,
লাগে বৃষ্টির ছাট,
ভিড় করে খেয়াঘাটে যাত্রীর দল।

আকাশে বাতাসে উড়ে বলাকার হার,
আসে বাস মালতী ও কাঁটালীচাঁপার।
রাঙা জলে একাকার
থই থই চারি ধার,
গৌরীর গৈরিকে শোভে ধরাতল।

এসেছে নবীন চল কাণায় কাণায়,
পাকচূণা ছড়ায়ে সে সোহাগ জানায়।
ডাকে মেঘ খণেখণ,
ফুলে ভরে উঠে বন,
প্রবাসীর মন করে চল চঞ্চল।

যূথপতি

(শ্রীসুকুমার দে সরকার)

টিলায় টিলায় মহাশূন্যের ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পাহাড় মেঘের মত ধোঁয়াটে হয়ে মিলিয়ে গেছে; তারি নীচে গভীর খড়কাইএর বনে এরার প্রচুর ঐশ্বর্য্য নিয়ে বসন্ত এসেছে। বনের এমন সম্পদ্ বোধ হয় আর কখনও হয় নি; অন্ততঃ ঝিক্‌মিকের তাই মনে হয়। দেবদারুর বনে বনে ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা ভরিয়ে তুলতে কেমন যেন মনে হয়—মন উদাস হয়ে আসে।

কুর্চ্চি ফুলে ফুলে বন সাদা হয়ে গেছে। মহুয়ার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরপুর। ওখানে ভালুকের দলের মাতামাতি রাতে।

কি আশ্চর্য্য, সারা দিন ধরে ঝিমিয়ে রাতেই আসে ভালুকের দল মহুয়ার লোভে লোভে। রাতে যখন সমস্ত সুবুদ্ধি প্রাণীরা ঘুমোয়, ঝিক্‌মিক্‌ও তার লতাগুল্ম-ঘেরা ঠাণ্ডা ঝোপটায় গা ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আসে ভালুকের দল, আরো বোধ হয় কত নিশাচর প্রাণী! গাছের পাতা ঝরার টুপটাপ শব্দ হয়. রহস্যময় খস্‌খস্ শব্দ করে কে যেন দ্রুত চলে যায় বনে। ওদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে ক্ষীণ মৃত্যু-কাতর চীৎকার ভেসে আসে। অদৃশ্য শব্দে চমকে জেগে উঠে ঝিক্‌মিক্ দেখে স্বচ্ছ আকাশের কালো বুকে হীরের কুচির মত অজস্র তারা; দেবদারু, শাল বনে কেমন তীব্র ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ভেসে আসে।

কিন্তু সমস্ত দিন সে বনে বনে খেলা করে বেড়ায়। টিলার পর টিলা লাফিয়ে লাফিয়ে সে যখন ওপরে উঠতে থাকে তার শরীরের নমনীয় দৃঢ় পেশীগুলিতে বিদ্যুৎগতিতে ঢেউ খেলে যায়, তার ক্ষুরের নীচে চক্‌মকি পাথরে ঠিকরে আগুনের ফুলকি বেরোয়, ঘাড়ের সোনালী লোম গুলিতে রোদ ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে।

ঝিক্‌মিক্ একটা সম্বর হরিণ।

এবারে বসন্ত যেমন নিয়ে এসেছে প্রচুর ঐশ্বর্য্য—বন যাতে ভরে উঠেছে—তেমনি নিয়ে এসেছে নিঃসঙ্গতা। এবারে বসন্তের আসার সাথে সাথে ঝিক্‌মিক্ অনুভব করছে কেমন যেন বড় একা। কেউ তার সঙ্গী নেই, নেই কোন সাথী, কোন প্রিয়,দল!

সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া ঊষার প্রথম রশ্মিতে সোনালী মুকুট পরে ঝলমল করে উঠ্‌ল। তার নীচে সাদা বরফের ঢেউ। টিলার পর টিলা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে চলেছে ঝিক্‌মিক্ আর এক-একবার থেমে সন্দিগ্ধনয়নে চারদিক্ দেখে নিচ্ছে। তার চোখেও অমনি সোনালী বিদ্যুৎ। কে জানে কোথায় কোন্ ঝোপে চিতা বাঘ ওৎ পেতে বসে আছে, নিঃশব্দে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। চলেছে চলেছে ঝিক্‌মিক্, আজ তাকে কে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত টেনে নিয়ে চলেছে অজানা টানে। আজ পড়ে

রইল ঝরণা-পাড়ের কচি সবুজ ঘাস, পাথরে পাথরে ঝাঁপিয়ে-পড়া মিষ্টি ঝরণার জল। পড়ে রইল আবাল্য-অভ্যস্ত পরিচিত বন। ঝিক্‌মিক্‌ এ পাহাড়টা পার হয়ে ওধারের উপত্যকায় এসে পড়্‌ল।

বাঃ, এত প্রকাণ্ড পৃথিবীটা! ঝিক্‌মিক্‌ ভাবলে, এধারেও যে জগৎ আছে কে জান্‌ত?

দলে দলে জটলা পাকিয়ে গাছের দল নেমে গেছে—শাল, মহুয়া কুর্চ্চি, দেবদারু সব জড়াজড়ি করে। সরু, মোটা, খাটো, লম্বা সব গাছের দল। ঝিক্‌মিক্‌ ঠাহর করে দেখলে পথের একধারের ঘাসের সব মাথা-মুড়োন—একটা দল যেন খেতে খেতে এগিয়ে গেছে। আরও কিছু দূর এগিয়ে দেখলে ক্ষুরের দাগ। মনের আনন্দে সে ডেকে উঠ্‌ল—উচ্চ, পুরুষের গম্ভীর নিনাদে। বহু দূরের গুটিকতক কালো বিন্দু থম্‌কে দাঁড়াল।

এক দল সম্বর হরিণ। দলে বেশীর ভাগই হরিণী, গুটিকতক বাচ্চা ছাড়া। আর দলপতি পুরুষ। দূর থেকে হরিণের ডাক শুনে দলপতি ভেবেছিল বুঝি বা দলের কেউ ছটকে পড়েছে, তাই চল্‌তি দল থেমে দাঁড়াল। তার পর প্রমাণ হয়ে গেল ভুল, ঝিক্‌মিক্‌কে দেখে মাটিতে পা ঠুকে গর্জ্জে উঠ্‌ল দলপতি। দলে দু'জন সবল হরিণ থাকতে পারে না। 'কি চাই হে বাপু তোমার?'

ঝিক্‌মিক্‌ও পেছপাও নয়। তার দেহেও প্রাচীন সম্বর-বংশের রক্ত বর্ত্তমান। সেও গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে—'সরে পড় দেখি বাপু, আমি হব এই দলের কর্ত্তা।'

—'তাই নাকি? বেজায় যে আবদার?'

তার পরে দু'জনেই তাল ঠুকে মাথা নীচু করে শিঙে শিং আটকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ কেউ নড়েও না চড়েও না। শরীরের সমস্ত শক্তিকে নিয়ে জড় করা হয়েছে শিঙে, দু'জন কুস্তিগীর পালোয়ান যেন তাল ঠুকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছে। তার পর হঠাৎ নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে খটাখট্‌—খট্‌-খট্‌ ভীষণ যুদ্ধ সুরু হ'ল। ছিটকে পড়তে লাগল শিঙের ভাঙ্গা টুক্‌রো। কিচির কিচির করে ভয় পেয়ে পাখীর দল উড়ে পালাল। তার পর আবার খানিকক্ষণ সময় শিঙে শিং বাধিয়ে জোরে

পরীক্ষা। ঝিক্‌মিক্‌ তার প্রশস্ত 'ডালপালা'ওয়ালা শিং প্রতিপক্ষের শিঙে বাধিয়ে সজোরে মোচড় দিলে। তার প্রকাণ্ড কাঁধটা ভীষণ—ভীষণ ভাবে ফুলে উঠ্‌ল, মনে হ'ল মাংসপেশীগুলি এখনই বুঝি ফেটে বেরিয়ে আসবে; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ দলপতি সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

আর কি সে সেখানে থাকে? জয়ীর আর পরাজিতের এক দলে স্থান হ'তে পারে না। লেজ গুটিয়ে এক ছুটে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল পূর্ব্বতন দলপতি।

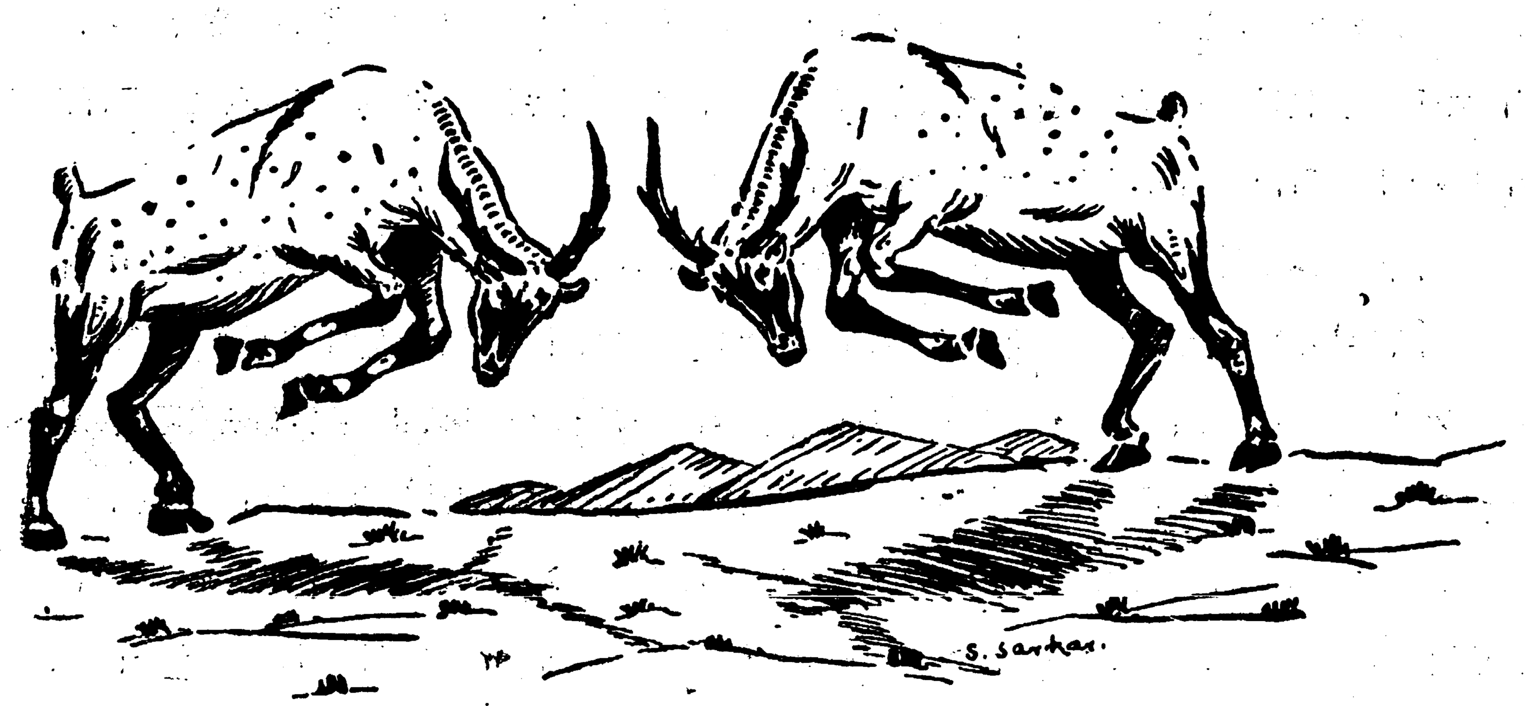

দু'জনেই তাল ঠুকে…

ঝিক্‌মিক্‌ সেই মাটিতে পা ঠুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—জয়ের চীৎকার—প্রতিদ্বন্দ্বের আহ্বান।

সমস্ত বৈশাখ মাসটা কেটে গেল। খড়কাই-এর বনে বসন্তের উৎসব ম্লান হয়ে আসছে। চৈতী ফুলের দল কবে মুখ লুকিয়েছে। বনে ফল পাকতে সুরু হ'ল। বিচিত্র সব পাখীর কলরবে বন মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। দলে দলে সব পাখীরা আসছে সেই সব দেশ থেকে এখনও যেখানে শীতের হিম নিঃশ্বাস সব কন্‌কনে করে রেখেছে।

এল বিগড়ি হাঁসের দল। এল টুক্‌টুকে লাল, বেঁকান ঠোঁট, ফ্লেমিঙ্গোর দল

হুস্ হুস্ করে সাঁঝের আকাশ কাঁপিয়ে। এল বিচিত্র বর্ণের হরেক রকম টিয়ার ঝাঁক। ছোট বিলটা মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল তাদের কলরবে।

সাদা ধবধবে পালকের মধ্যে লাল ঠোঁট গুঁজে ঝিমুতে ঝিমুতে ফ্লেমিঙ্গোরা বিগড়ি হাঁসেদের জিজ্ঞেস করলে—'কোথা থেকে আসা হচ্ছে গা ?'

—'সে কি এখানে ? ওই ওই ওপরের হুধ পাহাড় ফেলে, করালীর সাতচূড়ো পার হয়ে, মানস সরোবর থেকে। সাত দিন ধরে পথে। কাল-শরীর বিলে চিক্কি আর তার হুই মেয়েকে শেয়ালে নিলে। জলার বাদায় ছেলে-পুলে শুদ্ধ লাল-ঠোঁটি ময়ালের পেটে গেল, হুধ পাহাড়ের ওপরে ঠাণ্ডায় জমে শঙ্খচূড় আর মাথা তুল্‌ল না। সাত দিন সাত রাতের পথ।

ফ্লেমিঙ্গোরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বিগড়ি হাঁসগুলো বেজায় বাজে বকে।

ঝিক্‌মিক্ ঝোপের মধ্যে সন্তুষ্ট ভাবে জাবর কাটছিল আর পাখীদের কথা শুন্‌ছিল। কত খবরই না ওই পাখীগুলো বলে! তার দলে এখন হুটো বাচ্চা বেড়েছে, কেমন সুন্দর তুলতুলে হুটো বাচ্চা! কিন্তু দায়িত্বও তার ভয়ানক বেড়ে গেছে। এখন আর সে একা নয়, সমস্ত দল তার মুখ চেয়ে আছে। যূথপতি সে। মহাশত্রু চিতাটা যে কখন্ কোন্ দিক্ দিয়ে নিঃশব্দে এসে হাজির হবে তার ঠিক নেই; কোন্ গাছের ডাল থেকে চোরের মত লাফিয়ে পড়বে! চিতা জাতটাই জোচ্চোর। ঠিক সেই সময়ে হুটো হাঁস শরবন থেকে ঝট্‌পট্ করে গিয়ে জলে পড়্‌ল।

ঝিক্‌মিক্ বিহ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে সাঙ্কেতিক ডাক ডেকে উঠ্‌ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দলপতিকে অনুসরণ করে হরিণের দল পাহাড়ের টিলায় টিলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে চিতার ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বন গম্ গম্ করে উঠছে।

এমনি ক'রে সুখে হুঃখে বসন্তটা কেটে গেল। দলে আরও তিনটে বাচ্চা বেড়েছে। ঝিক্‌মিকের ঘাড়ের লোমগুলো আরো সোনালী হয়ে উঠেছে, দৃঢ় হয়ে উঠেছে ঘাড়টা। সে যখন পেশীগুলোয় ঢেউ খেলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে টিলায় টিলায় ওঠে দলের সবাই তখন মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে।

মহাশত্রু চিতাটাকে বার বার ফাঁকি দিয়েছে ঝিক্‌মিক্।

সেদিন বিকেলে সূর্য্য পাটে বসেছেন। ধবলগিরির সাদা চূড়ায় আগুন লেগে গেছে যেন। ঝিক্‌মিক্ তার দলকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এসেছিল—যেখানে কচি ঘাস মাথা তুলে সূর্য্যিঠাকুরকে অভিনন্দন জানায়। গাছের ভিড় বড় একটা সেখানে নেই—দূরে দূরে ফাঁকা ফাঁকা দেবদারুরা শুধু নিঃশব্দ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বনরেখা। ওদিকের স্বল্প ঝোপটায় ক্ষীণতম একটু শব্দ শুনে ঝিক্‌মিকের কান খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। সে নিভন্ত পশ্চিমের পানে মুখ তুলে তার সাঙ্কেতিক ডাক ডেকে উঠ্‌ল। চিতার গতিবিধি ঝিক্‌মিকের অজানা নয়। ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে বন কেঁপে উঠ্‌ল।

ছোট্ট ছোট্ট। দলকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ঝিক্‌মিক্! কত বার সে ঘন বনের মধ্যেই চিতাকে ফাঁকি দিয়েছে! আর এখানে ত ফাঁকা। বিহ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে হরিণের দল টিলার পর টিলায় লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু চিতাও আজ যেন মরিয়া। বসন্তের সাথে সাথে পাখীরা চলে গেছে, বনে শিকার মেলা ভার। আজ তার শিকার জোটান চাই-ই।

পাহাড়ের গা বন্ধুর হয়ে উঠছে। বড় বড় পাথরের চাঁই। সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ওপর দিয়ে ঝিক্‌মিক্ লাফিয়ে ওধারের পাথরের স্তূপে গিয়ে পড়্‌ল। মধ্যে অতলস্পর্শী খাদ কোথায় নেমে গিয়েছে—গভীর গভীরতর হ'তে হ'তে অস্পষ্ট অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। একে একে পার হয়ে এল দল। হঠাৎ একটা করুণ চীৎকার শুনে ঝিক্‌মিক্ ঘুরে দাঁড়াল। লাফিয়ে পার হয়ে এসে একটা ছোট বাচ্চা পাথরে আছাড় খেয়ে পড়েছে, উঠতে পারছে না। ওদিকে সাক্ষাৎ যমের মত আনন্দ-গর্জ্জন করে ছুটে আসছে মহাশত্রু।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ মন স্থির করে নিলে। আকাশের দিকে মুখ তুলে আর একবার সে তার সাঙ্কেতিক ডাক ডাকলে। ছুটে এগিয়ে চল্‌ল দল। আর সে ঘুরে এল সেই খাদের মুখে; কাঁধ নীচু করে শিং বাগিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। বাচ্চাটা ততক্ষণে উঠে কম্পমান পায়ে ছুট্‌ছে।

একটা ভীষণ গর্জ্জন। বিহ্যুৎ ঝলসানির মত লাফিয়ে পড়্‌ল চিতা খাদ পার

হয়ে ঝিক্‌মিকের ঘাড়ে, তার শিঙের ডালপালার মধ্যে। ঝিক্‌মিকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টান হয়ে ছিল। কাঁধের পেশীগুলো তার ফুলে উঠ্‌ল, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিলে সে শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে। চিতার থাবাও ততক্ষণে প্রচণ্ড এক চড় নামিয়েছে ঝিক্‌মিকের কাঁধে; কিন্তু চিতার আজ শেষ। সেই বলিষ্ঠ কাঁধের ঝাঁকুনী চিতা সামলাতে পারলে না। আকাশ ফাটা একটা গর্জ্জন ক'রে খাদের অতল তলে তলিয়ে গেল।

আর ঝিক্‌মিকের মনে হল চিতার গুরুভারটা কাঁধ থেকে নেমে যাওয়ার পরই শরীরটা কেমন যেন হাল্‌কা হয়ে গেছে। পেশীগুলি যেন নেই, দেহটাই যেন নেই। অজস্র তারা তার চোখের সামনে নেচে উঠল। পাহাড়টা দুল্‌ছে, কাঁধ থেকে টাটকা গরম রক্ত টস্ টস্ করে বেয়ে পড়ছে। ঝিক্‌মিক্ একবার শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, তার পর করুণ একটা চীৎকার ক'রে টলতে টলতে ভারী একটা পাথরের মত সেও খাদের অতল তলে মিলিয়ে গেল।

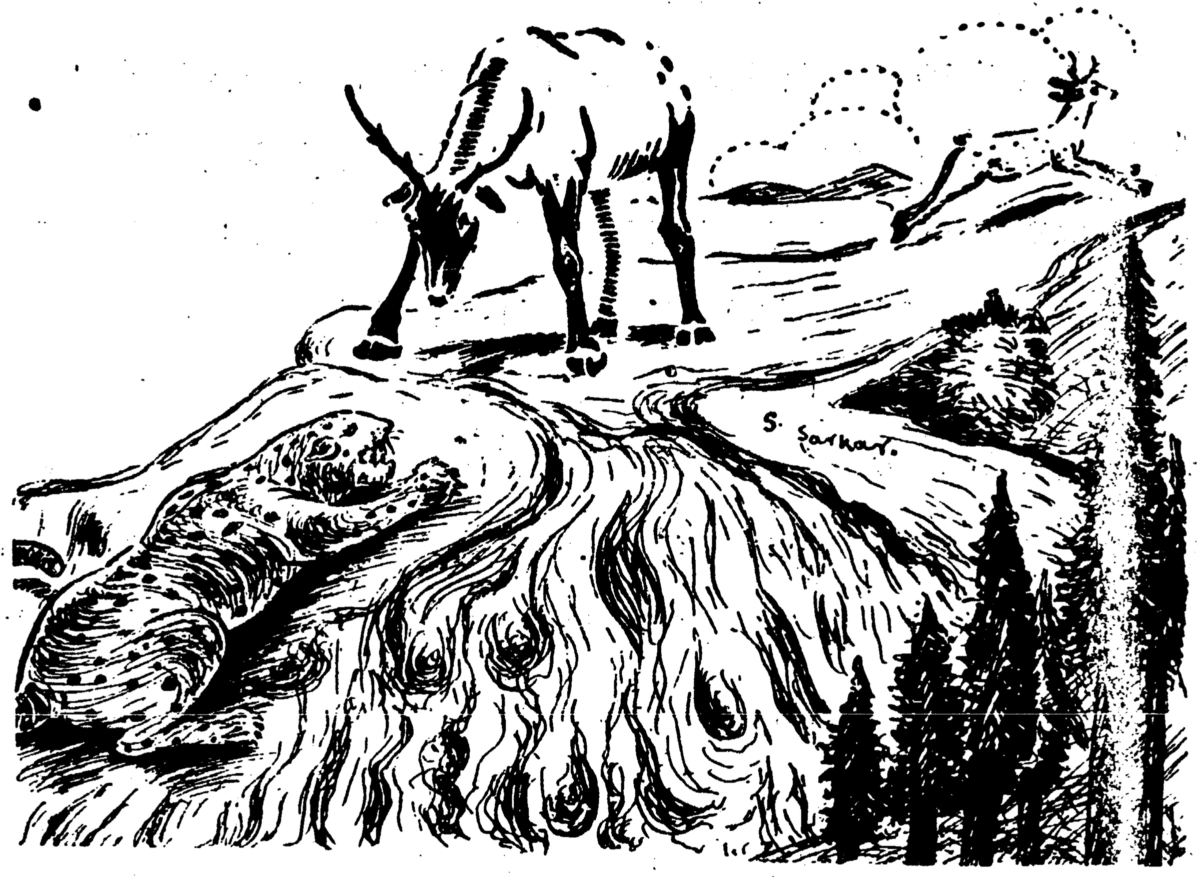

শিং বাগিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল

ভক্ত কবীর একবার নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "কবীর, তুমি যখন পৃথিবীতে আস তখন জগৎ হাসছিল, তুমি কাঁদতে কাঁদতে এলে। এমন একটা কিছু ক'রে যাও যাতে তোমার যাবার সময়ে জগৎই কাঁদবে, তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে।"

বিক্রমপুরের ছেলে ভুলান ছড়া

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সংগ্রাহক)

ছেলে ভুলান ছড়া আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। খুব প্রাচীন কাল হইতেই এগুলি আমাদের ভাণ্ডারে জড় হইয়া আসিতেছিল। দেশের অবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতি বদ্‌লাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই চমৎকার ছড়াগুলি কিন্তু আমরা প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছি। সমস্ত সভ্য দেশের রীতিই এই যে জাতির পুরানো সম্পত্তি-গুলিকে তাহারা নষ্ট হইতে দেয় না, সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখে। আমাদের দেশে এইজন্যই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদ্ বাংলার প্রাচীন পুঁথি, ছড়া, পাঁচালী, গাথা প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতেছেন, ফলে বাংলা ভাষার গৌরব দিন দিনই বাড়িতেছে।

এই ছড়াগুলি কাহারা রচনা করিয়াছিল এবং কত দিন ধরিয়া এগুলি যে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে তা বলা বড়ই শক্ত। ছড়াগুলির কোন কোন জায়গায় বেশ মিল আছে, আবার কোন কোন জায়গায় একেবারেই মিল নাই। এগুলি গদ্যও নয়, পদ্যও নয়; কোথাও কোথাও বেশ মানে হয়, কোথাও কোথাও মানে আদবেই হয় না। কিন্তু সুরটি আগাগোড়াই বড় শ্রুতিমধুর।

ছোট ছোট ছেলেদের আদর করিতে, সান্ত্বনা দিতে, তারা বায়না ধরিলে তাদের ভুলাইতে নানা রকমের ছড়া বা গান পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত আছে। বিলাতে এগুলিকে নার্সারি রাইম্ (Nursery Rhyme) বলে। আমাদের দেশে এগুলিকে "ছেলে ভুলান ছড়া" বা "ঘুম পাড়ানী ছড়া" বলা যাইতে পারে। বহু চেষ্টায় বিক্রমপুরের প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে লিখিত হইয়াছে। তাদের কয়েকটি মাত্র আজ তোমাদের শুনাইতেছি। এগুলি তোমাদের ভাল লাগিলে পরিশ্রম সফল মনে করিব।

(১)

আয় চাঁদ লড়িয়া (১) ভাত দেব বাড়িয়া ;

(১) লড়িয়া—দৌড়াইয়া।

খুকুর কপালে চাঁদ টীপ্ দিয়া যা।
দুধ খাবার বাটি দেব,
কালা গরুর দুধ দেব,
সোনার থালে ভাত দেব,
রূপার বাটিতে ব্যন্নন দেব,
ধান ভান্‌লে কুঁড়া দেব,
মাছ কুট্‌লে মুড়া দেব,
রাজার মেয়ে বিয়া দেব ;
খুকুর কপালে চাঁদ টীপ্ দিয়া যা।

(২)

বাঁশ বনের বুড়ী,
নাকে মাটি কুড়ি।
ছোট ছোট পোলাপান (২)
টকর টকর (৩) গিলি।

(৩)

তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই ;
মামারা ভাত দিল না, মাসীর বাড়ী যাই।
মাসীর বাড়ী ভারী মজা কিল চড় নাই।
মাসী গো ! আগে জল দেও ত তৃষ্ণা মিটাই ॥

(৪)

ফাক্কা (৪) না লো ফুক্কা, টাইলো টুয়ানি
খইল্‌সা মাছের বুয়ানি।
মামায় দিল খইল্‌সাটা সাইরা নিল চিলে,
চিলের লাগুড় পাইলাম না, খোকার ফাক্কা ভাইলে।

(৫)

গাপুর গুপুর (৫) গাপুর গুপুর
দুধ ভরে হাঁড়ি,

(২) পোলাপান—ছেলেমেয়ে। (৩) টকর টকর—খাইবার শব্দ।
(৪) ফাক্কা—কিছুই না। (৫) গাপুর গুপুর—দুগ্ধ দোহনের শব্দ।

এই দুধ যাইবে আমার
সোনার শ্বশুর বাড়ী।

(৬)

অবু তবু গিরি সুত।
মায়ে বলে পড় পুত ॥
পড়লে শুন্‌লে দুধিভাতি।
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥

(৭)

খোকা ঘুমা'ল পাড়া জুড়া'ল
বর্গী আইল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ?
ধান ফুরা'ল পান ফুরা'ল
খাজনার উপায় কি ?
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

(৮)

হড়ম বিবির খড়ম পায়, লাল বিবির জুতা পায়।
চল্ লো বিবি, ঢাকা যাই, ঢাকা গিয়া ফল খাই।
যে ফলের বোঁটা নাই সে ফল খেতে নাই।
সুন্দরী ! তোর বিয়া পাট কাপড়খান দিয়া।
ঢাকাইয়ারা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
সুন্দরীর বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত লো মা ! কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে, দেখ্‌তে দিলে না।
আগে যদি জান্‌তাম, ডুলি ধরে কাঁদ্‌তাম ॥

(৯)

আলুপাতা থালু থালু ভেন্নাপাতার দই,
সকল জামাই ভাত খেল, গোদা জামাই কই ?
গোদা গেছে মাছ ধর্‌তে, আন্‌ল দুইটা বাটা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করে গোদারে মাল্ল ঝাঁটা।
মাল্লি মাল্লি (৬) ঝাঁটার বাড়ি,
তেল দে চান (৭) করি ; ভাত দে খাই।
ভাত দিয়েছি, দই দিয়েছি, চিনি, মণ্ডা, মিঠাই,
তবু কেবল গোদা জামাই করে খাই খাই।
পাটীটা বিছায়ে দে ত গোদারে নাচাই॥
ভাঙ্গা ঘরে শুতে দিব, ইন্দুরে নেবে কান,
কেঁদ না গোদা জামাই, গরু দেব দান।

(১০)

কল্‌মি লতা, কল্‌মি লতা,
জল শুকালে থাক্‌বা কোথা ?
থাক্‌ব থাক্‌ব পেকের (৮) তলে,
ফাল (৯) দিয়া উঠুম বর্ষাকালে।

(১১)

শাক শাক আঠার শাক,
তার পর এল ঢেঁকি শাক।
ঢেঁকি শাক লাগে না মন্দ,
তার পর এল ভাঁড়ালী ছন্দ।
ভাঁড়ালী ছন্দের মাথায় গাড়ু,
তার পর এল ক্ষীরের লাড়ু।
ক্ষীরের লাড়ু লাগ্‌লো তিতা,
তার পর এল চিতৈ পিঠা।

(৬) মাল্লি মাল্লি—মারলি মারলি।
(৭) চান—স্নান।
(৮) পেক—কাদা, কর্দ্দম।
(৯) ফাল—লম্ফ দেওয়া।

চিতৈ পিঠার বুকে খুদ,
তার পর এল পোড়া দুধ।
পোড়া দুধ লাগে না ভাল,
খোকার মাথায় ঘোল ঢাল।

(১২)

অনুপমা দুধের সর।
কেমনে কর্‌ব পরের ঘর ?
পরের বেটা মারিবে,
কানাচে বসে কাঁদিবে ;
ছিনে জোঁকে ধরিবে,
লাফাইয়া মরিবে।
মা বলবে—আয় আয়,
বাপ বলবে—থাক্ ;
বৌ বলবে—দূর করে দাও,
শ্বশুরবাড়ী যাক্।

(১৩)

এতখানি পানি, ঝাক্কর জানী।
এতখানি কাদা, মুল্লুক জাদা॥

(১৪)

ইকির মিকির চাম চিকির
চামে কাটা মজুমদার,
ধেয়ে এ'ল দামোদর।
দামোদরের হাঁড়ি ভরি
ঘরে বসে চাল কুড়ি।
চাল কুড়্‌তে হ'ল বেলা,
ভাত খাও রে জামাই শালা।
ভাতে পড়্‌ল মাছি
কোদাল দিয়া চাঁছি।
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খেঁকশিয়ালীর মাথা।

(১৫)

আপিলা চাপিলা,
ঘন ঘন মাছিলা।
রামের হুক্কা নলের বাঁশী,
নল ভেঙ্গেছে একাদশী।
একা নল বেঁকা নল,
কে রে যাবি কামার-শাল ?
কামার মাগী দুগ্‌দুগানী,
খেরের আগে উঠ্‌ল পানী,
আপ্পন্ জাপ্পন, গোর গোষ্ঠি ব্রাহ্মণ্।

(১৬)

ও হনুমান কলা খাবি? বড় বৌর বাবা হবি।
জয় জগন্নাথ দেখ্‌তে যাবি? নিত্যগোপাল নিত্য পাবি।

(১৭)

আত্মরের কলাগুলি বাত্মড়ে খায়,
এমন সময় খোকামণি মামার বাড়ী যায়।
মামার বাড়ী যেয়ে খোকা ব্যাভার পেলে কি?
সোনার মাত্মলি আর রূপার কন্ধি।
তা হারায়ে খোকা দৌড় দিয়ে যায় ঘরে,
মামীরা তুলে নিলেন কোলেতে ক'রে।
মামারা উঠে বলেন, 'সাদা না কালো?'
মামীর উঠে বলেন, 'আঁধার ঘরের আলো'।

(১৮)

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি, দাওখান্ দে।
দাওখান কেন্? পাতখান্ কাটব।
পাতখান কেন্? বৌ ভাত খাইব।
বৌ কই? জলেরে গেছে।
জল কই? ডাউগে খাইছে।
ডাউগ কই? আরাবনে গেছে।
আরাবন কই? পুইরা গেছে।
ছালিমাটী কই? ধোপায় নিছে।
ধোপা কই? হাটে গেছে।
হাটে কেন্? স্থইচ স্থতা কিন্‌তে।
স্থইচ স্থতা কেন্? ঝুলি-কাঁথা সিলাইতে।
ঝুলি-কাঁথা কেন্? দাসী নফর কিন্‌তে।
দাসী নফর কেন্? (আমার) নস্মুরে আগাইতে মুতাইতে,

তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে॥

টাকা-পয়সার গল্প

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ। কথাটা একেবারে খাঁটী কথা। টাকার উপরেই আজকালকার ত্মনিয়া ঘুরিতেছে। শক্তি-সামর্থ্য, মান-সম্মান, আদর-আপ্যায়ন সবই আজকাল নির্ভর করে টাকার উপর। তুমি হয়ত একজন খুব বিদ্বান্ লোক, খুব সচ্চরিত্র, বিনয়ী, পরোপকারী—এক কথায় সমস্ত রকম সদ্‌গুণের অধিকারী, কিন্তু তোমার একটি অপরাধ—তোমার পকেটে, বাক্সে কিংবা ব্যাঙ্কে কোথাও তেমন টাকা নাই। ব্যস্, ঐ এক অপরাধই তোমার কাল হইল; কারও কাছে আর তুমি "পাত্তা" পাইবে না, নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোকেও তোমাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চাহিবে না—বড় লোকদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দাও। কিন্তু ঐ সব গুণ ততটা থাক্ বা না থাক্, তোমার পকেটটা যদি একটু ভারী থাকিত, অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায়—তুমি যদি একটি "টাকার কুমীর" হইতে, তবে দেখিতে ত্মনিয়ার হালচাল আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। নেহাৎ অজ পাড়াগেঁয়ে লোকটাও দেখিবে তখন তোমাকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, কারও বাড়ী গেলে তাড়াতাড়ি হুঁকাটি তোমার দিকে আগাইয়া দিবে; বড়লোকদের বাড়ীতে তো কথাই নাই—আজ এখানে নিমন্ত্রণ, কাল ওখানে 'টি-পার্টি,' পরশু আর এক জায়গায় 'য়্যাট্ হোম্'—একটা-না-একটা কিছু লাগিয়াই আছে। চাই কি তোমার বয়স একটু বেশী হইয়া পড়িলে তোমার একটা "জয়ন্তী"ও হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু টাকা-পয়সার অত কদর কেন? দেখিতেও জিনিষগুলি এমন 'আহা মরি' কিছু একটা নয়—কতকগুলি, তামা, নিকেল, রূপা—বড় জোর সোনার

চাকতি। আরও দামী নোট্গুলি তো এক-একখানা ছাপান কাগজ! কী-ই বা এমন জিনিষ! এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একজন বড় পণ্ডিত রাস্কিন্ সাহেব একবার বলিয়াছিলেন—আজ যদি পৃথিবীর সমস্ত টাকা-পয়সা-নোট নষ্ট হইয়া যায় তবে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইবে? পৃথিবীর খাদ্যভাণ্ডারে তা'তে এক চুলও কমিবে না, কাপড়-চোপড়, আসবাব-পত্র, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া—যা যেমনটা আছে সব তেমনি থাকিবে, শুধু কতকগুলি লোক আর কতকগুলি লোকের উপর যে প্রভুত্ব এবং ক্ষমতা পাইয়া আসিতেছিল সেটুকু হারাইবে—কতকগুলি বিষয়ে তারা অপরের চেয়ে যে বেশী সুবিধাটুকু পাইতেছিল তা আর পাইবে না। এই "শুধু" কথাটা শুনিতে বেশ ছোটখাট কিন্তু কী অসম্ভব রকম এর প্রভাব তা কল্পনায়ও আনা যায় না!

টাকা-পয়সাকে সাধু ভাষায় বলা হয় মুদ্রা। এই মুদ্রা জিনিষটি পৃথিবীতে কেমন করিয়া আসিল? পৃথিবীর সভ্যতার আদিম যুগে মানুষ এ সবের কোনও ধার ধারিত না। জীবন ছিল তাদের সহজ, অনাড়ম্বর। এ জিনিষটা আমার, এটা ওর, এ সব ভাব তাদের ছিল না। ক্রমে মানুষ বাড়ী-ঘর তৈরী করিতে শিখিল, চাষবাস করিতে শিখিল, গরু-ভেড়া পুষিতে শিখিল—ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাদের নজর পড়িল। তখন বাধ্য হইয়াই তাদের মধ্যে জিনিষ-পত্র অদল-বদল করা দরকার হইয়া পড়িল। ধর, তোমার জমিতে খুব বেশী রকম ধান হইয়াছে কিংবা তোমার গরু খুব বেশী দুধ দেয়। দুধ-ভাত তুমি খুব খাইতেছ কিন্তু তোমার গায়ে দিবার কম্বল নাই, শীতে তোমাকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। তোমার আর একটি বন্ধুর অনেকগুলি মোটা-সোটা ভেড়া আছে কিন্তু তার জমিতে তেমন ধান হয় নাই, তার গরুও দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে কিংবা তার গরু হয়ত একেবারেই নাই। এক্ষেত্রে অদল-বদল করাই হইতেছে 'বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি গিয়া বন্ধুকে বলিবে, "ওহে, আমার এই কয় আঁটি ধান তুমি নাও কিংবা এই দুধটুকু বা গোটা গরুটাই তুমি নাও, তার বদলে আমাকে দাও তোমার ঐ ভেড়া—ওর গায়ের লোম দিয়া আমি কম্বল বানাইব।" বন্ধু সহজেই রাজী হইল। কয়েক আঁটি ধান বা একটি গরু দিয়া তুমি তার কাছ হইতে গোটা দুই ভেড়া কিনিয়া লইলে; দু'জনেরই সুবিধা হইল।

এমনি ভাবে জিনিষ অদল-বদল করিয়া লোকে কেনা-বেচা করিতে শিখিল। কিন্তু বড় বড় জিনিষ লইয়া অদল-বদল করা একটু কষ্টকর এবং বিরক্তিকরও বটে। তাই লোকে মাথা খাটাইয়া স্থির করিল এমন একটা জিনিষ ঠিক করা যাক্ যা অন্য সমস্ত জিনিষের বদলে তাদের প্রতিনিধি ভাবে ব্যবহার করা যাইবে। অবশ্য এমন জিনিষ লইতে হইবে যা তেমন সহজলভ্য নয়। সব জিনিষের "প্রতিনিধি" এই বিশেষ জিনিষটিই আমাদের মুদ্রা।

প্রথম যুগের মুদ্রা অবশ্য এখনকার মত নিখুঁত ভাবে 'তৈরী' করা হইত না। নানা দেশে নানা রকম জিনিষ মুদ্রা রূপে ব্যবহার করা হইত। আমাদের দেশেই তো আগে কড়ি দিয়া জিনিষপত্র কেনা-বেচা যাইত। আমরা কথায়ই বলি টাকা-কড়ি। কড়ি কিন্তু শামুক-ঝিনুকের মতই এক রকম জলচর প্রাণীর খোলস। নানা রকম পাথর, নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ—খাবার জিনিষ, পরিবার জিনিষ, ঘর সাজাইবার জিনিষ আগে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হইত। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে এই সব আদিম যুগের মুদ্রা এখনও চলিতেছে। শামুক, ঝিনুক, কড়ি, প্রবাল—এ সব তো অনেক দেশেই চলে, নানা রকম রং-বেরংএর পাথর, কাচ, চিনামাটীর চাকতি এ সবও অনেক জায়গায় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। য়াপ্ বলিয়া একটা দ্বীপ আছে, সেখানে বড় বড় পাথর দিয়া মুদ্রা তৈরী করা হয়। ঐ সব পাথর সে দেশে পাওয়া যায় না, অন্য জায়গা হইতে আনিতে হয়, তাই তার অত আদর। যে পাথর যত বড় তার দামও তত বেশী। দু' মণ কি তিন মণ ওজনের একখানি পাথরের দাম হয়ত আমাদের হিসাবে ২০০।৩০০ টাকা। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের মধ্যে হরিণের দাঁত মুদ্রা রূপে চলে; বন্য জন্তুর হাড়, চামড়া, তেল—এগুলিও অনেক দেশের মুদ্রা। লয়াল্টি নামে একটা দ্বীপ আছে, সেখানে শেয়ালের লেজ আমাদের দেশের নোটের মত ব্যবহার করা হয়। সে নোট ভাঙ্গাইতে হইলেও কোন হাঙ্গামা নাই, টুক্রা টুক্রা করিয়া লেজটা কাটিয়া লইলেই হইল। (আমাদের দেশে নোট ভাঙ্গাইতে অনেকে সময়ে বিব্রত হইতে হয়; এ উপায় থাকিলে বেশ হইত—কাঁচি দিয়া নোটগুলিকে ইচ্ছামত যত টুক্রায় খুসী কাটিয়া ফেলিলেই চলিত।)

খাওয়ার জিনিষ, ব্যবহারের জিনিষ এখনও অনেকে দেশে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন মঙ্গোলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে চা, ফিলিপাইনে চাউল, লাপ্‌ল্যাণ্ডে হরিণ, আফ্রিকার নানা অঞ্চলে নূন, কাপড়-চোপড়, পশম, বাসনপত্র, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত মুদ্রার কাজ করে। ঐ সব মানুষকে দিয়া কাফ্রীরা ক্রীতদাসের কাজ করাইয়া লয়।

পৃথিবীর সভ্যতম দেশগুলিতে অবশ্য এ সব ধরণের মুদ্রা এখন আর চলে না—এখন কেন, অনেক দিন হইতেই চলে না। তাই মুদ্রা বলিতে আমরা তামা, দস্তা, পিতল, নিকেল, সোনা, রূপা—এই সব ধাতু দিয়া তৈরী নানা রকম ছাপ দেওয়া মুদ্রার কথাই জানি। আজকালকার মুদ্রাগুলি প্রায় সবই গোল চাকতি—আমাদের দেশে এক মাত্র দোয়ানিগুলি চৌকা চাকতি—কিন্তু তারও ধারগুলি গোল করা; আনি ও সিকি কাটা কাটা হইলেও গোল। অন্যান্য দেশেরও বেশীর ভাগ মুদ্রাই গোল চাকতি। গোল চাকতি ব্যবহারের পক্ষে, সঙ্গে লইয়া ঘুরিবার পক্ষে এবং তাড়াতাড়ি গুণিবার পক্ষে সুবিধাজনক, তাই সাধারণতঃ মুদ্রাগুলিকে ঐরূপ চেহারা দেওয়া হয়। কিন্তু সেকালে ধাতুর মুদ্রা নানা রকম আকৃতির হইত। আমাদের ভারতবর্ষে চৌকা মুদ্রার প্রচলন খুব বেশী ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এক রকম মুদ্রা দেখা যাইত সেগুলি তোমাদের খেলিবার মার্ব্বলের মত গোল (চাকতি নয়)।

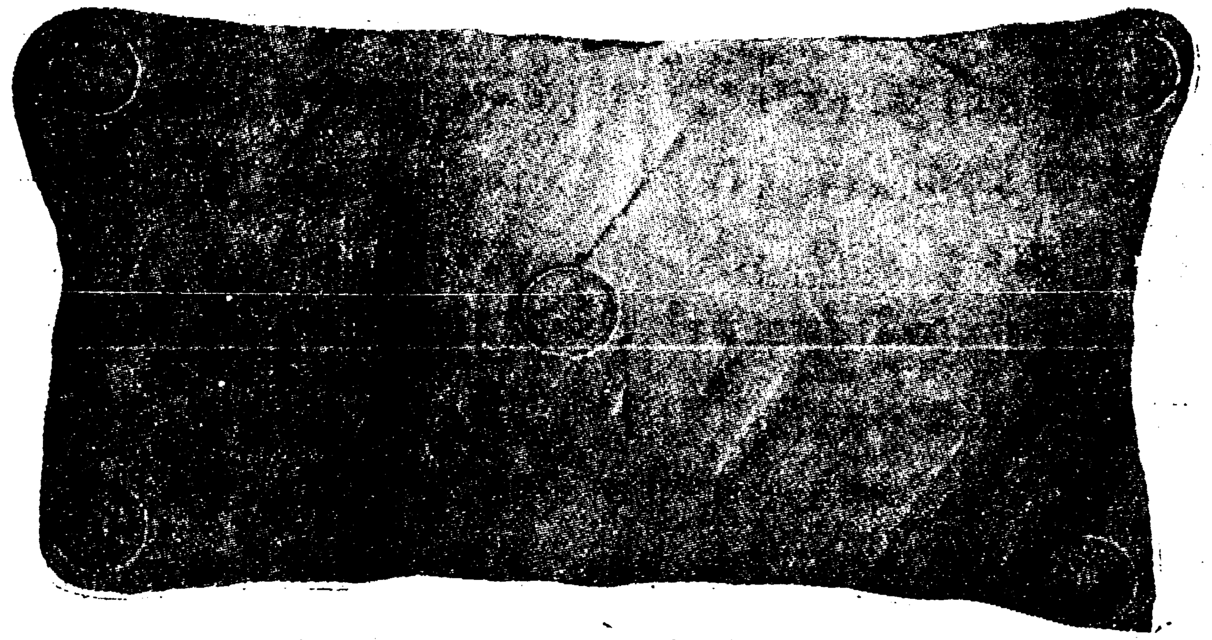

সুইডেনের সপ্তদশ শতাব্দীর তামার মুদ্রা

প্রাচীন ইংলণ্ডে লাঠির মত লম্বা লম্বা মুদ্রার প্রচলন ছিল। আমাদের ভারতবর্ষেও বহু—বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তারের মত মুদ্রা দেখা যাইত। তারের মত

ধাতুর মুদ্রা আরও অনেক দেশে ছিল—কোন কোন জায়গায় আবার উহা ভাঙ্গাইবার সময় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দিলেই চলিত। সিংহলের মুদ্রা ছিল বঁড়শীর মত। প্রাচীন স্পেনের মুদ্রাগুলি গোল হইলেও তার মাঝখানে গর্ত্ত থাকিত। লোকে সেই গর্ত্তে সূতা ভরিয়া ঐ টাকার মালা তৈরী করিয়া গলায় পরিত। কি সুবিধা বল দেখি! অযথা মনিব্যাগ্ কিনিবার দরকার নাই, টাকা দিবার সময়ে মালা হইতে একটা টাকা খুলিয়া দিলেই হইল। এই রকম ছিদ্রযুক্ত মুদ্রা চীন দেশে এখনও আছে। চীন দেশে আরও নানা রকম অদ্ভুত আকৃতির মুদ্রা দেখা যায়; তার কোনটা বা ছুরির মত, কোনটা বালার মত, কোনটা আংটির মত, আবার কোনটা বা বাটীর মত।

কিন্তু সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে সেকালকার সুইডেনের মুদ্রা (সপ্তদশ শতাব্দীর)। আগের পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখ। যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনি বিরাট্ তার আকৃতি। এই মুদ্রা তামার তৈরী। এক-একটা লম্বায় ছিল প্রায় দু' ফুট, চওড়ায় ও এক ফুটের উপর। ওজনে প্রায় পনের সের। এত বড় মুদ্রা আর বড় একটা দেখা যায় না। এই মুদ্রা লইয়া বাজার করিতে হইলেই কর্ম্ম শেষ। কোন জিনিষের জন্য দরকার হউক্ আর না হউক্ এই পয়সা (?) ঘাড়ে করিয়া বাজারে লইয়া যাইবার জন্যই বোধ হয় কয়েক জন মুটের দরকার।

মুদ্রার গায়ে নানা রকম ছাপ মারা থাকে। বেশীর ভাগ দেশের মুদ্রায়ই সে দেশের রাজার মাথা আঁকা থাকে, কিন্তু অনেক মুদ্রায় আবার সে দেশের ধর্ম্মচিহ্ন, দেবদেবীর মূর্ত্তি, সে দেশের প্রসিদ্ধ দৃশ্য—ইত্যাদির ছবিও আঁকা থাকে। শুধু তাই নয়, মুদ্রার গায়ে আবার নানা কথা লেখা থাকে—রাজার বংশ-পরিচয়, তারিখ—এই সব। প্রাচীন মুদ্রার গায়ে এই সব চিহ্ন দেখিয়া আজকালকার পণ্ডিতেরা সেকালকার অনেক ইতিহাস বাহির করিতেছেন। সেকালকার রাজাদের পরিচয়, ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, ভাষার কথা, সেকালকার বিশেষ বিশেষ ঘটনার কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আশ্চর্য্য উপায়ে এই সব মুদ্রার সাহায্যে বাহির হইতেছে। বড় বড় মিউজিয়ামে এই রকম নানা দেশের হাজার হাজার মুদ্রা সংগ্রহ করা হইতেছে—প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দিনরাত তা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। মুদ্রা লইয়া

TIGHT BINDING

এই যে গবেষণা—এ বিদ্যার একটা নামও তাঁরা দিয়াছেন—"মুদ্রাবিজ্ঞান" (Numismatics)।

মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, আজকালকার মুদ্রা কেমন করিয়া তৈরী হয় এবার সে সম্বন্ধে কিছু বলি। টাঁকশালের নাম তোমরা শুনিয়াছ,—এই টাঁকশালেই টাকা তৈরী হয়। সমস্ত দেশেই সরকারী টাঁকশাল আছে। সরকারী টাঁকশাল ছাড়া অন্য কোথাও টাকা তৈরী হইতে পারে না। কেউ যদি সে রকম কোনও চেষ্টা করে তবে তার গুরুতর শাস্তি হয়। আমাদের কলিকাতায়ও টাঁকশাল আছে, লণ্ডনে খুব বড় একটি টাঁকশাল আছে। ইংরাজীতে টাঁকশালকে বলা হয় মিণ্ট (mint)।

প্রাচীন ভারতবর্ষের কয়েকটি মুদ্রা

উপরে (ডান দিক হইতে)—(১) প্রাচীন নেপালী মুদ্রা (অংশুবর্ম্মণ)
(২) ঐ (৩) সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা—সমুদ্রগুপ্ত (৪) ঐ—লক্ষ্মী
নীচে—(১) সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেছেন (২) ঐ—লক্ষ্মী
(৩) চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা—চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী
(৪) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব-চিহ্নিত মুদ্রা

তোমরা জান পয়সা তৈরী হয় তামা দিয়া, টাকা তৈরী হয় রূপা দিয়া। কিন্তু উহাতে শুধু তামা আর রূপাই থাকে না, আরও কতকগুলি ধাতু—টিন, দস্তা প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে মিশান থাকে; উহাকে বলা হয় খাদ। একটা পয়সা তৈরী করিতে হইলে কি সূক্ষ্ম কলকব্জার দরকার হয় আর কত রকম খুঁটিনাটী হিসাব করিতে হয় সে একটা দেখিবার জিনিষ। প্রথমে বড় বড় তামার পাত লইয়া সেগুলিকে আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম দাঁড়িপাল্লায় নিখুঁত ভাবে ওজন করা হয়। তার পর তার সঙ্গে ঠিক ওজন মত খাদ মিশাইয়া বড় বড় চুল্লীর মধ্যে সেগুলিকে গালাইয়া

ফেলা হয়। তার পর সেই গলান ধাতুকে ছাঁচে ফেলিয়া পাৎলা পাৎলা পাত তৈরী করা হয় আর সেই পাতকে রোলারের সাহায্যে দলিয়া পিষিয়া ঠিক যতটা পুরু করা দরকার ততটা পুরু করা হয়। তার পর কলের সাহায্যে সেই পাত হইতে পয়সার আকারের গোল গোল চাকতি কাটিয়া লওয়া হয়। এই কাটা এত তাড়াতাড়ি হয় যে মিনিটে পাঁচ-ছ'শ' পয়সা অনায়াসে কাটা যায়।

এই বার ধার উঁচু করিবার পালা। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ টাকা-পয়সার ধার বা কিনারাগুলি ভিতরের চাইতে একটু উঁচু—ঠিক থালার মত। ক্রমাগতঃ ঘষা লাগিয়া লাগিয়া টাকার উপরকার রাজার মুখের ছাপ যাহাতে না উঠিয়া যায় সেই জন্যই এই সতর্কতা। বলা বাহুল্য এ কাজটিও কলের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি হয়। তার পর রাজার মুখ আঁকিবার পালা। এই কাজের আগে পয়সাগুলিকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল একটা লম্বা চুল্লীর ভিতর দিয়া চালাইয়া লইয়া গরম করা হয়—এটাকে অগ্নিশুদ্ধি বলিতে পার। তার পর ঐ গরম গরম পয়সার উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়া রাজার মুখ, নাম, সন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ছাপগুলি আঁকিয়া দেওয়া হয়।

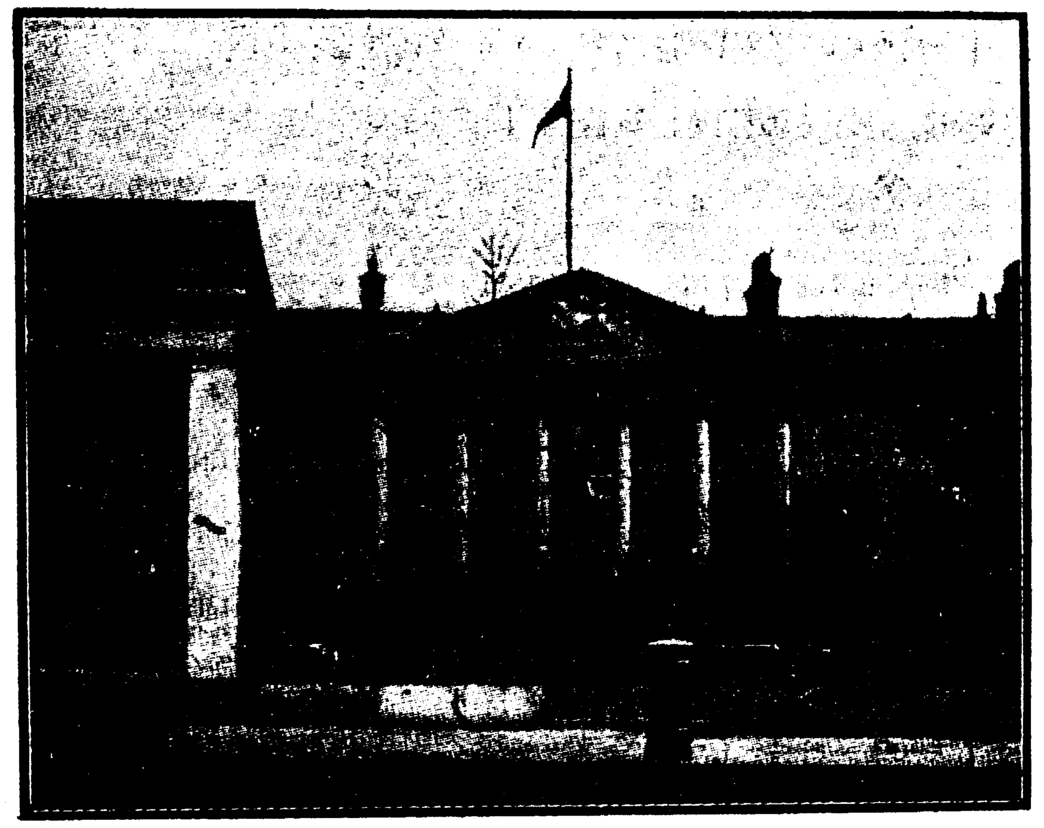

লণ্ডনের টাঁকশাল

পয়সা তো তৈরী হইল কিন্তু তখনও সমস্ত কাজ শেষ হয় নাই। পয়সা ঠিক মত হইল কিনা—কোনও খুঁত রহিল কিনা তাও পরীক্ষা করা দরকার। প্রথমে একজন বিশেষজ্ঞ লোক হাত বুলাইয়া বুলাইয়া পয়সাগুলিকে পরীক্ষা করেন।

তার পর সেগুলিকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় আর একটা কলে। বাকী সমস্ত কাজ এই সূক্ষ্ম কলটিকে দিয়া হয়। পয়সাগুলি আবার পরীক্ষা করিয়া, বাজাইয়া, গুণিয়া, একেবারে বস্তায় পূরিয়া তবে এ কল তাদের রেহাই দেয়। কোন পয়সায় যদি কোন খুঁত থাকিয়া যায় তবে আর তার অদৃষ্টে বস্তায় প্রবেশ করা সম্ভব হয় না—কলের এমনই গুণ যে সে ঐ পয়সাটিকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া ফেলিবে আর বস্তায় না পূরিয়া তাকে ফেলিবে আর একটা বাক্সে; কারণ সে পয়সা অচল। সচল পয়সাগুলি বস্তায় চাপিয়া টাঁকশাল হইতে বাহির হয়, তার পর বাকী জীবনটা নানা লোকের পকেটে চড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সব কাহিনী তো তোমরা জানই।

ডাকাতের হাতে

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়)

কথা হচ্ছিল, চণ্ডী বাঁড়ুয্যের জামরুল গাছটিকে কি ক'রে উজাড় করা যায়। এ আর কেউ নয়—স্বয়ং চণ্ডী বাঁড়ুয্যে, সকাল বেলা জলগ্রহণ না ক'রে যার নাম কেউ নেয় না। এ বিষয়ে গোবর্দ্ধনের কিছু অভিজ্ঞতা আছে—অন্ততঃ সে তো তাই বলে। কথাটা এই—

সেদিন ইংরিজী এপ্রিল মাসের পয়লা। ঘুম থেকে উঠে গোবর্দ্ধন সবে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—এমন সময় স্বয়ং চণ্ডী বাঁড়ুয্যে একখানি নিমের দাঁতন হাতে নিয়ে সে পথে এসে উদিত হলেন। মন তো তার তখনই মুষ্‌ড়ে পড়্‌ল আজ না জানি বরাতে কী আছে! কিন্তু খানিক বাদে ডাকহরকরার কাছ থেকে যখন তার নামের একখানা চিঠি পেলে তক্ষুণি সে চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। কে বলে চণ্ডী ঘোষের নামে হাঁড়ী ফেটে যায়? তার দর্শনে দক্ষিণ হস্তের দস্তুরমত ভূরি ব্যবস্থার সম্ভাবনা! মাসিমাদের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, লিখেছে মাসতুতো ভাই নন্তু। আজ দুপুর বেলা তাদের বাড়ীতে শুধু গোবর্দ্ধনের খাওয়ার নেমন্তন্ন। মেজদা'কে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি গোবর্দ্ধন খুব খুসী হয়ে গেল।

পিঠেপিঠি ভাই ব'লে মেজদা'র সঙ্গে ওর বরাবরই আড়ি। অথচ এত বড় অপমানেও মেজদা'র লজ্জা হ'ল না, আবার কিনা চিঠি পড়ে অবধি গোবর্দ্ধনের দিকে চেয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছিল। গোবর্দ্ধন দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ ক'রে মনে মনে বল্লে, "শেম্‌লেস্‌"।

দুপুর বেলা সাজসজ্জা ক'রে গোবর্দ্ধন মাসিমাদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলো; মাসিমা তো ওকে দেখে আকাশ থেকে পড়্‌লেন। মুখে বল্লেন, "তবু ভালো, ছেলের একবার মনে পড়েছে। এত কাছে আছিস্‌ গোব্‌রা, একবারও আস্‌তে ইচ্ছে হয় না? কিন্তু তা-ও বলি, এমন অসময়ে আসা কেন বাপু? ইস্কুল পালিয়েছিস্‌ বুঝি? কি হয়েছে সব আজকালকার ছেলেদের! নন্তুটা-ও আজ ইস্কুলে যেতে চায় নি। ব'লে-কয়ে তবে পাঠিয়ে দিলুম। আজ আবার কি বলে এপ্রিল ফুল না কি—তাই কিনা।"

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জিনিষটা গোবর্দ্ধনের কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। "আজ তবে যাই মাসিমা" বলে সে কোনোমতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিলে।

বাড়ী এসেই কি ছাই নিস্তার আছে? দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে মেজদা'—এবার আর মুচ্‌কি হাসি নয়, দাঁত বের ক'রে হে'সে হে'সে বল্‌ল, "কি গোবর্দ্ধন বাবু, কেমন হ'ল খাওয়াটা?"

অপমানের চূড়ান্ত! তার উপর কিনা মাসিমা নন্তুর মুখে সব খবর পেয়ে বিকেলের দিকে গোবর্দ্ধনের জন্য এক থালা খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

গোবর্দ্ধন তো বড় গলা ক'রে বলে, এর জন্য আর কেউ নয়—দায়ী সেই চণ্ডী বাঁড়ুয্যে।

তার বাগানে চুরি! কথাটা ভাব্‌বার বিষয় বটে।

ভাবনার আরও কারণ আছে। একে তো গাছের প্রতি চণ্ডী বাঁড়ুয্যের মমতাটা পুত্রস্নেহের মত, তার ওপর তার যে একটি দারোয়ান আছে—সুদের

থেকে যার মাইনে চলে যায়—সেই নান্নু সিংএর চোখ ছুটোও ঠিক যমের মত।

গেল বছর বদ্যিনাথ একবার জামরুল গাছটির দিকে তাকিয়ে আর লোভ সাম্‌লাতে পারে নি—চক্ষের নিমেষে একেবারে গাছের আগ্‌ডালে। তখন আর চণ্ডী বাঁড়ুয্যের কথা তার মনেই পড়ে নি। কিন্তু খানিক বাদে কোঁচড় ভর্ত্তি ক'রে যখন নাম্‌তে যাবে, নীচের দিকে চেয়েই তো তার চক্ষুস্থির! বাঁড়ুয্যে ভাঁটার মত চোখ পাকিয়ে তার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন। আস্তে আস্তে নাম্‌তে নাম্‌তে বদ্যিনাথ ফন্দী আঁট্‌তে লাগ্‌ল—কি ক'রে এবার এই বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

নাম্‌তে নাম্‌তে বদ্যিনাথ যখন নাগালের কাছাকাছি এ'সে পড়েছে—চণ্ডী বাঁড়ুয্যে তখন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। যা থাকে কপালে ভেবে বদ্যিনাথ দিলে লাফ,—আর যায় কোথায় বাঁড়ুয্যের ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় ক'রে পড়্‌ল। বাঁড়ুয্যে তো "বাপ্‌স্" বলে চীৎপাত। বদ্যিনাথ ইতিমধ্যে উধাও।

"ব'দেকে অবধি এতটা বেগ পেতে হয়েছে,—কে আর যাবে মাথা খোয়াতে বাবা?" মণ্টু তো পরিষ্কার ব'লে ফেল্লে।

"কোই ফিকর নহী, হম্ হ্যায়" বলে গোবর্দ্ধন বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। "আজ্‌কে এই নষ্টচন্দ্র দিনেই ওর বাগান সাবাড় করেগা। তবে দিনে নয়, রাত্তিরে।"

খুব রাগের সঙ্গে অথবা সাহসের সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলেই গোবর্দ্ধন হিন্দী ব'লে ফেলে।

অশোক কবিতা লেখে, মেয়েলি গলায় বল্লে, "যাও বীর, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে রাখ্‌বে।"

আমরা খেলাধুলো শেষ ক'রে সন্ধ্যের দিকে বাড়ী ফিরছি, দেখলুম গোবর্দ্ধন বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বল্লে, "ভেতরে ঢোক্‌বার একটা রাস্তা পাওয়া গিয়েছে। কেলো, তোদের বাড়ীতে আজ রাত্তিরে আমার নেমন্তন্ন, জান্‌লি? আজ্‌কে রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে আর বাড়ী ফেরা হবে না—বুঝেছিস্?"

ব্যাপারটা এই, বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর একটা আমগাছ ডালপালা ছড়িয়ে প্রতিবেশী কেলোদের বাড়ীর দোতলার জান্‌লায় এসে ঠেকেছে। গোবর্দ্ধন সে-পথেই বাঁড়ুয্যে-বাড়ী যাবার সঙ্কল্প করেছে।

সন্ধ্যার খানিক পরে কেলো এসে হাজির, বল্লে, "তোদের সব্বাইকার আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন। মাকে ব'লে রেখেছি।"

বদ্যিনাথ তো ফূর্ত্তিতে লাফিয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "গোব্‌রা, পেটে খেলে পিঠে সইবে রে। চণ্ডী বাঁড়ুয্যের হাতে যদি প্রহারেন ধনঞ্জয় হয়ে আসিস্ তবু আমার আর দুঃখু নেই, জান্‌লি?"

পর দিন রবিবার, তাই গার্জ্জিয়ান্‌দের পড়ার তাগাদা নেই। আমরা চার-পাঁচ জন মিলে কেলোদের হল্ ঘরটায় ব'সে চুপি চুপি নানা ফন্দী আঁটছি,—হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে গোবর্দ্ধন সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, তার পরে মালকোছা মেরে জান্‌লা থেকে গাছের ডাল ধ'রে ঝুঁকে পড়্‌ল এবং বাক্যব্যয় না করে কাঠবেড়ালীর মত তর্‌তর্ করে ডাল বেয়ে মাটীতে নেমে পড়্‌ল।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ফলাফল জান্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লুম। বদ্যিনাথ এক দৃষ্টিতে বাইরের পানে চেয়ে রইল। হঠাৎ আমার হাতে খুব জোরে একটা চাপ দিয়ে সে বল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, গোব্‌রাটা ধরা পড়ে গেছে।"

তার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে বিরাট্ কোলাহল পড়ে গেল। "চোর চোর, আলো আলো, দারোয়ান্ দারোয়ান্!"

আমাদের মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। এখন উপায়!

খানিকক্ষণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্‌তে না পেরে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে রইলুম। বদ্যিনাথ তো নিজের হাত কাম্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তার পরে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত ক'রে গোবর্দ্ধনের প্রদর্শিত পথে বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর অন্দরে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও অতি কষ্টে তাকে অনুসরণ কর্‌লুম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমরা দেখতে লাগলুম আর উপায় খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম।

চণ্ডী বাঁড়ুয্যের ঘরের সম্মুখে বিচার হচ্ছে। উপস্থিত শুধু চণ্ডী বাঁড়ুয্যে এবং তাঁর স্ত্রী—আমাদের সার্ব্বজনীন ঠান্‌দি'—ক্ষান্ত ঠাকরুণ। দারোয়ান্‌রা ছিল,

তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঁড়ুয্যে যখন খুব ক্রুদ্ধ হ'ন তখন কাউকে কাছে থাক্‌তে দেন না শুধু ক্রোধের পাত্রটিকে ছাড়া। বুঝ্‌লুম গোবর্দ্ধনের অদৃষ্ট আজ নিতান্তই মন্দ।

চণ্ডী বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "কি হে ছোক্‌রা, দেখ্‌তে তো যেন ভিজে বেড়ালটি! কি সদুদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছ এবং পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে একবার দয়া ক'রে বল না?"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের বেত গাছা লক্‌লক্ ক'রে উঠ্‌ল।

গোবর্দ্ধন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লে, "আজ্ঞে, আজ্‌কে আমার 'কালো'দের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। আপনি তো আমাকে চেনেনই। ঐ গাঙ্গুলীপাড়ায় আমাদের বাড়ী।"

কথার মাঝখান থেকে চণ্ডী বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "চিনি হে চিনি। তোমাদেরকে চেন্‌বার আর আমার বাকী নেই।"

তার পরে ঠানদি'র দিকে চেয়ে বল্লেন, "জান্‌লে, আজকালকার চোরদের নতুন কৌশল হয়েছে, ছোট ছোট ছেলেকে দলে ভর্ত্তি ক'রে তাদের ভদ্দরলোকের বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দেওয়া। কেউ সন্দেহ করবে না, বুঝ্‌লে কিনা? বলি তোমার মৎলবখানা খুলে বল, নতুবা নান্নু সিংকে থানায় পাঠাচ্ছি এখনই।"

গোবর্দ্ধনের মুখে যেন রক্তের চিহ্ন নেই, কোনমতে সে ব'লে গেল, "আজ্ঞে, খেয়ে-দেয়ে আমি শুতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ জান্‌লা থেকে দেখ্‌লুম একজন লোক, খাকী য়ুনিফর্ম্ম পরা, আপনার পাঁচীলের নীচে এসে দাঁড়িয়ে একবার হুইস্‌ল্ দিলে। অম্‌নি চারদিক্ থেকে চারজন ছুটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং একখানা মই বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে আপনার বাড়ীর ভেতর এসে পড়্‌ল। দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম, এদের উদ্দেশ্য ডাকাতি করা। তাই আপনাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্য চুপি চুপি সেই মই বেয়ে এখানে এসেছি। আপনার ভাল কর্‌তে এসে আমাকে এম্‌নি নাজেহাল হতে হ'ল। কি কর্‌ব, অদৃষ্ট!"

এই পর্য্যন্ত ব'লে গোবর্দ্ধন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে চুপ মেরে গেল।

চণ্ডী বাঁড়ুয্যে বেত হাতে দাঁড়ালেন, "তোমার অদৃষ্টের নিকুচি কর্‌ছি, কোথায় সেই মই? দেখাবে চল।"

গোবর্দ্ধন পাংশু মুখে বল্লে, "চলুন"।

হঠাৎ বস্তিনাথ আমার কানে কানে বল্লে, "আমি যা কর্‌ব ঠিক তাই করবি। ঐদিকে ছুটে যা"—ব'লে আমাকে এক কোণ দেখিয়ে দিলে এবং নিজে তার বিপরীত দিকে ছুটে গেল।

তার পর মুহূর্ত্তে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। বস্তিনাথ ছুট্‌তে ছুট্‌তে জিভের নীচে আঙ্গুল চালিয়ে খুব জোরে শিস্ দিতে লাগ্‌ল।

আমি ফুটবল্ খেলার ক্যাপ্টেন ছিলুম। পকেট থেকে "হুইস্‌ল্"টি বের করে ফুঁ দিতে লাগ্‌লুম।

আর যায় কোথায়? প্রথম ধ্বনি শুনে চণ্ডী বাঁড়ুয্যে থম্‌কে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় ধ্বনিটির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যব্যয় না করে বাক্স-পেঁটরা সাম্‌লাতে—এমন কি ঠানদি'কে অবধি ফেলে—ছুটে চলে গেলেন। ঠানদি' মোটা মানুষ,—"শরীরে আর পদার্থ নেই," তবু কি করা, বিপদে মানুষ কি না করে? তিনিও স্বামীর অনুসরণ কর্‌লেন।

বস্তিনাথ ছুটে গিয়ে হতভম্ব গোবর্দ্ধনের হাত চেপে ধ'রে গাছ বেয়ে কেলোদের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল, অবশ্য আমিও বাদ যাই নি।

বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে তখন আবার কোলাহল উত্থিত হ'ল—"নান্নু সিং, এ নান্নু সিং! ডাক্কু ঘুসা, জল্‌দি আও।"

নান্নু সিং-এর জবাব শোনা গেল—"হুজুর, হাতিয়ার নেহি মিল্‌তা।" *

জেনে রাখ

ঘরের মেঝে থেকে ভাঙ্গা কাচের টুক্‌রো তুলে ফেলতে হ'লে ভিজে পশমী কাপড় সব চেয়ে সুবিধাজনক।

কম্বল ধোবার সময় জলে দু' চামচ গ্লিসিরিন্ মিশিয়ে নিলে কম্বল শুকোবার পর আর শক্ত (কড়কড়ে) হয় না।

---

* ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

'বেণু'

(শ্রীনলিনী গুপ্ত, এম্-এ, বি-টি)

আমাদের ক্ষুদে খোকা—নাম তার 'বেণু',
দাপটের চোটে তারি' সারা হ'য়ে গেনু।
দেখিতে সুবোধ ? বটে ! বুঝ্‌বে কি তুমি ?
ড্যাবডেবে দু'টি চোখে ভরা দুষ্টুমী।
থপ্ থপ্ করে হাঁটে ; ধরিতে গেলে
টুক্ ক'রে ছুট্ দেয়—দস্যি ছেলে !
একটুও থির নেই—দিনরাত খালি
ছুটোছুটি—লুটোপুটি—ধুলো আর বালি।

পড়িবার ঘরে ঢোকে—চুপে খুলে খিল্ ;
চারদিকে বই, খাতা, শ্লেট্, পেন্‌সিল্,
দোয়াত, কলম, কালি, জুতো, স্যাণ্ডেল্,
হ্যাণ্ডেল, টুথ-ব্রাশ্ আর ফুল-তেল—
কাজের জিনিষ যত, যা পায় সমুখে
পরখ করেন ছিঁড়ে, চুষে আর শুঁকে।
শোনে কি নিষেধ কারু ? দেখাইলে কীল
কচি কচি দাঁত মেলে হাসে খিল্‌খিল্।

কিছুতে উঠি না এঁটে ; বলি যদি কিছু
ধমকিয়ে রাগ ক'রে,—মুখ ক'রে নীচু,
জলে ভারী যোড়া চোখে চেপে দুটি হাত
'বাবা' ব'লে ফুঁপিয়েই করে বাজী-মাৎ।

ক্যান্‌ভাসার

শিল্পী—শ্রীমান্ সুমুখনাথ মিত্র (রামধনুর গ্রাহক)

হারান-দা'র সঙ্গে এক সন্ধ্যা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

'তাড়াতাড়ি চলেছি বায়োস্কোপের দিকে, হাতে বেশী সময় নেই ; গলির মোড় পেরোতেই আমাদের হারান-দা'র সঙ্গে দেখা।

'আরে পল্টু যে ! কি খবর ? কেমন আছো ?'

বিনীত ভাবে বললুম, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আর আছি! এই তো দেখো, তোমার বৌদি গেছেন বাপের বাড়ী, চাকর-বাকর নিয়ে কি আর শান্তি আছে? মাইনে দিয়ে দু'-দুটো জোয়ান পুষছি, তা এই বিকেল বেলায় দু'জনেই বেরিয়েছেন হাওয়া খেতে। শেষটায় কিনা আমাকেই আসতে হ'ল চায়ের চিনি কিনতে! এই দেখো।'

হাত নেড়ে কাগজের যে পুঁটলিটি তিনি প্রদর্শন করলেন, এমনিতে আমার হয়তো তা চোখেই পড়তো না।—'বল তো পল্টু, এ সব চিনি-ফিনি কেনা কি ভদ্দরলোকের পোষায়?'

মাথা নেড়ে তৎক্ষণাৎ সায় দিলুম। ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলুম আলাপ সংক্ষিপ্ত করতে, ঘড়িতে ছ'টা বাজে।

'তা তুমি কোথায় চলেছ?'

'একটু বায়োস্কোপে যাবো ভেবেছিলাম।'

'বায়োস্কোপে! খুব বায়োস্কোপ দেখো বুঝি? এই তো আমি সেদিন নিউ এম্পায়ারে হেল্‌স্ এঞ্জেল্‌স্ দেখে এলাম—ওঃ, গ্রেট্ ছবি! নিউ এম্পায়ার, জানো তো, আঠারো আনার নীচে টিকিট নেই। ওঃ, চমৎকার হাউস্‌টি করেছে, খাঁটি সাহেব-মেমরা সব যায়। যাও নি বুঝি কখনো—হেঁঃ?' হারান-দা' পান-খাওয়া লালচে দাঁত দেখিয়ে খুব একচোট হেসে নিলেন।

'আজ্ঞে, গেছি কয়েক বার।'

হারান-দা' আমার কথাটা শুনতেই পেলেন না যেন।—'বেশ, বেশ, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। ক্ষেমেশ কেমন আছে?'

'দাদা ভালোই আছেন।'

'বেশ, বেশ। তোমরা এ পাড়াতেই তো থাকো, কোথায়?'

'এই তো কাছেই—বেনেপুকুরে।'

'বেনেপুকুর—ও, হ্যাঁ। রাস্তাটা একটু ঘিঞ্জি, না? বড় নোংরা—কি বলো?'

আমি মৃদুস্বরে আরম্ভ করলুম, 'কই, তেমন তো—'

'আমার নতুন বাড়ী দেখো নি বুঝি? কোয়াইট্ এ ডিসেণ্ট্ ফ্ল্যাট্—রীতিমত বিলিতি ধরণের। দেখো নি?'

ততক্ষণে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। কোথায় ট্রামে লাফিয়ে উঠবো—না তিন-চারটে ট্রাম ক্রিং-ক্রিং ক'রে চ'লে গেল—হ'লো না বুঝি আজ আর বায়োস্কোপ দেখা! হারান-দা' আমার দাদার বন্ধু, পড়তেন এক সঙ্গে, কলকাতায় এসেছেন বছর খানেক এক কলেজের প্রোফেসর হ'য়ে। দিব্যি গোলগাল চিকচিকে মূর্ত্তি, সমস্ত পৃথিবীর উপর সব সময় খুসী হ'য়েই আছেন—সব চেয়ে বেশী খুসী নিজের উপর।

'চলো, চলো, আমার বাড়ীটা একবার দেখে আসবে,' হারান-দা' সস্নেহে আমার কাঁধের উপর একবার হাত রাখলেন।

বায়োস্কোপের আশা ছাড়তে হ'লো। দাদার বন্ধু, আমাকে ছোট দেখেছেন, তাঁর কথা না রেখে উপায় কি? আর তাঁর এই সাদর আমন্ত্রণে মনে মনে একটু যে খুসী না হয়েছিলাম তাও নয়।

'কেমন বাড়ী পেয়েছ তোমরা?' আরো কয়েক পা গিয়ে হারান-দা' জিজ্ঞেস করলেন।

'এই—আছে আর কি এক রকম।'

'এক রকম মানে? বেশী ভাল নয় বুঝি? ইলেক্‌ট্রিক্ কনেক্‌শন্ আছে তো?'

কলকাতার বাড়ী সম্বন্ধে ও-কথা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে আমাদের সে বাড়ীটাতে সত্যি ইলেক্‌ট্রিসিটি ছিল না। তা-ই বললুম।

কথাটা শুনে হারান-দা'র মুখ-চোখ যেন তাল পাকিয়ে একেবারে গোল হ'য়ে গেল।—'সে কি! নো ইলেক্‌ট্রিসিটি! আছো কী ক'রে তোমরা? এই তো দেখো, গরম-গরম ক'রে সকলে অস্থির, আর আমি গরম কি জিনিস টেরই পেলুম না। আয়্ ভ্ গট্ মাই ফ্যান্, গরম লাগ্‌লো কি পাখা চালিয়ে দিলাম।'

বাকি পথটুকু অধোমুখে নীরব রইলাম। পৌঁছনো গেল হারান-দা'র বাড়ীতে। নীচের তলায় এক ঘর কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গি, দোতলায় স্বয়ং আমাদের

হারান-দা' যে ঘরটিতে নিয়ে তিনি আমাকে বসালেন তার চারদিকই প্রায় বন্ধ, মুহূর্ত্তে ঘেমে উঠলাম। রুমাল বা'র ক'রে মুখ মুছতেই হারান-দা' ব'লে উঠলেন, 'ওঃ, গরম হচ্ছে বুঝি? দাঁড়াও, পাখাটা চালিয়ে দিই।'

ঘরের এক কোণে পুরোনো একটি জার্ম্মান টেব্‌ল্‌-ফ্যান্; হারান-দা' বীরদর্পে উঠে গিয়ে সেটা চালিয়ে দিলেন, কিন্তু পাখা চললো না। এটা নাড়লেন তিনি, ওটা টানলেন, কিছুতেই ফল হ'লো না; পাখাটা দস্তুরমত ধর্ম্মঘট ক'রে বসে রইলো।

'ওঃ, তাই তো, এটার কি গোলমাল হয়েছে দেখছি। তা কোন ভাবনা নেই, আমার এক বন্ধুর ইলেক্‌ট্রিকের দোকান আছে, তাকে খবর দিলেই এসে সারিয়ে দিয়ে যাবে। পাখার ও-রকম হয় মাঝে মাঝে—বুঝলে? তা তেমন গরমও তো নয়, এই তো দক্ষিণের জানলা দিয়ে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে।'

ঘরটার এক দিকে একটা জানলা ছিল তা ঠিক, কিন্তু তার গায়েই মস্ত চারতলা একটা বাড়ী; আর সে জানলা দিয়ে যে হাওয়া আসছিল সেটা নিশ্চয়ই এমন প্রকৃতির যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সেটা টের পায় না।

হারান-দা' বলতে লাগলেন, 'বাড়ীটার সবগুলো ঘরই দক্ষিণ খোলা—মস্ত সুবিধে এটা, কি বলো?'

আমি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বললুম, 'নিশ্চয়ই।' যদিও এটা মনে হ'লো যে সবগুলো ঘর দক্ষিণ খোলা হ'তে হ'লে আকাশের একাধিক দিক্ দক্ষিণ হওয়া দরকার। তার পর ক্ষীণ স্বরে আরম্ভ করলুম, 'আচ্ছা, আমি তা' হ'লে—'

'বোসো, বোসো একটু। আমিও বেরুবো, এক পেয়ালা চা খেয়ে নিই।'

জামার নীচে ঘামে নেয়ে উঠছিলাম, চায়ের কথাটা শুনে প্রাণে একটু ভরসা এলো। বায়োস্কোপ দেখবার তাড়ায় বিকেলে চা খাওয়া হয় নি, এখন চা-টা বেশ ভালোই লাগবে। কিন্তু হারান-দা' বোধ হয় ভেবেছিলেন যে আমি চা খাই নে, কি হয়তো 'অসময়ে' চায়ের পেয়ালা এনে হাজির করাটা বিলিতি প্রথাবিরুদ্ধ—সে যা-ই হোক্, তিনি আমার সামনে ব'সে ব'সে চা খেলেন, আমাকে একটিবার জিজ্ঞেস করলেন না, 'না' বলবার সুযোগটা একবার দিলেন না পর্য্যন্ত। আমি মুখের এমন চেহারা ক'রে রইলুম যেন চা কী বস্তু তা-ই আমি জানি নে।

চায়ের পেয়ালা খালি ক'রে তিনি বললেন, 'একটু বোসো, কাপড় প'রে আসি।'

রইলুম সেই দক্ষিণে-হাওয়া-খেলানো ঘরে ব'সে, ঘর্ম্মসিঞ্চনে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। খানিক পরে হারান-দা' এলেন, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে চক্‌চকে জুতো, চুলটা বোধ হয় এই মাত্র কিছু একটা মেখে চক্‌চকে করেছেন; গা থেকে তিন-চার রকম গন্ধ বেরুচ্ছে, একেবারে যাকে বলে ফুল-বাবু। তা তো বুঝলুম, কিন্তু গালের ওখানটায় খানিকটা চূণ লাগিয়েছেন কেন? ফোঁড়া উঠেছে নাকি? কই, চোখে পড়ে নি তো। কিন্তু একটু পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলুম। ওরে মূর্খ, চূণ নয়, ক্রীম, মুখে মাখবার ক্রীম। কিন্তু ওটা মুছে ফেলাই ভালো নয় কি? একবার মনে হ'ল বলি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। ঐ অবস্থাতেই হারান-দা' বেরুলেন রাস্তায়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

'এসো, পান খাওয়া যা'ক্,' ব'লে তিনি একটা উড়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন।

'আমি তো পান খাই নে।'

'আহা, পান খাও না! ফেমাস্ পান এ দোকানের, এত ভালো পান কলকাতায় আর কোথাও পাবে না। আমি সব সময় এখান থেকেই খাই।'

এখানকার পান ভালো বলেই তিনি খান, না তিনি খান ব'লেই কলকাতায় সব চেয়ে ভালো সেটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। হারান-দা' বড় বড় দু' খিলি পান নিয়ে মুখের মধ্যে এক সঙ্গে পূরে দিলেন, পকেট থেকে বার করলেন জরদার কৌটো; খানিকটা জরদা মুখে ফেলে দিয়ে ফুটপাথ সই ক'রে সজোরে একবার রসটা ছুঁড়ে ফেললেন। আমি সভয়ে ছিটকে সরে দাঁড়ালুম।

'কোন্‌দিকে যাবে?' পরম অমায়িক আত্ম-প্রসন্ন ভাবে তিনি বললেন। 'চলো চৌরঙ্গীর দিকে যাওয়া যাক্—এ-সময়ে—চৌরঙ্গী ইজ্ গ্র্যাণ্ড্। যা-ই বলো, পল্টু, কলকাতায় কিছু দিন থাকলে মফঃস্বলে আর ভালোই লাগে না—কেমন ক'রে মানুষ থাকে তা-ই বুঝি নে। ট্র্যামে যাবে? এসো না হাঁটি—সন্ধ্যেবেলা

হাঁটতে আমার বেশ লাগে, রোজ এ সময়ে আমি অনেকখানি হাঁটি—বেশী তো দূর নয়, ঐ তো কর্পোরেশন ষ্ট্রীট দিয়ে সোজা গিয়ে পড়বো।'

খাওয়া হয় নি. চা, হ'লো না সিনেমা দেখা, এখন এণ্টালি থেকে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত হাঁটবার প্রস্তাবে কেমন যেন বেশী উৎসাহিত বোধ করতে পারলুম না।

'আমি বরং বাড়ীই ফিরি।'

'এখন বাড়ী ফিরবে কী—পাগল! এই তো কলকাতাকে দেখবার সময়। সন্ধ্যেবেলাটা ঘরে ব'সে কাটিয়েই তো বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। খুব বেড়াবে, ভালো ক'রে খাবে—তবে তো? চলো, চলো।'

সারা রাস্তা হারান-দা' অনর্গল কথা বললেন—সব শুনে মনে হ'ল সমস্ত কলকাতার সহরটা তিনিই তৈরী করেছেন, এমন কি সন্ধ্যেবেলার এই দক্ষিণে হাওয়াটাও যেন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। আমি যখন বললুম যে আমাদের বাড়ীতে হাওয়া খেলে মন্দ না, তখন তিনি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি তাঁর সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে গেছি।

পথ যত দীর্ঘই হোক্ এক সময়ে ফুরোয়; আমাদের পথও ফুরোল। হারান-দা' বললেন, 'এসো একটু মার্কেট্‌টা ঘুরে যাই।'

'কিছু কিনবেন?'

'কেনবার জন্যে ভাবনা কি হে—কিনলেই তো হ'লো। দেখো, ঘোরো, বেড়াও—ইচ্ছে হয় কেনো, ইচ্ছে হ'লে কী না কেনা যায়, বলো?'

হারান-দা' আমাকে নিয়ে মার্কেটের গলিতে গলিতে ঘুরলেন, বেড়ালেন, দেখলেন, কিন্তু এটা একটু আশ্চর্য্যই বলতে হবে যে কত রকমের এত জিনিসের মধ্যে একটাও তাঁর কিনতে ইচ্ছে করলো না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের ওজন নিলেন, কার্ডটার দিকে তাকিয়ে হাসিতে গলে পড়লেন।—'দেখো, আরো তু' সের বেড়েছি। বাড়বো না, যা খাওয়া আমাদের বাড়ীতে! একেবারে বেষ্ট্‌ ফুড্‌—ও-রকম কি আর সাধারণ বাঙ্গালীর বাড়ীতে হয়? এক দিন খেয়ো এসে তোমার বৌদি এলে। বাই দি ওয়ে, এখন কিছু খাবে?'

এতখানি হেঁটে ক্ষিদে মন্দ পায় নি, বললুম, 'তা—তা—'

'ওঃ, মার্কেটের খাবার অনায়াসে খেতে পারো। এখানে ভেজাল দেয় কার সাধ্যি! তা কি খাবে? আইস্‌-ক্রীম? স্যাণ্ড্‌-উইচ্‌? ঠিক! ডালমুট খাওয়া যাক্, এসো। খাসা জিনিস ডালমুট! সায়েবরা চায়ের সঙ্গে খুব খায়, জানো তো? আমি তো মার্কেটে এলেই ডালমুট খাই।'

এর পর তিনি এক পয়সার ডালমুট কিনলেন এবং আমাকে অর্দ্ধেকটা দিলেন। গরমের মধ্যে এতখানি হেঁটে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়েছিলো, কী ক'রে ডালমুট চিবোবো আর গিলবো সেটা একটা চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠলো।

'কী, তুমি বুঝি বেশী ভক্ত নও?'

'এই তো খাচ্ছি।' ব'লে তাড়াতাড়ি আমি সেই অপূর্ব্ব সুখাদ্য একটু মুখে দিলুম। বাকিটা চট্ ক'রে লুকিয়ে ফেললুম পকেটে—হারান-দা' দিব্যি বাঁ হাতের তেলো থেকে অল্প অল্প মুখে দিতে দিতে পরমানন্দে মার্কেট্ পর্য্যটন করতে লাগলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। অতি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'হারান-দা, এবার বাড়ী ফিরি।'

'বাড়ী ফিরবে?···হ্যাঁ, চলো। তা বেশ ভালো লাগলো না হেঁটে? ক্লান্ত লাগছে?'

ধাঁ ক'রে ব'লে ফেললুম, 'লাগছে একটু।'

হারান-দা' হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।—'অভ্যেস না থাকলে ও রকম একটু লাগেই। রোজ হাঁটতে হাঁটতে কেমন চমৎকার লাগে, দেখো। আর ভালো লাগছে না বুঝি তোমার, য়্যাঁ? শ্যাল্ উই টেক্ এ ট্যাক্সি?'

বুকের ভিতরটা হঠাৎ একবার লাফ দিয়ে উঠলো। চুপ ক'রে রইলুম, এ অবস্থায় আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকাই সঙ্গত। রাস্তার ওদিকে অপেক্ষমান শূন্য ট্যাক্সির সারির দিকে একবার করুণ দৃষ্টিপাত করলুম, এই যা।

তার পর হারান-দা' বললেন, 'এসো একটু পান খাওয়া যাক্।' ব'লে তাঁর কালো চামড়ার ভারী ব্যাগ বার ক'রে এক পয়সার পান কিনে খেলেন। তার পর

TIGHT BINDING

অন্যমনস্ক ভাবে কলকাতার ও কলকাতায় তাঁর বাড়ীর নানা রকম সুবিধের কথা বলতে বলতে অনেকখানি পথ চ'লে এল্লেন।

হঠাৎ তাঁর কথার মাঝখানে একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললুম, 'হারান-দা, ঐ একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছে।'

'ট্যাক্সি? ও ইয়েস্, শুড্ উই টেক্ ওয়ান্? তা অর্দ্ধেক রাস্তা তো এসেই গেছি। চলো হাঁটাই য়াক্। চমৎকার ক্ষিদে পাবে বাড়ী যেতে যেতে—আর ক্ষিদে পেলে তবে তো খাওয়ার সুখ। আর আমার বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া আমার—হা-হা—বুঝলে তো? খেয়ো এসে এক দিন তোমার বৌদি এলে।'

বলা বাহুল্য, বাকি রাস্তা—আর সে রাস্তা বড় কম নয়—আমার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোয় নি।

য়্যাবিসিনিয়া

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্)

ইটালী আর য়্যাবিসিনিয়া দেশের ঝগড়া আজকাল খবরের কাগজে সব চেয়ে বড় খবর। ইটালী কোথায় তা' যদি ব'লে দিতে হয় সেটা বড় লজ্জার বিষয় হ'বে, এবং সে দেশের কর্ত্তা যে মুসোলিনী সে কথা নতুন ক'রে তোমাদের ব'লে দিতে হ'বে না। আর য়্যাবিসিনিয়া (ইথিওপিয়াও বলা হয়) হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব্বভাগে একটী দেশ, এবং আফ্রিকার দুটী স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে একটী। অপরটী লাইবেরিয়া।

য়্যাবিসিনিয়া বড় পুরোনো দেশ। বাইবেলের মত পুরোনো বইএও এই দেশের কথা পাওয়া যায়, নামটা অবশ্য তখন ছিল কুশ্! এমনও শোনা যায় যে শেবার রাণী (Queen of Sheba) এই দেশেরই মেয়ে ছিলেন, এবং এ দেশের এখনকার রাজারা এই গর্ব্ব ক'রে থাকেন যে বিখ্যাত রাজা সলোমন এবং এই শেবার রাণীর ছেলে মেনেলেকই তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ। শুন্‌লে আমাদের দেশের সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের কথা মনে পড়ে।

ইউরোপীয়দের মধ্যে বোধ হয় ফ্রুমেন্টিয়াস্ নামে একজন পাদ্‌রী প্রথম য়্যাবিসিনিয়ায় যা'ন, এবং কতক লোককে খ্রীষ্টান করেন। সে প্রায় ১৬০০ বছর আগেকার কথা। তার ৩০০ বছর পরে একজন রাজার কথা শোনা যায় যিনি এত ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন যে আরবদেশ পর্য্যন্ত জয় ক'রে নেন। কিন্তু মুসলমানরা প্রবল হ'য়ে য়্যাবিসিনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা শীঘ্রই চূর্ণ ক'রে দেয়। এর পর প্রায় এক হাজার বছর আর এ দেশের খবর কেউ পায় নি, এ দেশটীও অপর কোন দেশের সংস্পর্শে আসে নি'।

য়্যাবিসিনিয়ার সম্রাট্ রাস্ টাফারি

এই হাজার বৎসর পরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'চ্ছে ব্লু-নাইলের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার। আফ্রিকার নীল নদ লম্বায় প্রায় চার হাজার মাইল, পৃথিবীর অধিকাংশ নদীর চেয়েই বড়। সেই নীল নদের উৎপত্তি হ'য়েছে দুটী স্রোত মিলে, একটীর নাম হোয়াইট্-নাইল্, অপরটী হ'ল ব্লু-নাইল্। জেম্‌স্ ব্রুস্ নামে একটী সাহেব ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্লু-নাইলের গোড়া খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গিয়ে য়্যাবিসিনিয়ায় হাজির হ'ন। এ ছাড়া আরও কয়েকজন পর্য্যটক য়্যাবিসিনিয়া গিয়েছেন।

য়্যাবিসিনিয়াতে রাজা বল্‌তে যা' বোঝায় তা' হ'চ্ছে চার জন, তাদের Negus বলে। প্রত্যেকেই প্রায় স্বাধীন ভাবে থাক্‌তেন। তাই দেশটার চার ভাগ,—আম্‌হারা, টাইগ্রে, গোজাম ও শোআ। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে আম্‌হারার রাজাই সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী এবং আর সবাই তাঁকে মেনে চলে। তিনিই রাজা সলোমনের বংশধর ব'লে দাবী করেন। তাঁকে বলা হয় রাজার রাজা (Negusa Negast)।

নাম-করা সম্রাট্‌দের মধ্যে আমরা শুন্‌তে পাই যে থিয়োডোর নামে একজন

আম্‌হারার রাজা শোআর রাজা মেনেলেককে বন্দী ক'রে আনেন। তাঁর বোধ হয় একটু ক্ষমতার অহঙ্কার হ'য়েছিল, কিন্তু তা' বেশীদিন টিঁক্‌ল না। ইংরাজদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া বেধে গিয়ে তাঁকে ম্যাগ্‌ডালাতে হেরে যেতে হয়; ইংরাজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন লর্ড নেপিয়ার—তাঁর একটী মূর্ত্তি কল্‌কাতায় কেল্লার কাছে রেড্‌ রোডের মোড়ে র'য়েছে দেখ্‌তে পা'বে। এই গোলমালের সুযোগে মেনেলেক পালিয়ে গিয়ে দল পাকাতে থাকেন। কিন্তু তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছু সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি, যত দিন না টাইগ্রের পরাক্রান্ত রাজা কাসাই ইটালী দেশের সঙ্গে বিবাদ ক'রে যুদ্ধে মারা পড়েন। মেনেলেক তখন সম্রাট্‌ হ'ন। ঝগড়া বিবাদ চল্‌তেই থাকে, শেষটায় শত্রুরা য়্যাবিসিনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এখন যিনি সম্রাট্‌, উপাধিশুদ্ধ তাঁর নাম রাস্‌ টাফারি। তিনি প্রথমে মেনেলেকের মেয়ে রাণী জদিতুর অভিভাবকস্বরূপ রাজ্যশাসন করতেন, পরে ১৯২৮ সনে তাঁকেই সম্রাট্‌ করা হয়। বয়স তাঁর খুব বেশী নয় এবং তাঁর প্রজাদের মত তাঁর রংও নাকি অত কালো নয়। বোধ হয় সলোমন এবং শেবার বংশধর ব'লে। এঁর সঙ্গেই এবার আবার ইটালীর ঝগড়া লেগেছে।

য়্যাবিসিনিয়ার ধারে ধারেই সব বিদেশী রাজ্য, যেমন ধর—ইটালীর সোমালিল্যাণ্ড্‌, ইংরেজদের সোমালিল্যাণ্ড, এই সব। ইটালী একটা রেল-রাস্তা বার করতে চায়, তা'তে য়্যাবিসিনিয়ার কাছে খানিকটা জায়গা চায়। কিন্তু তা' দিলেই তো আবার ক'দিন বাদে আর একটু জায়গা বিদেশীদের ছাড়তে হ'তে পারে। আসলে এ হ'চ্ছে ঝগড়া বাধাবার ফন্দী। কাজেই ঝগড়া খুব পেকে উঠেছে। মুসোলিনী সৈন্য সাজাচ্ছেন, রাস্‌ টাফারীও জাপান থেকে অস্ত্র কিন্‌ছেন, যুদ্ধে পেছোবেন না ব'লে শাসাচ্ছেন, আবার ইটালীর দেওয়া কোন কোন সর্ত্তে রাজীও আছেন। এই ভাবে চল্‌ছে। এ নিয়ে এত হৈ-হৈ হ'বার আসল কারণ হ'ল এই যে অনেক দিন অর্থাৎ ষোল বছর কোন মারামারি কাটাকাটি না ক'রে ক'রে মানুষ এখন এমন হ'য়েছে যে লড়াইএর নামেই আমোদ পায়।

ইটালীর তুলনায় য়্যাবিসিনিয়া কিছুই নয়। লোক সংখ্যা হ'ল এক কোটী,

কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ কিছু নেই। খানিকটা সভ্যতার আলো ঢুক্‌ছে, এই মাত্র। যুদ্ধে যা'বে তা'ও খালি পায়ে, সঙ্গে নিতে চায় তরোয়াল। লোকের প্রধান কাজ হ'চ্ছে চাষবাস, অর্দ্ধসভ্য জাতের যা' হয়। তবে জমি বেশ উর্ব্বর। কল-কারখানা বিশেষ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য সামান্যই। মোটে একটী রেল-রাস্তা, সেটীকে রাজধানী য়্যাডিস্‌ আবাবা পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। টাকার ব্যবহার আছে বটে, নাম তা'র মারিয়া থেরেসা ডলার, কিন্তু নূনের খণ্ড বা বন্দুকের গুলির বদলেও সহজেই জিনিষপত্র কিন্‌তে পাওয়া যায়। লোকগুলি কতক খ্রীষ্টান, কতক মুসলমান।

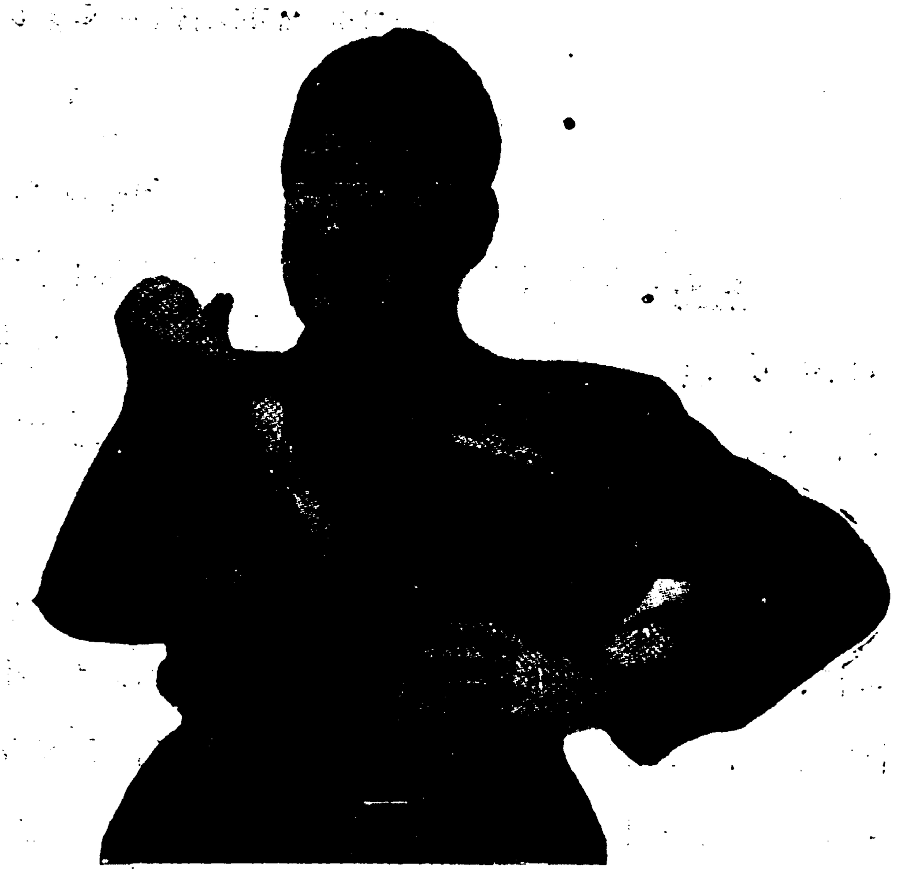

মুসোলিনী বক্তৃতা দিয়ে তাঁর সৈন্যদের উত্তেজিত কর্‌ছেন।

আর ইটালী? সে তো পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাশালী দেশদের মধ্যে অন্যতম। তা'র সঙ্গে যুদ্ধে য়্যাবিসিনিয়ার কি হ'বে তা' বলা বেশী শক্ত নয়। প্রবলে দুর্ব্বলে ঝগড়ার ফল যা' তাই। তবে কিনা লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ ব'লে যে একটা সভার কথা তোমরা কয়েক বার 'রামধনু'তে প'ড়েছ, তার দ্বারা একটা শেষ চেষ্টা হ'চ্ছে, দেখি ঝগড়াটা মেটে কিনা। সম্ভাবনা কিন্তু কম।

"হঠাৎ আজি নাম্‌ল বাদল"

(শ্রীভারতী দেবী)

হঠাৎ আজি নাম্‌ল বাদল গগন ছেয়ে,
মাত্‌ল আবার ঝড়ো হাওয়ায় বৃষ্টি-মেয়ে।
দীঘির জলে পড়্‌ল মেঘের কালো ছায়া,
গগন মাঝে ছড়িয়ে প'ল কাজল কায়া।

শালিখ বসে ভিজ্‌ছে একা ক্ষেতের মাঝে,
পদ্মপাতায় জলদেবীর নূপুর বাজে।
আজকে ভাল লাগছে না আর করতে খেলা,
বৃষ্টিধারা দেখ্‌ছি বসে, অলস বেলা।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৭

অদৃশ্য শত্রু

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে কাশীতে ধনপৎ কাজেরিয়ার নিকট রেজিষ্টার্ড খামে মোড়া একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানা হিন্দিতে লেখা, বানান আর ব্যাকরণ ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া বাংলায় তর্জ্জমা করিলে সেখানা এইরূপ দাঁড়ায় :—

"সর্দ্দারজি,

"তোমার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালা হয়েছে আর তার ফলে যে উদ্দেশ্য আমাদের কল্‌কাতা আসা সে কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'সু'সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা এখনও ঠিক মত বুঝতে পার্‌ছি না। সমস্ত ব্যাপারটাতেই কেমন যেন একটা অজানা রহস্যের ছায়া দেখ্‌ছি। এই নির্জ্জন জায়গায় বসে তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌তেও মাঝে মাঝে গা'টা যেন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ছে, মনে হচ্ছে অলক্ষ্যে আমার পেছন থেকে উঁকি মেরে এক জোড়া চোখ বুঝি গোপন-তথ্য সংগ্রহ কর্‌তে ব্যস্ত।

"আমরা এখানে রওনা হয়ে আস্‌বার আগে তুমি বুক ঠুকে বলেছিলে 'দেখি, কাশীবালা গুণ্ডাই বড়, না কলকাত্তা-বালা বড়!' কথাটায় তখন আমাদের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে এখন যেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি কি ভয়াবহ জীব এরা। এদের কাজের ধারা প্রত্যক্ষ কর্‌লে মনে হয় সেই ছেলেবেলার গল্পে শোনা এক দল 'জিন' বুঝি এদের হুকুম তামিল কর্‌বার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েছে—তারা যেন সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের সমস্ত মৎলবই টের পায়; যে কোন জায়গায়, হাওয়া ফুঁড়ে ইচ্ছামত তারা বার হতে পারে, আবার যখন তখন হাওয়াতেই মিলিয়ে যেতে পারে। কাশীতে নাগোয়ার পথে ঝড়ের মত হঠাৎ উড়ে এসে পঞ্চাশ জন শয়তানের চেলা যখন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তখন আশ্চর্য্য আমরা

যতই হই না কেন, তারা যে আমাদেরই মত রক্তমাংসের জীব অন্ততঃ সেটা অস্বীকার কর্‌তে পারি নি। কিন্তু অশনি বাবুদের বাড়ী থেকে সোনার হরিণ লুটে আন্‌বার পর যারা পদে পদে আমাদের চোখের সাম্‌নে নানা রকম ধাঁধার সৃষ্টি করে যাচ্ছে তারা বাস্তবিকই মানুষ না অন্য কোন অশরীরী জীব তা নিয়ে আমাদের মধ্যে নিয়তই আলোচনা চল্‌ছে। আমার এ চিঠিখানা আগাগোড়া পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন আমি এ কথা বল্‌ছি।

"অশনি বাবুদের বাড়ীর প্রায় সবাই রাত্তিরের 'শো'তে বায়োস্কোপ্ দেখ্‌তে যাবে খবর পেয়ে সেদিনই তোমার উপদেশ মত আমরা আমাদের বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেল্লাম। গুর্খা দরওয়ানটার পেটে ওষুধ পড়্‌তে সে এম্‌নি অকাতরে ঘুমাতে সুরু করে দিল যে বিহার বা কোয়েটার মত বড় রকমের একটা ভূমিকম্প না হলে সে যে তার চারপায়া ছেড়ে উঠ্‌বে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। টুক্ করে তার কোমর থেকে কুক্‌রিটি তুলে নিয়ে কেষ্ট খাটিয়ার সঙ্গেই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চাদর চাপা দিয়ে রাখ্‌ল—যেন নিমতলায় বয়ে নিয়ে যেতেই যা বাকী। কিন্তু সর্দ্দারটি ওদের যে বিশেষ ঝানু তা স্বীকার কর্‌তেই হবে। আলমারীর গায়ে ছেনির ঠকাঠক্ সুরু হতেই তার তন্দ্রা ছুটে গেল, ধড়মড়িয়ে ইজি-চেয়ারের ওপর উঠে বস্‌তে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আমি তার গলা টিপে ধর্‌লাম, আর সাম্‌নে থেকে কেষ্ট আর ফুকন সিং ভোজালী উঁচিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখলে। মনে মনে একটু খুসী হলাম এই ভেবে যে, অতি সহজেই সব গোল চুকে গেল, মারামারি রক্তপাতের দরকার হল না। হঠাৎ কিন্তু এক তালার দিকে নজর পড়্‌তেই আমার চক্ষুস্থির! ছিপ্‌ছিপে, ছায়ার মত কালো একটা মূর্ত্তি মাঝে মাঝে টর্চ্চ ফেলে আনাচে-কানাচে উঁকি মেরে কি দেখ্‌ছে। নাগোয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠ্‌ল: বিদেশে ঝড়ের-মত-আসা সে দলটা সেবার অন্ততঃ আমাদের প্রাণটা রেহাই দিয়েছিল, আজ নিজের দেশে মুঠোর মধ্যে পেয়ে সবাইকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে রেখে গেলেই বা প্রতিরোধ কর্‌বার কে আছে? সে স্থানটা আবার এম্‌নি যে সন্ধ্যার পর বাড়ীর মধ্যে ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেলেও প্রতিবেশীরা যে তার কোন সাড়াশব্দ পাবে সে আশা নাই। কি করে এরা আমাদের সমস্ত

মংলক আগে থেকে টের পেয়ে ঠিক সময় মত এসে উপস্থিত হয় তা এক ভগবানই জানেন। তাড়াতাড়ি কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম ব্যাপারটা কি দেখ্‌বার জন্য; আর নিজে খগেনের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে, পাশে বাক্স-প্যাঁট্‌রা রাখ্‌বার ছোট্ট একটা যে গুদাম ছিল, তারই মধ্যে ওকে পূরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলাম। ততক্ষণে কেষ্ট ফিরে এসেছে, বল্লে, সে আর ফুকন সিং সমস্ত বাড়ীর আশপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, কোথাও কোন টর্চ্চওয়ালা শত্রুর সন্ধান মেলেনি। আমাদের এদিক্‌কার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর অপেক্ষা কর্‌বার কোন দরকার ছিল না, সবাই তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে মোটরে চেপে বস্‌লাম। আস্‌বার সময় মোটরটা চালিয়ে এনেছিল ফুকন সিং, তাকে বলে দিলাম ধারে কাছে শত্রু থাক্ বা না থাক্, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বড়বাজারের 'বাসায়' গিয়ে পৌঁছুতে হবে। ওপরের বন্ধ গুদাম থেকে খগেন তখনও চীৎকার করে মর্‌ছিল, তার গলার ক্ষীণ, অস্পষ্ট আওয়াজ মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম।

"বিপদের সময়ই বিপদ্ বুঝি বেশী করে আসে; ফুকন সিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে গেল, গাড়ী কিন্তু ষ্টার্ট নিতে চাইল না। প্রাণপণ চেষ্টায় যতই সে হাতলটা ঘোরায়, এঞ্জিন ততই ভোঁস্ ভোঁস্ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে পরক্ষণেই আবার থেমে যায়। ভেতরে বসে আমরা তখন ক'টি প্রাণী অস্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্‌ছি, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন পেছন থেকে বিপুল এক ঝাঁকুনিতে সমস্ত গাড়ীখানা কাঁপিয়ে দিল।

"'কে?' বলে হাতল-হাতে সন্ত্রস্ত ফুকন সিং এগিয়ে এল, আমরাও শশব্যস্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লাম। সঙ্গেসঙ্গেই অনুসন্ধানের সাড়া পড়ে গেল, গাড়ীর চার ধার নানান্ দিক্ থেকে নানান্ ভাবে ঘুরে ফিরে সবাই দেখ্‌তে সুরু কর্‌লাম, কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হবে, মানুষ তো দূরের কথা, একটা অচেতন বস্তুও কা'রো নজরে পড়্‌ল না। প্রত্যেকের মুখেই তখন চাঞ্চল্যের স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে—কে এ অদৃশ্য শত্রু, ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থেকে লড়্‌বার চেষ্টায় আছে। এতগুলো লোক যখন কাঁপুনি টের পেয়েছে তখন এ আর কিছু মনের বিকার নয়! আমাদের সঙ্গে ব্যঙ্গ করে নিজের অস্তিত্বটুকু জানিয়ে দিয়ে এ কে

হাওয়ায় মিশে গেল—ভবিষ্যতে ভীষণতর একটা কিছু কর্‌বে তারই পূর্ব্ব আভাস জানিয়ে দিয়ে?

"সে রাত্রে সবাই যে বেশ উদ্বিগ্নমনেই 'বাসায়' ফিরে এলাম তা বোধ করি না বল্লেও বুঝ্‌তে পার্‌ছ। পর দিন সারাক্ষণ শঙ্কিত মনেই কাটালাম; দিনের বেলাটা ভালোয়-ভালোয়ই কাট্‌ল বটে, কিন্তু রাত্রে যে ব্যাপারটা ঘট্‌ল তা

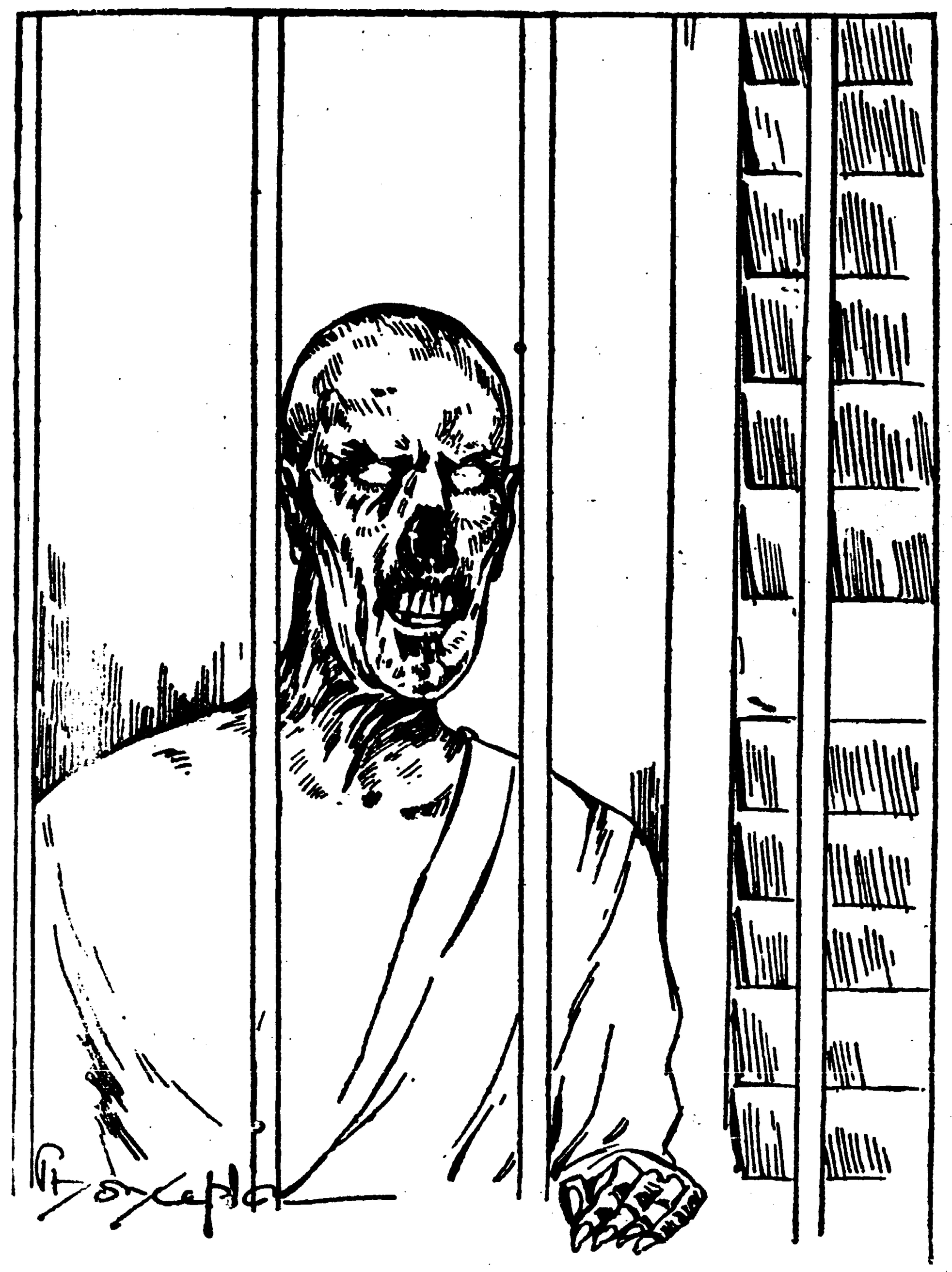

একাধারে বীভৎস, রহস্যময়, অচিন্তনীয়! রাত তখন বোধ করি একটা হবে; সমস্ত কলকাতা সহর ঘুমন্ত দৈত্যের মত নিঃসাড়ে পড়ে আছে, শুধু আমরা কয়টি প্রাণী তেতালার একটা কুঠরীতে মোমবাতি জ্বেলে গোপনপরামর্শে ব্যস্ত। ঘরের দরজা বন্ধ, শুধু বারান্দার দিকে বাতাস চলাচলের জন্য লোহার শিক দেওয়া একটা জানালা খোলা রয়েছে। পরদিনই আমাদের কাশী রওনা হয়ে পড়া উচিত না কি কল্‌কাতায় আরও কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই কর্ত্তব্য, কাশী যেতে হলে ঠিক সোজা রেলের পথে না গিয়ে কোন্ পথে গেলে ভাল হয়—এই সব নানা বিষয়ে আস্তে আস্তে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় কেষ্ট হঠাৎ "বাবাগো!" বলে আমার হাত চেপে ধর্‌ল। চম্‌কে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাইতেই জানালার ওধারে যা দেখ্‌লাম্ তা ভাব্‌তে এখনও আমার গা শির্‌শির করে, শরীরের প্রত্যেকটি লোম

মংলক আগে থেকে টের পেয়ে ঠিক সময় মত এসে উপস্থিত হয় তা এক ভগবান্‌ই জানেন। তাড়াতাড়ি কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম ব্যাপারটা কি দেখ্‌বার জন্য; আর নিজে খগেনের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে, পাশে বাক্স-প্যাট্‌রা রাখ্‌বার ছোট্ট একটা যে গুদাম ছিল, তারই মধ্যে ওকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলাম। ততক্ষণে কেষ্ট ফিরে এসেছে, বল্লে, সে আর ফুকন সিং সমস্ত বাড়ীর আশপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, কোথাও কোন টর্চ্চওয়ালা শত্রুর সন্ধান মেলেনি। আমাদের এদিক্‌কার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর অপেক্ষা কর্‌বার কোন দরকার ছিল না, সবাই তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে মোটরে চেপে বস্‌লাম। আস্‌বার সময় মোটরটা চালিয়ে এনেছিল ফুকন সিং, তাকে বলে দিলাম ধারে কাছে শত্রু থাক্ বা না থাক্, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বড়বাজারের 'বাসায়' গিয়ে পৌঁছুতে হবে। ওপরে বন্ধ গুদাম থেকে খগেন তখনও চীৎকার করে মর্‌ছিল, তার গলার ক্ষীণ, অস্পষ্ট আওয়াজ মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম।

"বিপদের সময়ই বিপদ্ বুঝি বেশী করে আসে; ফুকন সিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে গেল, গাড়ী কিন্তু ষ্টার্ট নিতে চাইল না। প্রাণপণ চেষ্টায় যতই সে হাতলটা ঘোরায়, এঞ্জিন ততই ভোঁস্ ভোঁস্ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে পরক্ষণেই আবার থেমে যায়। ভেতরে বসে আমরা তখন ক'টি প্রাণী অস্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্‌ছি, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন পেছন থেকে বিপুল এক ঝাঁকুনিতে সমস্ত গাড়ীখানা কাঁপিয়ে দিল।

"'কে?' বলে হাতল-হাতে সন্ত্রস্ত ফুকন সিং এগিয়ে এল, আমরাও শশব্যস্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লাম। সঙ্গেসঙ্গেই অনুসন্ধানের সাড়া পড়ে গেল, গাড়ীর চার ধার নানান্ দিক্ থেকে নানান্ ভাবে ঘুরে ফিরে সবাই দেখ্‌তে সুরু কর্‌লাম, কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হবে, মানুষ তো দূরের কথা, একটা অচেতন বস্তুও কা'রো নজরে পড়্‌ল না। প্রত্যেকের মুখেই তখন চাঞ্চল্যের স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে—কে এ অদৃশ্য শত্রু, ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থেকে লড়্‌বার চেষ্টায় আছে। এতগুলো লোক যখন কাঁপুনি টের পেয়েছে তখন এ আর কিছু মনের বিকার নয়! আমাদের সঙ্গে ব্যঙ্গ করে নিজের অস্তিত্বটুকু জানিয়ে দিয়ে এ কে

হাওয়ায় মিশে গেল—ভবিষ্যতে ভীষণতর একটা কিছু কর্‌বে তারই পূর্ব্ব আভাস জানিয়ে দিয়ে?

"সে রাত্রে সবাই যে বেশ উদ্বিগ্নমনেই 'বাসায়' ফিরে এলাম তা বোধ করি না বল্লেও বুঝ্‌তে পার্‌ছ। পর দিন সারাক্ষণ শঙ্কিত মনেই কাটালাম; দিনের বেলাটা ভালোয়-ভালোয়ই কাট্‌ল বটে, কিন্তু রাত্রে যে ব্যাপারটা ঘট্‌ল তা

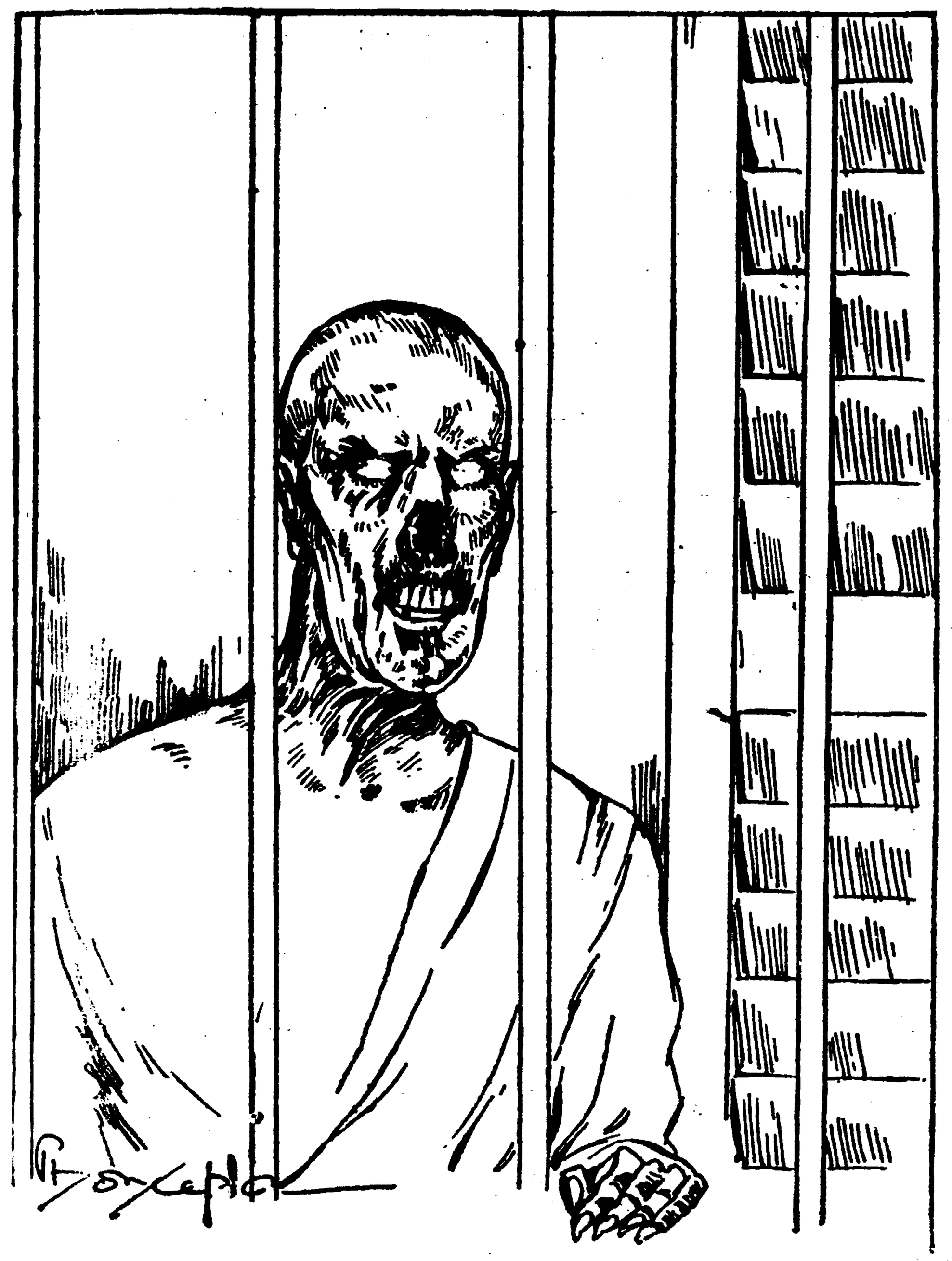

একাধারে বীভৎস, রহস্যময়, অচিন্তনীয়! রাত তখন বোধ করি একটা হবে; সমস্ত কল-কাতা সহর ঘুমন্ত দৈত্যের মত নিঃসাড়ে পড়ে আছে, শুধু আমরা কয়টি প্রাণী তেতালার একটা কুঠুরীতে মোমবাতি জ্বেলে গোপনপরামর্শে ব্যস্ত। ঘরের দরজা বন্ধ, শুধু বারান্দার দিকে বাতাস চলাচলের জন্য লোহার শিক দেওয়া একটা জানালা খোলা রয়েছে। পর-দিনই আমাদের কাশী রওনা হয়ে পড়া উচিত না কি কল্-কাতায় আরও কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই কর্ত্তব্য, কাশী যেতে হলে ঠিক সোজা রেলের পথে না গিয়ে কোন্ পথে গেলে ভাল হয়—এই সব নানা বিষয়ে আস্তে আস্তে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় কেষ্ট হঠাৎ "বাবাগো!" বলে আমার হাত চেপে ধর্‌ল। চম্‌কে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাইতেই জানালার ওধারে যা দেখ্‌লাম্ তা ভাব্‌তে এখনও আমার গা শির্‌শির করে, শরীরের প্রত্যেকটি লোম

খাড়া হয়ে ওঠে। যে প্রাণীটি আমাদেরই মাত্র কয়েক হাত দূরে শিকের পেছনে দাঁড়িয়ে, কি বলে তার বর্ণনা দেব? শ্মশানের চুল্লী থেকে আধপোড়া অবস্থায় সে যেন উঠে এসেছে। নাকটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে—চিহ্ন মাত্র নাই—আছে কেবল তারই জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত। শুধু নাক নয়, ওপরের চোয়ালেরও অনেকখানি পোড়া; তার ফলে মাড়িশুদ্ধ দাঁতগুলো বার হয়ে পড়েছে—উঁচু নীচু অসমান এক সারি দাঁত। চোখের জায়গায় ছুটো গভীর খোঁড়ল দেখা গেল বটে, কিন্তু তার ভেতর বাস্তবিকই কোন তারা আছে কিনা নজরে এল না। ঘোড়ার মত লম্বাটে মুখের গাল ছুটো তোবড়ান, হাড় বেরিয়ে আসছে, আর সমস্ত মুখখানা আগুনে পুড়ে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

"পলকের জন্য আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, এম্‌নি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমরা যে তার শরীর বলে কোন বস্তু আছে কিনা তাও লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ দেখি জীবটার পেট ফুঁড়ে কেমন একটা অদ্ভুত আলোর রেখা ফুটে বার হয়ে এল, উগ্র, অতি উগ্র সে আলো, সাধারণ মানুষের চোখে সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি সকলেই এক সঙ্গে চোখ বুঁজে ফেল্লাম, আর তার পরক্ষণেই শুন্‌তে পেলাম হা হা করে বিকট একটা অট্টহাসি। চোখ খুলে দেখি সেই মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা জানালা ছেড়ে থপ্ থপ্ করতে করতে বারান্দার পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। কী যে আমাদের কর্ত্তব্য কিছুই ঠাহর কর্‌তে না পেরে আমরা ক'টি প্রাণী শুধু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌লাম। জানি, তুমি আমাদের ভীরু অপবাদ দেবে, কিন্তু তবুও স্বীকার না করে উপায় নাই যে দরজা খুল্‌তে আমাদের ভরসা হ'ল না, কেননা বারান্দার পশ্চিম দিক্ দিয়ে কারোই কোন দিকে বার হবার জো নাই; ওটা নির্ঘাৎ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"আট দশ মিনিট কেটে গেল; বাইরে কোন সাড়াশব্দ নাই দেখে আমাদের সাহসও যেন একটু একটু করে ফিরে এল। হাজার হোক্, দলে তো আমরা একেবারে পাৎলা নই! নিঃশব্দে দরজা খুলে, ডান হাতের সবল মুষ্টিতে ছোরা ধরে এক সঙ্গে সবাই বেরিয়ে এলাম। বারান্দা ধরে পশ্চিমের দিকে কয়েক পা এগুতেই তো আমাদের চক্ষু স্থির! কোথায় অন্তর্হিত হল সে মূর্ত্তিটা? বারান্দার

দক্ষিণে যে ঘরটা সেটা বার থেকে তালা বন্ধ, ভিতরে পিঁপড়া পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পারে না; পুবদিক্ আমরা আগ্‌লে বসে আছি; উত্তর আর পশ্চিম দিকে ঘোরান রেলিং থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে রেখেছে। রেলিংএর নীচেই দেওয়াল একতালা অবধি নেমে গেছে—মসৃণ দেওয়াল—তার গায়ে কোন অবলম্বন নাই। তেতালা থেকে লাফ দিয়ে কেউ নীচে পড়্‌লে যতই ওস্তাদ হোক্ না কেন সে, মৃত্যু অনিবার্য্য। আর তা ছাড়া সেক্ষেত্রে শব্দও তো একটা হ'ত; কারো কানে এতটুকু শব্দও তো আসে নি।

"আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে ভেবে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তোমার পত্রোত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে বসে রইলাম। ইতি—রামদয়াল"

(ক্রমশঃ)

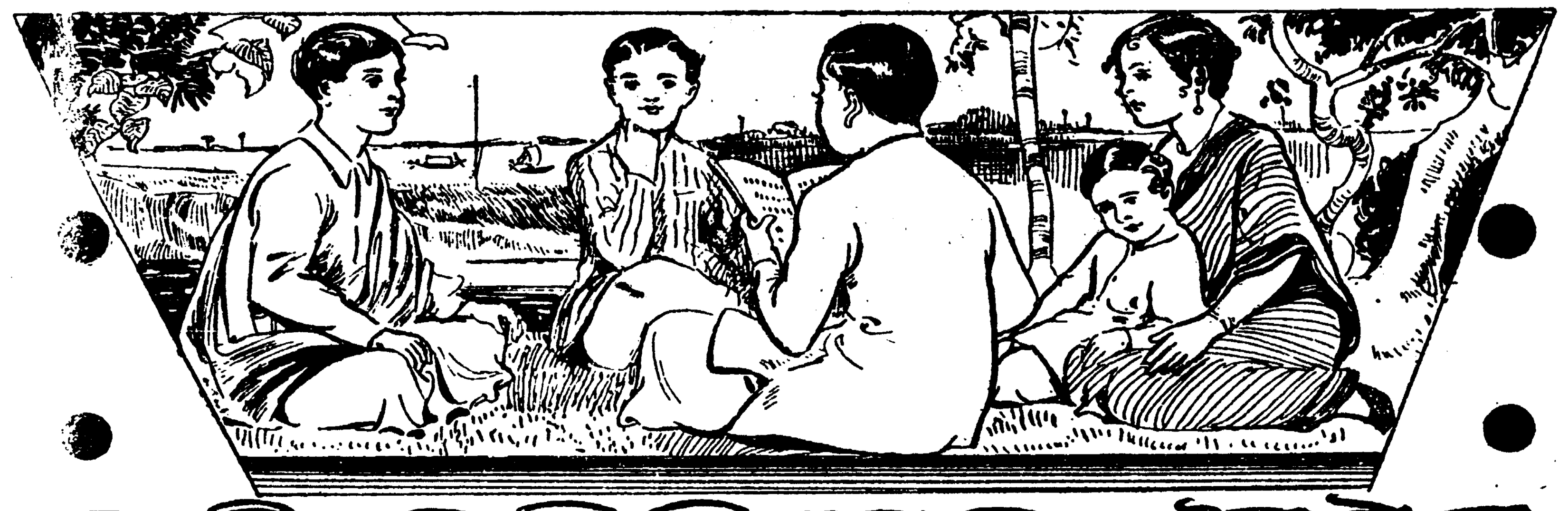

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাদল রাণী

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলবর্ম্মণ)

আকাশে নাচিছে ওই বাদল-বালা,
সুরু হল বরষার কাঁদন-পালা।
ঝুর ঝুর ঝরে জল,
অবিরাম অবিরল,

ভরে যায় নদ-নদী পুকুর নালা ;
নাচিছে নূপুর পায়ে বাদল-বালা।

আকাশে লেগেছে ওই মেঘের মেলা ;
সাগর-বুকেতে যেন চলেছে ভেলা।
উহাদের' পরে চ'ড়ে,
পাল তুলে হাল ধরে,
বাদল-বালক সবে করিছে খেলা।
আকাশে লেগেছে আজ মেঘের মেলা।

বাদল-রাণীর কাজ সলিল ঢালা।
উজাড় করিয়া দেছে শোভার ডালা ;
কামিনী কদম তুলে,
কেয়া ও কেতকী ফুলে
ভরিছে ফুলের সাজি, গাঁথিছে মালা ;
খুশীতে ভরিয়া গেছে ধরণী-বালা।

চিঠি-পত্র

গত মাসে "অমল-স্মৃতিপদক" নামে যে পুরস্কারের কথা লেখা হইয়াছে উহা "অক্ষয়-স্মৃতিপদক" হইবে। —রাঃ সঃ

"গত মাসে প্রকাশিত কবি জসীমউদ্দীন লিখিত "আমার বাড়ী" কবিতাটির কতকগুলি লাইন আমি অনেক দিন যাবৎ গ্রাম্য চাষাদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি, কবির উহা উল্লেখ করা উচিত ছিল।" —শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার সেন রায়

কবি জসীম উদ্দীন উত্তরে জানাইয়াছেন যে তিনি নানা গ্রাম্য ছড়া অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন ; উহাদের ভাষাও যতটা সম্ভব মূল অনুযায়ী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শীঘ্রই সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এ কবিতাটি তারই একটি। বইএর ভূমিকায় উহার উল্লেখ করিবেন ভাবিয়া তিনি আর উহা লিখিয়া দেন নাই। যাহা হউক, তিনি তাঁর ত্রুটী স্বীকার করিতেছেন। —রাঃ সঃ

ছোটদের চিত্রশালা

সাত ঘরোয়া গুহা

গয়া হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে বরাবর পাহাড়। সেখানে অশোকের তৈরী কয়েকটি গুহা আছে, এটি তারই একটি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রানিট্ পাথর কাটিয়া এগুলি নির্ম্মিত। গুহার দেওয়াল এত মসৃণ যে দু' হাজার বছরের বেশী পুরাতন হইলেও, এখনও উহাতে আরসীর মত মুখ দেখা যায়। গুহার দরজার উপর কারুকার্য্যটিও চমৎকার। (আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

শিলঙের একটি দৃশ্য
(আলোকচিত্রগ্রহীতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

সন্দেশ

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রলাল রায় আর নাই। দুরন্ত টাইফয়েড রোগে অকালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কবি এবং গল্প-লেখক হিসাবে হেমেন্দ্রলালের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—শিশুসাহিত্য-রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা "গল্পের মায়াপুরী"

প্রভৃতি বই তোমরা অনেকেই বোধ হয় পড়িয়াছ। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল।

* * *

গত ৬ই আগষ্ট মহাপুরুষ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী গিয়াছে। এমন এক দিন ছিল যেদিন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পরকে চিনিত না, তারা যে এক ভারতীয় মহা জাতিরই অংশ সে কথা বুঝিত না। সে কথা প্রথম বুঝাইয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর তিরোধানের সময় বাংলার একজন মনীষী যে কথা বলিয়াছিলেন, আমরাও আজ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিব—"আমাদিগকে আজ সেই মহাপুরুষের পদানুসরণ করিতে হইবে, বলিতে হইবে তোমার দেশপ্রেম আমাদিগকে দাও, তোমার কর্ম্মশক্তি আমাদিগকে দাও, আমরা দেশমাতৃকাকে যেন তোমার মত ভালবাসিতে পারি।"

"বিষে বিষক্ষয়" বলিয়া একটা কথা আছে। ডাক্তার ডেভিড্ মাখ্‌ট্ নামে বালটিমোরের এক ডাক্তার তার প্রমাণ দিতেছেন ক্যানসার রোগে কেউটে সাপের বিষ ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া। এই ইন্‌জেক্‌শনে রোগীর যন্ত্রণা নাকি আশ্চর্য্য রকম কমিয়া যায়।

* * *

আমাদের দেশের জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তির কথা সকলেই জানে—সম্প্রতি নিউইয়র্কে এই রকম আর একটি "তর্কপঞ্চাননের" পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—তাঁর নাম বার্ণাড্ জুকল। তিনি ১১১৭ পৃষ্ঠার একটা গোটা টেলিফোন ডিরেক্টরী মুখস্থ বলিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন।

* * *

বৈদ্যুতিক রশ্মির সাহায্যে আজকাল অষ্ট্রেলিয়ায় একই ক্ষেতে বছরে তিন বার করিয়া গম উৎপন্ন করা হইতেছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বাদাম, আম, কমলা, ডালিম, ফুটি, তাল।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

সুমিত্রা, সুলেখা ও সুজাতা (রঙ্গপুর); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী প্রভৃতি (জামালপুর); দিলীপকুমার রায় (কলিকাতা); ডলি, তুলতুল, অস্তকণা (ভবানীপুর); অমিতাভ, স্নেহমুকুল, প্রীতিকুসুম রায় প্রভৃতি (কলিকাতা); সুজাতা, ছোট্টচিত্রা, শিবু প্রভৃতি (কলিকাতা); দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ

(কলিকাতা); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); বিদ্যুৎ, অমু ও উমা (ছাপরা); নিখিল চৌধুরী (জলপাইগুড়ি); লতিকা, অলক, তমসা প্রভৃতি (রাজসাহী); অবনী, সুধীর ও অধীরচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি); জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); উমা, বিমল, অমল মুস্তফী প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); আভা, গোপাল, অরুণা (হাসনাবাদ); মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (মাথাভাঙ্গা); সুশীল, মাণিক, আশা প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); ছবিরন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মাথাভাঙ্গা); রণেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); শোভারাণী ও সত্যপ্রসাদ (জামসেদপুর); পবিত্রকুমার ও দীপ্তিরাণী রায় (জলপাইগুড়ি); গদা, চিনি, শান্তি (জলপাইগুড়ি); খোকা, ছায়া ও সাধনা (জলপাইগুড়ি); সুখু ও নারায়ণ (জলপাইগুড়ি); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু প্রভৃতি (চুঁচুড়া); পূর্ণেন্দুকুমার দাশ (হবিগঞ্জ); সাধনা ঘোষ (যশোহর); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); অমিয়প্রভা চৌধুরী, রেণু, অজিত প্রভৃতি (কিশোরগঞ্জ); নির্ম্মলকুমার দাস (ভবানীপুর); সত্যচরণ দত্ত (ভবানীপুর); রামপ্রসাদ সিং ও হিন্দুস্থানী (বেহালা); রামেন্দু দাশগুপ্ত ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); পুণ্যব্রত, পূর্ণিমা ও কটন (ধুবড়ী); সোনু, মোহন, বুড়ী প্রভৃতি (কলিকাতা); কিশোর সমিতির সভ্যবৃন্দ (চন্দনীমহল); বাণীমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); প্রতিভা, মনোরমা ও গৌরী দেবী (ভবানীপুর); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী, সুষমা, সবিতা প্রভৃতি (মালদহ); ছবিরাণী রায় (নিউ দিল্লী); অনিমেষচন্দ্র দাশগুপ্ত (কুমিল্লা); সুমুখনাথ মিত্র (দিনাজপুর); টুনকু, মণ্টু, রমা প্রভৃতি (চাইবাসা); প্রশান্তকুমার নিয়োগী (সন্তোষ); রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর), রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির সভ্যবৃন্দ (রেঙ্গুন); অনিমা রায় (সিন্দিয়াঘাট); মনীষা সেন, বড়দা', মেজদা' প্রভৃতি (গৌহাটী); অমিয়া নন্দী (নাড়াইল); তউজিলান বেগম (দিনাজপুর); যূথিকসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); জ্যোৎস্না দেবী, মুকুল ও গোপাল (রাজাপুর); এম্, ই, ক্লাসের ছাত্রীবৃন্দ (পূর্ণিয়া); অরুণকুমার মজুমদার (চাইবাসা); স্বপন ও সবিতা (রেঙ্গুন); রঙ্গপুর জিলা স্কুলের Class VII A'র ছাত্রবৃন্দ (রঙ্গপুর) মেমিও বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মেমিও); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); তরেন, পলি, ডলি প্রভৃতি (সিমলা); শিমুলিয়া এম্, ই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (দেবীসহর); তুলু বাবু ও কমলা দেবী (করকেন্দ কোলিয়ারী); ব্যোমকেশ রাহা (চট্টগ্রাম); লেখা গুপ্ত, অসীম, অসিত প্রভৃতি (কলিকাতা); ভবানীপ্রসাদ, তারক প্রভৃতি (বড়া, হুগলী); রেণু ও অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরৈল); নবকুমার, সুধীর, নন্দ প্রভৃতি (কালনা); অরুণকুমার গোস্বামী, নীরদ, অশ্বিনী প্রভৃতি (বাণীগ্রাম); পারুল গুহ (কলিকাতা); অমল, খোকা, কালিদাস (মালদহ); মাথরুন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (মাথরুন); বাণী, কিকি, খোকা প্রভৃতি (চাইবাসা); মনোরঞ্জন,

মণীন্দ্র, চারু প্রভৃতি (কোধলা) ; পাচুগোপাল ও কৃষ্ণদাস সরকার (নওপাড়া—শ্যামনগর) ; বলরাম গুপ্ত, সত্যেন্দ্র, অমরেন্দ্র প্রভৃতি (পউরদিয়া) ; রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির সভ্যবৃন্দ (হবিগঞ্জ) , মাখনচন্দ্র বাগচী, অজয়, দাদাবাবু (লক্ষ্মণপুর) ; অক্ষয় বিশ্বাস ও শান্তিলতা মিত্র (ভবানীপুর) ; ভূপেন্দ্র বসু ও বিশু (ঢাকা) ; কেরামউদ্দীন আহ্‌মদ (যশোহর) ; অরুণকুমার গোস্বামী, নীরদ, অশ্বিনী প্রভৃতি (বাণীগ্রাম) ;

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে :—

শোভা, সবিতা, সুনীল প্রভৃতি (মালদহ) ; রবীন্দ্রনাথ, অমিয়, পুলিন প্রভৃতি (দিনাজপুর) ; নৃপেন্দ্র, মণীন্দ্র ও নমিতা সেন রায় (কামারজানি) ; কল্যাণী রায় (শান্তিনিকেতন) ; সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাঁতিহাল) ; বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর) ; জয়ন্তী, অনিমা, অলকা প্রভৃতি (পিয়াপন) ; মীরা ও শান্তি গাঙ্গুলী (মেমিও) ; তড়িৎ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু, শীলা প্রভৃতি (ভবানীপুর) ; সত্যনারায়ণ সিংহ (সিরাজগঞ্জ) ; সরস্বতী পুস্তকাগারের সভ্যবৃন্দ (শুভগ্রাম, যশোহর) ; শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি, বুলি, ময়না (জেমসেদপুর) ; প্রতিমা দেবী (কিশোরগঞ্জ) ; অরুণ, বিনয়, নটু প্রভৃতি (ভবানীপুর) ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী) ; আর্য্যকুমার দত্ত (মজঃফরপুর) ; দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর) ; শিবানী ও কল্যাণী সরকার (ডিব্রুগড়) ; বিমলেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস (কালীঘাট) ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর) ।

ইহা ছাড়া আংশিক উত্তর অনেকে দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। অনেকে গ্রাহক-নম্বর না দেওয়ায় তাঁহাদের (উত্তর শুদ্ধ হইলেও) নাম বাহির করা হইল না।

নূতন ধাঁধা

আমাদের গ্রামে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে মাটীর তলায় একটা সিন্ধুকে কয়েকখানা পুঁথি পাওয়া গেছে; তার একটার মধ্যে অনেক গল্প—কিন্তু পুঁথিটা সাঙ্কেতিক ভাবে লেখা। তোমরা সে লেখা পড়তে পারলে গল্পগুলির আস্বাদ পেতে পার—একটু নমুনা দিচ্ছি, চেষ্টা ক'রে দেখ তো—

একটা হ্রদ ভারতবর্ষের একজন বড় রাজ-জঙ্গলে ভগিনীকে লইয়া যাওয়ায় এক জাতের বোয়াল মাছ এক পাতা উঁচু-নীচু সাহায্যে একটা তরকারী আক্রমণ করেন। তার পর সে এক মাছের রাজা গাছের গুঁড়ি। সেই হ্রদ একেবারে বাঁশের সঙ্গে জল পরিত্যাগ করে। পটু যা ঘোড়া। মহানন্দে পত্রসহজোরে সকলের প্রতি-ঘুরপাক।

(কেবল মাত্র নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হইবে।)

জাপানী মেয়ে

৮ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪২ { ৯ম সংখ্যা

ছিন্ন মেঘে করিল ভয়
ঐ যে ঝড় আসে।
মুকুলগুলি জাগেনা ভয়,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল শাখে জীর্ণ পাতা
মনেতে ভাবিছে,—
ঝড় যে তার মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রতুল গুপ্তের অটোগ্রাফ হইতে

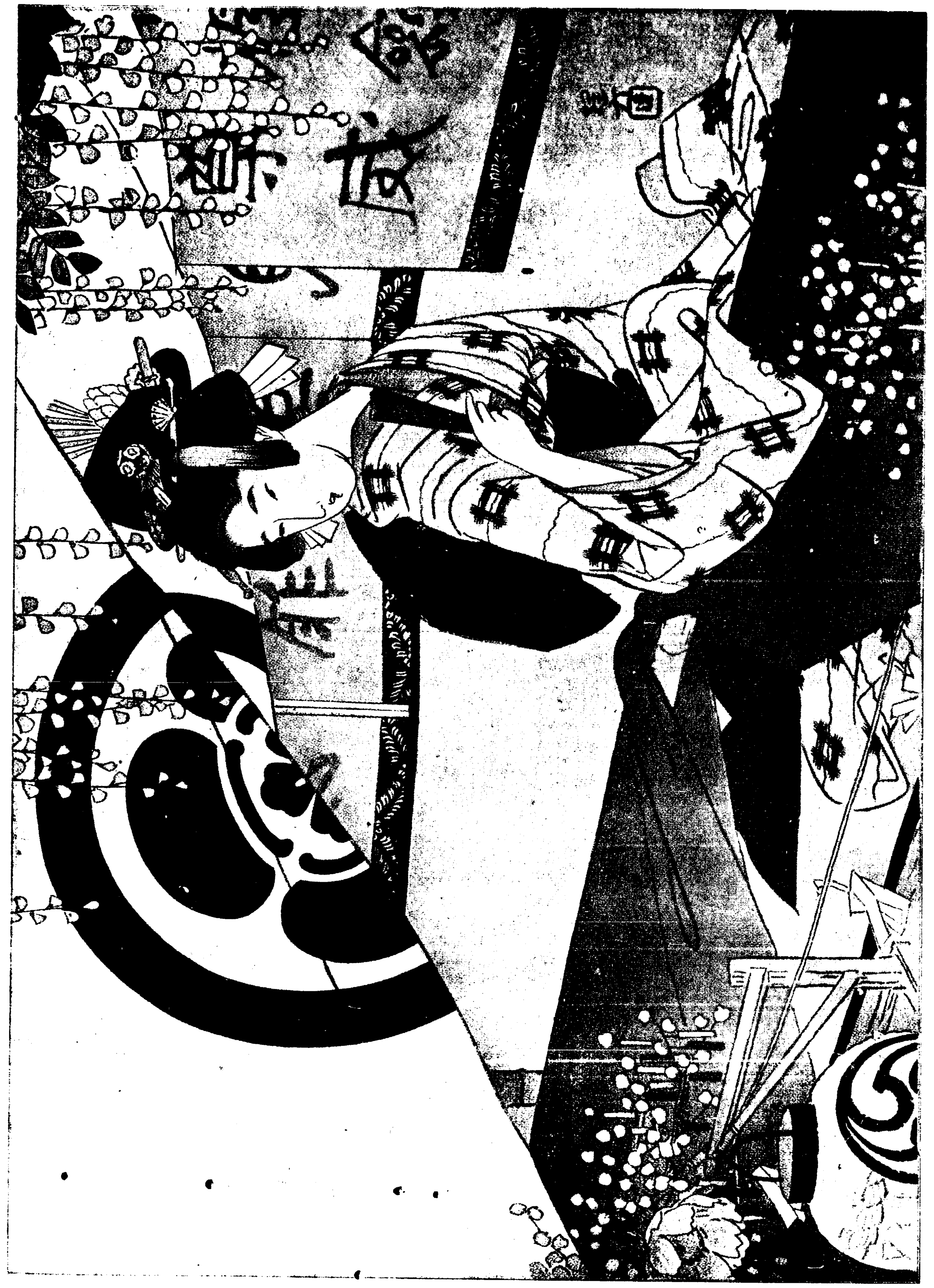

জাপানী মেয়ে

৯ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪২ { ৯ম সংখ্যা

ছিন্ন মেঘে করিয়া ভর
ঐ যে ঝড় আসে।
মুকুলগুলি জানেনা ডর,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল শাখে জীর্ণ পাতা
মরণে পায় ভয়,—
ঝড় যে তার মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রতুল গুপ্তের অটোগ্রাফ হইতে

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

পূজার আদর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

তোরাই ধরার আনন্দ যে,
তোরাই নয়নমণি রে,
নিত্য তোরা, বিত্ত তোরা,
সজীব সোনার খনি রে।
অমৃত যে বিলাস তোরা,
গড়িস নূতন বসুন্ধরা,
লক্ষ পাখীর গিট্‌কারী দেয়
তোদের জয়ধ্বনি রে।

তোদের লাগিই দেব-দেবীরা
আসে নীরস ধরাতে,
হর্ষে শরৎ-লক্ষ্মী আসে
ফুলের পোষাক পরাতে।
গোপাল তোরা, তোদের তরে
উৎসব সব ঘরে ঘরে,
তোদের তরেই থরে থরে
রয় ক্ষীর ও সর ননী রে।

দেখা জিনিস দেখ্‌তে মাতা
আস্‌তো না ত' বারম্বার,
ভালবাসেন দেখ্‌তে তোদের,
শুন্‌তে তোদের সুর বাহার।

তোদের সুখ আর তোদের হাসি
ফুলের মত, হয় না বাসি,
তোদের ভোজেই দশভুজার
পূজা চিরন্তনী রে।

অথ শ্রীভিক্ষুক-দর্শন

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

আসামের বিখ্যাত কাঠের ব্যবসাদার বর্দ্ধন এণ্ড্ বর্দ্ধন কোম্পানীর মালিক হর্ষবর্দ্ধন আর গোবর্দ্ধন কলকাতা বেড়াতে এসেছেন সে খবর তোমরা জান। কলকাতায় এসে তাঁরা অনেক কিছুই নতুন দেখছেন এবং শুনছেন—কারণ তাঁরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কলকাতায় আসেন নি।

সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, তাঁদেরই বাড়ীর দুয়ারে কে খঞ্জনী বাজিয়ে সঙ্কীর্ত্তন সুরু করেছে!

হর্ষবর্দ্ধন অভিভূত হয়ে গেলেন, বল্লেন, "আহা, কে হরিগুণ গান করে! গোব্‌রা, ওপরে ডেকে আন্, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে।"

নীচে থেকে গোব্‌রার গলা শোনা যায়—"কোন মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।"

"তুই ডেকে নিয়ে আয়।"

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্দ্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে আস্‌তে অনেক কষ্ট, অনেক কস্‌রৎ করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্দ্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন—"ভগবান্ তোমাকে খোঁড়া করেছেন সেজন্য দুঃখ ক'র না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপীতাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—"

গোব্‌রা কথাটা পূরণ করে—"তুমি ফুটবল্‌-খেলোয়াড় হবে।"

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয়—"আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বল্‌বেন নি, দয়ার জন্যেই মরে আছি। ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষতি সার্‌তে পরজন্মে না চার-পেয়ে ক'রে পাঠান আমাকে।"

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্দ্ধন ক্ষুব্ধ হন—"তুমি বোধ হয় পদ্যপাঠ পড় নি, সেই পদ্যটা—'একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা—' তার পরে কিরে গোব্‌রা?"

গোব্‌রার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বল্‌ছেন, তাই অনেক ভেবে সে লাইন্‌টা মিলিয়ে দেয়—"মোজা প'রে চলিয়া গেলাম কর্ম্মস্থলে।"

হর্ষবর্দ্ধন বিরক্ত হয়—"উঁহু উঁহু। মনে আস্‌ছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক্‌, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না ব'লে সে সেই রাগে ভগবান্‌কে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখ্‌ল আর একজনের পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেই, আর একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই! তখন তার দুঃখ দূর হ'ল।"

গোব্‌রা যোগ করে—"আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দু'জনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ ক'রে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌ল।"

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম কর্‌ল সেই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—"দেবেই ত'।"

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্দ্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন—"তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হ'লে আরো কত কষ্ট! ভগবান্‌ যে তোমাকে—"

ভিখারী বাধা দেয়—"যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল আমাকে অচল পয়সা চালাত। বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হ'তে হ'ল—কি করি? ভারী ঠকায় লোঁকে।"

হর্ষবর্দ্ধন দারুণ বিস্মিত হন—"বল কি? তুমি কি আগে অন্ধ ছিলে?"

"তা চোখ পেলে কি করে?" গোব্‌রাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারী আম্‌তা আম্‌তা করতে থাকে—"ভগবানের কের্‌পা। তা ছাড়া আর কি বল্‌ব!"

"তাই বল!" গোব্‌রা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্দ্ধন বলেন—"সেই কথাই ত' বল্‌ছিলাম হে। ভগবানের দয়ায় হয় না কি?"

ভিখারী তাগাদা লাগায়—"পয়সা দিন বাবু, যাই। অনেক বাড়ী ঘুরতে হবে, বেলা হ'ল।"

"আমাদের কাছে তো পয়সা নেই, নোট্‌ আছে। গোব্‌রা,—" বলা মাত্র গোবর্দ্ধন একখানা দশ টাকার নোট্‌ বের করে আনে।

ভিখারী তাচ্ছীল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—"ওঃ, দশ টাকার নোট্‌? তা আপনারা দু'জনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন' টাকা সাড়ে পনের আনা আপনাদের ফেরৎ দিচ্ছি—" ব'লে ঝুলি ঝেড়ে রাশিকৃত পয়সা গুণ্‌তে সুরু ক'রে দেয়।

"উঁহুঁ হুঁ" হর্ষবর্দ্ধন বাধা দেন—"তুমি গোটা নোট্‌খানাই নাও! ওর বদল নিতে হবে না। আমরা খরচ করতেই সহরে এসেছি।"

ভিখারীর চোখ দুটো ডাগর হয়ে ওঠে, সে অবাক্‌ হয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোট্‌খানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌তে থাকে, আসল কি জাল, আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অবশেষে তার সাহস হয়, "বাবু, আপনি কি পুলিসের টিক্‌টিকি?"

হর্ষবর্দ্ধন স্তম্ভিত হন—"গোব্‌রা, এ বলে কি? আমি টিক্‌টিকি! কলকাতায় এসে কি টিক্‌টিকির মত চেহারা হ'ল নাকি? আয়নাখানা আন্‌ তো।"

গোব্‌রা আয়না আন্‌তে পাশের ঘরে দৌড়ায়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোট্‌খানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে, ভিখারীও এই অবসরে আস্তে আস্তে স'রে পড়ে।

হর্ষবর্দ্ধন আপন মনে বল্‌তে থাকেন—"বৌ বল্‌ছিল বটে যেয়ো না কলকাতায়,

চামচিকের মত চেহারা হবে। কিন্তু চাম্‌চিকে না হয়ে হ'লাম টিক্‌টিকি! আশ্চর্য্য!"

আয়না দেখে হর্ষবর্দ্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—"নাঃ, এখনও অদ্দূর গড়াই নি।"

ভিখারীর চোখ ছুটো ডাগর হয়ে ওঠে

গোবর্দ্ধনও দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—"যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরীটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই আছে।"

গোবর্দ্ধনও সে বিষয়ে একমত হয়—"হ্যাঁ এখনও চোখ সারে নি সম্পূর্ণ। তা নইলে তোমার মত এমন লম্বা চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিক্‌টিকি! ছ্যাঃ।" ভিখারীর ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

"কিন্তু দেখেছিস্‌, ভিখিরী হ'লে কি হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ্! কলকাতার ভিখিরীরাও কী বড় মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়ত কিন্‌তে পারে!"

"যা বলেছ দাদা! হাতে হাতে ন' টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ,—চাই কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পার্‌ত হয়ত!"

"তা হ'লে একখানা এক শ' টাকার নোট্‌ ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচ্‌রো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার হয় বলা যায় না তো!"

"আর কি দেখ্‌লাম জান দাদা? অদ্ভুত ব্যাপার!"

"কি—কি?" হর্ষবর্দ্ধন উৎসুক হ'য়ে ওঠেন।

"লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, সিঁড়ি ভাঙ্‌তে যেন কত কষ্ট! কিন্তু যাবার সময় তিন লাফে সিঁড়ি টপ্‌কে তর্‌ তর্‌ ক'রে নেমে গেল। ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু!"

হর্ষবর্দ্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্‌ না—"আশ্চর্য্য আর কি! এ কি আমাদের আসাম? এ হ'ল গিয়ে সহর কলকাতা। এখানকার হাল্‌চাল্‌ই আলাদা!"

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

সাপের গল্প

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি-এস্‌-সি)

তোমাদের আজকে ছুটো সাপের গল্প শোনাব; এগুলোকে নিছক গল্প বলে মনে ক'র না যেন—প্রকৃত পক্ষে ছুটোই সত্যি ঘটনা। প্রথমটি আবার আমার নিজেরই প্রত্যক্ষ করা।

সুন্দরবনের কথা তোমরা সবাই জান। নানা রকম হিংস্র জানোয়ার—বিশেষ করে বাঘের জন্য সুন্দরবনের নাম আছে। এই বনে যেতে হলে সবাইকে 'পাশ' নিয়ে যেতে হয়। কল্‌কাতার চিড়িয়াখানায় ঢোকবার সময় যেমন ফটকের কাছে সরকারী কর্ম্মচারী এক আনা পয়সা নিয়ে তবে তোমাদের ভিতরে যেতে দেয়, সুন্দরবনেও তেম্‌নি প্রত্যেক নদীর ধারে—যেখান থেকে বন আরম্ভ হয়েছে

তেম্‌নি জায়গায়—সরকারের কর্ম্মচারী রয়েছে; তারা প্রত্যেকটা নৌকো অথবা ষ্টিমারকে পাশ দেবে, তবে তারা বনের ভিতর এগুতে পাবে। এই সরকারী কর্ম্মচারীর অফিস্‌কে বলা হয় ফরেষ্ট্‌ অফিস্।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা এম্‌নিধারা একটা অফিসে বসে ফরেষ্টার বাবুর সঙ্গে গল্প কর্‌ছি; বনের অনেক অভিজ্ঞতাই সে ভদ্রলোকটির আছে। তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে রাত হ'য়ে গেল। আমি এবং আমার সঙ্গী নৌকোয় ফিরে যাব বলে ফরেষ্টার বাবুকে অভিবাদন জানিয়ে উঠ্‌তে যাব এমন সময় তিনি বলে উঠ্‌লেন, "চলুন, আপনাদের নৌকোয় পৌঁছে দিয়ে আসি।" কথা শেষ করেই তিনি তাঁর দরওয়ানকে ডাক্‌লেন, আলো নিয়ে সে আমাদের পথ দেখাতে দেখাতে যাবে।

গোক্ষুর সাপ ; মেজাজটি এখন যাকে বলে 'চটিতং'।

সকলে রওনা হয়ে পড়্‌লাম। দরওয়ানটা 'হারিকেন' হাতে আমাদের হাত পনেরো আগে চল্‌ছিল, হঠাৎ সে দারুণ চীৎকার করে উঠ্‌ল, "বাবু-উ-উ!" তার পরেই একেবারে চুপ! লোকটা যেন পাথরের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হয় নিঃশ্বাসও পড়্‌ছে কিনা সন্দেহ।

ফরেষ্টার বাবুও থম্‌কে থেমে গিয়েছিলেন, বল্লেন, "এগোবেন না আর, ওকে সাপে বেড় দিয়েছে; চুপ করে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি আস্‌ছি।" বলেই তিনি আপিসের দিকে ফির্‌লেন। একটু বাদেই দেখি বন্দুক আর একটা

টর্চ্চ্‌লাইট্‌ হাতে করে তিনি ফিরে আস্‌ছেন। আমি এবং আমার বন্ধু তো ভয়ে একেবারেই জড়সড় হয়ে পড়েছিলাম, ফরেষ্টার বাবু অভয় দেওয়াতে তাঁর অনুসরণ করে যা দেখ্‌লাম তা'তে তখনই আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার জো হ'ল—সাপটা দরওয়ানের মাত্র হাত দুই দূরে গর্ত্ত থেকে কতকটা শরীর বার করে ফণা তোলা অবস্থায় ফোঁস্ ফোঁস্ করে গর্জ্জাচ্ছে। দুটো ক্রুদ্ধ ষাঁড় গুঁতোগুঁতি সুরু করবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে যেমন ফোঁস্‌ফোঁসাতে আরম্ভ করে অনেকটা সেই রকম। আর দরওয়ানও দু' চোখের এম্‌নি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে সাপের দিকে চেয়ে আছে যেন এক্ষুণি ওকে গিলে খাবে। উঃ, সে কি চাউনি—যেন দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার ওর চোখে। দরওয়ানের তেজ দেখে সাপ বেরোতে সাহস পাচ্ছে না, আর সাপের তেজ দেখেও দরওয়ানের সেই অবস্থা—সে না পারে এগুতে, না পারে পেছুতে। এগুলেই ছোবল দেবে, পেছুলেই তীরের ফলার মত ঢুঁ মেরে গিয়ে পড়্‌বে ওর উপর।

সাপের উপর টর্চ্চের আলো ফেলা হ'ল; ফরেষ্টার বাবু বন্দুক তাক করে ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন, দরওয়ানকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন, "দু' পা পিছিয়ে আয়।" যেম্‌নি পিছিয়ে আসা সাপও অম্‌নি গর্ত্তের ভিতর থেকে শরীর বার কর্‌তে লাগ্‌ল। ফরেষ্টার বাবু সাহস কর্‌লেন না ওই নিতান্ত হিংস্র খল জীবটাকে আর ঘাঁটাতে। দড়াম্ করে তাঁর বন্দুক গর্জ্জে উঠ্‌ল, খলের সমুচিত শাস্তিবিধান হয়ে গেল—এক গুলিতেই বাছাধন সাবাড়।

পথে যেতে যেতে ফরেষ্টার বাবু বল্লেন, "এ সাপ এত পাজি যে যাকে কামড়াবে তার মৃত্যু নিজে চোখে না দেখে ও নড়্‌বে না"।

আর একটা গল্প বলি শোন। এটা যদিও আমার নিজের চোখে দেখা নয় তবুও এর সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা সন্দিহান হয়ো না।

একবার একটা চিতাবাঘকে ময়াল সাপে ধরেছিল। অজগর জাতের বড় বড় সাপকেই যে ময়াল সাপ বলে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এদের স্বভাবই হচ্ছে, এরা শিকারের উপর পড়ে বিদ্যুদ্বেগে তার শরীরের চার পাশে সজোরে গোটাকতক প্যাঁচ কষিয়ে দেয়, তার পর শিকারটিকে আস্তে আস্তে গিল্‌তে সুরু করে।

এ ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। সাপটা চিতার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরার পর দেখ্‌ল, ওর নিজের মাথাটা চিতার সাম্‌নের দু'পায়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে। এতে একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, কেননা সাপের মনোগত ইচ্ছা—প্রথমে চিতার ঘাড় কামড়ে ঘাল করে তার পর ওকে উদরস্থ করা। অথচ প্যাঁচ পড়েছে এম্‌নি বেকায়দা-মত যে অন্ততঃ একটা প্যাঁচ এখন না খুলে নিলে ওর মাথা কিছুতেই শিকারের ঘাড় পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে না।

সব চাইতে বড় জাতের ময়াল সাপ ; শিকারের চারদিকে প্যাঁচ কষিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাকে এরা কাবু করে ফেলে।

এদিকে চিতাও তো আর ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়, সেও ইতিমধ্যে তার পেছনের পায়ের ক্ষুরধার নখ দিয়ে সাপের গা খাম্‌চে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। সাপ তাকে আছে কোন্‌ ফাঁকে চিতার ঘাড় ধর্‌বে, আর চিতাও ওঁৎ পেতে আছে বাছাধন একবার মাথাটি বার কর্‌লে হয়, এক কামড়ে মুণ্ডু ছাতু করে দেবে। দু'জনেই সুযোগ খুঁজ্‌ছে। সাপ চিতাকে এম্‌নি সবলে পেষণ কর্‌ছে যে সে বেচারা যন্ত্রণায় যায় আর কি, আবার এদিকে চিতাও নখের আঘাতে সাপের শরীর ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, তারও যন্ত্রণার অবধি নাই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা দুয়েরই অসাধ্য।

হঠাৎ সাপ বিদ্যুদ্বেগে একটা প্যাঁচ খুলে নিল, আর তার চাইতেও ক্ষিপ্রতর বেগে—চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে—অতি-তৎপর চিতা সাপের মুণ্ডু দুই চোয়ালের মধ্যে পূরে ফেল্ল। ব্যস্‌, সাপের মাথা ছাতু হয়ে গেল।

চিতা তো সাপের কবল থেকে রেহাই পেল, কিন্তু কতটা পেল জান? কেবল প্রাণটুকু। যাঁরা আড়ালে দাঁড়িয়ে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখ্‌ছিলেন তাঁদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে গর্জ্জে উঠ্‌ল, কিন্তু নড়্‌বার তার শক্তি ছিল না এতটুকু। সাপ তার বিপুল পেষণে ওর প্রত্যেকটি হাড় চূরমার করে দিয়ে গেছে। এম্‌নি আরও কতক্ষণ গর্জ্জন কর্‌বার পর গুলি খেয়ে ওর কষ্টের অবসান হয়ে গেল।

নাম-বিভ্রাট্‌

[শ্রীশেফালিকা সেন]

(১)

ছোট সংসার ; বড় বোন, ভাই এবং দুইটি ভাইপো। ছেলেদের বাপের নাম অবিনাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভালমতেই জানিতেন যে যথাকালে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হইবেনই।

অবিনাশ বাবুর বরাবরই একটু দর্শনের দিকে ঝোঁক ছিল এবং এ যুগের লোকেদের অনেকগুলি ইচ্ছাকৃত ভুল তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এ যুগের প্রধান ইচ্ছাকৃত ভুল—অতএব পাপ—হইল সন্তানের নাম রাখিবার সময় বিবেচনাশক্তির ব্যবহার না করা। মানুষ যে অমর নয় তা তো নিতান্তই খাঁটি সত্য কথা, তবুও তাঁহারা ছেলেমেয়ের নাম রাখিবার সময় মৃত্যুঞ্জয়, অমর, অক্ষয়, অবিনাশ ছাড়া আর যেন নাম খুঁজিয়া পান না ; রাজার পুত্রের নাম হয় অনাথদাস আর কাঠুরিয়ার ছেলের নাম হয় জগদিন্দ্রনাথ। বাংলার বাহির

হইতে আমদানী কত মর্কট-মার্কা চেহারা-ধারীর নাম হইল কিনা শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্জী, মহাদেব, পরমেশ্বর ইত্যাদি।

এক দিন এই ধরণের উচ্চাঙ্গের চিন্তা যখন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল তখন তিনি তাঁহার পুরাতন বছরের ডায়েরীগুলি পাড়িয়া আনিলেন। ডায়েরীর যেখানে যেখানে 'অবিনাশ' নাম লেখা ছিল, সবগুলি কাটিয়া তিনি লিখিলেন 'মরণশীল'; তার পর দিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, মা-বাবা মস্ত ভুল করে গেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাদেরই কর্‌তে হবে; আমার নাম অবিনাশ কিছুতেই হতে পারে না, এক দিন আমায় তো মরতেই হবে! কাজেই তুমি আজ থেকে আমায় 'মরণশীল' বলে ডাক্‌বে"।

দিদি ভাইএর দর্শন-তত্ত্বের কথা জানিতেন, অতএব বেশী কিছু না বলিয়া শুধু "ষাট, ষাট, মরণশীল কেন ডাক্‌ব, যত সব অলক্ষুণে কথা তোর" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। অবিনাশ বাবু এই দিদিটিকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন, কাজেই সেদিকে আর বেশী ঘেঁষিলেন না, কিন্তু সাপ্তাহিক ও মাসিকের আপিসে 'মরণশীল' স্বাক্ষরিত উচ্চ গবেষণাপূর্ণ বহু দার্শনিক প্রবন্ধ আসিয়া জমিতে লাগিল। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সম্পাদকদের জ্বালায় কোনটিই প্রকাশিত হইল না। অবিনাশ বাবু তখন এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি নিজেই একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া দেশবাসীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন।

এ হেন অবিনাশ বাবু দুই পুত্রের জন্মে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বড় ছেলে জন্মাইবার পর সকলে যখন জানিতে চাহিল ছেলের কি নাম তিনি রাখিতেছেন তখন তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "একটা মানুষের নাম রাখা তো আর সোজা কথা নয়, আমায় দু'চার বছর ভাব্‌বার সময় দাও।" বাড়ীর সবাই যখন শিশুকে খোকা নামে ডাকিতে সুরু করিল তখন তিনি যথার্থই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ছেলে তো এক দিন বড় হইবে, খোকা নাম তখন মানাইবে কি করিয়া? ইতিমধ্যে আর এক পুত্রের জন্ম হইল, অবিনাশ বাবুর স্ত্রীও মারা গেলেন।

অবিনাশ বাবু ও তাঁহার দিদি, দু'জনে মিলিয়া ছেলেদের নাম স্থির করিতে

আরম্ভ করিলেন। বিধবা দিদির ইচ্ছা ভাইপোদের নাম গণেশ, মহাদেব বা ঐ ধরণের একটা কিছু হয়—যাহাতে তিনি সর্ব্বদাই ঠাকুর-দেবতার নাম মুখে আনিতে পারেন। কিন্তু দার্শনিক ভাইএর জ্বালায় তা হইবার জো নাই। তিনি দিন-রাত বাংলা অভিধান ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া শেষে বাড়ীর চাকর-বাকরদের উপর দস্তুরমত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। খামাখা বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কিরে?"

"ভগবান্‌চন্দ্র রা…"

বেচারার মুখের কথা শেষ না হইতেই অবিনাশ বাবুর চীৎকারে ঘরখানা ফাটিয়া পড়িবার জো হইল, "ব্যাটা পয়লা নম্বরের চোর, বাজারের পয়সা লুটবার ওস্তাদ্, ওঁর নাম আবার ভগবান্! যত সব……"

বিষম রাগিয়া অবিনাশ বাবু চেম্বার্স্ ডিক্‌সনারি খুলিয়া বসিলেন; চার রাত্রি ডিক্‌সনারি ঘাঁটিয়া অবশেষে Transitory ও Passing—এই দুইটি নাম তাঁহার ভারী পছন্দ হইল, কিন্তু দিদির কাছে সে কথা প্রকাশ করিতেই তিনি মারমুখী হইয়া উঠিলেন, "ওসব ইংরেজী নাম আমার ঘরে চল্‌বে না!" অবিনাশ বাবু নিরাশ হইয়া বাংলা, ইংরাজী দুই অভিধানই বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং বড় ছেলের চেহারাটা হাঁদার মত বলিয়া তাহার নাম হাঁদা এবং ছোট ছেলের মুখখানা বাংলা পাঁচের মত বলিয়া তাহার নাম পাঁচু রাখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "দিদির তো বয়স হয়েছে,…এখন এই নামই থাক্, পরে পছন্দসই ভাল নাম রাখ্‌লেই চল্‌বে।" দিদিও ভাবিলেন, "থাক্ দু'টো ডাক-নাম; পরে অবিনাশের মত নিশ্চয়ই বদ্‌লাবে, তখন ঠাকুর-দেবতার নাম রাখ্‌লেই চল্‌বে।"

কিন্তু দিদিও পটল তুলিলেন না, অবিনাশ বাবুও নিজের মত বদ্‌লাইলেন না।

(২)

চূণাই নদীর পারে ঠিক ঘাটের পাশেই অবিনাশ বাবুর বিঘা চারেক জমি পড়িয়া ছিল। ভদ্রলোক জানিতেন পুরাকালে তপোবনই ছিল প্রকৃত জ্ঞানিগণের বাসস্থান। সংসারের খুঁটিনাটি নানা উৎপাত এখানে তাদের স্পর্শ করিতে পারিত না। জমিটা এত দিন ঘাটের মাঝিদের 'পার্কে' পরিণত হইয়াছিল, হঠাৎ এক দিন

দেখা গেল লোকজন, কুড়াল-শাবল প্রভৃতি নিয়া অবিনাশ বাবু সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেড়ায় ঘেরা, আবশ্যকীয় সরঞ্জামে পূর্ণ একখানি মাটীর ঘর গড়িয়া উঠিল। অবিনাশ বাবু প্রবেশ-পথে একখানা সাইন্‌বোর্ড্ টানাইয়া দিলেন, "MODERN TAPOBAN : SILENCE PLEASE." (আধুনিক তপোবন : অনুগ্রহ করিয়া গোলমাল করিবেন না।)

ইতিপূর্ব্বেই অবিনাশ বাবু আর একটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—মানুষের দ্বিতীয় দফা ভুল হইল 'শব্দের চয়ন ও বয়নে অসামঞ্জস্য।' এই জটিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়া এক দিন তপোবনে বসিয়া তিনি গবেষণা করিতেছিলেন, কোন্ দিক্ দিয়া সময় যে হু-হু করিয়া কাটিয়া গেল সেদিকে তাঁহার আর হুঁস্ই রহিল না। দিদিকে পূর্ব্বে খবর দেওয়া ছিল না, সারা দিনের শেষেও অবিনাশ বাবু যখন বাড়ী ফিরিলেন না তখন সে বেচারী তো ভাবিয়া আকুল। চারি দিকে লোকজন পাঠান হইল, কিন্তু সন্ধান মিলিল না কোথাও। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি কোন্ সূত্রে খবর পাইলেন ভ্রাতাটি তাঁহার তপোবনে গবেষণায় মগ্ন আছেন। অমনই তিনি ছেলেদের সঙ্গে নিয়া নিজেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দিদির মূর্ত্তি দেখিয়া অবিনাশ বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এসেছ কেন দিদি?"

"আর কেন? তপোবনে পুণ্যসঞ্চয় কর্‌তে! চল্, বাড়ী চল্, সারাদিন আমরা ভেবে ভেবে মরি, একটা খবরও তো দিতে হয়⋯"

অবিনাশ বাবু চমকিয়া উঠিলেন, "সারাদিন ভেবে মর? য়্যাঁ, সে কি হয়? কোথায়, মিল সাহেবের দর্শনে তো সে রকম কিছু নেই! এই তোমাদের দোষ, শব্দের চয়ন ও বয়ন তোমরা ঠিক মত কর্‌তে পার না। হেঁ হেঁ হেঁ, সারাদিন কি মর্‌তে পার?" তার পর খাতা খুলিয়া বলিলেন, "এখানে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি, এইটে পড়ে আমার সঙ্গে কথা কইবে। আর দেখ, এর একটা হিন্দি আর একটা উড়িয়া তর্জ্জমা করিয়ে চাকর-বাকরদের দিও, তারাও তাদের কথা শুধ্‌রে নিতে পার্‌বে।"

অবিনাশ বাবু দিদির সহিত বাড়ী ফিরিলেন; তার পর খাওয়া-দাওয়ার পর

চাকর রামকে ডাকিয়া কহিলেন, "হনূমান্, (রামের নাম তিনি হনূমান্ রাখিয়াছেন) এক গ্লাস্ খাবার জল আন্‌তে পার্‌বে?"

'হনূমান্' বলিল, "আজ্ঞে, এই এখুনি আন্‌ছি।"

"এখনি আন্‌ছ? কি আশ্চর্য্য, এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আবার জলও আন্‌ছ? এ কখনো সম্ভব হয়? বল, আন্‌ব।"

'হনূমান্' বলিল, "আজ্ঞে, আন্‌ব।"

"উঁহুঁ, তাও হ'ল না; এক সেকেণ্ডে পৃথিবীতে কত ওলট্-পালট্ হয়ে যেতে পারে। বল, আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

হনূমান্ "আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ব" বলিয়া সরিয়া পড়িল। এই ভাবে অবিনাশ বাবু বাড়ীর লোকেদের ভাষা সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দিদি ক্রমাগতঃ মারাত্মক ভুল করিতেছেন দেখিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

(৩)

কয়েক বছর চলিয়া গেছে, হাঁদা-পাঁচু বড় হইয়া উঠিয়াছে। হাঁদাকে দেখিয়া সকলেই বলে, "বাঃ, বেশ চট্‌পটে চালাক ছেলে তো!" পাঁচুরও চোখের উপর ভ্রূ গজাইবার ফলে এবং নাকটি টিকাল হইয়া দেখা দেওয়ায় চেহারাখানায় অনেকটা মানুষের শ্রী আসিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া অবিনাশ বাবু আবার দুশ্চিন্তায় পড়িলেন; কি মুস্কিল, ছেলেদের চেহারা যে এতটা বদ্‌লাইয়া তাঁহার দেওয়া নামগুলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে, এ কে জানিত?

ওদিকে ছেলেরা নিজেদের নামের ইতিহাস শুনিবার পর হইতে প্রায়ই দুইটি ভাল নাম নিয়া জল্পনা-কল্পনা করে। সন্ধ্যার পর হয়তো তর্ক আরম্ভ হইল—হাঁদা বলিল, "আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় রাখ্‌লে কেমন হয় রে পেঁচো?" পাঁচু বলে, "মন্দ নয়; আর আমার নাম অমর রাখ্‌ব, কেমন? অমর নামটা যাই বল মৃত্যুঞ্জয়ের চাইতে ঢের ভাল।"

হাঁদা প্রায় ক্ষেপিয়া উঠে, বলে, "ছাই। মৃত্যুঞ্জয় মানে জানিস্? সন্ধি ভাঙ্গ্‌লে হয় মৃত্যু+উঞ্জয়। মৃত্যু মানে যে মরণ তা তো জানিস্ই। আর উঞ্জয়

মানে হচ্ছে—কিনা—এই—ভয়ানক শক্ত মানে, তুই বুঝ্‌বি না।" দু' ভাইয়ের তর্ক তখন বেশ জমিয়া উঠে, কিন্তু সহসা পিসীমা কর্ত্তৃক খাওয়ার ডাক পড়ায় আধ ঘণ্টার জন্য সাময়িক ভাবে একটা সন্ধির রফা হয়। কিন্তু খাওয়ার পর পাঁচুর বড় ঘুম পায়, সে বলে, "দাদা, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আজ থাক্।" হাঁদারও ঘুম কিছু কম পায় না, পাঁচুর ঘুম পাওয়াতে মনে মনে সে খুসীই হয়, কিন্তু মুখে বলে, "কাপুরুষ, হেরে গেলি, তাইতে না ঘুম পেল? আমার সঙ্গে তর্কে পার্‌লে তো?"

দেখিতে দেখিতে আরও কতগুলি বছর চলিয়া গেল—ছেলেদের বয়স এখন প্রায় ১৪।১৫। তোমরাই বল, হাঁদা আর পাঁচু নাম নিয়া তাহারা ভদ্রসমাজে বাহির হয় কি করিয়া? এদিকে পিসীমা পুরোহিত ডাকিয়া ভাল দিন দেখিলেন এবং হাঁদার নাম পরমব্রহ্মানন্দ এবং পাঁচুর নাম অখিলসচ্চিদানন্দ রাখিবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু ছেলেদের বিশেষ ইচ্ছা, 'মৃত্যুঞ্জয়' আর 'অমর'ই রাখা হয়। তাহারা পাড়ার ফাজিল ছেলে কৃষ্ণপদর শরণ লইল।

নামকরণের নির্দ্দিষ্ট তারিখের দিন পাঁচেক আগে অবিনাশ বাবু একখানা নূতন বাংলা অভিধান কিনিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাত্রা করিলেন; এবং পরের দিন ভোরে কৃষ্ণপদ কাপড়ের নীচে একটা বড় নীল বোতল ও গোটা তিনেক কমলালেবু নিয়া চুপি চুপি ছেলেদের পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

শরীর অসুস্থ বলিয়া দুই ভাই সেদিন আর কিছু খাইল না, চুপ্‌চাপ শুইয়া রহিল। বেলা দু'টার পর দু'জনারই বেদম পেটের অসুখ। একা বাড়ীতে পিসীমা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। খবর পাইয়াই কৃষ্ণপদ ছুটিয়া আসিল—তাহারই পরিচিত এক ছোক্‌রা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়া। ছেলেরা ততক্ষণে গা খিঁচাইয়া "বাবা গো, মা গো, বাঁচাও পিসীমা" প্রভৃতি বলিতে সুরু করিয়াছে।

ডাক্তার বাবু রোগীদের বুক ঠুকিয়া, পীলে টিপিয়া নানা রকম পরীক্ষা করিলেন, তার পর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "মানসিক অশান্তির জন্য এদের কাইলো-ড্রেক্‌টিক্ এম্‌ফ্রিচিয়া হয়েছে।"

পিসীমা একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যত টাকা লাগে লাগুক বাবা, ওদের বাঁচাও।"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই, তবে ওদের মনে কিসের অশান্তি সেটা আগে জেনে নিয়ে তার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। নইলে পরে…"

পিসীমা চোখ মুছিয়া বলিলেন, "কি দুঃখু তোদের মনে বল্ বাবা? আমার কাছে লজ্জা কি?"

হাঁদা গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল, "আমার নামটা বড় বিশ্রী—পিসীমা, বদ্‌লে মৃত্যুঞ্জয় রেখো।" পাঁচু ততোঽধিক করুণ স্বরে বলিল, "আর আমার না—ম অমর—"

পিসীমা বলিলেন, "এই কথা? তা আমায় আগে বলিস্ নি কেন? তা হ'লে তো আর এই সর্ব্বনেশে কালোচিঁড়ে অসুখ হ'ত না।"

খানিকক্ষণ বাদে কৃষ্ণপদ এবং 'ডাক্তার বাবু' প্রকাশ্যে পিসীমার আশীর্ব্বাদ এবং গোপনে ক্যাষ্টর অয়েলের বোতলটি নিয়া বাড়ী ফিরিল।

নামকরণের ঠিক আগের দিন অবিনাশ বাবু ভারী ভারী দু'খানা অভিধান বগলে বাড়ীতে পা দিতেই পিসীমা চোখ-মুখ বিস্ফারিত করিয়া হাঁদা-পাঁচুর কালোচিঁড়ে রোগের একটা ভয়াবহ বর্ণনা দিয়া শেষে কহিলেন, "আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। ওদের মনের দুঃখু দূর কর্‌তেই হবে—মৃত্যুঞ্জয় আর অমর নাম ওদের রাখ্‌তেই হবে।"

সাম্‌না হইতে ধাক্কা-খাওয়া লোক যে ভাবে টাল সাম্‌লায় অবিনাশ বাবু মুখের ভাব ঠিক সেই রকম করিয়া বলিলেন, "কিন্তু, কিন্তু ডিক্‌সনারি…" কথাটা দিদির চোখের দিকে তাকাইয়া তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন, "তা বেশ তোমাদের যা ইচ্ছে তাই বলে ডেকো, আমি ওদের মরণসেবক আর মৃত্যুদাস বলে ডাক্‌ব, এই বলে রাখ্‌লাম।"

যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অবিনাশ বাবু এক দিন হাঁদাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া ডাকিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের ভুলের জন্য নিজেই নিজেকে কঠোর শাস্তি দিলেন; মাথায় পাঁচটা ও দুই হাতে দুইটা মোটা মোটা দর্শনের বই নিয়া ঝাড়া এক ঘণ্টা টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং

নিজের কান নিজে মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি আর কখনও ছেলেদের কোন সম্পর্কে থাকিবেন না।

তবে তোমাদের গোপনে বলিতেছি যে সম্প্রতি তিনি পিপীলিকা ও মানুষের মধ্যে এক রহস্যময় আত্মীয়তা আবিষ্কার করিয়া গভীর গবেষণায় মত্ত থাকাতে ছেলেদের নাম-বিভ্রাটের কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন।

মামার বাড়ী

(জসীম্ উদ্দীন)

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা,
ফুল তুলতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ী যাই।

মামার বাড়ীর পুণ্যিপুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হ'তে ওপার গিয়ে
নাচে ঢেউএর দল।

দিনে সেথা ঘুমিয়ে থাকে
লাল শালুকের ফুল,
রাতের বেলা চাঁদের সনে
হেসে না পায় কূল।

আম কাঁঠালের বনের ধারে
মামাবাড়ীর ঘর,
আকাশ হ'তে জ্যোছ্না-কুসুম
ঝরে মাথার 'পর।

রাতের বেলা জোনাক জ্বলে
বাঁশ-বাগানের ছায়,
শিমুল গাছের শাখায় ব'সে
ভোরের পাখী গায়।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়োতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি,
রঙীন করি' মুখ।

কাঁদি ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে,
ছেলেমেয়ে, আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চলে।

"প্রকাণ্ড প্রমাদ"

(শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী)

প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষকে চেন তো? তিনি হ'লেন ডাক্তার ঢক্কানিনাদ ঘোষের মেজ ছেলে। বড় ছেলে উগ্রচণ্ডী ঘোষ হরিহরপুর কলেজের ফিলসফির প্রফেসার।

আত্মম্ভরী বাবুও হরিহরপুর কলেজের ইতিহাসের প্রফেসার বটে; কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে তাঁর নিজের ল্যাবরেটরিতে (বা পরীক্ষাগারে)। সেই অদ্ভুত ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে লোকে খুব অল্প কথাই জানে। তাঁর এসিষ্ট্যাণ্ট (বা সাহায্যকারী) সমনদমন সিংহও মিশুক লোক নন্;—আর, মিশুক হ'লেই বা কি? তাঁরও তো অধিকাংশ সময় ল্যাবরেটরিতে কাটে।

সেদিন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সরস সমাচার"-এর সহকারী সম্পাদক সত্যসখা সরকার আত্মম্ভরী বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন; তা' থেকে দু'-চার কথা জানা যায়।

প্রবন্ধের নাম "আত্মম্ভরীর আত্মকথা"। তা'তে লেখা আছে, কেমন ক'রে ছেলেবেলায় এক দিন সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে বেড়াল-ধরা কলের এক্সপেরিমেণ্ট (বা পরীক্ষা) কর্তে গিয়ে কলের ফাঁদের তার এক বেজায় মোটা ভদ্রলোকের পায়ে আটকে গিয়ে ভদ্রলোক হোঁচট খেয়ে একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খান্। টেবিলের উপর ছিল একটা রঙের গামলা। সেই রঙ ছিট্কে গিয়ে ধাবধাবাপুরের জমিদার মশাইএর গায়ে লাগে; তিনি তখন মোটরে চড়ে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন। জমিদার মশায়ের শালে, মুখে, হাতে রঙের ছিটা তো লাগ্লই, নূতন হল্দে মোটরে রঙের ছিটা লেগে অনেকটা চিতাবাঘের মত হয়ে গেল। সঙ্গের বরকন্দাজ আর মোটর ড্রাইভারের গায়ে আর মুখেও রঙের ছিটা লাগ্ল।

আর যাবে কোথায়! মোটা ভদ্রলোক, জমিদার মশায়ের ড্রাইভার আর বরকন্দাজ এবং জমিদার মশাই স্বয়ং 'ধর্ ধর্' ক'রে বালক আত্মম্ভরীকে তাড়া

করলেন। সেও দম্‌বার পাত্র নয়। গম্ভীর ভাবে একটা মোটা হল্‌দে পিচ্‌কারি হাতে তুলে নিয়ে 'ফী—ই—ই—ই—চ্' 'ফী—ই—ই—ই—চ্' ক'রে এক-একবার মোটা ভদ্রলোক, বরকন্দাজ, ড্রাইভার আর জমিদার মশাইএর নাকে কি একটা

ফী—ই—ই—ই—চ্

ধোঁয়ার মতন জিনিষ ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই 'হ্যা-চ্চোঃ', 'হ্যা-চ্চোঃ' ক'রে ঘন ঘন গভীর হাঁচির চোটে অস্থির হ'য়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। ততক্ষণে আত্মম্ভরী অদৃশ্য!

রাস্তার লোকে সে দৃশ্য দেখে এত জোরে হেসেছিল যে থানা থেকে এক দল পুলিশ লাঠি হাতে ছুটে দেখ্‌তে এল এত হল্লা কিসের।

জমিদার মশাই, মোটা ভদ্রলোক প্রভৃতি মানে মানে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়্‌লেন। বেড়াল-ধরা কলটা পুলিশ থানায় নিয়ে গেল, কিন্তু মালিকের বিরুদ্ধে থানায় কেউ কোনও ডায়েরি করায় নি ব'লে পরে সেটা মালিককে ফেরত দেওয়া হ'ল। বালক আত্মম্ভরী বাড়ী গিয়ে অম্‌নি তার নোট-বইএ লিখে রাখ্‌ল:

"(১) 'মার্জ্জার-ধরক যন্ত্র'—পরীক্ষায় চমৎকার উৎরেছে। যত বড় বেড়ালই হোক্ না কেন, ঠিক ধরা যাবে। মোটা বাবুর ওজন তিন মণের কম হবে না।

(২) 'হাঁচল'—এও খুব ভাল উৎরেছে। এক ঝল্‌কায় ২০।২৫ হাঁচি নির্ঘাত;— মোটা বাবুর ৪৩টা হাঁচি হয়েছিল। গোলমরিচের গুঁড়ো আর মান্দ্রাজী কড়া নস্য আর একটু বেশী মিশা'লে ভাল হয়।"

১৪ বছর বয়স থেকে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ হয়। এম্‌-এ পাশ ক'রে অত্মম্ভরী বাবু প্রফেসার হন্; তখন আরও উঁচুদরের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে কিন্তু তিনি একদিনও এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়েন নি।

আজকাল নাকি তিনি নানা রকমের রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে বহু আশ্চর্য্য ঔষধ আবিষ্কার করছেন। তা'র দু'চারটির বিষয় "সরস সমাচার" যা' লিখেছে নীচে তুলে দিলাম:

"(১) 'ঢেঁকুরল'—এই তরল পদার্থ অদ্ভুত ফলপ্রদ। পর্ণকুটিরবাসী দরিদ্রও ইহার এক ফোঁটা মাত্র সেবনে কালিয়া, কোর্ম্মা, পোলাও প্রভৃতির ঢেঁকুর অনায়াসে তুলিতে পারিবে।

(২) 'বুদ্ধীন'—ইহার সাহায্যে বোকাও অচিরাৎ বুদ্ধিমান্ হইয়া যাইবে। ঔষধ ঠিক স্থান-কাল-পাত্রে না পড়িলে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে।

(৩) 'ডাকল'—নিদ্রাকালে যাহাদের নাক ডাকে না, ইহার এক ফোঁটা মাত্র নাসিকায় ঢালিয়া দিলে বহু দূর হইতে তাহাদের নাসিকা-গর্জ্জন শুনা যাইবে। সামান্য বেশী মাত্রায় ঘন ঘন গভীর হাঁচির সম্ভাবনা।

(৪) 'মশকারি'—নামটি 'মশকারি' বটে, কিন্তু ইহাকে 'সর্ব্বারি' বলা যাইতে পারে। গায়ে মাখিয়া শুইলে ইহার অত্যুগ্র গন্ধে মশা, মাছি, ছারপোকা, বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছি—এমন কি মানুষ এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। গন্ধ বহু কাল স্থায়ী।"

প্রবন্ধের শেষে "সরস সমাচার" লিখেছে: "প্রণম্য প্রশান্ত-প্রকৃতি প্রফেসারের প্রত্যেক প্রচেষ্টায় প্রতিভাত প্রদীপ্ত প্রভাত-প্রভাংশুপ্রতিম প্রভূতপ্রতিভা প্রকৃষ্ট-প্রকারে প্রকট।"

আজকাল নাকি প্রফেসার ঘোষ 'বিষে বিষক্ষয়' বিষয়ে পরীক্ষায় লেগেছেন। ড্রেনের দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য তিনি নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ জিনিষ ড্রেনের মধ্যে ঢেলে পরীক্ষা করছেন "দুর্গন্ধে দুর্গন্ধক্ষয়" (অথবা তাঁর ভাষায়, "গ্যাসে গ্যাসক্ষয়") হয় কিনা। এর জন্য তিনি পচা চিংড়ির আরক, ছুঁচোর আরক, গাঁধি পোকার আরক, গাঁধালের আরক, মূলো-পচার আরক, বাঁশ-পচান জলের আরক প্রভৃতি ১৯ রকমের উৎকট দুর্গন্ধি জিনিষ তৈয়ারী ক'রেছেন। পাড়ার লোকের জ্বালায় তাঁকে বাড়ী ছেড়ে গ্রামে মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাড়ী তৈয়ারী ক'রে ল্যাবরেটরি 'বসা'তে হয়েছে;—দুর্গন্ধে নাকি পাড়ার লোকে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল! সেখানেও তাঁ'কে অতি সাবধানে, জানালা-দরজা এঁটে কাজ করতে হয়। ঐ উৎকট দুর্গন্ধের মধ্যে তাঁরা কি ক'রে কাজ করেন কেউ কখনও দেখে নি, কারণ কা'রও এত উৎসাহ নাই যে সেখানে দুর্গন্ধের মধ্যে গিয়ে দেখে আসে।

*   *   *

হরিহরপুরে আজ হৈ হৈ কাণ্ড। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু বিপদবারণ বসু বিজ্ঞাপনে বহু বার ব'লেছেন, সহজে সহরের ড্রেনের দুর্গন্ধ দূর করার উপযুক্ত উপায় যিনি আবিষ্কার করবেন তাঁকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষ মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা ও কর্ম্মচারীদের কাছে তাঁর আধুনিক আশ্চর্য্য আবিষ্কার "দুর্গন্ধীন" পরীক্ষা ক'রে দেখিয়ে দেবেন, দারুণ দুর্গন্ধওয়ালা ড্রেনে দুই ফোঁটা "দুর্গন্ধীন" দিলে দুই সেকেণ্ডে দুর্গন্ধ দূর হ'য়ে যাবে।

গোলাপবাগান গলির ড্রেনের গন্ধ সব চেয়ে বেশী; সেখানেই সকালে কর্ত্তারা কাপড়ে নাক ঢেকে ড্রেনের চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন;—এখনই আত্মম্ভরী বাবু সমনদমন বাবুকে নিয়ে "দুর্গন্ধীন"-এর আশ্চর্য্য গুণ পরীক্ষা ক'রে দেখাতে আসবেন।

বেলা তখন ঠিক ৮টা—'ভঁ-অঁ-অঁ-প' ক'রে মোটর হর্ণের আওয়াজ হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার ঘোষ আর সিংহ মশাই এসে হাজির হলেন।

যথারীতি সাদর সম্ভাষণ প্রভৃতির পর মোটর থেকে দুটি কাঠের বাক্স নামান

হ'ল। তার একটির মধ্যে একটি তুলো-ভরা টিনের বাক্স, তা'র মধ্যে ছোট একটি কৌটা, তার মধ্যে তুলোয় ঘেরা একটি ছোট্ট শিশি। সেই শিশির আবার কাচের ছিপির উপর একটি কাচের ঢাকনি লাগান; ঢাকনির চারি পাশ আবার গালা দিয়ে বেশ ক'রে আঁটা। এত কাণ্ড ক'রে মাত্র ১০ ফোঁটা "দুর্গন্ধীন" আনা হয়েছে, কারণ, এক ফোঁটাই নাকি "দারুণ-est" দুর্গন্ধ দূর করার পক্ষে যথেষ্ট।

এবার পরীক্ষা আরম্ভ হবে। বিপদবারণ বাবু এবং অন্যান্য সকলে একবার নাকের কাপড় খুলে মুহূর্ত্তের জন্য ড্রেনের গন্ধটা শুঁকে গন্ধের গভীরতা আর উৎকটতা অনুভব ক'রে নিলেন।

তার পর প্রফেসার ঘোষের মোটর থেকে অন্য যে বাক্সটি নামান হয়েছিল তার মধ্যে থেকে কয়েকটি অদ্ভুত মুখোস-গোছের যন্ত্র বের করা হ'ল। সেগুলো নাকি "Gas-mask" (অর্থাৎ, গ্যাস্ থেকে আত্মরক্ষার মুখোস)। প্রত্যেকের মুখে এক-একটি মুখোস পরিয়ে দিয়ে প্রফেসার ঘোষ বললেন, "এবার আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, আমি শিশির ছিপি খুলব।"—বলেই তিনি আর সিংহ মশাই এক-একটি মুখোস প'রে নিলেন।

এবার শিশির ছিপি খুলে ড্রেনের মধ্যে ফোঁটা ঢালবার পালা। প্রফেসার ঘোষ আস্তে আস্তে ছিপির উপরের ঢাকনির গালা চেঁছে ফেলে দিয়ে, ঢাকনি খুলে, শিশিটাকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে ধরলেন; সিংহ মশাই ছিপি খুলবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। হাত দিয়ে ধ'রে ছিপি খুলবার রীতিমত চেষ্টা করলেন—কিছুতেই কিছু হ'ল না। তখন একটা মোটা চিমটে দিয়ে ধ'রে কাচের ছিপিতে এক পাক দেওয়া হ'ল। অমনি শিশির গলাটি ভেঙে ছিপিশুদ্ধ গলা সিংহ মশায়ের হাতে উঠে এল আর শিশির ভিতর থেকে দারুণ গ্যাস্ ভুস্‌ভুস্ করে বের হ'তে লাগ্‌ল।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই শিশির দিকে চেয়ে ছিলেন। তার পর যখন "দুর্গন্ধীন"-এর দারুণ দুর্গন্ধ সেই মুখোস ভেদ ক'রেও তাঁদের নাকে অল্প অল্প যেতে আরম্ভ করল তখন সকলেই আত্মমর্য্যাদা ভুলে, প্রাণটি হাতে ক'রে চোঁচা দৌড় দিলেন। প্রফেসার ঘোষ আর সিংহ মশাই তো আগেই দৌড় দিয়েছেন—শিশিটি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এর পর যা' ঘটেছিল তা' আর বেশী ব'লে কাজ নেই। সে পাড়ার সব বাড়ী দেখ্‌তে দেখ্‌তে খালি হ'য়ে গেল, আশ-পাশের গাছপালা থেকে ফুল-ফল ঝ'রে প'ড়ে গেল, কাক, চিল, চড়াই সব উড়ে পালিয়ে গেল। ঘরের বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, আরশুলা, মাছি, মশা সব পালিয়ে গেল। যে সব ছাগল, গরু আশেপাশে বাঁধা ছিল তা'রা পালাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। আধ মাইলের মধ্যে কোনও বাড়ীর লোকের আর সেদিন দুর্গন্ধে খাওয়া হয় নি। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে মুখোস প'রে, এসিড ঢেলে, আলকাৎরা ঢেলে আগুন ধরিয়ে শিশি শুদ্ধ জ্বালিয়ে শেষ করে, তবে পাড়ার লোক রক্ষা পেল।

প্রফেসার ঘোষ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সেই রাত্রেই হরিহরপুর ছেড়ে কোথায় জানি, চ'লে গেলেন—অনেকে বলে তিনি বিলাত গেছেন। সমনদমন বাবু আফগানিস্থানে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন। "সরস সমাচার" লিখ্‌ল:

"দুর্গন্ধ-দূরের দুরাশায় দারুণ দুর্গন্ধ "দুর্গন্ধীন" প্রয়োগের প্রচেষ্টায় প্রথমেই প্রকাণ্ড প্রমাদ!"

একটি অদ্ভুত ত্যাগের কাহিনী

(শেখ ফজলল্‌ করিম, সাহিত্য-বিশারদ, কাব্যরত্নাকর, নীতিভূষণ)

শান্ত জলরাশি। কোথাও একটু তরঙ্গ নেই। স্বচ্ছন্দে জাহাজ ভেসে চলেছে। আরোহীরা ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে গল্প করছে, নিজের নিজের কাজে সকলেরই প্রখর দৃষ্টি।

জাহাজখানা একবার থর্‌ থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। ওকি? হু হু শব্দে জল উঠ্‌ছে না? তবে কি·····

কাপ্তেন বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি করলেন। সবাই বুঝ্‌ল, জার্ম্মান টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ ফুটো হ'য়েছে। রক্ষা নেই, রক্ষা নেই, প্রাণ বাঁচাতে হ'লে এক্ষুণি তৈরী হ'তে হবে;—সময় হয় ত পাঁচ মিনিট!

যে যার মতন ছুটোছুটি আরম্ভ করল। কারো দিকে কেউ তেমন তাকাচ্ছে না। হায়, হায়, আর একটু পরেই কে কোথায় যাবে!

জাহাজের ডঙ্কাবাদক এক বালক। সে তার ডঙ্কাটির ওপর ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিল। একজন সৈনিক তাকে দেখে বল্‌লে, 'ডঙ্কাটি ছেড়ো না ভাই, ছেড়েছ কি মরেছ। ওর সাহায্যে তুমি অনায়াসে জলে ভাস্‌তে পার্‌বে।'

এক পল, হয় ত তা'ও নয়, তার পরেই জাহাজ ডুবে যাবে!

বালক ডঙ্কাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁপ দেবে দেবে, সহসা চোখে পড়্‌ল, আর একটি বালক,—তার চেয়ে বয়সে ছোট, তার চেয়ে দুর্ব্বল, অবলম্বনহীন, অসহায়, দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণবদনে মরণকে বরণ ক'রে নিতে।

ডঙ্কাবাদক চট্‌ ক'রে ডঙ্কাটি তার হাতে দিয়ে বল্‌লে, 'আমার চেয়ে দুর্ব্বল তুমি, আমার চেয়ে ছোট তুমি—আমার ডঙ্কাটি নাও ভাই। আমার উপায়?' সে একটু আকাশ পানে চাইল।

কথা বলার সময় নয়। আরোহীরা জলে ভেসেছে; ছোট্ট ছেলেটিও ডঙ্কায় ব'সে ভেসে চল্‌ল।

আর ডঙ্কাবাদক?

যতক্ষণ শক্তি-সাধ্যে কুলাল সে ভেসে রইল। তার পর কি হ'ল সে কথা বল্‌বার জন্য আজ আর সে দুনিয়ায় বেঁচে নাই। কিন্তু যারা তাকে ডুব্‌তে দেখ্‌ল কিংবা শুন্‌ল তার অমানুষিক ত্যাগের কথা, তাদের মনে সোনার অক্ষরে লেখা রইল তার মহত্ত্বের কাহিনী।

* * *

জাহাজখানার নাম ফর্ম্মিডেবল্‌। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ প্রণালীতে ডুবেছিল।

মধ্য এশিয়ার মরু-প্রান্তরে

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

কিছু দিন আগে তোমাদের আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির গল্প বলিয়াছিলাম। সেই যে ভীষণ দেশ—যেখানে না আছে জল, না আছে গাছপালা, না আছে কোনও জ্যান্ত প্রাণী—শুধু যত দূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ করিতেছে সীমাহীন বালির সমুদ্র ; আর আছে তু'টি জিনিষ—প্রচণ্ড বাতাস আর প্রচণ্ড উত্তাপ !

সাহারার মত অত বড় না হইলেও সাহারার মতই ভয়ঙ্কর, বিরাট্ বিরাট্ মরুভূমি পৃথিবীতে আরও অনেক আছে। আমাদের এশিয়ার ম্যাপ খুলিলেও দেখিবে তার ঠিক মাঝখানে—তিব্বতের উপরে, সাইবেরিয়ার নীচে অমানিধারা একটা বিরাট্ মরুর রাজ্য পড়িয়া আছে। সাহারার মত এ মরুভূমিও অতি ভয়ঙ্কর স্থান। শত শত মাইল ধরিয়া হয়ত সেখানে বালির সমুদ্র আর বালির পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ক্বচিৎ কোথাও এক-আধটা মরূদ্যান মিলিয়া গেলে সে তোমার কপালের জোর বলিতে হইবে। এই মরূদ্যানগুলি মরুভূমির বুকে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত ;—ছোট ছোট গ্রাম ; সেখানে গাছপালা, জল, জীবের বাস সবই পাওয়া যায়।

এই সব মরুর রাজ্যে সখ করিয়া কি কেউ যাইতে চায় ? ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে দল বাঁধিয়া সঙ্গে প্রচুর সরঞ্জাম, উট, জল ইত্যাদি লইয়া কখনও কখনও ঐ অঞ্চলের বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত কম বিপদ্‌সঙ্কুল মরুভূমি পার হয় বটে কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যার মধ্যে যাইবার কথা উঠিলে তারা শুদ্ধ আঁৎকাইয়া উঠিয়া কানে আঙ্গুল দিবে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বিপদ্‌কেই ভালবাসে—একটা নতুন কিছু জানিবার জন্য তারা না করিতে পারে এমন কঠিন কাজ নাই। জীবন জিনিষটা যেন তাদের কাছে খেলার মত নিতান্ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার। এই সব সাহসী বীরদের জন্যই পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার এত বাড়িয়াছে—পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা এত কিছু জানিতে পারিয়াছি।

অধিকতর বিপদ্‌সঙ্কুল যে সব মরুভূমির কথা বলিতেছিলাম মধ্য এশিয়ার

'টাকলা মাকান' (Takla Makan) মরুভূমি সেই রকম একটি। তুই দিকে তুই নদী—এক দিকে ইয়ারকান্দ আর এক দিকে খোটান, মাঝখানে শ' তুই মাইল যুড়িয়া এই টাকলা মাকান। এ বড় ভয়ঙ্কর মরুভূমি। ও অঞ্চলের লোকেরা ইহার নাম দিয়াছে অজানা দেশ। কোন লোক ইতিপূর্ব্বে এ মরুভূমি পার হইতে পারে নাই—এত তার বাধাবিঘ্ন ! মরুভূমিটি আগাগোড়া সুউচ্চ বালির পাহাড়ে ভর্ত্তি, আর সে বালি এত নরম যে তার উপর পা রাখিলে প্রতি মুহূর্ত্তে ভিতরে ডুবিয়া যাইবার ভয় আছে। এই মরুভূমির ভিতরে নাকি প্রায় তু' হাজার বছর আগেকার সাতটি বড় বড় সহর তাদের রাশি রাশি ধনরত্ন সমেত চাপা পড়িয়া আছে। সেই সব ধনরত্নের লোভেই মাঝে মাঝে তু'-চার জন লোক ইহার মধ্যে ঢোকে—কিন্তু তারা সকলেই ২।৪ দিন পরে অবসন্ন দেহে, খালি হাতে ফিরিয়া আসে আর নানা বিভীষিকাপূর্ণ গল্প বলে। অনেকে আবার একেবারেই ফেরে না, মরুভূমির তপ্ত বুকেই তাদের জীবন শেষ হইয়া যায়। এ হেন টাকলা মাকান মরুভূমি ডাঃ স্বেন্ হেডিন্ নামে সুইডেনের এক বীর ভ্রমণকারী কেমন করিয়া পার হইয়াছিলেন সেই গল্প আজ তোমাদের বলিব।

স্বেন্ হেডিনের নাম তোমরা অনেকেই হয়ত শুনিয়াছ। পৃথিবীর বড় বড় পর্য্যটকদের নাম করিতে হইলে স্বেন্ হেডিনের নাম গোড়ার দিকেই করিতে হয়। বিদেশীদের মধ্যে ধরিতে গেলে ইনিই প্রথম এশিয়ার—বিশেষ করিয়া মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চল এবং তিব্বত প্রভৃতি বিদেশীদের প্রায় অগম্য দেশগুলি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সব ভ্রমণের সময়ে তাঁকে কত রকম বাধাবিঘ্ন, কত রকম ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁর লিখিত ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে তা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কখনও তুরন্ত শীতের মধ্যে রক্ত জমাট-করা বরফের রাজ্যে তাঁকে দিন কাটাইতে হইয়াছে, আবার কখনও ঠিক বিপরীত ভাবে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অগ্নিকুণ্ডের মত মরুভূমির বুকে তাঁর দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে। সে সব অতি বিস্ময়কর কাহিনী। শুধু দেশ বেড়াইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেই সব দেশের মানচিত্র তৈরী করিয়াছেন, নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে দেশের লোকদের সঙ্গে মিশিয়া, ভাব করিয়া তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের

জীবনযাত্রার প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছেন। এমনি ভাবে তিনি পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার অনেকখানি বাড়াইয়াছেন। এজন্য তাঁকে অনেক সময় বিপদেও পড়িতে হইয়াছে কিন্তু তাতে তিনি একটুও বিচলিত হন নাই—তাঁর ভ্রমণের নেশা একটুও কমে নাই।

স্বেন্ হেডিন্ যাইতেছিলেন মধ্য এশিয়া হইতে তিব্বতের দিকে। অনেক-

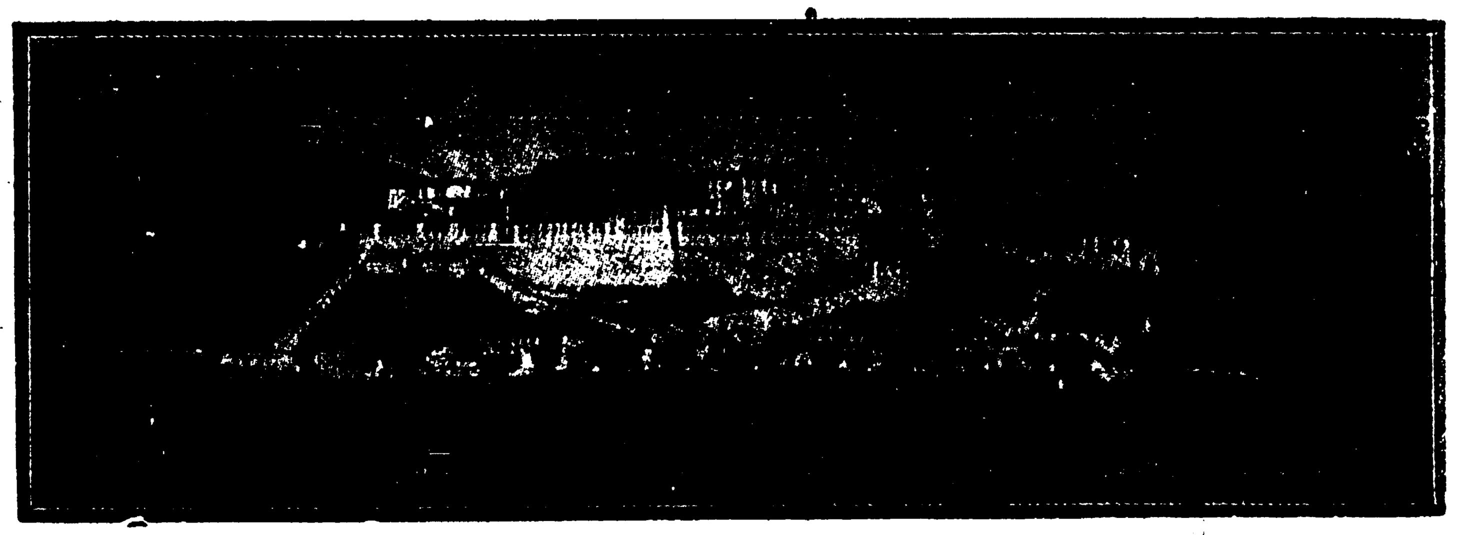

তিব্বতের একটি দৃশ্য

খানি পথ অগ্রসর হইবার পর তিনি এই টাকলা মাকান মরুভূমির ধারে আসিয়া পড়িলেন। তিব্বত পৌঁছিতে হইলে তাঁকে এই মরুভূমি পার হইতে হইবে।

সে অঞ্চলের লোকেরা স্বেন্ হেডিন্‌কে নানা রকম ভয় দেখাইয়া এ মরুভূমি পার হইতে নিষেধ করিল; ইহার সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গল্প বলিল, জানাইল যে এ মরুভূমি পার হইতে গিয়া কেউ ফিরিয়া আসে নাই—মানুষের পক্ষে এ নিতান্তই অসাধ্য কাজ। কিন্তু স্বেন্ হেডিন্ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'তবে তো আমি নিশ্চয়ই যাইব। মানুষের পক্ষে যখন এ মরুভূমি পার হওয়া অসাধ্য তখন তো বাছিয়া বাছিয়া এই পথেই আমাকে যাইতে হইবে।' মরুভূমির মধ্য দিয়া একটা আঁকাবাঁকা শুক্‌না নদী ছিল,' অন্য লোক হইলে হয়ত ওরই মধ্যে একটু ঘুরিয়া সেই নদীর পাড় দিয়া মরুভূমি পার হইতে চেষ্টা করিত—কিন্তু স্বেন্ হেডিন্ বলিলেন, 'না, অত ঘুরিতে যাইব কেন? একেবারে সোজাসুজি মরুভূমি পার হইতে হইবে।'

১৮৯৫ সনের এপ্রিল মাসে স্বেন্ হেডিন্ তাঁর এই ভীষণ যাত্রা সুরু করিলেন। সঙ্গে লইলেন আটটা বড় বড় বলিষ্ঠ উট, কতকগুলি ভেড়া, কুকুর, মুরগী আর

তাঁবু প্রভৃতি অন্যান্য দরকারী সরঞ্জাম। তা' ছাড়া তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে রহিল ইস্‌লাম নামে একটি বিশ্বাসী চাকর, একজন উটচালক আর এক কাসিম নামেরই দু'জন লোক। তাদের একজন ইতিপূর্ব্বে বহু বার মরুভূমির মধ্যে গিয়াছিল, কাজেই সেদিক্‌কার রাস্তা-ঘাট তার কিছু কিছু জানা ছিল, সে-ই হইল দলের পথপ্রদর্শক।

মরুভূমির ভিতর দিয়া এপার ওপার একটা প্রকাণ্ড পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। স্বেন্ হেডিন্ ঠিক করিলেন তাঁরা এই পাহাড়ের তলা ঘেঁষিয়া যাইবেন। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে তাঁদের প্রায় দুই সপ্তাহ লাগিয়া গেল। এই পথটুকু সমস্তই আগাগোড়া বালির স্তূপে ভরা—শুধু মাঝে মাঝে দু'-একটা "পপ্‌লার" গাছ আর "টামারিস্কে"র ঝোপ চোখে পড়িল। এই গাছগুলির সবই প্রায় গলা পর্য্যন্ত বালির মধ্যে ডোবা। এ যাবৎ জলের জন্য তাঁদের খুব বেশী কষ্ট হয় নাই; সঙ্গে উটের পিঠে বড় বড় পিপে বোঝাই জল তো ছিলই, তা' ছাড়া মাটী খুঁড়িয়াও কিছু কিছু জল পাওয়া যাইত (যদিও সে জলের চেহারা খুব লোভনীয় নয়)। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা ছোট হ্রদ ছিল, কয়েকটা বন্য উট আর বন-মোরগের সঙ্গেও সেখানে মোলাকাৎ হইল। মোটের উপর তখন পর্য্যন্ত নিরুৎসাহ হইবার মত কোন কিছু ঘটে নাই।

কিন্তু তার পরেই সুরু হইল আসল মরুভূমি—শুধু সীমাহীন বালির সমুদ্র—যত দূর চোখ যায় অগণিত সমুদ্রের ঢেউএর মত বালির পাহাড় ছাড়া আর কিছু নাই;—কোনও জীবজন্তু, গাছপালা, এমন কি একটা পোকা-মাকড় পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। পথপ্রদর্শক কাসিম জানাইল এই পথটুকু পার হইতে ৪।৫ দিন লাগিবে; ম্যাপ্-ট্যাপ্ দেখিয়া স্বেন্ হেডিনেরও তাহাই মনে হইল। কিন্তু সাবধানের বিনাশ নাই, তাই তিনি অনুচরদিগকে অন্ততঃ দশ দিনের উপযুক্ত জল তুলিয়া সঙ্গে লইতে আদেশ দিলেন কারণ এবার হইতে পথে আর এক ফোঁটা জল পাইবার আশা নাই।

আদেশ দিলেন বটে কিন্তু সে আদেশ মত কাজ হইল কিনা সেটা আর তিনি দেখা আবশ্যক বোধ করিলেন না। ওইখানেই হইল ভুল। চার-পাঁচ দিনের

রাস্তা শুনিয়া দলের লোকেরা আর স্বেন্ হেডিনের সতর্ক বাণী গায়ে মাখিল না; তারা আর কষ্ট করিয়া দশ দিনের উপযোগী জল তুলিল না, কেবল ৪।৫ দিনের মত্তই জল লইল। এই কুঁড়েমির ফল শীঘ্রই ফলিল।

খানিক দূর গিয়াই পথ দুর্গম হইতে আরম্ভ করিল। বড় বড় বালির ঢিপি খুব ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিল—তার কোন কোনটা ১৫।২০ তালা বাড়ীর সমান উঁচু। এক-এক মাইলের মধ্যে এ রকম ৫।৬টা করিয়া স্তূপ পার হইতে হইল, ফলে একটু পরেই সকলে দারুণ রকম পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শুধু তাই নয়, ঢিপিগুলি এক দিকে অত্যন্ত ঢালু, আর এত নরম বালিতে তৈরী যে একটুতেই পা ফস্কাইয়া যায়, আর পা ফস্কাইলেই উটশুদ্ধ একেবারে স্তূপের তলায়।

ক্রমে পথ আরও দুর্গম হইতে লাগিল; তার পর সুরু হইল বাতাস। সে কী বাতাস! সমস্ত আকাশ ধূলায় ঢাকা পড়িয়া অন্ধকার হইয়া গেল, আর উড়িয়া-আসা বালির ঘষা লাগিয়া নাক, মুখ, কান, এমন কি জামার ভিতরকার চামড়া পর্য্যন্ত ক্ষতবিক্ষত—রক্তাক্ত হইয়া গেল। এই অবস্থায় স্বেন্ হেডিন্ আবিষ্কার করিলেন, কুঁড়েমি করিয়া সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল আনা হয় নাই। কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। রাত্রে মাটী খুঁড়িয়া জল বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু ১০।১২ ফিট্ খুঁড়িয়াও এক ফোঁটা জল পাওয়া গেল না।

ক্রমে জলের অভাবে একটি দু'টি করিয়া উট মরিতে লাগিল কিন্তু রাস্তা আর ফুরাইতে চায় না। পথ ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া স্বেন্ হেডিন্ দলের আগে আগে চলিলেন আর উটগুলির পরিশ্রম কমাইবার জন্য সকলে হাঁটিয়া রওনা হইলেন। উটদের জল দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কারণ মানুষ আগে, তার পর উট। অবশ্য এ জন্য রুটি-মাখনগুলি উটদের খাওয়াইতে হইল। নিজেদের জল খাওয়াও একেবারে কমাইয়া দেওয়া হইল। নেহাৎ অসহ্য হইলে শুধু ঠোঁটটা ভিজাইবার মত জল দেওয়া হইবে—স্বেন্ হেডিন্ এই রকম আদেশ দিলেন।

এদিকে রাস্তা ক্রমেই দুর্গম হইতেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন চারদিক্ অন্ধকার করিয়া প্রবল শব্দে এক মরু-ঝড় আসিয়া হাজির। সে কি ঝড়! সকলের

গা, হাত-পা যেন কাটিয়া লইতে চায়! কোন রকমে মুখ গুঁজিয়া সকলে পড়িয়া রহিলেন। পর দিন সকাল বেলা দেখা গেল সমস্ত জিনিষপত্র কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই সৃষ্টিছাড়া রাজ্যে তো আর চোরের ভয় নাই, কাজেই স্বেন্ হেডিন্ অনুমান করিলেন জিনিষপত্র নিশ্চয়ই ঝড়ে উড়িয়া-আসা বালির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। হইয়াছিলও তাই। মাটী খুঁড়িয়া সেগুলি বাহির করা হইল।

ক্রমে জলের ভাণ্ডার আরও কমিয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া উটগুলির পরিশ্রম আরও লাঘব করিবার জন্য স্বেন্ হেডিন্ তাঁর আসবাবপত্রের অনেক কিছুই পথে বিসর্জ্জন দিলেন। সাত দিনের দিন দেখা গেল সঙ্গে যে দু' পিপে জল অবশিষ্ট ছিল তারও অনেকখানি চুরি গিয়াছে। প্রচণ্ড পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া দলের লোকেরাই লুকাইয়া সে জল খাইয়া ফেলিয়াছে। স্বেন হেডিন্ মহা বিপদে পড়িলেন। কারণ একবার তৃষ্ণা মিটিলেও এ এমনই জায়গা যে এখানে পদে পদে নূতন করিয়া পিপাসা পাইবে। কিন্তু পাইলেও এখন আর কোন উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে ঠোঁট ভিজাইবার মত জলটুকুও ফুরাইয়া গেল।

কিন্তু মরুভূমিও আর ফুরায় না, পিপাসাও আর যায় না। দেখিতে দেখিতে দলের সকলে পাগলের মত হইয়া গেল। অনাহারে তারা থাকিতে পারে কিন্তু এক ফোঁটা জল না পাইলে আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু কোথায় জল? অবশেষ অনুচরেরা ঠিক করিল সঙ্গের শেষ ভেড়াটাকে কাটিয়া তার রক্ত পান করিয়া পিপাসা মিটাইবে। ভেড়াটাকে কাটা হইল, কিন্তু দেখা গেল যে তার রক্ত এমন ভয়ানক ভাবে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে যে তা' আর পান করা যায় না। লোকগুলির গলাও এমন শুকাইয়া গিয়াছে যে শক্ত কিছু গিলিবার সাধ্য তাদের নাই, চেষ্টা করিলে গলা ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। এদিকে স্বেন্ হেডিন্ নিজেও পিপাসায় পাগলের মত হইয়া গেলেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া তিনি সঙ্গের ষ্টোভ্ জ্বালিবার স্পিরিট্টুকু লইয়া গলায় ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তা' কি আর কেউ খাইতে পারে? পরমুহূর্ত্তেই তিনি অবসন্ন দেহে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না,

তারা তাঁকে সেখানে ফেলিয়াই রওনা হইয়া গেল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না, কিছুক্ষণ পরেই স্বেন্ হেড়িন্ টলিতে টলিতে গিয়া তাদের ধরিয়া ফেলিলেন—তারা পথে বিশ্রাম করিতেছিল।

সঙ্গের যা কিছু জিনিষপত্র এবার সব ফেলিয়া দেওয়া হইল—নেহাৎ যা না লইলে চলে না তাহাই শুধু লইয়া তাঁরা রওনা হইলেন। এই জিনিষগুলির মধ্যে স্বেন্ হেডিন্ তাঁর নোট্-বইখানাকেই সব চাইতে দামী বলিয়া মনে করিতেন, সেখানা সঙ্গে লইতে তিনি ভুলিলেন না।

খানিক দূর গিয়া পথপ্রদর্শক কাসিম ও উট-চালক আর চলিতে পারিল না, তারা সেখানেই—সম্ভবতঃ চিরতরেই রহিয়া গেল। ইস্‌লাম, অপর কাসিম এবং স্বেন্ হেডিন্ তখনও চলিতে লাগিলেন। শেষে ইস্‌লামও বসিয়া পড়িল, তার কাছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন ফেলিয়া রাখিয়া বাকী দু'জন আগাইয়া চলিলেন।

পথে অসহ্য গরম। সূর্য্যের দিকে তাকান' পর্য্যন্ত যায় না। হতাশ হইয়া তাঁরা মাটীতে এক গর্ত্ত খুঁড়িলেন, তার পর পরনের জামা-কাপড় লইয়া তাঁর মত আড়াল দিয়া তার ছায়ায় কোন রকমে পড়িয়া রহিলেন। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িল, তাঁরাও উঠিয়া পোষাক পরিয়া লইয়া আবার রওনা হইলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়িল সামনে কতকগুলি টামারিস্ক গাছের ঝোপ। তবে হয়ত পথ শেষ হইতে আর দেরী নাই। তাঁদের তখন সে কি পুলক! কোন রকমে পড়িতে পড়িতে গিয়া তাঁরা সেই গাছের নীচে দাঁড়াইলেন, গাছের পাতা ছিঁড়িয়া সেই পাতা চিবাইয়া গলাটা একটু ভিজাইবার চেষ্টা করিলেন। তার পর রাত্রে, যদি ইস্‌লাম বাঁচিয়া থাকে তবে তা'কে নিশানা দিবার জন্য, সেখানে একটা আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তাঁরা আবার রওনা হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল ঝোপ আর দেখা যাইতেছে না, আবার সেই পুরানো বালির সমুদ্র। কাসিম সমস্ত আশা ছাড়িয়া দিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িল, স্বেন্ হেডিন্ আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু খানিক পরে তাঁকেও বসিতে হইল, কাসিম আবার গিয়া তাঁকে ধরিল। সঙ্গে অতি সামান্য কিছু খাবার তখনও ছিল ; কোন রকমে তাহাই মুখে পূরিয়া অতি কষ্টে থামিয়া থামিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলেন।

স্বেন্ হেডিন্

অবশেষে এক দিন দেখা গেল দূরে অস্পষ্ট একটা কালো রেখা দেখা যাইতেছে। তাঁরা মরুভূমির প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—ঐ বুঝি নদীর রেখা! একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য তাঁরা বিপুল উদ্যমে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কাসিমের সে শক্তি ছিল না, সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। স্বেন্ হেডিন্‌ও হাঁটিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু তিনি থামিলেন না, হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

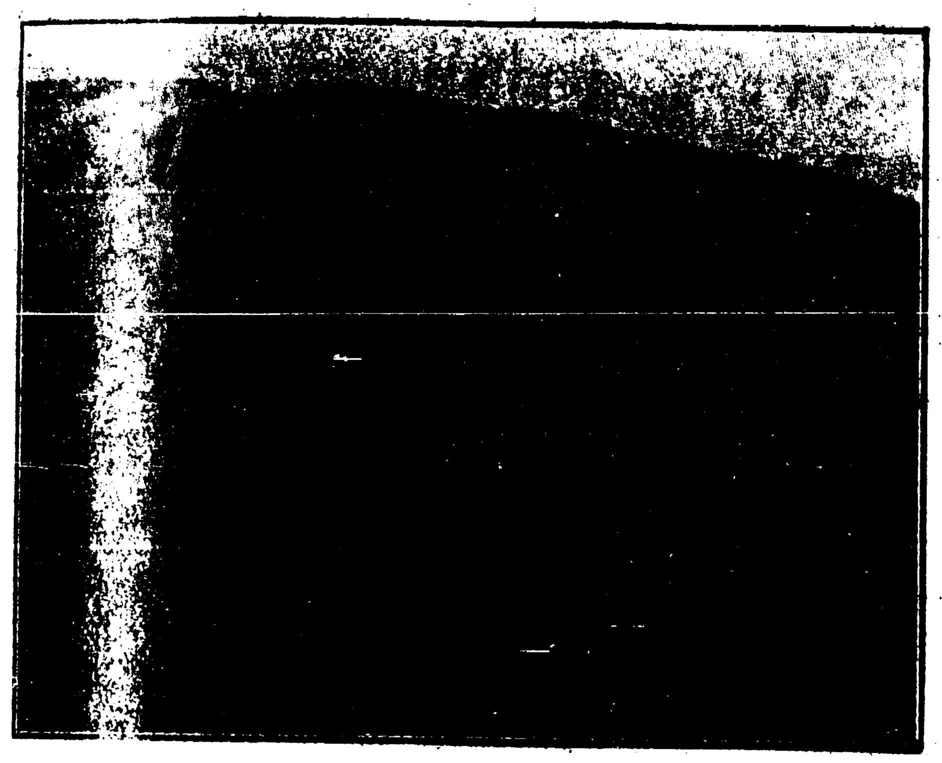

মধ্য এশিয়ার মরুরাজ্যের নদী। নদীর ওপারে যে পাহাড় দেখা যাইতেছে ওটা তৈরী হইয়াছে উড়িয়া-আসা বালি জমিয়া।

কিন্তু হায়! কাছে গিয়া দেখেন নদী আছে বটে কিন্তু তা একেবারে শুষ্ক—এক ফোঁটাও জল তার মধ্যে নাই। অন্য লোক হইলে হয়ত ঐখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত কিন্তু হেডিন তখনও আশা ছাড়িলেন না; হয়ত ওপারে জল আছে এই আশায় তিনি কোন রকমে সেই শুষ্ক নদীর উপর দিয়াই চলিলেন—দু' মাইল পথ পার হইতে আর পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। শেষে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখা গেল নদীর ওপারে সত্যিই খানিকটা টলটলে জল রহিয়াছে।

অঞ্জলি ভরিয়া হেডিন্ জল পান করিতে লাগিলেন। সে কি অসীম তৃপ্তি! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর কাসিমের কথা মনে পড়িল; তিনি পা হইতে জুতা খুলিয়া সেই জুতা পূর্ণ করিয়া জল লইলেন, তার পর ফিরিয়া আসিয়া কাসিমকে সে জল পান করাইলেন। কাসিম প্রাণে বাঁচিল কিন্তু তার আর নড়িবার শক্তি ছিল না। সুতরাং স্বেন্ হেডিন্ একাই নদীর ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন। কয়েক দিন তাঁকে শুধু বেঙাচি আর ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইল—পথে খাইবার মত আর

কিছুই ছিল না। অবশেষে এক দিন কয়েক জন রাখালের সঙ্গে তাঁর দেখা হইল, তারাই তাঁর জীবন রক্ষা করিল।

এদিকে ইস্‌লাম হেডিন্ ও কাসিমের আগুনের নিশানা লক্ষ্য করিয়া রওনা হইয়াছিল—শুধু হাতে নয়, স্বেন্ হেডিনের পরিত্যক্ত টাকা-পয়সা এবং যতটা সম্ভব অন্যান্য আসবাবপত্র একটা উটের পিঠে চাপাইয়া লইয়াছিল। সেও কোন রকমে নদীর ধারে পৌঁছিয়া প্রাণ রক্ষা করিল, তার পর এক দিন স্বেন্ হেডিন্‌কে খুঁজিয়াও বাহির করিল। এই বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তির জন্য স্বেন্ হেডিন্ তাঁর হারানো সম্পত্তির অনেকটাই ফিরিয়া পাইলেন।

ডাঃ চিরঞ্জীবের এড্‌ভেঞ্চার

(লেখক ও শিল্পী—সত্যগোপাল)

রেঙ্গুন
মং তাই-এর কফি-কেবিন।

প্রিয় রণু,

তোমার চিঠিখানা যথাসময়েই পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে একটু দেরী—হ্যাঁ, বেশ একটু দেরী হ'য়ে গেল। কিছু মনে ক'র না। যে-রকম কাজের চাপ তাতে সময় ক'রে ওঠা দায়। তার ওপর মানসিক অবস্থা নর্ম্যাল রাখা আমার পক্ষে বড় মুস্কিলের কথা। এই দেখ না, বাড়ী থাকতেও কফি-কেবিনে ব'সে চিঠি লিখতে হ'চ্ছে। তার কারণ, বাড়ীতে খেতে আর ঘুমোতে ছাড়া বসবার সময় হয় না। আবার—সময় হ'লে হয়ত খেয়াল হয় না। বিশেষ ক'রে এইবার এত দেরী হ'য়ে গেল ওই কোকেনওয়ালাটার কেসে ঢুকে। খবরের কাগজে কি-ই বা প'ড়েছ, আসল গল্প শুনলে হাঁ হ'য়ে যাবে। সত্যি, ভারী জবর আর ভারী

মজার। তোমার ঔৎসুক্য মেটাতে দেরী হ'য়ে গেল, তবু আশা করি খুসী-ই হবে। শোনো তা হ'লে,—

সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কয়েক মাস থেকেই একজন লোক অর্থাৎ ওই কোকেনওয়ালার খোঁজে ঘুরতে হ'চ্ছিল সে কথা তো আগের চিঠিতেও জেনেছ। লোকটা গোপনে কোকেন আমদানী ক'রে বিক্রী ক'রত। এত গোপনে বিক্রী ক'র্‌ত যে, আমরা চার জন অফিসার সারা রেঙ্গুন ঘেঁটেঘুঁটে তার টিকিরও পাত্তা পাই নি। এই রকম ধড়িবাজ লোক—যারা গোপনে আবগারী ডিপোর নিষিদ্ধ জিনিষ আমদানী-রপ্তানি করে ইংরেজীতে তাদের বলে 'স্মাগ্‌লার' (Smuggler)। যা' হোক্, এই লোকটার 'কেপাসিটিতে' মুগ্ধ হ'য়ে আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম "বুড়ো শেয়াল।" অফিসে বা রাস্তায় আমাদের চার জনের দেখা হ'লেই প্রশ্ন উঠ্‌ত, "বুড়ো শেয়ালের খবর কি হে?"—তার পর উত্তর শুনে মুখের চেহারা লম্বা হ'য়ে যেত!

হ্যাঁ, সেদিনকার কথা ব'লছিলাম। শোন। বিকেল তিনটে থেকে বর্ষাতি এঁটে আর টুপীটা চোখের ওপর টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে পথে, গলিতে গলিতে। যেখানে সন্দেহ হ'চ্ছে, সেখানে সিগার ধরাতে থাম্‌ছি। কিন্তু কোথাও বুড়ো-শেয়ালের অস্তিত্বের কোন খবরই পাচ্ছি না। মাথার ওপর দু'-তিন পশ্‌লা বৃষ্টিও হ'য়ে গেল। মনটা নেহাৎ খিঁচ্‌ড়ে গেল। হঠাৎ দেখা হ'ল সহকর্ম্মী রামারাও-এর সঙ্গে। একেবারে খাঁটি মাদ্রাজী চেহারা তার। দেখলেই বোঝা যায় দক্ষিণ ভারত তার জন্মভূমি। সর্ব্বদা খুব সাহেবী ষ্টাইলে থাকার চেষ্টায় সে ব্যগ্র এবং ব্যস্ত। দেখা হ'তেই হ্যাণ্ডসেক ক'রলে। নিয়ম মত বুড়ো শেয়ালের খবর জিজ্ঞেস ক'রলাম। তার মুখটা দেখ্‌লাম—একটু উজ্জ্বল-উজ্জ্বল মনে হ'ল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বেশ 'য়্যাট্র্যাক্‌টিভ্ ষ্টাইলে' সে ব'ললে, "উঃ, বহু কষ্টের পর এত দিনে খবর পাওয়া গেছে, ডাক্তার। এই ভবঘুরে বৃত্তি থেকে এবার সত্যিই আমরা মুক্তি পাব। না, না, খুব দেরীতে নয়, আজই!"

এই ব'লে সে গর্ব্বোজ্জ্বল হাসি হাসতে লাগ্‌ল। কৌতূহলী আমি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস ক'রলাম, "সত্যি? সত্যি?"

রামারাও নিজস্ব ভঙ্গীতে আবার সুরু ক'র্‌ল, "আরে, হ্যাঁ ডাক্তার, সত্যি। বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি খুব 'ঈগার' (Eager) হ'য়ে উঠেছ ব্যাপারটা শুনবার জন্যে। আচ্ছা শোন তা হ'লে। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় ছুতোর গলিতে একটা কফি-কেবিনে ঢুকে কাপের পর কাপ কফি ধীরে ধীরে চুমুক মেরে মেরে শেষ কর্‌ছি, আর চোখ-কান খাড়া ক'রে কিছু আবিষ্কার ক'রবার চেষ্টা ক'রছি। কিন্তু চার দিকের আব্‌হাওয়া একেবারে শান্তিময়। শেষে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ব উঠ্‌ব কর্‌ছি, এমন সময় দুটো, শীর্ণাকৃতি বার্ম্মিজ ঢুকলো ঘরে। খিঁচ্‌ড়ে-যাওয়া চেহারা দেখেই মনে হয় নেশাখোর। একটা বর্ম্মা ধরিয়ে ফুঁকতে সুরু ক'রলাম। তারা আমার পাশের টেবিলে। আমার চেহারা দেখে তারা বুঝ্‌তে পার্‌ল আমি দক্ষিণ ভারতীয়, তাই ধ'রে নিল যে আমি তাদের ভাষা বুঝবার যোগ্য নই। এক-এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ফুস্ ফুস্ ক'রে কথা সুরু ক'রলে তারা। একজন ব'ললে, 'আজ কৌটো খালি ভায়া। খবর তো রাখতে পারি নি। ব'লতে পার কোথায় দেখা পাওয়া যাবে?' দ্বিতীয় জন ব'ললে, 'পারি বৈকি। আমারও কৌটো খালি হবে কাল। আজই ভাঁড়ার পূরো ক'রে রাখতে চাই।' তার পর —একটা মুখভঙ্গী ক'রে নাক র'গ্‌ড়ে আসল কথাটা খুলে ব'ল্‌লে। ব'ল্‌লে, 'সাড়ে ছ'টার সময় সহরের পশ্চিম প্রান্তে শেষ কফি-কেবিনের সামনে।' শুন্‌লে? এ নিশ্চয়ই বুড়ো শেয়াল। আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি। কিন্তু দেখ ভাই, সাবধান, আমার এলাকায় যেও না ব'লে দিচ্ছি। আমিই খবর যোগাড় ক'রেছি, আমিই ওকে পাকড়াও ক'র্‌ব। নেহাৎ তুমি, তাই ব'ললাম তোমাকে সব কথা।'

আমি বললাম, "আরে না, না, সে কি কথা। তোমার পথে আমি কাঁটা হব কেন! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি তুমি বুড়ো শেয়ালের লেজ ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের দেখাবে।"

কিন্তু খবরটা শুনে আমি একটু বিমর্ষও হ'লাম, আর যথেষ্ট সন্দেহও মগজে ভীড় ক'রে চ'লে এল। বিশেষ ক'রে মুখভঙ্গী আর নাক রগ্‌ড়ানোর কথা শুনে আমার মনে সত্যিই সন্দেহ হ'ল যে, ওরা কোন সাঙ্কেতিক ধরণে খবরটা আদান-

প্রদান করে। তা ছাড়া ও রকম গুরুতর ব্যাপার খোলাখুলি ভাবে কেউ বলাবলি ক'রতে কখনোই সাহস করে না।

যা' হোক্, তার পর দু' চারটে কথার পর সে হেল্‌তে দুল্‌তে চ'লে গেল গন্তব্য পথে। আমি একটা সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে উল্টো পথে ধীরে ধীরে চল্‌লাম। সন্ধ্যা কখন হ'য়ে গেছে, রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্ব'লে উঠেছে—আমার তখনও খেয়াল হয়-নি। হঠাৎ ঝম্ ঝম্ ক'রে নাম্‌ল বৃষ্টি। তখন আমার চমক ভাঙ্গ্‌ল। রিষ্টওয়াচের ঘণ্টার কাঁটা সাতের দাগ পেরিয়ে গেছে। চোখ তুলে চার দিক্ একবার দেখে নিলাম। দেখ্‌লাম আমি এসে প'ড়েছি একেবারে সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে—একেবারে শেষ রাস্তায়। বাতি-টাতি খুব কম, তবে রাস্তাটায় গোটা কয়েক চা-কফির দোকান আর হোটেল আছে। সেগুলোতে তখন দু'চারজন লোকের সমাগম হ'য়েছে। বৃষ্টিও নাম্‌ল ভীষণ জোরে, আর ঘুরে ঘুরে ক্ষিধেও পেয়ে গিয়েছিল খুব। সাম্‌নেই মা-ইয়োপোর কফি-কেবিন—ঢুকে প'ড়লাম। সে তখন এক রাশ শুক্‌নো মাছ, শুক্‌নো বাঁধাকপি ইত্যাদির মধ্যে ব'সে ছিল। সেলাম ক'রে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস কর্‌ল। তার পর উঠে গেল খাবার আনতে।

দোকানে তখন কেউ ছিল না। হঠাৎ রামারাওএর কথা মনে প'ড়ে গেল। সে বোধ হয় এতক্ষণে বুড়ো শেয়ালকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গিয়ে হম্বিতম্বি ক'রছে। একবার মনে হ'ল, যাওয়া যাক্ অফিসে—সত্যিই রামারাও ওকে ধ'রতে পার্‌ল কিনা দেখ্‌তে। কিন্তু বৃষ্টির তোড় দেখে, আর উদরগহ্বরের হাঁহাকার শুনে অস্থির না হ'য়ে বেশ স্থির হ'য়ে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়লাম।

মা-ইয়োপো খুব চেনা লোক। আমার চেহারা আন্দাজে খাবার আনতে ভুল ক'র্‌ল না। খুসী হ'য়ে ধীরে-সুস্থে আহারে মন দিলাম। জানই তো, খেতে আমার কতখানি সময় লাগে। খাওয়া যখন প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়েছে, তখন বৃষ্টিটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চ'লে গেল। রাস্তায় একজন দু'জন ক'রে লোকের আমদানী হ'তে লাগ্‌ল। দু'-একজন মা-ইয়োপোর দোকানে ঢুকে কফি-চা ইত্যাদি খেতে সুরু ক'রল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা লোক মুখে ঐ রকম আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে আসছে। আওয়াজটা কতকটা—অনেকগুলো মৌমাছির গুণ্‌গুণানির মত, তবে কি একটা সুরও যেন আছে ব'লে মনে হ'ল। একটু কৌতূহলী হ'য়ে তাকে দেখতে লাগ্‌লাম। লোকটা একটু কুঁজো হ'য়ে প'ড়েছে, চীনাম্যানের মত ঢিলা পায়জামা আর জামা পরা, একটা অতি পুরোনো টুপী একেবারে চোখের ওপর টানা। কুঁজো হ'য়ে চ'লছিল বলে তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। যেই দোকানের সামনে এল, অম্‌নি দোকানের আলোয় তার মুখটা দেখা গেল। লোকটা চীনাম্যান্। অকালপক্ক চেহারা তার মুখের, ভয়ানক নেশাখোরের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তা'তে। থ্যাঁদা নাক প্রায় ছুঁচলো হ'য়ে এসেছে, মুখে গভীর দাগ প'ড়ে গেছে। লোকটার হাতে দেখলাম চারটে ফাউণ্টেন পেন। সেইগুলো বাড়িয়ে ধ'রে সে মুখে ঐ রকম আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। ফিরিওয়ালা আর কি,—ফাউণ্টেনপেন বিক্রী করা ব্যবসা, সকলকে আকৃষ্ট ক'রবার জন্যেই অমন সুর ভাঁজ্‌ছে। দেখে বোঝা গেল তার জামার পকেটগুলোতেও অনেক পেন আছে। তার হাতে যেগুলো ছিল সেগুলো সব ভিন্ন ভিন্ন রঙের। একটা সাদা, একটা ধূসর, একটা সবুজ আর একটা লাল।

লোকটা দু'-তিনবার দোকানের সামনে থেকে এপার ওপার মোড় পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ গজ রাস্তা ঘোরাফেরা কর্‌ল। ইতিমধ্যে কোন খদ্দেরই পেল না। একটা লম্বা-চওড়া পাঠান ভিড়ের ভেতর থেকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস কর্‌ল, "কেৎনা ?"

ফিরিওয়ালা চীনাভাষায় বল্‌ল, "আট টাকা।"

পাঠানটা বুঝতে না পেরে ওয়েষ্টকোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে দোকানে এসে এক কাপ কফি খেতে বস্‌ল। আমার খাওয়া তখন শেষ হ'য়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে একটা বর্ম্মা ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি আর কি! তখন একটা বর্ম্মিজ খদ্দের দাঁড়ালো ফিরিওয়ালার সামনে। নীচু গলায় কি দর কষাকষি ক'রে সে আটটি টাকা নগদ দিয়ে ধূসর রঙের পেনটা নিয়ে চ'লে গেল। আমিও আর মিনিট তিনেক ব'সে উঠ্‌ব উঠ্‌ব কর্‌ছি, হঠাৎ দেখি সেই খদ্দেরটা ফিরে এসে ব'ললে,

পেন তার বৌএর পছন্দ হ'চ্ছে না, ফেরৎ নিতে হবে। আবার দর কষাকষি ক'রে সে পাঁচটি টাকা ফেরৎ নিয়ে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে চ'লে গেল। পেনওয়ালা বল্‌লে "আগেই তো ব'লেছিলাম বাপু, আমার কাছে এই নিয়ম।"

কথাগুলো আমার কানে কি রকম সন্দেহজনক ঠেক্‌ল। আমি উঠে গেলাম তার কাছে। ঠিক তখন একটা চীনাম্যান্ সাদা রঙের পেন্‌টা নিয়ে টাকা দিয়ে চ'লে গেল। আমি পেনওয়ালাকে বল্‌লাম, আমি একটা পেন চাই। সে তার হাতের পেন্‌গুলো বাড়িয়ে ধর্‌ল। সাদাটার বদলে তখন সে একটা বেগুনী রঙের পেন্ বের ক'রেছিল। আমার সত্যিই সন্দেহ হ'য়েছিল। আমি চাইলাম ধূসর রঙের পেন্‌টাই। সে রাজি হ'ল না। দু'-চারবার চেষ্টা ক'রার পরেও যখন সে রাজি হ'ল না, তখন তার মুখের দিকে চাইলাম। মনে হ'ল আর বার কয়েক চেষ্টা ক'রলেই সে ওটা দিয়ে দেবে। আমার সন্দেহ বাড়্‌ল। মিনিটখানেক চিন্তা ক'রে আমি খপ্ ক'রে সবুজ রঙের পেন্‌টা টেনে নিয়ে দোকানের আলোয় এসে তীক্ষ্ণ চোখে সেটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিছু না, একেবারে ফ্যান্সি ফাউণ্টেন্-পেন্। কিন্তু লোকটার মুখের ভাবে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে একটু ব্যস্ত ভাবে পেনটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ল। আমি হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে নিব্‌টা জিভে ঠেকিয়ে নোটবইটায় লিখে দেখ্‌তে গেলাম কি রকম লেখাটা হয়। তোমরা সবাই জানো ওটা আমার চিরকালের 'বদ্ অভ্যাস'। কলম হোক, পেন্সিল হোক,—লিখতে সুরু করার আগে চট্ ক'রে একবার জিভে ঠেকিয়ে নেওয়া চাই-ই। ইস্কুলে মাষ্টারের কাছে সেজন্যে মার খেয়েছি, অনেক উপদেশ শুনেছি, এখানে সহকর্ম্মীরা কত 'পসিব্‌ল্' ভয়ের কথা দেখিয়ে দিয়েছে। তবুও ওটা যায় নি! সবাই বলে, "ওটা তোমার ভয়ঙ্কর রকমের বদ্ অভ্যাস, ডাক্তার, সাবধান।"

কিন্তু ঐ বদ্ অভ্যাসই আমার ব্যাঙ্কের য়্যাকাউণ্টে আড়াই হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে পার্‌ছ কিছু ?—

যেই কলমটা জিভে ঠেকিয়ে লিখ্‌তে হাত নামালাম, স্পষ্ট টের পেলাম, জিভে যা ঠেক্‌ল তা কালী নয়। কালীর স্বাদ আমার অজানা নয়। যে জিনিসের স্বাদ জিভে ঠেক্‌ল, তা-ও আমার অজানা নয়। লাফিয়ে উঠ্‌লাম আমি।

চীনাম্যান্‌টাও তখন বুঝতে পেরেছে। সে দৌড় মেরে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতে তাকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে কলার ধ'রে তুল্‌লাম।

মা-ইয়োপোর দোকানে ফিরে এসে নোটবই পকেটে পূরলাম। লোকটা ছাড়া পাবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল, দুই চড় মেরে তাকে ঠাণ্ডা ক'রলাম। ভীড়ের লোকেরা জিজ্ঞেস কর্‌ল, কি ব্যাপার? ব'ললাম, "ব্যাটা লুকিয়ে কোকেন বিক্রী ক'রছে সেজন্যে আমি ওকে গ্রেপ্তার ক'রলাম।" মা-ইয়োপোকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, "একে চেন?" সে সেলাম ক'রে ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ল—সে চেনে না। পেনের মধ্যে ফিরিওয়ালা কোকেন বিক্রী ক'রছিল শুনে সে হাঁ হ'য়ে গেল। তার পর বল্‌ল, "বাবা, এত বুদ্ধি! কিন্তু বড় হারটাই হার্‌ল ও আপনার কাছে। যাক্ এবার শ্রীঘরে,—যেমন কর্ম্ম, তেমনি তো ফল।"

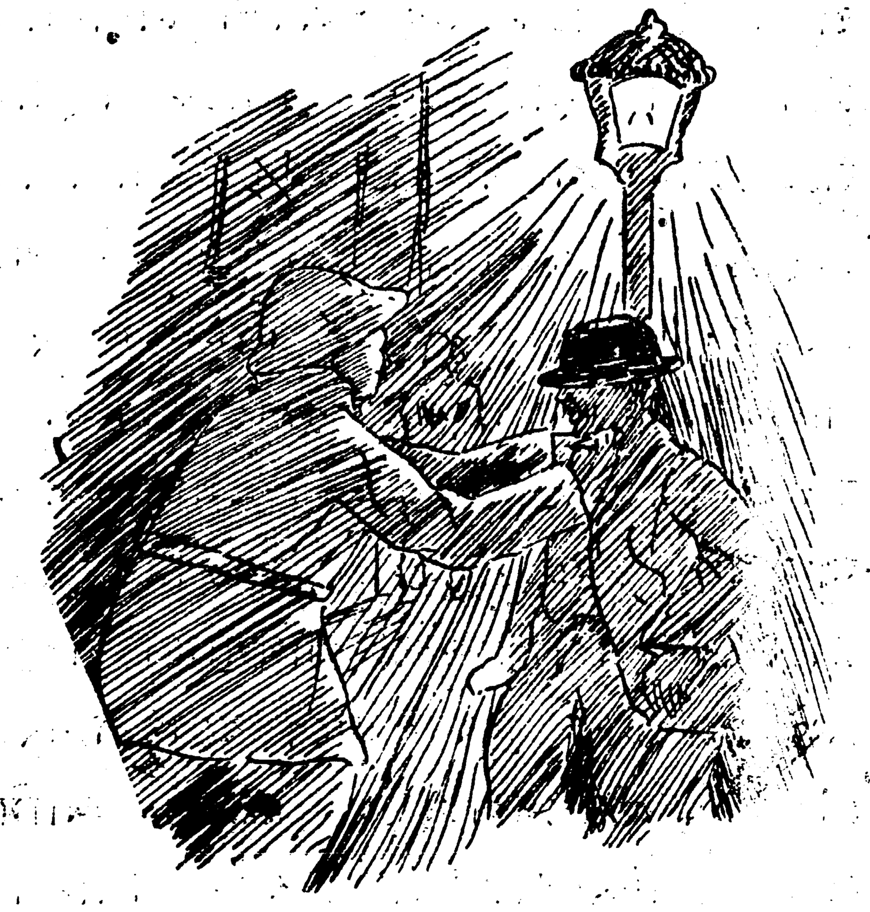

কলার ধ'রে…

বুড়ো শেয়ালকে গুঁতো মেরে বল্‌লাম, "চল বাপধন, এবার খোঁয়াড়ে। বহু দিন থেকে তৈরী ক'রে রেখেছি। যা হিম্‌সিম্ খাইয়েছ, সার্থক তোমার নাম দিয়েছিলাম বুড়ো শেয়াল।" সে একেবারে বজ্রাহতের মত হ'য়ে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। বল্‌লাম, "কি দেখ্‌ছ, ভস্ম ক'রে ফেলবে নাকি? এ শর্ম্মা আর কেউ নন—চিরঞ্জীব গুপ্ত, আমার চামড়ায় ওসব ঢুক্‌বে না। চল এবার গুটিসুটি।"

গাড়ী ডেকে বুড়ো শেয়ালকে তুলে নিয়ে চ'ললাম অফিসে।

বুড়ো শেয়ালের চাতুরীটা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ। তিনটে ক'রে টাকা

সে ফিরিয়ে রাখ্‌ত কোকেনের দাম। কোন খদ্দেরই পেন্ কিন্‌ত না, সবাই দু'-চার মিনিট পরেই ফেরত দিত। যখন তাকে নিয়ে অফিসে হাজির হ'লাম তখন সেখানে কেউ নেই। ফোনে খবর দিতেই সবাই এসে জুট্‌ল।

বুড়ো শেয়ালের পরিচয় দিয়ে, তার শার্ট, কোট, প্যান্টের সমস্ত পকেট ঝাড়াঝুড়ি ক'রে প্রায় শ' তিনেক ফাউন্টেন পেন্ বের ক'রলাম। নিব চেটে চেটে দেখতে বললাম সবাইকে। চেটে সবাই থ'। তার পর খুলে ব'ল্‌লাম, কেমন ক'রে তাকে পাকড়াও ক'রেছি। সবাই বল্‌লে, 'হ্যাঁ, ব্যাটার বুদ্ধি আছে বটে।'

রামারাও ব'ল্‌ল, "শুধু কি ও? ওর খদ্দেররাও বড় কম যায় না। আমায় কি ঠকানটাই না ঠকালে! ওদের কথা শুনে পূর্ব্বপ্রান্তে গিয়ে হাঁটাহাঁটি ক'রে ঘাপ্‌টি মেরে ঘেমে গেলাম, কোন বেটার টিকিরও পাত্তা নেই। সব বেচারা ভাল মানুষের বাসা ও জায়গাটায়।"

সাহেব আমাকে 'কন্‌গ্র্যাচুলেট' ক'রে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। সহকর্ম্মীরাও তার প্রতিধ্বনি ক'র্‌লে।

তার পর দিন কয়েকের ভেতরই বুড়ো শেয়ালের ব্যবস্থা ক'রে ফেলা গেল। তার আড্ডায় আরও কিছু কোকেন পাওয়া গেল। এমন কেস্ সচরাচর পাওয়া যায় না। বিচারকেরা বুড়ো শেয়ালকে দশ বছরের জন্য কারাগারে ঢুকিয়ে দিলেন। আমিও এক ইয়া সোনার মেডেল ঝুলিয়ে, আড়াই হাজার টাকার তোড়া নিয়ে চ'লে এলাম। মিনু তো মেডেলটা আমার বুকে ঝুলতে দেখে হেসেই আকুল। বাবলুকে ডেকে দেখাল—"বাবাও সোনার গয়না পরেছে!"

এখানে সব ভাল আছে। তোমরা কেমন আছ লিখবে।

তোমাদের—চিরণ দা'।*

* গল্পটির মূল ভাবটুকু একটি ইংরেজী গল্প থেকে নেওয়া।

হাতে-হাতে

(শ্রীনলিনী গুপ্ত, এম্-এ, বি-টি)

(১).

রবিবার সকাল সাড়ে আটটা।

কলিকাতা —নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের উপর তিনতলা একটি বোর্ডিং হাউস্এর সর্ব্বোচ্চ তলের সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন একটি সিঙ্গ্ল্-সীটেড্ রুমে চেয়ারে বসিয়া যে ছেলেটি এক মনে পাশের পড়া পড়িতেছে তাহার নাম হরিহর হোড়, নিবাস হরিসেনা, বয়স বাইশ-তেইশ বছর। হরিহর এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শন শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিবে।

ছেলেটির মনে কিন্তু এখন যে চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেটা ঠিক পরমার্থের চিন্তা নয়, বরং তাহাকে অর্থচিন্তা বলা যাইতে পারে। পরীক্ষার তারিখ একেবারে হু হু করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, কাল ফীস্ দাখিল করিবার শেষ তারিখ। বাড়ী হইতে আজ মাসের যাবতীয় খরচ বাবদ মোটা টাকাও কিছু আসিয়াছে। অথচ নানা কারণে পড়াশুনায় সে রীতিমত প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তাহার বর্ত্তমান মনের অবস্থা তাই অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হ্যাম্লেট্-এর মতই—'টু সিট্ অর্ নট্ টু সিট্ ছাট্ ইজ্ দি কোশ্চেন্'।

—"বাবুজী"!

হঠাৎ অপরিচিত গুরুগম্ভীর আওয়াজে হরিহর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় বাঁকাইয়া পেছনে তাকাইতেই সে দেখে—৬॥০ 'ফুটী' এক পাঞ্জাবী। মাথায় তাহার গেরুয়া রংএর পাগড়ী, গায়ে সেই রংএরই হাঁটু অবধি ঝোলা পাঞ্জাবী। পরনে কাছা-হীন গেরুয়া কাপড়, পায়ে মজবুত নাগরাই। বাঁ হাতের বগলে একটি ন্যাকড়া-বাঁধা দপ্তর, দাড়ি-গোঁফ পরিপাটি করিয়া কামানো, কপালে রক্ত তিলক।

—"গুডমর্ণি বাবু"।

হরিহরের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সহাস্যমুখে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে!

বলা বাহুল্য এই সময়ে এ জাতীয় জীবের উপস্থিতি হরিহরের নিকট 'মোষ্ট্ আন্ওয়েল্কম্'। প্রথমতঃ সে একাকী গভীর চিন্তায় মগ্ন, দ্বিতীয়তঃ জ্যোতিষীদের উপর মিঃ হরিহর হোড় হাড়ে হাড়ে চটা। এই সব গণক ঠাকুরদের সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। অর্থাৎ আলঙ্কারিকের ভাষায়, ইহাদের সহিত তাহার অহি-নকুল সম্পর্ক। তাহার এই "জ্যোতিষাতঙ্ক" রোগের খবরটা ঠাকুর-চাকর হইতে ম্যানেজার বাবু অবধি সবারই নিত্যনৈমিত্তিক আলোচনার বিষয়। সুতরাং হঠাৎ কেহ দেখিতে পাইলে…

গুড্ মর্ণিং, বাবু।
(শিল্পী—মিসেস্ বি, গুহ)

—"হাত দেখ্লায়েঙ্গে জি"?

—"নেহি নেহি বাবু, আবি সরে পড়", হরিহর হঠাৎ অত্যন্ত রাগের অভিনয় করিয়া হিন্দী বাংলার উক্তরূপ খিচুড়ি পরিবেষণ করিল: তার পর একখানা মোটা দর্শনের বই টানিয়া নিল। কিন্তু ইহারা 'ঝানু'। লোকের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই ইহাদের কারবার, অতএব লোকটা ঈষৎ হাসিয়া পাঠনিরত হরিহরের সম্মুখে টেবিলের পাশে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

"আপকো ভবিষ্যৎ তো বহুৎ আচ্ছা হ্যায় বাবুজী"—হরিহরের কঠিন উপেক্ষাকেও বেমালুম হজম করিয়া, অসীম ধৈর্য্যের সহিত লোকটা তাহার কপালের উপর ডান হাতের আঙ্গুলটি আল্‌গোছে বুলাইয়া যায়। হরিহরের মনে একটু দুর্ব্বলতা হয়ত জাগে···কিন্তু নাঃ, এক্ষুণি হয়তো কেউ······

"ভাগো বল্‌ছি হিঁয়াসে।"

"লেকিন্ কপালমে কুছ্ তক্‌লিফ্ হ্যায়, বন্ধুবিচ্ছেদ—আউর—"

"আঃ"—হরিহরের বিরক্তির সুরে কিন্তু দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে।

"আউর, থোড়া অর্থহানি হ্যায়।"

—"গেট্ আউট্ ম্যান্।" হরিহর এইবার ভ্রূকুটি-কুটীল উপেক্ষার সহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে। মনে মনে আওড়ায়, 'হ্যাঃ, অর্থহানি! এক পয়সা নাই রোজগার, তার আবার অর্থহানি!'

হরিহরের অস্বাভাবিক চীৎকারে নাছোড়বান্দা লোকটাও শেষে নিরুপায়ের মত হাল ছাড়িয়া দিল। আর তাহার কোন নিবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না—এই ভাব প্রকাশ করিবার মৎলবে হরিহর রীতিমত চেঁচাইয়া পড়া সুরু করিল।

(২)

ইতিমধ্যে কখন দশটা বাজিয়াছে!

নাঃ, আজ আর পড়াটা জমিতে পাইল না। চেয়ারে বসিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া হরিহর দেখিল ছয় ফুটী দেহ তাহার ঘর হইতে কখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। 'আপদ্ গিয়াছে, চার পয়সার রুদ্রাক্ষের বীচিটা তো আর একটু হইলেই গছাইয়াছিল আর কি! তাড়াতাড়ি ঘর বন্ধ করিয়া কাপড়-গামছা লইয়া হরিহর স্নান করিতে নামিল। সে তার মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে—আজই ইউনিভার্সিটিতে গিয়া ফীস্ দাখিল করিয়া আসিবে। একেবারে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, ভিজা কাপড় হাতে লইয়া হরিহর তেতলায় উঠিয়া আসিল। দুয়ার খুলিয়া বিছানার দিকে তাকাইতেই হঠাৎ একটি কথা বিদ্যুতের মত তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।

দুই হাতে বালিশ সরাইয়া, বিছানার চাদর উল্টাইয়া, মশারি ঝাড়িয়া,

সমস্ত বিছানাপত্র হরিহর তিন মিনিটে তচ্‌নচ্ করিয়া ফেলিল। তাহার মুখে ব্যাকুলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার পর চেয়ার টানিয়া, চৌকী সরাইয়া, পকেট হাতড়াইয়া, শেল্‌ফ্‌এর বই পাল্টাইয়া, বাক্স খুলিয়া, কাপড়ে, বইয়ে, জুতায়, জামায় সমস্ত ঘরটা হরিহর একাকার করিয়া ফেলিল—

··· কিন্তু

কই? তাহার মানিব্যাগ্ কোথায়? আজই ডাকে টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাড়াতাড়িতে হরিহর টাকাটা মানিব্যাগে পুরিয়া বালিশের নীচেই রাখিয়াছিল যে!···

হরিহর বিছানা উল্‌টাইবার সময়ে একখানা ছোট্ট কাগজের টুক্‌রা উড়িয়া গিয়াছিল, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ কাগজখানা তাহার নজরে আসিল, খুব গোটা গোটা দেবনাগরী অক্ষরে তাহাতে কি লেখা আছে। এক নিঃশ্বাসে লেখাটা সে পড়িয়া ফেলিল, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের আভাস দেখা দিল। বাংলা করিলে লেখাটা এই রকম দাঁড়ায়— "বাবু সাহেব, আপনাদের ধারণা আমরা গুণিতে জানি না। ঘণ্টাখানেক বাদেই টের পাইবেন আমি ঠিকই গুণিয়াছি—আপনার সত্যিই অর্থহানি ঘটিয়াছে।"

বোর্ডিং-হাউসের সর্ব্বোচ্চ তলের সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন সিঙ্গ্‌ল্‌-সীটেড্ রুমে বসিয়া হরিহর মমে মনে সাড়ে ছয় ফুট দেহধারীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

নানা কথা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান

অনেক কাল ধরেই আমাদের দেশে প্রবাদ চলে আস্‌ছে যে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন লুম্বিনী-উদ্যানে। কিন্তু ঠিক কোথায় যে সে জায়গাটি অবস্থিত, বছর সত্তর-আশী আগে পর্য্যন্ত পণ্ডিতদেরও সে সম্বন্ধে কোন ধারণা

ছিল না। একবার এক জার্ম্মান্ সাহেব হঠাৎ প্রচার করে দিলেন শাক্যমুনি নামে এক ব্যক্তির আশ্রম তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন ; সেই সঙ্গে সঙ্গে মাপ-জোক দিয়ে একটা নক্সা পর্য্যন্ত বার করে দিতে তিনি কসুর কর্লেন না, য়াতে করে লোকের মনে বদ্ধ ধারণা জন্মাতে পারে যে বুদ্ধদেব সেখানেই জন্মেছিলেন। একটা বড় রকমের হৈচৈ পড়ে গেল, পণ্ডিত-মহল উদ্গ্রীব হয়ে উঠ্লেন, কিন্তু তুদিন যেতে না যেতেই সবাই জান্তে পারল ব্যাপারটা আসলে একটা ধাপ্পাবাজি, সাহেবের উদ্ভট্ কল্পনা ছাড়া তার মূলে সত্যি নাই এতটুকু।

ঐতিহাসিক-মহলে তখন বুদ্ধদেবের সত্যিকার জন্মস্থানটি 'আবিষ্কার' কর্বার জন্য রীতিমত চেষ্টাচরিত্র স্থুরু হয়েছে। চীনা তীর্থযাত্রী ইউয়ান্ চোয়াং-এর নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান—সেই যে ভদ্রলোক, ইতিহাসের বইএ যাঁকে তোমরা অনেক সময় হিউয়েন্থ সাং রূপে দেখ্তে পাও। লুম্বিনী-উদ্যানে তিনি নিজে গিয়েছিলেন এবং কোন্ পথে সেখানে যেতে হয় তাও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লেখা আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ সাহেব (আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে-পেতে বার কর্তে এ ইংরাজ পুরুষটি যা পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা মেলা ভার) একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলেন—ইউয়ান্ চোয়াংএর জায়গার বর্ণনায় বড় বিশেষ ভুল নাই ; যেখান থেকে যত দূরে এবং যেদিকে যে জায়গাটি আছে বলে তিনি লিখে গেছেন, সেটা প্রায়ই মিলে যায়। অবশ্য দিকের নাম কর্তে গিয়ে তিনি যদি কোন কোণাকুণি দিকের নাম করেন—যেমন ধর উত্তর-পশ্চিম—তবে একটু অসুবিধা হবে বৈ কি, কেননা ঠিক কতটা উত্তর এবং কতটা দক্ষিণ তা তো আর বলা নাই! তবে সে অসুবিধা যে একেবারে কাটিয়ে ওঠা যাবে না তাও নয়। এখন, লুম্বিনী গ্রামে যাওয়ার ঠিক আগে ইউয়ান্ চোয়াং যে স্থানটিতে গিয়েছিলেন সেটি একটি বিখ্যাত জায়গা, তার অবস্থান সম্বন্ধে কোন গোলমাল ছিল না। সেখান থেকে লুম্বিনী-উদ্যান কোন্ দিকে এবং কত দূরে তার বর্ণনা দিয়ে ইউয়ান্ চোয়াং লিখ্ছেন—'বুদ্ধের জন্মকে চিরস্মরণীয় করে রাখ্বার জন্য মহারাজ অশোক এখানে একটা স্তম্ভ তৈরী করে রেখেছেন।' অশোকস্তম্ভগুলো যে কি ভাবে তৈরী তা তো আর অজানা

নাই! তিনি এবং পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে আর একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক এক দিন এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়্লেন, এই স্তম্ভটিকে বার করবার জন্য। ইউয়ান্ চোয়াংএর নির্দ্দেশ মত এগিয়ে গিয়ে ইতস্ততঃ খানিক অনুসন্ধান কর্বার পরই আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁরা লক্ষ্য কর্লেন বন-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে সত্যিসত্যিই দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অশোকস্তম্ভ। তার খানিকটা অংশ মাটীর ভেতর পুঁতে গেছে বটে, কিন্তু গায়ে যে শিলালিপিটি রয়েছে তু'হাজার বছরেরও আগেকার সে অক্ষর তখনও নতুনের মতই জ্বল্জ্বল্ কর্ছে। তাতে লেখা আছে—সেখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; মহারাজ প্রিয়দর্শী (অশোকের নাম) প্রভুর জন্মস্থানটিকে স্মরণীয় কর্বার জন্য এ স্তম্ভটি তৈরী করালেন।

লুম্বিনী-উদ্যান যে কোথায় সে সম্বন্ধে তখন আর কোন গোলমাল রইল না। আরও জানা গেল কাছেই একটা গ্রামের নাম রুম্মিন্ দেঈ (দেবী)। আজকালকার গোরক্ষপুর থেকে খানিক দূরে সে জায়গাটা।

অজন্তাগুহার সন্ধান

আজকালকার দিনে অজন্তাগুহার নাম না জানাটা যে কোন লোকের পক্ষেই যে লজ্জার কথা তা বোধ করি স্বীকার কর্বে। হায়দরাবাদের সীমানায় এটি একটা ছোট্ট গ্রাম। তু' হাজার বছরেরও বেশী আগে এখানে পাহাড়ের গুহার ভেতর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস কর্তেন, বিহার এবং চৈত্য বানিয়ে। প্রধানতঃ বুদ্ধের মহিমা প্রচার কর্বার জন্যই এই সমস্ত গুহার গায়ে তখনকার শিল্পীরা নানা রকমের ছবি এঁকেছিলেন। দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবিকে বলা হয় ফ্রেস্কো—কী চমৎকার যে এ ফ্রেস্কোগুলো তা আর কি বল্ব! ভারতের নিজের ধারায় আঁকা তু' হাজার বছরেরও পুরোনো এ ছবিগুলোর প্রতিলিপি যখন বার হতে লাগ্ল, তখন সমস্ত পৃথিবীর রসিক-সমাজ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমাদের তুর্ভাগ্যের জন্যই বল, আর আমাদের দেশে যে অবনতি ঘটেছিল তার জন্যই বল, এ সমস্ত অপূর্ব্ব ছবিগুলোর কথা আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এগুলো যে ধরাধামে আছে তাই কেউ জান্ত না, যদিও ইউয়ান

চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ গুহাগুলোর কথা লেখা আছে। সম্পূর্ণ এক দৈবের ব্যাপারে এগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। শ'খানেক বছরের কিছু আগে এক ইংরাজ সৈনিকপুরুষ বাঘ শিকার করতে এ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাঘের সন্ধান মিল্‌ল না, কিন্তু একটু একটু করে এগিয়ে সাহেব জঙ্গলের একেবারে অজানা জায়গায় এসে পড়েছেন বুঝতে পার্‌লেন। তাঁর মনে ভয় আসা তখন খুবই স্বাভাবিক। হঠাৎ তাঁর কানে এল মানুষের গলার আওয়াজ, সাহেব মনে মনে ভরসা পেয়ে একটু এদিক্ ওদিক্ নড়াচড়া করতেই ছোট একটি রাখাল বালককে দেখ্‌তে পেলেন। ছোট্ট ছেলেটা সাহেবের পোষাক-আসাক আর হাতিয়ার দেখ্‌তে পেয়েই বুঝ্‌লে লোকটা শিকারী, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একটা গুহার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বুঝিয়ে দিলে বাঘের আড্ডা ওরই ভেতর। সাহেব সাবধানে সে দিকে চাইতেই ভেতরকার ছবির খানিকটা আভাস তাঁর চোখে পড়্‌ল। তিনি ভাবলেন, হয়তো কোন প্রাচীন কীর্ত্তি এই গুহার ভেতর থেকে থাকবে।

অজন্তাগুহার একটি ফ্রেস্‌কো চিত্র

এর পর গুহা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করা হয়, আর অজন্তার কীর্ত্তিও লোকসমাজে প্রকাশ পায়। গুহাগুলোর ভেতর ডাকাতের আড্ডাও ছিল অনেকে মনে করেন,—তাঁদের রান্না করবার উনুন থেকে ধোঁয়া উঠে ছবির অনেক জায়গা কালো হয়ে গেছে।

হাতীর স্মৃতিচিহ্ন

ফতেপুর শিক্রীতে যারা বেড়াতে গিয়েছ, তারা নিশ্চয়ই বিখ্যাত হিরণ মিনারটি দেখেছ। মিনারটির সারা গা দিয়ে যেন হাতীর দাঁত ফুঁড়ে বেরোচ্ছে। মিনারে হাতীর দাঁতের এত ছড়াছড়ি কি জন্য হয়তো তোমরা কেউ কেউ অবাক্ হয়ে ভেবেছ। আসলে এ মিনারটি একটি হাতীরই স্মৃতিচিহ্ন—পৃথিবীতে আর নাকি কোথাও হাতীর স্মৃতিচিহ্ন নাই। ফতেপুর শিক্রীর এ হাতীটির মালিক বড় কেউ কেটা ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং সম্রাট্ আক্‌বর, আর হাতীটি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। প্রিয় হাতীর মৃত্যুতে সম্রাট্ প্রথমটা খুবই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তার পর হুকুম দেন ঠিক যে জায়গায় হাতীটি মারা গেছে সেখানেই এই মিনারটিকে গড়ে তুল্‌তে।

হিরণ মিনার

সম্রাট্ আক্‌বর একটা হাতীকে স্মরণীয় করে রেখেছেন, আর ও পৃষ্ঠায় দেখ কি ভাবে একটা হাতীর দাঁতকে স্মরণীয় করে তোল্‌বার বন্দোবস্ত হচ্ছে। হাতীর দাঁতের উপর এ চমৎকার খোদাই কাজ আমাদের ভারতবর্ষেরই একটি লোক আরম্ভ করেছিল, কিন্তু জীবনে তা শেষ করে যাবার সুযোগ বেচারা পায় নি। কিন্তু সে কাজ সমাপ্ত করে তার ছেলে। দু পুরুষ ধরে কি ধৈর্য্য এবং অধ্যাবসায় বল দেখি! দুঃখের বিষয় এ দাঁতটি আমাদের দেশে আর নাই, অতুল ধনশালী মার্কিনরা এটাকে এ দেশ থেকে কিনে নিয়ে গেছে।

আমাদের ভ্রান্ত ধারণা

বহু দিন ধরে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে চলে আস্‌ছে আজ তারই একটা ফিরিস্তি দেব।

তোমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস জেম্‌স্ ওয়াট্ ছেলেবেলায় চায়ের টেবিলে বসে লক্ষ্য করেছিলেন যে, উনুনে কেটলি ক'রে যে জল চাপান হয়েছিল সেই কেটলির ভেতরকার বাষ্প কেটলির ঢাকনীটিকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেল্‌ছে এবং তাই থেকেই ষ্টীম্ এঞ্জিনের ধারণা তাঁর মাথায় আসে। এক চিত্রকর এই চায়ের টেবিলের এম্‌নি এক কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন যে তাই থেকে সকলেরই ধারণা আবিষ্কারটী বাস্তবিকই বুঝি ঐ ভাবেই ঘটেছিল। আসলে কিন্তু দু' হাজার বছরেরও আগে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে হিরো বাষ্পের শক্তি থেকে যে গতি আনা সম্ভব তা দেখিয়েছিলেন, এবং জেম্‌স্ ওয়াটের অনেক আগেই খনির ভেতর বাষ্পের দ্বারা চালিত জবরজং ধরণের নানা রকম এঞ্জিন ব্যবহার হ'ত। ওয়াট্ ছিলেন যন্ত্রপাতি মেরামৎ ব্যাপারে একজন পাকা ওস্তাদ্। এই ধরণের একটা জবরজং এঞ্জিন একবার তাঁর হাতে মেরামৎ হ'তে আসে। তখন তিনি ভাবতে থাকেন জিনিষটা আরও ভাল করে করা যায় কি না, এবং তারই ফলে আসল ষ্টীম্ এঞ্জিন (Condensing এঞ্জিন) বার কর্‌তে তিনি সমর্থ হন্।

হাতীর দাঁতের উপর অদ্ভুত খোদাই কাজ

আরও কতকগুলো ভুল ধারণার কথা ধরা যাক্। অনেকের ধারণা "হঠাৎ" কোন একটা কাণ্ড ঘটে বসাতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই

'হঠাৎ' বা 'দৈবাৎ' থেকে কিন্তু অধিকাংশ আবিষ্কারই হয় নি, তাদের মূলে অনেকখানি চিন্তা এবং পরিশ্রম আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেকের ধারণা—গ্যাল্‌ভিনির স্ত্রীর একবার অসুখ করেছিল, ডাক্তার পথ্য দিলেন ব্যাঙের ঝোল। ব্যাঙের ঝোল কাছে আস্‌তেই তিনি দেখ্‌তে পেলেন মরা ব্যাঙ্ নড়্‌ছে। অবাক্ হয়ে গ্যাল্‌ভিনিকে তিনি ডেকে আন্‌লেন, আর তার ফলেই বৈদ্যুতিক শক্তির কথা মানুষের চোখে ধরা পড়্‌ল। এটীও আর একটি ভুল ধারণা, কেননা, তাঁর স্ত্রীর অসুখের এগার বছর আগে থেকেই গ্যাল্‌ভিনি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করতে সুরু করেছিলেন—সেই পরীক্ষায় তিনি 'ইলেক্‌ট্রোস্কোপ' হিসাবে ব্যাঙের পা ব্যবহার করতেন। এলিবার্ট্ নামে একজন ইটালিয়ান্ লেখক বেজায় রকম অতিরঞ্জিত করে এই গল্পটি প্রচার করেছিলেন—সত্যের সঙ্গে এর খুব কমই সংশ্রব আছে।

নিউটন সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা তিনি দৈবের ফলে অনেক আবিষ্কার কর্‌তে সক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু এই দৈবের আগে তিনি যে কতখানি পরিশ্রম করেছিলেন সেটি অনেকেই ভুলে যান।

অনেকের ধারণা বাজ কোন জায়গায় একবার পড়্‌লে দ্বিতীয় বার আর সে জায়গায় পড়ে না। কখনো বিশ্বাস ক'র না। একাধিক বার একই জায়গায় বাজ পড়েছে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সত্যবাদী স্বুকু

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

স্বুকুকে তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ?

সেই যে তোমাদের ক্লাশের ফার্ষ্ট বেঞ্চিতে বসে থাকে—গোলগাল ভাঁটার মত মুখওয়ালা ছেলেটি। শীতকালে কানে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে থাকে সারা দিন, পাছে ঠাণ্ডা লাগে, আর গ্রীষ্মকালে পাছে তাত লাগে গায়ে ব'লে টিফিনের সময় ক্লাশ থেকে খেলতে বেরোয় না! সেই যে মাষ্টারের খোসামুদে ছেলেটি, ক্লাশে মাষ্টার মশাই চেয়ার টেনে বসতে না বসতে নিজের বইটা দেয় এগিয়ে, আর হোম-টাস্কের পাঁচটা অঙ্কের জায়গায় দশটা অঙ্ক কষে আনে, যেন

ভুল করে-ই। কতখানি পড়া দিয়েছিলেন মাষ্টার মশাই নিজে ভুলে গেলেও যে গায়ে পড়ে দেয় মনে করিয়ে, আর পাশের ছেলে অঙ্কের রেজাল্টটা মিলোতে চাইলে যে খাতাটা কাৎ করে, হাত দিয়ে আড়াল করে ধরে। সেই সুকুর এত সব গুণের সেরা গুণ হ'ল তার সত্যবাদিতা।

এমন সত্যের প্রতি অনুরাগ এ বয়সে বুঝি কখনও দেখা যায় না! থার্ড্ বেঞ্চিতে হরিপদ সেদিন উপক্রমণিকাটা আনতে ভুলে গেছে। অনন্ত পণ্ডিতের ক্লাশে বই না নিয়ে এলে নিস্তার নেই, যতক্ষণ তিনি পড়াবেন ততক্ষণ সকলের বই হাতে ধরে বসে থাকতে হবে। অনন্ত পণ্ডিতের রাম গাঁট্টার ভয়ে হরিপদ উপক্রমণিকার বদলে ভূগোলটা হাতে ধরে বসেছে, আর তাই দেখে পাশের শশী বুঝি হেসে ফেলেছে খুক্ করে।

অনন্ত পণ্ডিত 'গজ গজো' থামিয়ে বল্লেন, "হাসলি কে রে? গজ শব্দ শুনে হাসি পেল কোন দিগ্‌গজের?"

সবাই চুপ। আলপিন ফেললে শব্দ শোনা যায়, কিন্তু আলপিন ফেলবে কে? নেহাৎ না ফেললে নয়, নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই ভয়ে ভয়ে।

অনন্ত পণ্ডিত হাঁকলেন—"নিজের নাম শুনে হাসি পেল কোন্ গজাননের? এগিয়ে এস ত বাপু!"

এগিয়ে আর কে আসবে! সবাই কাঠ হয়ে আছে বসে।

"অস'ড়ে হেসে ফেলেছ বুঝি, হেসেছি তবু জানতে পারি নি - কেমন? কিরে! কেউ কিচ্ছু জানিস্ না?" অনন্ত পণ্ডিত চোখ দুটো বেঞ্চিগুলোর উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন।

জানলেও এটা কি তা বলবার সময়? সবাই চুপ করে আছে বসে। কিন্তু সত্যবাদী সুকু আর তা পারে না। সে উঠ্‌ল দাঁড়িয়ে—"আজ্ঞে, আমি জানি স্যার!"

"কি জান বাপু?"

"শশী হেসেছে স্যার!"

"হুঁ, এদিকে এস ত' শশীনাথ। উঁহুঁ, অমন গজেন্দ্রগমনে কেন? তারপর, কেন হেসেছিলে বল ত' বাপু?"

গাঁট্টা খেয়ে শশী মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌ল, কিন্তু মুখে তার কথা নেই।

"হেসেছিলে কেন, গজ গজো শুনে জীবে গজার কথা মনে পড়ে গেল বুঝি?"

তবু শশী নীরব! অনন্ত পণ্ডিত ধমক দিয়ে বল্লেন এবার—"কেন হেসেছিলে?"

"অমনি স্যার।"

"অমনি স্যার! অমনি তোমার হাসি পায়? কই, অমনি একবার কান্না পায় না ত'! তার জন্যে গাঁট্টা লাগে কেন? বল কেন হেসেছিলে?"

শশী তবু কিছু বলবে না। হরিপদর হৃদ্‌কম্প এতক্ষণে বুঝি একটু থেমেছে।

হঠাৎ সত্যবাদী সুকু দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল আবার—"আমি বল্‌ব স্যার?"

"কি বলবে স্যার?" অনন্ত পণ্ডিত দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু সুকু দমবার পাত্র নয়। সত্যের খাতিরে সোজা দাঁড়িয়ে থেকে বল্লে, "হরিপদ ভূগোল খুলে বসে আছে ব'লে হেসেছে স্যার!"

"ভূগোল খুলে?"

"হ্যাঁ স্যার, উপক্রমণিকা আনে নি বলে ভূগোল খুলে রেখেছে!"

সেদিন শশী আর হরিপদর লাঞ্ছনাটা যে কি রকম হ'ল তা আর ব'লে কাজ নেই, কিন্তু সুকু তার কি করবে? সে ত' শুধু সত্য কথাই বলেছে!

শুধু স্কুলে নয়, বাড়ীতেও সুকুর সত্যবাদিতার জ্বালায় সবাই অস্থির। তার দিদি রাণু সেদিন বিকেল বেলা দরজার ধারে অবাক জলপান কিনছে, হঠাৎ সুকু এসে হাজির স্কুল থেকে। ব্যাপারটা লুকোন আর যাবে না। একটা আস্ত ঠোঙ্গা সুকুর হাতে দিয়ে দিদি তাই বল্লে মিনতি করে—"দোহাই সুকু, বলিস্ নি ভাই, মাকে। তা হ'লে আর জলখাবারের পয়সা দেবে না কাল।"

সুকু গম্ভীর ভাবে বল্লে,—"ক'পয়সার কিনেছিস্?"

লজ্জিত হয়ে দিদি বল্‌লে,—"এই, মোটে তিন ঠোঙ্গা। তোকে একটা দিলাম, একটা আমি নেব, আর একটা দেব রাণীকে।"

রাণী পাশের বাড়ীর মেয়ে, রাণুর বন্ধু। সুকু নিজের ঠোঙ্গাটি নিঃশেষ করতে করতে বল্লে,—"রাণীকে দিয়ে কি হবে?"

"তা ত' বটেই! শুধু নিজেরটি হলেই হ'ল, না? স্বার্থপর কোথাকার!" রাণু চটে উঠতে গিয়েও সুকুর মুখের দিকে চেয়ে রাগটা চেপে গেল। সুবিধে হবে না সুকুকে ঘাঁটিয়ে। বাকী ঠোঙ্গাটা দু' জনের মধ্যে বখরা করাই ভাল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাণু বল্লে,—"বল্‌বি নি ত' ভাই?"

সত্যবাদী সুকু বল্লে,—"আমি ত' কথা দিই নি।"

অগত্যা রাণুকে সুকুর পরিপুষ্ট গালে একটা চপেটাঘাত করেই পরিণামের শাস্তির শোধ নিতে হয়।

সুকুর তারস্বরে কান্না বেতারকেও বোধ হয় ছাপিয়ে যায় কলকাতাময়, আর রাণুর সাজাটা যে নেহাৎ সোজা হয় না তা বলাই বাহুল্য।

সুকু সত্যাশ্রয়ী শুধু নয়, সত্যসন্ধানীও যে বটে তার প্রমাণ এতক্ষণে পাওয়া গেছে। ছুটির দিনে দুপুর বেলা দিদি ভাঁড়ার ঘর থেকে আমচুর চুরি করে খায় কিনা এবং ক্লাশে কোন্ ছেলে জল খাবার নাম করে বাইরে বেরিয়ে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখে এ সমস্ত তথ্য সে সত্যের খাতিরেই পরমাগ্রহে সংগ্রহ করে। শুধু পরের বেলায় নয়, নিজের বেলাতেও তার সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ প্রবল।

সেদিন ক্লাশের কোন ছেলের হাতের লেখার সমালোচনা করায় সে সুকুর চেহারার সূক্ষ্ম সমালোচনা করে বলেছিল—"হোঁদল কুৎকুৎ"।

শব্দটা সুকুর মোটেই পছন্দ হয় নি। তবু তার প্রতি সেটা প্রয়োগ করা উচিত হয়েছে কিনা জানবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যার পর ওপরের ঘরে বড় আয়নাটার সামনে সুকু অনেকক্ষণ ধরে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে নিজেকে বিচার করে দেখছিল।

হোঁদল কুৎকুতের কি ফুলো ফুলো গাল হয়? নাকটা কি হয় থ্যাবড়া, চুলগুলো কি খোঁচা খোঁচা? হাসলে কি তাকে এই রকম দেখায়, আর মুখ ভেঙ্গালে?

না, কিছুই ঠিক করা যায় না। অথচ ঠিক না করে আয়নার সামনে থেকে সে নড়তেও পারছে না।

এখন, এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভারী অদ্ভুত এক কাণ্ড হয়ে গেল। এমন কাণ্ডের কথা বুঝি কেউ কখন শোনে নি।

নির্জ্জন ঘরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন সুকুর মাথাটা গেল গুলিয়ে। তারপর ভয়ানক একটা সন্দেহ তার ভেতর থেকে উঠ্‌ল ঠেলে। কিছুতেই সে ঠিক করতে পারে না, আয়নার কোন্ দিক্‌টায় সে আছে!

সুকু এদিক্-ওদিক্ নড়্‌ল-চড়্‌ল, কিন্তু ডান না বাঁ, আগে না পেছনে কিছুই সে বুঝতে পারছে না! ভড়কে গিয়ে সে এবার পিছু হাঁটতে সুরু করলে। একি! আয়নার ভেতরই সে যে ঢুকে যাচ্ছে, অনেক—অনেক পেছনে! ঘরের ভেতরকার সুকু যেন হাঁটতে হাঁটতে সেই ওপারের দেয়ালে মিলিয়ে গেল!

এবার সে একা, চারিধারে ছমছমে অন্ধকার। রীতিমত তার ভয় করছে। ডান দিকে মনে হ'ল একটা আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। মনে করলে সেই দিকে এগিয়ে একটু দেখবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ডান দিক্‌টা গেল কোথায়? ডান দিকে যাবে বলে সে যে উল্টো দিকেই যেতে সুরু করেছে! ডাইনে যেতে হলে কি বাঁ দিকে এগুতে হবে নাকি?

খানিক বাদে দু'-চারবার ঘুরপাক খেয়ে হায়রাণ হয়ে তাকে ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হ'ল। সব কিছু সত্যিই গেছে উল্টে। কোন্‌টা ডান কোন্‌টা বাঁ ঠিক করে এখানে কিছু বলা যায় না।

ডান কানটা চুল্‌কোচ্ছে মনে হ'লে বাঁ কানটায় হাত দিতে হয়, বাঁ পায়ে ঠোকর লাগলে ডান পা টনটনিয়ে ওঠে।

সম্প্রতি তার পায়ে সত্যিই ঠোকর লেগেছিল। কিন্তু কোন্ পায়ে লেগেছে সেটা ঠিক করবার আগেই কে হঠাৎ অন্ধকারে ধম্‌কে উঠ্‌ল,—"কে রে বাপু! দেখে চলতে পার না?"

সুকু ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে,—"অন্ধকার যে বড়! দেখতে পাই নি।"

অন্ধকারেই উত্তর হ'ল, "অন্ধকারেই দেখে চল না, আলোতে ত' তা হ'লে চোখ বুজে চলবে?"

অবাক্ হয়ে সুকু বলে ফেল্লে,—"অন্ধকারে বুঝি দেখে চলা যায়?"

অন্ধকারে হঠাৎ হো হো করে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর কে বলে উঠ্‌ল,—"বদ্ধ পাগল! বদ্ধ পাগল!"

সুকু এবার একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে,—"বদ্ধ পাগল কি রকম?"

"তা ছাড়া কি? তোমার কথাটা বিচার করলে কি দাঁড়ায়—ভেবে দেখেছ? অন্ধকারে বুঝি দেখে চলা যায়? তার মানে অন্ধকারে না দেখে চলা যায়। 'না'টা যদি কাটাকাটি করে নাও তা হলে দাঁড়ায়, আলোতে দেখে চলা যায় না!"

সুকুর মাথাটা রীতিমত গুলিয়ে উঠেছে এবার। বল্লে—"এ সব কথার কিছু মানে হয় না।"

"খুব হয়। সব কথার মানে হয়। আলোর মানে হয়, দেখের মানে হয়—"

সুকু তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে বল্লে, "এক সঙ্গে জড়িয়ে মানে হয় না।"

"এক সঙ্গে জড়াবে কেন? দরজায় জানলায় কি এক সঙ্গে জড়ায়! তক্তপোষে আর টেবিলে, জুতোয় আর জামায়···অবশ্য বাঘে ছাগলে জড়ালে মানে হয় একটা।"

সুকু না জিজ্ঞাসা করে পারলে না—"কি মানে?"

"কেন, ছাগলের মানেটা বাঘের পেটে হজম হয়ে শুধু মানে হয় বাঘ।"

না, এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সুকু হতাশ হয়ে বল্লে—"তুমি কে?"

"আমি? দাঁড়াও ভেবে দেখি। আগে ছিলাম রামকান্ত, এখনো আছি রামকান্ত, কিন্তু আগে ছিলাম দাঁড়িয়ে, এখন আছি বসে; আগে পেট ভরে খেয়েছিলাম, এখন পেয়েছে ক্ষিদে।"

"তাতে কি আসে যায়?"

"বাঃ, তাতে আসে যায় না! কি ছিলাম, কি হয়েছি, কি হবে, তার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে ত' আমি কি বলতে হবে?"

"বলতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?"

"তা বলা যায় না। সাত বছরও লাগতে পারে, পৌনে তিন দিন সাড়ে তেরো সেকেণ্ডও লাগতে পারে।"

"সাড়ে তেরো সেকেণ্ড আবার কেন?"

"বারো সেকেণ্ডে হবে না ব'লে।"

"তেরো সেকেণ্ডেও ত' হতে পারে।"

"হ'তে পারে কিন্তু কিছু হাতে রাখা ভাল।"

"তা তুমি হাতে রাখ, আমি ততক্ষণ তোমায় রামকান্ত বলে বল্‌ব।"

"কখ্‌খনো না, কিছুতেই না, আমায় কিছুতেই রামকান্ত বলতে পাবে না।"

"কেন, তোমার নাম ত' রামকান্ত-ই বল্লে!"

"বেশ করেছি বলেছি। নিজের নাম আমি যা খুসী বল্‌ব, তা বলে তুমি বলবার কে? তা ছাড়া আমার নাম রামকান্ত নয়।"

"সে কি, এই যে খানিক আগে বল্লে!"

"খানিক আগে বলেছিলাম তা এখন কি! এখন আমার নাম বদলে গেছে।"

"নাম আবার বদলে যায় নাকি?"

"খুব যায়, জামা বদ্‌লে যায়, কাপড় বদলে যায়, গোঁফ, দাড়ি, চেহারা, বদ্‌লে যায়। নাম বদ্‌লে যাবে না কেন? নাম ত' বদলাতেই হয়।"

"বেশ, তা হলে তোমায় কি নামে ডাক্‌ব?"

"আমায় ডাকতে তোমায় কে বলেছে?"

তাও ত' ঠিক। সুকু চুপ করে গেল, কিন্তু অন্ধকারে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কতক্ষণ? সুকু কি করবে ভাবছে এমন সময় আবার শোনা গেল—"চুপ করে আছ যে?"

"বাঃ, তুমি ত' ডাকতে বারণ করলে!"

"কথা কইতে ত' বারণ করি নি। না ডেকে বুঝি কথা হয় না? আমায় একটা কুনুইএর গুঁতোও ত' দিতে পার।"

সুকু অবশ্য সেটা দিতে পারলে খুসীই হ'ত। সে উৎসুক ভাবে বল্লে—"দেখতে পাচ্ছি না যে!"

"আচ্ছা দাঁড়াও, অন্ধকারটা নিভিয়ে দিই।"

সুকু হেসে বল্লে,—"আলো জ্বালবে বল!"

"কেন তা বলব?"

"বাঃ, আলো নিভলেই ত অন্ধকার!"

'উঁহুঃ, অন্ধকার জ্বালালেই আলো নিভে যায়; তুমি পরীক্ষা করে দেখ।"

"আচ্ছা মুস্কিল ত' বাপু! আলো নিভোলে অন্ধকার হয় কে না জানে?"

"ও ভুল জানা। তোমার দু'পাশে কান আছে না দু' কানের মাঝে তুমি? কুকুরের পেছনে ল্যাজ না ল্যাজের আগে কুকুর?"

"আমার দু পাশেই কান আছে।"

"তোমার কান দুটো টেনে দেখাচ্ছি, কানের মাঝখানে তুমি কি না!"

কান সম্বন্ধে কথাটা চাপা দেবার জন্যে সুকু তাড়াতাড়ি বল্লে, "ও ত' শুধু ঘুরিয়ে বলা। আসলে আলো নিভলেই অন্ধকার।"

"বেশ! তা হ'লে প্রমাণ কর অন্ধকার জ্বাললে আলো নেভে না।"

এ ত' মহা ফ্যাসাদ বাপু! এমন বিপদে কে আবার কবে পড়েছে! সুকু বল্লে, "আচ্ছা, তোমার কথাই ঠিক। অন্ধকারটাই নেভাও।"

"তাই বল তা হ'লে।"

আলো জ্বলে উঠতেই সুকু অবাক্ হয়ে দেখলে মস্ত বড় একটা ঘরের এক কোণে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা বোধ হয় পাঠশালা, ঘরের চারিধারে ছোট, বড়, মাঝারি, ঢ্যাঙা, বেঁটে, কুঁজো, রোগা, মোটা, দোহারা—এক গাদা ছেলেপুলে বসে কি বই পড়ছে! সবাই ছেলেপুলে নয়, তাদের ঠাকুরদাদারাও আছে।

তার সামনেই যে বেঁটে, এক মুখ শাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বুড়ো বসেছিল তাকে দেখে অবাক্ হয়ে সুকু জিজ্ঞাসা করলে—"তুমিই কি রামকান্ত?"

বুড়ো কট্‌মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললে।

সুকু ভড়কে যেতেই সে লজ্জায় এক হাতে চোখ ঢেকে ফেলে আর এক হাতে পাশের ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—"আমি নয়, ও রামকান্ত।"

সুকু তার দিকে চাইতেই সে আবার পাশের ছেলেটাকে দেখিয়ে দিলে—"ওই রামকান্ত।"

তার পর দেখতে দেখতে ঘরময় সবাই ও ওকে রামকান্ত ব'লে দেখাতে দেখাতে বুড়োর পালা ফিরে এল। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "বেশ! আমি রামকান্ত তা হয়েছে কি?"

"না না, হবে আবার কি! কিন্তু তোমরা কর্‌ছ কি?"

"দেখতে পাচ্ছ না, 'রামায়ণ' পড়ছি?"

সুকু বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে অবাক্ হয়ে বল্লে, "তোমার বইএ ত' শুধু একটা 'রা' লেখা! রামায়ণ পড়্‌ছ কোথায়?"

"বাঃ, আমাদের এটা 'সমবায়-পাঠশালা' তা জান না?"

"সে আবার কি ?"

"আমরা পড়ার খাটুনি কমাবার জন্যে ভাগ করে বই পড়ি। আমি 'রা' পড়ি, রামকান্ত 'ম' পড়ে, তার পরের রামকান্ত 'ম' পড়ে, এমনি করে সবাই মিলে তাড়াতাড়ি সবটা পড়া হয়ে যায়।"

"নাঃ" সুকু বল্লে,—"তোমার পাশে ওর নাম কি বল্লে ?"

"কেন ? রামকান্ত !"

"তার পাশে ?"

"সেও রামকান্ত !"

"তার পর ?"

"ওরা সবাই রামকান্ত।"

"দূর্, সকলের বুঝি এক নাম হয় !"

"সকলের আলাদা নাম হতে পারে, এক নাম হবে না কেন ?"

"ও একটা যুক্তিই হ'ল না।"

"খুব হ'ল। তোমার নামও রামকান্ত।"

সুকু এবার অত্যন্ত চটে উঠে বল্লে, "কখ্খনো নয়, আমার নাম সুকু।"

"মিছে কথা ব'ল না, তোমার নাম রামকান্ত।"

সুকু মুখ-চোখ রাঙিয়ে বল্লে—"আমি মিছে কথা বলি না, আমার নাম সুকু !"

"তা হলে প্রমাণ কর তোমার নাম রামকান্ত নয়, ভ্যাবাকান্ত নয়, বেচারাম, ফ্যালারাম, তুলোরাম—কিচ্ছু নয়, শুধু সুকু।"

"তা কেন প্রমাণ করতে যাব, আমি বলছি আমার নাম সুকু।"

"তা'বল্লে শুধু হবে কেন ? সত্যি যদি হয় ত' প্রমাণ করতে হবে।"

"আমি যদি না করি ?"

"না করলে তোমায় রামকান্ত হ'য়ে পড়তে হবে আমাদের সমবায় পাঠশালায়।"

সুকু এবার ভয় পেয়ে গেল। ঢ্যাঙা, বেঁটে, ছোট, মাঝারি, ছেলে, বুড়ো, মোটা, রোগা সমবায়-পাঠশালার রকমারি পড়ুয়া উঠেছে দাঁড়িয়ে। সে একটু একটু করে পেছোয় আর তারা এগোয়। মুখ ফিরিয়ে সুকু এবার চোঁচা মারলে দৌড়। রামকান্ত হ'তে তার একটুও ইচ্ছে নেই।

দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ ঠকাস্। মাথাটা সজোরে ঠুকে যেতেই সুকু চমকে উঠে দেখে সে আয়নার একেবারে ওপরে এসে পড়েছে। মাথাটা টনটনিয়ে উঠলেও সুকুর তখন আর দুঃখ নেই। সে আয়নার যে ধারে মানুষের থাকা উচিত সেই ধারেই পৌঁছে গেছে। আয়নার ওদিকে অন্ধকারে রামকান্ত'র দল হাজার শাসালেও আর তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু তা ব'লে সুকুর ভয় গেছে ব'লে মনে ক'র না। সে এখন বুঝে-শুঝে সত্যি কথা বলে। রামকান্ত'র দল কোথায় ওৎ পেতে আছে কে জানে ?

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচের ছবিখানা (স্বপ্ন) নিয়ে একটা কবিতা কিংবা একটা গল্প লিখতে হবে। একজন দুই-ই লিখতে পারে। লেখা যেন রামধনুর দু' পৃষ্ঠার চেয়ে বড় না হয়। ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে—একটি কবিতার জন্য ও একটি গল্পের জন্য। পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখা ভাল হ'লে সে লেখা এবং লেখকের ফটো (তাঁর আপত্তি না থাকলে) রামধনুতে বার হবে। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে গ্রাহকের **নিজের** নাম ও **নিজের** গ্রাহক-নম্বর থাকা চাই।

স্বপ্ন

(শিল্পী—মিসেস্ বি, গুহ)

প্রতিযোগিতাটি শুধু গ্রাহকদের জন্য।

TIGHT BINDING

দিন-মাহাত্ম্য

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

ক্লাসে দু'টো দল। তার মধ্যে রেষারেষির অন্ত নেই। এক দলের সর্ব্বদা চেষ্টা আর এক দলকে কেমন ক'রে ঠকাবে, বোকা বানাবে।

সুরজিৎ ছেলেটি নতুন। প্রথম ক' দিন ক্লাসে এসে গদাইয়ের কাছে বস্‌ল—বেশ আলাপও জম্‌ল কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। ও আমাদের দলে চলে এল। জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "কিরে সুরজিৎ, যূথভ্রষ্ট হলি যে?" বল্ল,—"যা সব ছেলে—এক-একখানি চীজ্, ভাগ্যিস্ আগেই জান্‌তে পারলাম—"

বল্লাম, "কেন রে, কি হ'য়েছিল?"

ও কথার উত্তর না দিয়ে বল্ল, "আচ্ছা, তোদের নিয়ে ওরা অত ঠাট্টা করে কেন রে"?

ব্যস্ত হ'য়ে আমরা সবাই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "কি রকম? কি বলে?"

ও বল্লে, "ওঃ, কত কি—এই ধর না কান্তি ত' তোদের দলপতি, ওকে বলে দু'-পেয়ে গোদা হাতী। মোহনের উপাধি দিয়েছে কি জানিস্? লম্বকর্ণ—কানটা কতক ইয়ে······কি না?"

মোহন বিসুভিয়াস্ অগ্ন্যুৎপাতের উপক্রম কর্‌ছিল, আমরা তাকে থামিয়ে দিলাম। সেই থেকে সুরজিৎ আমাদের দলের 'একজন'। সমস্ত গোপনীয় কথা ওর সঙ্গে আলোচনা হয়। ওকে সন্দেহ করার কিছুই নেই। ওর মাথায় কু-বুদ্ধির অভাব নেই—খনি বল্লেই চলে। অনেক সময় ওর বুদ্ধির কৃপায় আমরা বাজী-মাৎ করেছি-ও গদাইদের কাৎ করেছি।

সেদিন শনিবার। স্কুলের পর সুরজিৎ চুপি চুপি আমাকে বল্ল, "দেখ্, আমাদের একটা প্ল্যান্ না করলেই নয়। কোথায় সবাই মিলে বসে ঠিক করা যায়?" বল্লাম, "চল না—পার্কে গাছের ছায়ায়।" সে বল্ল, "ছোঃ, তার থেকে চল্ তোরা আমার বাড়ী।" বল্লাম, "না ভাই, তা হয় না—আমরা অল্ রেডি ম্যাটিনিতে

টিকিট বুক্ করে ফেলেছি।" সুরজিৎ একটু ভেবে বল্ল, "বেশ, আজ সন্ধ্যেবেলা সকলেই ত' ফ্রি—আমার বাড়ীতে চল্ না কেন? সব ঠিক করা যাবে আর রাতের খাওয়াটাও ওখানে হবে, কি বলিস্?" বল্লাম, "যুক্তি অকাট্য"। ধীরু আমার পাশে ছিল, বল্ল, "তোর বাড়ী ত' কখনও চোখেও দেখলাম না, যাওয়া ত দূরের কথা।" সুরজিৎ বল্ল, "আমার বাড়ী ঠিক জেণ্ট্স্ পার্কের ওপর, চিন্‌তে একটুও কষ্ট হবে না।" আমি বল্‌লাম, "বাড়ী ত চিনলাম কিন্তু হয়ত তোর বাবা বাড়ীতে থাকবেন, তিনি হয়ত—" সুরজিৎ বল্‌ল, "দূর, তোরা গিয়ে দেখ্‌বি গেটেতেই এক দিকে, আমার নাম—Mr. S. K. Chatterjee আর এক দিকে বাবার নাম লেখা আছে—সটান ঢুকে যাবি, সাম্‌নে পাবি সিঁড়ি—ওপরে উঠে যাবি, দরোয়ান জিজ্ঞেস করলে আমার নাম করবি—বুঝলি? আর বাবার কথা? ওল্ড বয়—ভেরী গুড—আপিস্ থেকে ফিরেই তিনতলায় ওঠেন্, ব্যস্, তার পরেই শ্রীমান্ সুরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রাজ্য। কিন্তু দেখ্, আর একটু বলে রাখি, আমার এক সম্পর্কে দাদা আছেন—খুব সাহেবী ধরণের—বড় চড়া মেজাজের; যদি তাঁর সাম্‌নে পড়িস্ তা হ'লে দু'-একটা উঁচু গলায় কথা বলিস্, তা হ'লেই সরে যাবে। ভারী অদ্ভুত লোক—"

বায়স্কোপ থেকে ফিরে আমার বাড়ীতে আড্ডা জম্‌ল—ধীরু, মোহন, বঙ্কিম, কান্তি সকলেই হাজির। চায়ের টেবিলে বসে রাজা-উজীর মার্‌তে মার্‌তে হু হু করে সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল—ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা থেকে কখন আটটায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর আধ ঘণ্টা পরেই বেরুনো যাবে। এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল।

সুরজিতের গলা। বল্‌লে, "বিশেষ কাজে আমাকে এখুনি বারাকপুর যেতে হচ্ছে।" আমায় বল্‌তে হ'ল, "না না, আমাদের জন্যে ভাবনা নেই।" "ভেরী সরি—তা' হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা?" "আচ্ছা, ওসব পরে হবে, তুমি যাও।" "না না, তা হয় না। কালকেই—আচ্ছা—বাই-বাই টু ইউ অল্—"

বন্ধুরা শুনে মুখ টিপ্‌ল। সে রাত্রে আহার-কার্য্যটা আমার বাড়ীতেই হ'ল।

পরের দিন। তখন প্রায় সন্ধ্যা আটটা। আমরা দলবদ্ধ হয়ে সুরজিতের

বাড়ীর দিকে চলেছি—গেটের বাইরে থেকে দেখলাম একখানা মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম একটু অপেক্ষা করেই দেখি মোটরটা বাইরে যায় কিনা। মোটরটা বাইরে চলে গেল ; দেখলাম ভেতরে একজন প্রৌঢ়, অনুমানে বুঝলাম সুরজিতের বাবা। ব্যস্, এখন ত' আমরা সুরজিতের রাজ্যে প্রবেশ করছি। 'সাহসে করে ভর হলাম অগ্রসর'। দরোয়ান জিজ্ঞেস করল, "কোন্ বাবুকো আপ্ লোক...?"

কান্তি রেজায় রসিক (অবশ্য জায়গা বুঝে)। সে চট্ করে সিঁড়ির দেওয়ালের ওপর থেকে Mr. S. K. Chatterjee লেখা কাষ্ঠফলক খুলে এনে দরোয়ানজীর মুখের ওপর ধরে বল্ল, "ইস্‌কো"।

সদর্পে আমরা ওপরে উঠ্‌তে লাগলাম—কাঠের সিঁড়ির ওপর দমাদ্দম্ শব্দ করে ; চলার ভঙ্গী আমাদের এম্‌নি যেন আমাদেরই বাড়ী, বহু দিন ব্যবহার করি নি, এখন এসেছি—এমন কি সিঁড়িগুলো পর্য্যন্ত দেখে উঠছি ঠিক আছে কি না। ওপরে উঠে সিঁড়ির পাশের ঘরে আলো জ্বালা গেল। দেখলাম সেটা ড্রয়িং রুম্। আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লাম, "সুরজিৎ"! মোহন দরোয়ানকে উদ্দেশ করে হাঁক্‌ল, "বড় বাবুকো বোলাও।" তার পর সুমধুর কণ্ঠে গর্দ্দভ রাগিনীর আলাপ সুরু করে দিল।

এমন সময় হঠাৎ এক ভদ্রলোক, কোট্-প্যাণ্ট-পরা, অতি বিস্মিত ভাবে ঘরে ঢুকলেন। সামনে কান্তি পড়্‌ল, জিজ্ঞেস করলেন, "এ সব কি? এর—" কথা শেষ হলে প্রব রাগে গলা কেঁপে উঠ্‌ল। আমরা অনুমানে বুঝলাম ইনিই সেই সাহেব দাদা, অমনি সুরজিতের উপদেশ মত কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। বঙ্কিম বল্ল, "কিছু না— এস্-কে কোথায় জান্‌তে চাই।" ভদ্রলোক বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন, "কে?" বঙ্কিম গলার স্বর চড়িয়ে বল্ল, "—সু—র—জি—ৎ"। ভদ্রলোক চটে উঠলেন, বল্লেন, "কি বল্‌ছ?" ব্যস্, এতক্ষণ তবু ভদ্রতা ছিল—এবার ভদ্রতার সীমা ছাড়া'ল। আমরা 'টোরুণ'; অমাদের কিনা এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক "তুমি" বলবে! দাঁড়াও—

বঙ্কিম গলার স্বর অনুকরণ করে বল্ল, "কি বল্‌ছ?" মোহন পেছন থেকে

ব'লে উঠ্‌ল, "বাঃ, দাদা তোফা বেশ একখানি চুল ছাঁট দিয়েছে—ঠিক যেন একেবারে ফেল-করা ব্যারিষ্টার।" লোকটী একবার কট্‌মট্ করে চাইলেন, তারপর কান্তিকে কিছু ভদ্র দেখে ইংরাজীতে বল্লেন, "হু আর ইউ? হোয়াট্ ডু ইউ ওয়াণ্ট্?" কান্তি চুপ, আমি বল্লাম, "বাঃ, দাদার চীনে ইংরাজীতেও বেশ দখল দেখ্‌ছি! বৃথাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আক্ষেপ করছেন—এই মহাপ্রভুকে নিয়ে একবার যদি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে যাওয়া যায় আর সেখানে যদি ভাল দু-একটা ইংরাজী বুলি দেন তা' হলে আর দেখ্‌তে হবে না, সব সাহেব বাপ বাপ করে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবে মাতৃভাষা ভুলে যাবার ভয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের হাতেই ফিরে আসবে। কি বলেন দাদাপ্রভু?"

ভদ্রলোক রাগে দিশেহারা হয়ে এক হেঁচকা টানে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলের টেম্পারেচার একেবারে 'সাব্-নর্ম্মাল'। তিনি হয়ত' একটা কিছু করেই বস্‌তেন কিন্তু বাধা পড়্‌ল, পাশের ঘরে ফোনের আওয়াজ শোনা গেল। ভদ্রলোক উঠে গেলেন। একটু পরেই পাশের ঘরে শুন্‌তে পেলাম, ভদ্রলোক বল্‌ছেন, "হ্যাঁ আমি, তা—" তারপর অনেকক্ষণ ভদ্রলোক ফোনে কান দিয়ে কি শুনলেন, শেষে গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, "পুলিস পাঠিয়েছ? আচ্ছা, এস।"

পুলিস শুনেই আমরা একদম দমে গেলাম। ধীরু বল্ল, "চল্, এখনও—" বিনা বাক্যব্যয়ে চুপি চুপ পা টিপে যেই নীচে নেমেছি, অমনি দরোয়ান চীৎকার করে উঠ্‌ল, "উঁহা ভাগ্‌তা, পাকড়ো"। ব্যস্, পাঁচ-ছ'টা পুলিস এসে খপ্ খপ্ করে আমাদের ধরে ফেল্ল। কাঁদ্‌ব না চীৎকার কর্‌ব? গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। এক ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব বেতের লাঠি নিয়ে এলেন ও হিন্দীতে পুলিসদের জিজ্ঞেস করলেন, কেউ পালিয়েছে কিনা। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবটী বাঙ্গালী—আমাদের দিকে বক্রদৃষ্টি ও উপেক্ষার হাসি হেসে বল্লেন, "কি খবর? আরে, তোমরাই ত' শ্রীখণ্ড ট্রেন-ডাকাতীর মামলায় ধরা পড়েছিলে না? বেশ, বেশ, মিঃ চাটার্জ্জীর রিভলভারটা নিতে পারলে না?" আমরা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লাম, "আজ্ঞে, আমরা তারা নই—" আমরা সবে পরিচয় দিতে যাচ্ছি—এমন সময়

ওপর থেকে ভদ্রলোকটী নেমে এলেন। ইন্‌স্‌পেক্টরকে বল্লেন, "অল্ রাইট্, এখন এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?"

"এখন আপাততঃ লালবাজারে।" "এরা কি ওল্ড্ কাল্‌প্রিট্ ?" "নিশ্চয়; এরাই ত' শ্রীখণ্ড ট্রেন্-ডাকাতীতে কয়েদ ছিল। এবার কম-সে-কম চারটী বছর হবে এখন—" বিশ্বাস করবে না, আমরা কেঁদে ফেল্লাম। ভদ্রলোক একবার কি ভাবলেন, পরে বল্লেন, "আচ্ছা, আপনি এদের নিয়ে একবার ওপরে আসুন।" ওপরে গিয়ে ভদ্রলোকটী ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবকে বল্লেন, "এরা যখন আমার রিভল-ভারটা হাত করতে পারে নি তখন—" ইন্‌স্‌পেক্টর বাধা দিয়ে বল্লেন, "কি যে বলেন, ওদের কখনও ছেড়ে দিতে পারি !"

"না—না, তা বলছি না—বলছি যে আজকে রাত্রে এরা আমার জিম্মায় থাক্, কালকে বরং আপনি প্রিজ্‌ন্ ভ্যান্ পাঠাবেন।"

ইন্‌স্‌পেক্টর রাজী হলেন। আমার পেটে এক গুঁতো দিয়ে বল্লেন, "এই কাগজে সই কর।" সই কি করা যায় ? হাত কাঁপছে—তবু ঝুঁকে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, 'ওমা, এ কি ! কাগজে টাইপ্ করে প্রথমে লেখা 'রিভেঞ্জ'। পরে লেখা —নেম্ ইন্ ফুল্ অব্ দি এপ্রিলফুল; তলায় গদাই ও সুরজিতের নাম সই করা ! আরে, আজ যে ১লা এপ্রিল ! এর থেকে যে মরণ ছিল ভাল—ছি-ছি। হাত থেকে পেন্সিল পড়ে গেল। আমাদের চমক ভাঙ্গ্‌ল বিকট হাসিতে। ইন্‌স্‌পেক্টর দাড়ী-গোঁপ টেনে খুলে ফেল্‌লেন। আরে এ যে সুরজিতের খুড়তুত ভাই ! কিন্তু পুলিসগুলো সত্যিকারই পুলিস ! এখন মনে পড়্‌ল সুরজিতের কাকা পুলিসের বড় চাকরী করেন। ভদ্রলোকটী হেসে বল্‌লেন, "আর অমন করে তাকিয়ে কি কর্‌বে ? চল খেতে যাওয়া যাক্"। অপর ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আমি সুরজিতের পিসতুত ভাই। হ্যাঁ, এস, খেয়ে নেওয়া যাক্, তা না হ'লে তোমাদের বাড়ীর লোকেরা এবার সত্যি করে পুলিসে ডাইরী করবেন ছেলে হারিয়েছে বলে।"

আমাদের অবস্থা আর বল্‌তে পারি না—উঃ, সে যে ভয়ানক। বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি সুরজিৎ। সে একগাল হেসে বল্‌ল, "কখন এলে ভাই ?" মনে

হ'ল—দিই এক ঘুঁষি। সামলে নিলাম। গদাই আবার ভুঁইফোড়ের মত কোথা থেকে এসে ভাল মানুষটীর মত জিজ্ঞেস করল, "এই যে, এখানে হঠাৎ ?"

বল্‌লাম, "এমনি।"

একটু মুচকে হেসে গদাই বল্লে, "বেশ, বেশ, তা' বেশ।"

ছোটদের চিত্রশালা

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আঁকা ছবি ও তোলা ফটো)

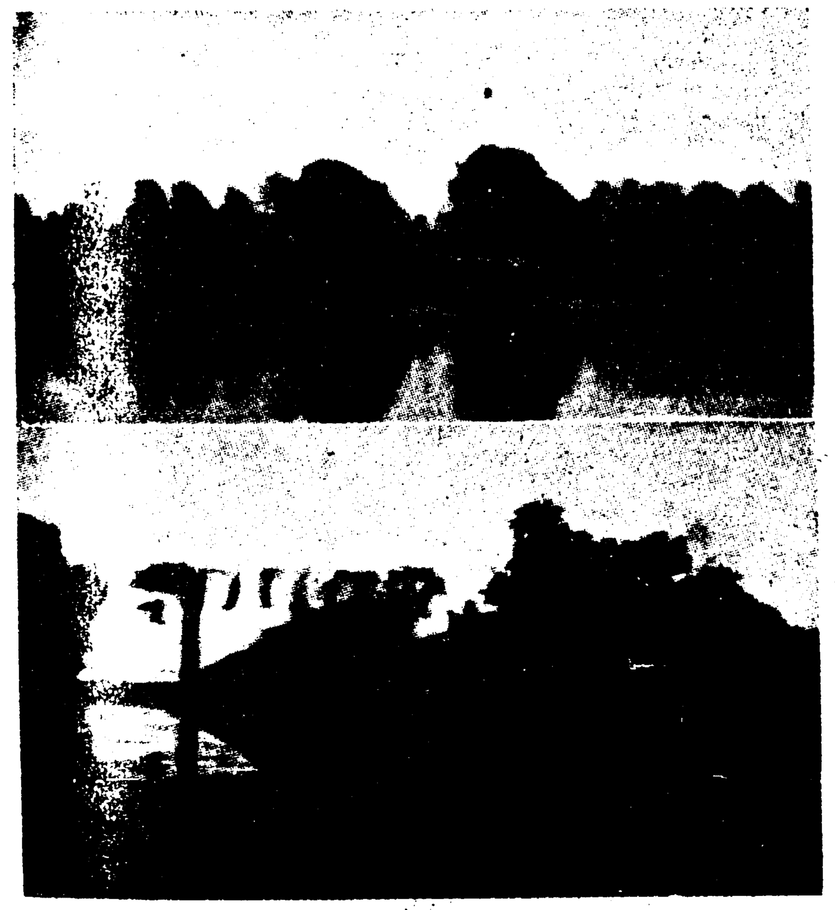

ব্রহ্মদেশের দু'টি দৃশ্য

উপরে—মেমিওর বোটানিক্যাল গার্ডেন

নীচে—মান্দালয়ের দুর্গের একাংশ

(আলোকচিত্র-গ্রহীত্রী—শ্রীমীরা গঙ্গোপাধ্যায়)

শৈল-শয্যা

(শিল্পী—শ্রীনির্ম্মলকুমার দাস)

শরৎ আজি এলে

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

শিউলি-বনের ডাকে
মাঠের পথের বাঁকে
সবুজ শোভা ঢেলে,
নদীর কূলে কূলে
ছুলিয়ে কাশের ফুলে
শরৎ আজি এলে।

ঝল্‌মলানি গানে
সুর জেগেছে প্রাণে,
উঠ্‌ল নেচে হিয়া;
রং-ঝরানো প্রাতে
আজকে তোমার সাথে
যাই গো বাহিরিয়া।

চল্‌ব দূরের মাঠে,
নদীর ঘাটে ঘাটে,
নতুন গাঁয়ে গাঁয়ে;
নতুন ফোটা ফুলে
বাতাস যেথা ছুলে
ফিরছে বনের ছায়ে।

ভরা নদীর পারে
সবুজ মাঠের ধারে
সোনার আঁচল মেলে,
ছুটীর গানে গানে
মাতিয়ে সকল প্রাণে
শরৎ আজি এলে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

জন্মদিনে

(শ্রীসুধীর মজুমদার)

রুণুর দাদারা ভারী নিষ্ঠুর। তারা সময় পেলেই পাখীর বাসা থেকে ছানা পেড়ে এনে খেলা করে। তারপর বাচ্চাটি মরে গেলে তাকে ফেলে দেয়। রুণু দাদাদের কত নিষেধ করে; তারা মোটে শোনে না।

রুণুদের বাড়ীর ধারে আম-বাগানে ছুটো হলদে পাখী বাসা বেঁধেছে। রুণু রোজ গাছের তলায় খই ছড়িয়ে দেয়। হলদে পাখা ছুলিয়ে পাখী ছুটো যখন সেই খই খায়, রুণুর দেখতে ভারী ভাল লাগে।

গাছের বাসায় পাখীরা ডিম পাড়্‌ল। সেই ডিম ফুটে ছোট ছুটো হলদে ছানা হ'ল। রুণু রোজ আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের কিচির-মিচির শব্দ শোনে। ছানাগুলোর মা আছে, বাবা আছে। তারা ছানাগুলোকে আদর করে। রুণু ত' তাদের ভাষা বুঝতে পারে না, রুণুর মা রুণুকে যেমন 'লক্ষ্মীটি সোনাটি' বলে আদর করেন, সে ভাবে, পাখীর মা হয়ত তেমনি তার বাচ্চাগুলোকে 'লক্ষ্মীটি সোনাটি' বলে আদর করে।

ক্রমে পাখীগুলোর সঙ্গে মনে মনে রুণুর খুব ভাব হয়ে গেল। রুণু যখন রাতের বেলায় ঘুমুতে যায়, তখন শুয়ে শুয়ে ভাবে, পাখীর মা বুঝি তার বাচ্চাগুলোকে রূপকথা শোনাচ্ছে। আচ্ছা, হলদে পাখীর মা-বাপ তার বাচ্চাগুলোকে কি ধরণের রূপকথা শোনায়? রুণু মনে মনে ভাবে—হয়ত তারা হলুদ ফুলের গল্প করে। পাতালপুরীতে হলুদ বরণ রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। তার পা হ'তে হলুদের ফুল ফুটে উঠ্‌ল। সেই ফুল দেখে টিয়ে পাখীর ছেলে হলুদ-কন্যাকে

ঘিয়ে করবার জন্য পাগল হ'ল। তার পর কত রাক্ষসের সঙ্গে দেখা, অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ, আরও কত কি! এই সব ভাবতে ভাবতে রুণু ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন দুপুর বেলা রুণু দেখে কি, দাদারা সেই হলদে পাখীর বাচ্চাগুলোকে পেড়ে এনেছে। পাখীদের মা-বাবা এ ডালে ও ডালে ঘুরে কেবলই কিচির-মিচির করে কাঁদছে। রুণু কেঁদে বল্‌ল, "দাদারা, তোমাদের পায়ে পড়ি, পাখীর বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দাও।"

রুণুর মেজদা' ধমক দিয়ে বল্‌ল, "যা যা, মুরুব্বিয়ানা করতে হবে না। আমরা বাচ্চাগুলো বাজারে বেচে অনেকগুলো ঘুড়ী কিন্‌ব।"

রুণু বল্‌ল, "তোমরা পাখীর বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দাও, আমি আমার কানের মাকড়ী খুলে দিচ্ছি। এটা বেচে যত ইচ্ছে ঘুড়ী কিনে নিয়ে এস।"

রুণুর দাদারা দেখ্‌ল রুণুর প্রস্তাবই বেশী লাভজনক। তারা পাখীর বাচ্চাগুলোকে বাসায় দিয়ে এসে রুণুর কানের মাকড়ী নিয়ে বাজারে বেচতে গেল। পাখীর বাপ-মা আনন্দ-কলরব করতে লাগ্‌ল।

১৩ই বৈশাখ রুণুর জন্মদিন। বাড়ীতে কত খাবার তৈরী হয়েছে। পাড়া থেকে রুণুর আরও কয়েকটি ছোট ছোট বন্ধুর নিমন্ত্রণ হয়েছে।

এমন সময় মা রুণুকে বল্‌লেন, "রুণু, তোর কানের মাকড়ী কোথায় রে?" রুণু কেঁদে মায়ের পা জড়িয়ে ধর্‌ল, "মা, বক্‌বে না বল?" মা বল্‌লেন, "সত্যি কথা বল্‌লে বক্‌ব কেন?" রুণু বল্‌ল, "না মা, ওটা হারায় নি। দাদাদের দিয়েছি।" তার পর রুণু আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা মাকে বল্‌ল। মা রুণুকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, "রুণু, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে। পাখীরও আমাদের মত সুখ-দুঃখ আছে। পাখীর মায়ের দুঃখে যে তোমার প্রাণ কাঁদে এ জন্য আমি বড় সুখী হলুম। তোমাকে আমি আরও ভাল মাকড়ী কিনে দেব। তোমার দাদারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আমি তাদের আর কোন উপহার দেব না।"

অভিমত

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী—রাসায়নিক শিল্পে বাংলাদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান নাম করেছেন এই কোম্পানী তাঁদের অন্যতম। এঁদের তৈরী মার্গো সোপ, নিম টুথ্‌পেষ্ট্‌ ও পাউডার, রেণুকা টয়লেট পাউডার, বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদমতে তৈরী ভৃঙ্গল, তিলল, কোকোনল, ক্যাষ্টরল প্রভৃতি নানা রকম তেল এবং নানা রকম ওষুধ-বিষুধ ব্যবহার

করে কাউকে ঠকতে হয় নি—সবগুলিই চমৎকার। সিলট্রেস্‌ নামে এঁরা একটা সুন্দর ক্যাম্পুও বার করেছেন। আমরা এঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সেনোলা—বাংলাদেশে গ্রামোফোন, রেকর্ড ও আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ে সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্‌-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। এবার এঁরা "স্বপন-বুড়ো" নাম দিয়ে ছোট ছেলেদের উপযোগী একটা নতুন রেকর্ড বার করেছেন। বাংলাদেশে এ বিষয়ে বোধ হয় এঁরাই প্রথম পথ দেখালেন। বাংলার ঘরে ঘরে এর আদর হবে সন্দেহ নেই।

ভীমচন্দ্র নাগ—ভীম নাগের সন্দেশের নাম জানে না এমন লোক বাংলাদেশে নেই। দীর্ঘ দিন ধরে এঁরা বাংলাদেশকে রসনার আনন্দ (শ্রেষ্ঠ আনন্দ) দিয়ে আসছেন। এঁদের তৈরী সন্দেশের বাস্তবিক তুলনা হয় না। আমরা দিন দিন এঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পুস্তক-পরিচয়

আজব বই—সম্পাদক শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী। প্রকাশক—দেবসাহিত্য কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম ১৷৹

ইংরাজী Wonder book-এর মত এই সুদৃশ্য বইখানি এবারকার বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটা বড় রকম দান। সুযোগ্য সম্পাদকের সম্পাদনায় বইখানি বাস্তবিকই বড় সুন্দর হইয়াছে। দুনিয়ার নানা রকম আজব কাণ্ড—নানা রকম জানিবার তথ্যে বইখানি ভরপূর। তা ছাড়া গল্প-কবিতাও অনেক আছে; আর ছবির তো কথাই নাই। শিক্ষার সঙ্গে আমোদকে কি ভাবে মিলাইতে হয় এই বইখানিতে তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত।

কিছু-মিছু—অমিয়া গুপ্তা ও নলিনী গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শিশু-সাহিত্য মন্দির (১৭, নীলমণি দত্ত লেন, কলিকাতা)। দাম ৷৹

নলিনী বাবু রামধনুর একজন নিয়মিত লেখক। তাঁর লেখার সঙ্গে তোমরা পরিচিত। এই বইখানিতে তাঁর ও অমিয়া গুপ্তার লেখা কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গল্প ও কবিতা আছে। বইখানা সকলেরই ভাল লাগিবে।

ভ্যাঁস্তুরাম—শ্রীননীগোপাল মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুবিমল মজুমদার, ২এ, কুপার ষ্ট্রীট,। দাম ৷/৹

এই বইখানিতে ননী বাবু গল্পের ভিতর দিয়া জন্তু-জানোয়ারের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনেক কথা বলিয়াছেন। গল্পগুলি একেবারে নতুন ধাঁচে লেখা—ছেলেদের খুবই ভাল লাগিবে, সেই সঙ্গে তারা অনেক কিছু শিখিবেও। বইটির ছবি ও ছাপা বেশ সুন্দর।

আনারস—শ্রীনবজীবন ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক – রঞ্জন প্রকাশালয় (২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা)। দাম ১৲

ছেলেদের জন্য লেখা কতকগুলি কবিতা- পড়িয়া আনন্দ পাইবে। বইখানি দেখিতে সংগ্রহ। অনেকগুলি কবিতাই হাসির—ছেলেরা বেশ সুদৃশ্য ; প্রত্যেক পাতায় ছবি আছে।

সন্দেশ

বিখ্যাত বাঙ্গালী সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষের কথা তোমরা রামধনুতে অনেক বার পড়িয়াছ। তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে আর একজন বাঙ্গালী অবিরাম সাঁতারে নূতন করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড্ ভাঙ্গিয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি থাকেন এলাহাবাদে। সম্প্রতি ইনি একাদিক্রমে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সাঁতার কাটিয়াছেন। ইহার আগে পৃথিবীর রেকর্ড্ ছিল ৮৭ ঘণ্টা ১৭ মিনিট—একজন ইটালিয়ানের।

* * *

আমেরিকায় অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে প্রতি ৪৫ মিনিটে একটি করিয়া লোক খুন হয়। প্রতি বছর সেখানে প্রায় ১৪০ ০০০ জন লোক নানা অপরাধে জেলে যায়।

* * *

আধ সের তূলা হইতে চেষ্টা করিলে ৩৩২০০ মাইল লম্বা সূতা তৈরী করা যায়। অর্থাৎ সে সূতা পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে চার গুণেরও বেশী লম্বা।

* * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা নাকি নিউজিল্যাণ্ড্। সেখানে পুরুষদের আয়ু গড়ে ৬২ বছর, মেয়েদের আরও বেশী—৬৫ বছর। ইংলণ্ডের পুরুষেরা গড়ে বাঁচে ৫৬ বছর। আর আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরা গড়ে ২৩ বছরের কিছু বেশী বাঁচে।

* * *

অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ উত্তর মেরুর কাছে এক রকম অদ্ভুত গাছ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে অঞ্চলে মাটী পাওয়া যায় না—সমস্তই বরফে ঢাকা, কিন্তু এই গাছগুলি সেই বরফের মধ্যেই শিকড় গাড়িয়া বাঁচিয়া থাকে। গাছগুলি অবশ্য খুব বড় হয় না, কিন্তু তাতে এক রকম চমৎকার গন্ধওয়ালা রঙ্গিন ফুল ফোটে। এই গাছের নাম "বেটুয়ালা ওডোরাটা"।

* * *

প্রাচীন মিশরে 'অনানা' নামে একজন গল্প-লেখক ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন পৃথিবীতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম 'ছোট-গল্পের' লেখক।

* * *

গরমের দিনে শব্দ শীতের দিনের চেয়ে তাড়া-তাড়ি যায়। অর্থাৎ একই জায়গা হইতে যদি কামান দাগা যায় তবে তার আওয়াজ ঠিক একই জায়গায় বসিয়া শীত কালের চেয়ে গ্রীষ্ম কালে তাড়াতাড়ি কানে আসিবে। অবশ্য এই সময়ের তফাৎটা এতই কম যে কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিকেরাই তাঁদের যন্ত্রপাতি দিয়া তা' ধরিতে পারেন।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে যখন জার্ম্মানীতে খাবারের অভাব দেখা দেয় তখন জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিকেরা করাতের গুঁড়া হইতে খাবার তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি বেগিন্স্ নামে এক জার্ম্মান্ পণ্ডিত মানুষের উপযোগী না হোক্, গরু-ভেড়ার উপযোগী এক রকম খাবার করাতের গুঁড়া হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন।

* * *

জোনাকী পোকার শরীর হইতে আলো বাহির হইতে তোমরা দেখিয়াছ; অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর শরীর হইতেও ঐ রকম আলো বাহির হয়। কিন্তু কোন মানুষের শরীর হইতে আলো বাহির হইবার কথা বলিলে তোমরা নিশ্চয়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু ইটালির পিয়ানোতে আনা মোনারো নামে একটি মেয়ের বুকের কাছ হইতে কিছু দিন যাবৎ এক রকম সবুজ আলো বাহির হইতেছে। এই আলো সব সময়ে বাহির হয় না, কিন্তু যখন হয় তখন ৩।৪ সেকেণ্ড্ থাকে। উপবাস করিলে দিনের মধ্যে ২৫ বারও এই রকম আলো বাহির হয়। মেয়েটির বিশেষ কোনও ব্যারাম নাই। ডাক্তারেরা এখনও ইহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

* * *

প্রফেসার ওলফষ্ট্র্যাণ্ডওল্ড্ নামক ওয়াশিং-টনের এক পণ্ডিত বলিতেছেন—কলম্বসের প্রায় চার শ' বছর আগে নর্স্ জলদস্যুরা আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব ঘাঁটিয়া তিনি ইহার ভাল প্রমাণ পাইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের 'য়্যাবিসিনিয়া' নামক প্রবন্ধে একটু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। লর্ড্ নেপিয়ারের প্রতিমূর্ত্তি কেল্লার নিকটেই, কিন্তু রেড্ রোডের মোড়ে নয়; কেল্লার পশ্চিম দিকে গঙ্গার কাছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লেখাটা এই রকম হবে—

রাবণ অশোক-বনে জনক-দুহিতাকে লইয়া যাওয়ায় রাঘব এক দল বন্ধুর সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন। তার পর সে এক বিরাট কাণ্ড। রাবণ একেবারে সবংশে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। তৎপর যা হয়। মহানন্দে সদলবলে সকলের প্রত্যাবর্ত্তন।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

রামেন্দু ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কলিয়ারী); মৃণাল, চিন্ময়, মৃন্ময় প্রভৃতি (রঙ্গপুর); সিমূলিয়া এম্, ই, স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ;

লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (মিঠাপুর); নিখিল, সত্য; শান্তিব্রত, (জলপাইগুড়ি); শৈলেশচন্দ্র দাস ও অজিতকুমার সেন (মাথাভাঙ্গা); ম, অমল, বিমল মুস্তফী প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণদাস ও পাঁচুগোপাল, শরৎ বাবু (নওয়াপাড়া); মঞ্জু, কৃষ্ণা, মায়া প্রভৃতি (শিলং); নরেন্দ্র বিশ্বাস ও অতুল দাশগুপ্ত (শিলং); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); বলরাম দে, ননীগোপাল, চিত্ত; খগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র; অমরেন্দ্র সত্যেন্দ্র (মালখানগর)।

নূতন ধাঁধা

আমাকে পেলে লোকে খুব খুসী হয়, অথচ কোন বিশ্রী কিছু দেখলেই লোকে আমার নাম করে। আমার গোড়ার দিক্ থেকে খানিকটা নিলে পাবে এক সহর, আর শেষ দিক্ থেকে খানিকটা নিলে আসবে একজন বড় বীর। আমার গোড়ার দিক্ থেকে খানিকটা আর শেষের দিক্ থেকে খানিকটা যদি একত্র ক'রে নিতে চাও তবে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত। আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ কি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার রামধনু আকারে ও নানা দিক্ দিয়া অনেকখানি বড় করা হইল। সেজন্য এবং শেষ দিকে ছাপাখানায় অপ্রত্যাশিত বিভ্রাটের জন্য ছাপাখানা কিছুতেই ১লা তারিখে কাগজ বাহির করিয়া দিতে পারিল না—কয়েক দিন দেরী করিয়া ফেলিল। আশা করি গ্রাহকেরা আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

পূজা-সংখ্যা বলিয়া এ মাসে কোনও ধারাবাহিক রচনা দেওয়া হইল না।

পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে, সেজন্য কার্ত্তিক মাসের রামধনু ১লা কার্ত্তিক বাহির না হইয়া **১২ই কার্ত্তিক** বাহির হইবে। বলা বাহুল্য, অগ্রহায়ণ হইতে আবার ১লা তারিখেই কাগজ বাহির হইতে থাকিবে।

দিনের শেষে

৮ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪২ | ১০ম সংখ্যা

ছেলেদের গান

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ভালবাসি আমরা সবাই
আমাদের এই পৃথিবী রে,
নিত্য অভিষিক্ত সে যে
হাসির সুধায়, আঁখির নীরে।
স্বর্গে ঋতু বসন্ত ভাই,
সবাই যুবক, শিশু যে নাই,
হয় না প্রতিপদের এ চাঁদ
পূর্ণশশী ধীরে ধীরে।

নাইক' কুঁড়ি, নাই ঝরা ফুল,
আজন্ম ফুল ফুটেই থাকে,
পদ্ম হতে পদ্মচাকী
হবার আশা কেউ না রাখে।
নাইক' মুকুল, নাই কচি আম,
কেবল ডাঁটো ডাঁসার যে ধাম,
ডাব নাহি ভাই, সব নারিকেল—
মন্দাকিনীর তীরে তীরে।

ক্ষণিক কিছু নাইক' সেথা
রামধনু তাই ওঠে নাক',
আতসবাজির নাই সুবিধা,
শিউলিও তাই ফোটে নাক'।
সেথায় কেহ নাইক' বুড়া—
কেবল সেথা বাবা, খুড়া,
রয় না সেথা নাত্‌নী-নাতি
এমন ঠাকুরদাদায় ঘিরে।

চাকে যেমন মৌমাছি রয়
আমরা ধরায় ঘিরেই র'ব,
দেব্‌তা হতে না পারি ভাই,
মানুষ মোরা হ'বই হ'ব।
আমরা কাঁচা, আমরা কচি,
মর্ত্ত্যে মোরা স্বর্গ রচি,
পারিজাতই না হই যদি
পদ্ম হবার বাধা কি রে?

দেবতা বড় আমরা ছোট—
মোটেই ত' নেই আড়াআড়ি,
থাকুক মোদের ছোট হ'তে
বড় হ'বার অধিকারই।
চতুর্ভুজের বাহন হবার
থাকুক বুকে শক্তি সবার,
গরুড় শিশু ভাণ্ড সুধার
স্বরগ থেকে আনবো ফিরে।

নিয়তির খেলা

(কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ)

কৌশাম্বীর প্রধান শ্রেষ্ঠী রত্নদত্ত বাণিজ্যের জন্য বারাণসী নগরে বাস করিতেছিলেন। কাশীরাজের জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিলেন, "আজ কৌশাম্বীর ভবিষ্যৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর জন্ম হইল।" রত্নদত্তের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। রত্নদত্ত ভাবিলেন—নিশ্চয় তাঁহারই পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। তখনই অশ্বারোহী দূত প্রেরিত হইল। কয় দিন পরে দূত ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—রত্নদত্তের সন্তান হয় নাই। রত্নদত্ত এ সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া কৌশাম্বী নগরে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার এক বুদ্ধিমতী দাসীকে বলিলেন, "তুমি নগর ভ্রমণ করিয়া খোঁজ লও, কাহার ঘরে ঐ দিনে পুত্র জন্মিয়াছে। যত টাকা লাগে তাহাই দিব—ঐ ছেলেটিকে সংগ্রহ করিতে হইবে।"

দাসী খোঁজ করিয়া জানিল—যে দিনের কথা জ্যোতিষী বলিয়াছিল তাহার পর দিন ভোর বেলায় নগরের ঝাড়ুদার পথের পাশে একটি সদ্যোজাত শিশু কুড়াইয়া পাইয়া পালন করিতেছে। রত্নদত্ত ঝাড়ুদারকে সহস্র মুদ্রা দিয়া

শিশুটিকে সংগ্রহ করিল। শিশুটি পরমসুন্দর, রাজপুত্রের মত সুদর্শন। রত্নদত্ত ঠিক করিল, যদি তাহার গৃহিণীর কন্যাসন্তান জন্মে তবে তাহার সহিত এই ছেলেটির বিবাহ দিবে, আর যদি পুত্রসন্তান জন্মে তাহা হইলে ইহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। শিশুটির নাম দেওয়া হইল ঘোষক।

পনের দিন পরে রত্নদত্তের গৃহিণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। তখন রত্নদত্ত ছেলেটিকে বধ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। সোজাসুজি বধ করিলে পাছে রাজার রোষে পতিত হয় সেই ভয়ে রত্নদত্ত কৌশল খুঁজিতে লাগিল। প্রথমে রত্নদত্তের নির্দ্দেশে দাসী শিশুটিকে গোয়ালবাড়ীর দুয়ারে শোয়াইয়া রাখিল—ভোরবেলায় যখন গোরুগুলি বাহির হইবে তখন নিশ্চয় তাহাদের পদতলে শিশুটির মৃত্যু হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। প্রথমেই পালের প্রধান ষাঁড়টি বাহির হইয়া শিশুটিকে আঁগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সব গোরুগুলি একে একে চলিয়া গেলে সে চলিয়া গেল। তার পর রত্নদত্ত ঘোষককে রাত্রিকালে রাজপথে শোয়াইয়া রাখিল—ভাবিয়াছিল শকট, অশ্ব কিংবা হস্তীর পদতলে নিশ্চয়ই এ মারা যাইবে। কিন্তু দেখা গেল প্রাতঃকালে সে পথে শুইয়া হাসিতেছে। একটি কুকুর তাহাকে ঘেরিয়া শুইয়া আছে। তার পর রত্নদত্ত তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিল কিন্তু শ্মশানের কুকুর, শৃগাল, শকুনি তাহাকে স্পর্শও করিল না—একটি শকুনি পাখার আড়ালে ছেলেটিকে বাঁচাইয়া রাখিল। তার পর ঘোষককে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইল; তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। তখন রত্নদত্ত ঘোষককে কৌশলে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টায় রহিল।

ঘোষক শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল; ক্রমে সে সাত-আট বৎসরের বালক হইল। এদিকে এক বিপদ্ ঘটিল—শ্রেষ্ঠীর ছেলেটির সঙ্গে ঘোষকের এমন ভাব হইল যে শ্রেষ্ঠীপুত্র এক মুহূর্ত্তও ঘোষককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। দুই জনে এক সঙ্গে খেলা করিত, এক সঙ্গে উঠিত-বসিত, এক সঙ্গে খাইত। দুই জনের মধ্যে যমজ ভাইএর মত ভাব জন্মিল। রত্নদত্ত ভাবিল আর দেরী করা উচিত নয়। কিন্তু সুযোগ আর ঘটে না—ক্রমে ঘোষকের বয়স বারো বৎসর হইল।

রত্নদত্তের অনুগত এক কুম্ভকার ছিল। কুম্ভকার একবার হত্যার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল, রত্নদত্ত বহু টাকা দিয়া তাহাকে খালাস করিয়াছিল। কুম্ভকার নগরের প্রান্তে বাস করিত। সে জানিত রত্নদত্ত তাহার পালিত পুত্রের প্রাণ হরণ করিতে চায়, কিন্তু কোন্‌টি পালিত পুত্র কোন্‌টি ঔরসজাত পুত্র তাহা সে সঠিক জানিত না। রত্নদত্ত এক দিন একখানি চিঠি দিয়া ঘোষককে কুম্ভকারের বাড়ীর দিকে পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল—'পত্রপাঠ পত্রবাহককে হত্যা করিয়া তোমার হাঁড়ী পোড়ানোর অগ্নিকুণ্ডে পোড়াইয়া ফেলিবে। এজন্য তোমাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।' ঘোষক পত্র লইয়া যাইতেছিল, পথে শ্রেষ্ঠিপুত্রের সঙ্গে দেখা হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র খেলায় হারিয়া কাঁদকাঁদ হইয়া ঘোষককে বলিল, "ভাই, তুমি আমার হইয়া খেলিয়া ঋণ শোধ দাও, আমি পারিতেছি না।" ঘোষক বলিল, "আমি একখানা চিঠি লইয়া সুদর্শন কুম্ভকারের বাড়ী যাইতেছি, আমি এখন খেলিতে পারিব না।" শ্রেষ্ঠিনন্দন বলিল, "আমি তোমার চিঠি লইয়া যাইতেছি, তুমি আমার হইয়া খেল।" এই বলিয়া শ্রেষ্ঠিনন্দন চিঠিখানি লইয়া সুদর্শনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কুম্ভকার শ্রেষ্ঠিনন্দনকে ঘোষক বলিয়া বুঝিল—পত্র পড়িয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তৎক্ষণাৎ অর্থলোভে কুম্ভকার শ্রেষ্ঠিনন্দনকে হত্যা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিল।

রত্নদত্ত কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন সে নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য মাথার চুল ছিঁড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সে বুঝিল—বিধাতার বিরুদ্ধে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠী ঘোষকের জীবন-হরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। ঘোষক তাহার ভ্রাতাকে হারাইয়া রাত-দিন কাঁদিত। এই ভাবে কিছু কাল গেল।

ক্রমে ঘোষক বিশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক হইয়া উঠিল। হঠাৎ রত্নদত্তের হত্যাপিপাসা আবার জাগিয়া উঠিল। পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে রত্নদত্তের একটি জমিদারী ছিল। যে কর্ম্মচারীর উপর ঐ জমিদারীর ভার ছিল সে ছিল একজন ভীষণ প্রকৃতির লোক। রত্নদত্ত ঠিক করিল, তাহার দ্বারাই ঘোষকের হত্যাসাধন

করিতে হইবে। একখানি পত্র লিখিয়া রত্নদত্ত ঘোষককে ঐ কর্ম্মচারীর কাছে পাঠাইল। পত্রে লেখা রহিল—'পত্রবাহককে হত্যা করিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।' ঘোষক পত্র লইয়া যাত্রা করিল।

চল্লিশ ক্রোশ দূরে একজন শ্রেষ্ঠী থাকিতেন, তাঁহার নাম মণিকণ্ঠ। মণিকণ্ঠ রত্নদত্তের আত্মীয়। ঘোষক মণিকণ্ঠের গৃহে রাত্রিকালে আশ্রয় লইল। মণিকণ্ঠ গৃহে ছিল না, তাহার স্ত্রী পরিচয় পাইয়া ঘোষককে আদর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। আহারান্তে পথক্লান্ত ঘোষক ঘুমে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। মণিকণ্ঠের একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাহার নাম কমলা। কমলা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সুশিক্ষিতা। সে লক্ষ্য করিল ঘোষকের উড়ুনিতে একখানি পত্র বাঁধা আছে। ঘোষক ঘুমাইয়া পড়িলে কমলা তাহার কক্ষে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে পত্রখানি খুলিয়া নিজের কক্ষে গিয়া পড়িয়া দেখিল। চিঠি পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন সুন্দর ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য শ্রেষ্ঠী তাহার কর্ম্মচারীকে কি করিয়া আদেশ দিল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। কমলা চিঠিখানিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একখানি চিঠি জাল করিল। সে চিঠিতে লিখিল—"আমার পালিত পুত্র ঘোষককে তোমার কাছে পাঠাইলাম। ইহার সহিত আমার আত্মীয় মণিকণ্ঠের কন্যার বিবাহ দিবে এবং তাহাকে আমার জমিদারীতে একটি ভাল বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিবে। ঘোষক জমিদারীতে থাকিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখিবে। এখানে বিবাহ দিলে বহু টাকা ব্যয় হইবে, সেজন্য তোমার উপর ভার দিলাম।"

এই চিঠিখানি কমলা ঘোষকের চাদরে বাঁধিয়া দিল। ঘোষক ঐ চিঠি লইয়া জমিদারীতে গেল। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘোষকের বিবাহ হইল; প্রকাণ্ড বাড়ীতে বরকন্যা মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিল। রত্নদত্ত যখন এ সংবাদ শুনিল তখন একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সে শয্যাগ্রহণ করিল এবং তাহাকে নানা রোগে ধরিল। রত্নদত্ত ঘোষকের কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইল—"আমি বড়ই পীড়িত, তোমরা শীঘ্র এস।"

কমলা কৌশাম্বীর বার্ত্তাবাহককে ঘোষকের সঙ্গে দেখা করিতেই দিল না।

বুদ্ধিমতী কমলা বুঝিল এখনও শেষ সময় উপস্থিত হয় নাই। আবার কয়েক দিন পরে আর একজন লোক আসিল। কমলা তাহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিল, ঘোষক এ সংবাদ জানিতে পারিল না। তৃতীয় বার যখন দূত আসিল তখন কমলা তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিয়া বুঝিল—আর বেশী দেরি নাই। তখন সে ঘোষককে শ্রেষ্ঠীর পীড়ার সংবাদ জানাইল এবং বহু লোকজন লইয়া কৌশাম্বী যাত্রা করিল।

পথে অযথা দেরী করিয়া কমলা ও ঘোষক যখন কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইল তখন শ্রেষ্ঠীর শেষ সময় উপস্থিত। শ্রেষ্ঠীর শয্যাপার্শ্বে ঘোষক ও কমলা গিয়া দাঁড়াইল—চারি পাশে আত্মীয়, বন্ধু ও কর্ম্মচারিগণ বসিয়া আছে। রত্নদত্তের ঘোষককে কিছুই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। পাছে ঘোষক মৃত্যুর পর শ্বশুরের সাহায্যে সব অধিকার করে তাই সে কে কি পাইবে বলিয়া যাইতে চায়। শ্রেষ্ঠী বলিল, "আমার সম্পত্তির দুই আনা পাইবে আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র, দুই আনা পাইবে আমার দুই ভাগিনেয়, আর বাকী পাইবে ঘোষকের স্ত্রী"। এই কথা বলিয়াই রত্নদত্ত ভুল-সংশোধনের জন্য আবার যেমন মুখ খুলিয়াছে, অমনি কমলা রত্নদত্তের বুকে মাথা রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা, আপনিই যদি চলিলেন—আমি ধন-সম্পত্তি লইয়া কি করিব? বাবা, আমি হতভাগিনী, আপনার সেবাযত্ন করিতে পাইলাম না—আপনার সম্পত্তির চেয়ে আমার স্নেহ আমার কাছে অনেক দামী।' এই ভাবে সে চেঁচাইয়া এমন গোলমাল বাধাইয়া দিল যে শ্রেষ্ঠী পরে কি বলিল বা বলিতে চাহিল তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না। ঐ গোলমালের মধ্যে শ্রেষ্ঠী প্রাণত্যাগ করিল। শ্রেষ্ঠীর বলিবার ইচ্ছা ছিল—'বাকী আমার স্ত্রী পাইবে।' 'আমার' বলিতে গিয়া শ্রেষ্ঠী 'ঘোষকের' বলিয়া ফেলিয়াছিল। কমলা বুঝিয়াছিল শ্রেষ্ঠী ভুল করিয়াছে, তাই কিছুতেই ভুল-সংশোধন করিতে দিল না। ঘোষক কৌশাম্বীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী হইল। সে কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নীকেই গৃহের কর্ত্রী করিয়া রাখিল।

আর একটু হ'লেই—

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত' বিশ্বাস করতে চাইবে না—কিন্তু কথাটা সত্য যে মানুষকে দেখ্‌বামাত্রই বিনা আহ্বানে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার মত 'সৎ'-সাহস খুব অল্প পশুরই আছে। বিশেষ ক'রে সেই মানুষের গায়ের রং যদি কালোর বদলে সাদা হয় ত' কথাই নেই—তাকে কোন অসাধারণ জীব মনে ক'রে সে নিজের জায়গায় চুপ্‌চাপ্‌ প'ড়ে থাকে!

এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিই: আফ্রিকায় রোডেসিয়ার একজন ইংরাজ যুবক এক দিন তার খনিতে কাজ করতে যাচ্ছে—হাতে সাধারণ এক গাছা ছড়ি ছাড়া কোন অস্ত্র নেই। গ্যাটুলিং হিল্‌ নামে একটা জায়গা ছাড়িয়ে খানিক দূর যেতেই তার পথ পড়্‌ল বড় বড় ঘাসওয়ালা একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে। সেই পথ ধ'রে খানিকটা যেতেই সে দেখ্‌ল কিছু দূরে কি একটা জন্তু তার দিকে আস্‌ছে। তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ (short-sighted) ছিল ব'লে সে পশুটাকে একটা বড় কুকুর মনে ক'রে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে চল্‌ল।

কিন্তু একটু পরেই পশুটাকে যখন স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাওয়া গেল তখন সে একেবারে কেঁপে উঠ্‌ল—যাকে কুকুর ব'লে মনে করেছিল সেটা একটা প্রকাণ্ড সিংহ! যুবকটী তখন ভাল করেই বুঝতে পার্‌ল যে পালাবার চেষ্টা করা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। এই কথা ভেবে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই পাথরের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিংহটা কয়েক মুহূর্ত্ত অস্থির ভাবে লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে তার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল, তার পর অকস্মাৎ ঘুরে বড় বড় ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। যুবকটীও আর দাঁড়াল না, যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌তে লাগ্‌ল; এবং প্রতিক্ষণে আশঙ্কা করতে লাগ্‌ল বুঝি সিংহটা তার অনুসরণ করতে করতে এইবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্‌বে! কিন্তু তাকে আর সে রকম বিপদে পড়্‌তে হয় নি।

পশু-শিকার সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক বক্‌স্‌টন্‌ সাহেবও একবার উগাণ্ডায়

এই রকম বিপদে পড়েছিলেন। এক দিন তিনি ও তাঁর মেয়ে দু'খানা সাইকেলে চড়ে জনশূন্য একটা পথ ধ'রে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে লক্ষ্য করলেন কিছু দূরে পথ আগ্‌লিয়ে জনৈক পশুরাজ তাঁদের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তা' দেখে পিতা-পুত্রী কেউই মনের সাহস হারালেন না, অবিরাম 'বেল্‌' বাজাতে বাজাতে তীরবেগে সিংহটার দিকে সাইকেল চালাতে লাগলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নেই, তাঁরা কাছাকাছি আস্‌বামাত্রই পশুরাজ দু'পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে নিয়ে পথের এক পাশে সরে গেলেন।

ঘাসওয়ালা মাঠ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সে সাম্‌নে দেখ্‌তে পেল—

কিন্তু সিংহের কাছ থেকে এই রকম সম্মান লাভ সকলের অদৃষ্টেই ঘটে না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর রোডেসিয়ার বারোট্‌স্‌ল্যাণ্ডের এক জায়গা থেকে কর্ণেল হার্ডিং নামে একটী শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারী গাধায়-টানা গাড়ীতে চ'ড়ে কালোমো নামে এক গাঁয়ে চলেছিলেন। পথের মধ্যে এক জায়গায় হঠাৎ ন'টা সিংহ মিলে তাঁকে আক্রমণ কর্‌ল। গাধা দু'টো প্রাণভয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালাল আর কর্ণেল হার্ডিং একা একটা রাইফেল নিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন। দু'টো সিংহকে তিনি তখনই শেষ ক'রে ফেল্‌লেন। এর পর একটা প্রকাণ্ড সিংহী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় তিনি ধরাশায়ী হলেন। মরণ-বাঁচনের কথা যখন আর কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার ঠিক সেই সময়ে তাঁর কাফ্রী চাকর আর একটা রাইফেল নিয়ে সেখানে এসে পড়্‌ল এবং তারই চেষ্টায় হার্ডিং সাহেব প্রাণে বেঁচে গেলেন।

সিংহের মুখে গিয়েও এভাবে জীবন নিয়ে ফিরে আসার কথা বড় একটা শোনা

যায় না, কিন্তু এবার যে ব্যাপারটার উল্লেখ করব তার যেমন তুলনা নেই তেমনি মিথ্যা মনে করবারও কোন কারণ নেই—আফ্রিকার বার্বারটন্ জেলার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ আল্‌ফ্রেড্ পীজ সাহেব নিজে এ কাহিনী সত্য ব'লে বলেছেন: ট্রান্‌স্‌ভালের বন-বিভাগের পরিদর্শক ভোল্‌হুটার এক দিন কাজ সেরে সন্ধ্যার কিছু পরে ওলিফ্যান্ট্ নদীর ধার দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন—হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ছ'টো সিংহ বেরিয়ে এল। ভোল্‌হুটারের ঘোড়াটা ভয়ে লাফালাফি ক'রে প্রভুকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে এক দিকে দৌড় দিল—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে একটা সিংহও তাড়া করল। আর, ভোলহুটার উঠে দাঁড়াবার আগেই দ্বিতীয় সিংহটা গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসে তাঁকে মুখে ক'রে ধরে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চল্‌ল।

সিংহটা ভোল্‌হুটারের ডান দিকের কাঁধের কাছে কাম্‌ড়িয়ে ধরেছিল ব'লে তাঁর মুখখানা উপর দিকে ছিল। ঘষ্‌রানির ফলে পায়ের হুক (spur) লাগান জুতো জোড়া পা থেকে ছিঁড়ে চ'লে গেল, পশুটার মুখের ফেনা ও গরম নিঃশ্বাসে তাঁর দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। দৈহিক যন্ত্রণা ও মানসিক আতঙ্কের যে বর্ণনা তিনি পরে দিয়েছিলেন তা যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ।

এই ভাবে প্রায় দু'শ গজ যাবার পর হঠাৎ তাঁর মনে পড়্‌ল যে তাঁর কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে একখানা ছুরি আঁটা আছে। তখন পিঠের তলা দিয়ে বাঁ হাতখানা ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি অনেক চেষ্টায় ছুরিখানা হস্তগত করলেন। এই সময়ে একটা বড় গাছের তলায় এসে সিংহটা একবার থাম্‌ল—আর সঙ্গে সঙ্গে ভোল্‌হুটার প্রাণপণ বলে সিংহের পাঁজরে—যার নীচে হৃদ্‌পিণ্ড আছে—দু'বার ছুরি বসিয়ে দিলেন।

এ ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় সিংহটা যন্ত্রণায় হাঁক দিয়ে উঠ্‌তেই ভোল্‌হুটার মাটীর উপর প'ড়ে গেলেন এবং বিদ্যুদ্বেগে পশুটার গলায় ছুরি মারলেন। কোন রক্তবাহী-নালী কেটে যাওয়ায় সিংহটার গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুতে লাগ্‌ল—সে লাফ দিয়ে ২।৩ গজ দূরে সরে গিয়ে ভীষণ গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। ভোল্‌হুটারও যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে বিহ্বলের মত হয়ে গলা ছেড়ে চীৎকার ক'রে পশুটার প্রতি গালিগালাজ করতে লাগলেন।

কতকটা নিজের ক্ষতের দরুণ কতক বা মানুষটার এই অদ্ভুত আচরণে ভয় পেয়ে পশুটা পিছু হটে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে চ'লে গেল—এবং ক্রমে তার গর্জ্জনও মৃত্যুর আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এ দিকে, ভোল্‌হুটার কষ্টেসৃষ্টে তাড়াতাড়ি সামনের একটা গাছে চ'ড়ে বসলেন। এমন সময় অপর সিংহটা ঘোড়ার নাগাল না পাওয়ায় রক্তের চিহ্ন ধ'রে

শিকারের উপর পতিত ক্রুদ্ধ সিংহ ; চোখ থেকে যেন আগুনের ফুল্‌কি বার হচ্ছে; পেশীগুলি কেমন সবল তা'ও লক্ষ্য কর।

ধ'রে গাছতলায় এসে হাজির! ওদিকে, ভোল্‌হুটারের কুকুরটা অনেক দূর থেকে প্রভুর অনুসরণ করেছিল—সে এই সময়ে এসে পড়ায় সিংহের সঙ্গে তার খিটিমিটি লেগে গেল। কুকুরটা এমন কৌশলে এবং নাছোড়বান্দার মত পশুরাজকে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরণে আঁচ্‌ড়াতে-কাম্‌ড়াতে লাগ্‌ল যে শেষে বিরক্ত হ'য়ে পশুরাজ রণে ভঙ্গ দিলেন! তার পর ভোল্‌হুটারের চাকর-বাকর এসে পড়ায় তাঁকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

Big Cat অর্থাৎ বড় বিড়াল শ্রেণীর পশুদের মধ্যে চিতাবাঘই সব চেয়ে জঘন্য স্বভাবের ও হিংস্র পশু বলে শোনা যায়। এ বিষয়ে আফ্রিকার ও ভারতবর্ষের চিতা সম-পর্য্যায়ভুক্ত।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। নিউইয়র্কের ন্যাচারাল্ হিষ্ট্রী মিউজিয়মের কর্ম্মচারী একলী সাহেব এক দিন পূর্ব্ব-আফ্রিকার টানা নদীর কাছে শিকার কর্‌ছিলেন। হঠাৎ একটা পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় তিনি দেখলেন ভিতরে একটা চিতা গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গুলি চালালেন—কিন্তু সেটা চিতার গায়ে না বিঁধে সামনের বাঁ পায়ে গিয়ে লাগ্‌ল। সেও তখনই একলী সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে ধরাশায়ী কর্‌ল—রাইফেল্‌টা হাত থেকে ছিট্‌কে দূরে প'ড়ে গেল।

তার পর আরম্ভ হ'ল ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ। একলী সাহেব নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারলেন না, চিতাটা তাঁর বাঁ হাতখানা কাম্‌ড়ে ধ'রে রীতিমত চিবুতে আরম্ভ কর্‌ল—অর্থাৎ তাঁকে জ্যান্ত অবস্থাতেই খেয়ে ফেলবার উদ্যোগ কর্‌ল! হাতের পাঞ্জাখানা খেয়ে চিতাটা একটু নড়ে-চড়ে বস্‌তেই একলী সাহেব তাঁর ডান হাতখানা মুক্ত ক'রে নিলেন এবং দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পশুটার গলা আঁকর্ড়িয়ে ধরলেন। সাহেব নিশ্চয়ই 'মরিয়া' হয়ে লেগেছিলেন—সে বজ্র আঁটুনী সহ্য করবার মত ক্ষমতা চিতার আর হ'ল না, তাকে দম বন্ধ হ'য়েই মরতে হ'ল। সাহেবের একখানা হাত গেল কিন্তু প্রাণটা বাঁচ্‌ল!

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বেবুনদের মত ধূর্ত্ত ও দৈহিক গঠনের অনুপাতে শক্তিশালী জানোয়ার খুব কম আছে। এখানে বেবুন-মানুষের হাতাহাতি যুদ্ধের একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি: রবার্ট্ হিউজ নামে কেপ্ কলোনীতে এক জমিদার থাকতেন। তিনি একদিন ক্ষেত-খামার তদারক করতে বেরিয়ে দেখেন একটা প্রকাণ্ড বেবুন তাঁর ফল-ফুলের বাগানে ঢুকে সব তছ্‌নছ্ ক'রে দিচ্ছে। বেবুনেরা সাধারণতঃ কোন অস্ত্রধারী মানুষকে দেখলেই এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে বন্দুকের গুলি তত দূর পৌঁছতে পারে না। এইজন্য হিউজ সাহেব তাঁর রাইফেল নিয়ে চুপি চুপি প্রায় ৩৫০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে তাক্ ক'রে গুলি চালালেন। এইখানে একটা কথা

জানিয়ে দেওয়া ভাল: কৃষকেরা তাদের ফসলের জন্য পঙ্গপালকে যেমন ভয় করে বেবুনকেও তেমনি ভয় করে, তাই ওদের দেখা পেলেই মেরে ফেলবার চেষ্টা করে।

গুলিটা বোধ হয় বেবুনটার শরীরের কোন জায়গায় লেগেছিল—কারণ দেখা গেল, জানোয়ারটা মুখ থুবড়ে পড়্‌ল; কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য—পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে সে এক দিকে পলায়ন কর্‌ল। হিউজ সাহেব তখন তাঁর চাকর ও টেরিয়ার কুকুর দু'টোকে তার পেছনে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন এবং খানিক পরেই দেখ্‌তে পেলেন যে বেবুনটা ধীরে ধীরে একটা ছোট পাহাড়ের মাথার দিকে উঠ্‌ছে।

ক্রুদ্ধ বেবুন

হঠাৎ বেবুনটা গড়িয়ে প'ড়ে এক জায়গায় আট্‌কে গিয়ে নিশ্চল হ'য়ে রইল। হিউজ সাহেব মনে করলেন যে সেটা নিশ্চয়ই মরে গেছে, তাই রাইফেল্‌টা নীচে রেখে দিয়ে তিনি উপর দিকে উঠ্‌তে লাগলেন।

কুকুর দু'টো এই সময়ে অন্য পথে বেবুনটার কাছে গিয়ে পড়েছে—অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়িয়েই তাদের দু'হাতে ধ'রে ফেল্‌ল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চার টুক্‌রো ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার পর চাকরটাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করতেই সে 'বাপ্ রে' ব'লে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কর্‌ল। হিউজ সাহেবও বিপদ্ বুঝে পিছন ফিরতে-না-ফিরতে জানোয়ারটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। তিনি তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—সুতরাং অন্য উপায় না থাকায় বেবুনটার গলা টিপে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বেবুনটা রাগে এবং গুলির আঘাতের যন্ত্রণায় পাগলের মত হ'য়ে সাহেবের দু' হাতের মাংস তুলে তুলে ফেলতে লাগ্‌ল; সাহেব অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুণ—এবং বয়সে বৃদ্ধ ব'লেও—দুর্ব্বল হয়ে শুয়ে পড়লেন, ভাব্‌লেন মৃত্যু নিশ্চিত। ঠিক এই সময়ে তাঁর ডান হাতটা একখানা ভারী পাথরে ঠেকে গেল—বেবুনটা তখন তাঁর বাঁ হাতখানা কামড়ে ধ'রে টানাটানি করছে। যা হোক, পাথরখানা তুলে নিয়ে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে জানোয়ারটার মাথায় আঘাত করলেন এবং তাতেই তার দফা শেষ হ'য়ে গেল, কেননা, গুলি খেয়ে তার শরীরের অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আস্‌ছিল।

পূজোর শিকার

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি)

হাফ্‌ ইয়ার্লি পরীক্ষায় নন্দ এক নম্বরের জন্য অঙ্কে ফেল করিয়াছে, এ সংবাদ ট্যারা সুরেশ যখন আনিয়া দিল তখন নন্দ একবার ঠোঁট বাঁকাইল মাত্র। তিন দিন পরে প্রোগ্রেস্ রিপোর্টে দেখা গেল সে একত্রিশ পাইয়াছে, অর্থাৎ পাশ নম্বরের চেয়েও নগদ এক নম্বর বেশী। সুরেশের আশ্চর্য্য লাগে, নন্দ তুড়ি মারিয়া বলে, "নীট্‌নেসে মেরে দিয়িচি বাবা! কুড়িখানা পাতার ভেতর মাত্র তিনটি পাতে কালীর আঁচড়, আর সব তোফা সাদা—নীট্‌নেসে আদ্দেক নম্বর না দিয়ে যায় কোথা?"

সুরেশ ট্যারা চোখটা একটু নাচাইয়া বলে, "ও তিনখানা পাতাতেই বা লিখ্‌তে গেলি কেন, একেবারে ব্ল্যাঙ্ক্‌ পেপার ঝেড়ে দিয়ে এলেই তো পার্‌তিস্—নীট্‌নেসের চার নম্বর তবে তোর মারে কে?" প্রত্যুত্তরে নন্দ তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই চম্‌কাইয়া উঠিল—পাশের দরজা দিয়া মুরলী বাবু ঘরে ঢুকিতেছেন। নন্দ তখন তাড়াতাড়ি বুড়ো আঙ্গুলটি বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া সুরেশের

চোখের সাম্‌নে গিয়া বলিল, "এই যে—এই জায়গাটায়, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? বড্ড লেগেছে।" মনে মনে সে তখন ভাবিতেছে মাষ্টারমশাই তাহার এ হাতচালটুকু ধরিতে পারিয়াছেন কি না।

মুরলী বাবু হাতচালটুকু ধরিতে পারিলেই বোধ করি ভাল হইত, কেননা তাহার বদলে তিনি যে কথা পাড়িলেন তাহাতে বেচারা নন্দর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "দেখ নন্দ, তোমরা ক'টি ছেলে আছ অঙ্কে বড়ই কাঁচা। আমি ঠিক করেছি এবার পূজোয় হোষ্টেলেই থাক্‌ব; তোমরাও থেকে যাও, অঙ্কটা ঝালিয়ে দেব'খন। ইস্কুল খুল্‌লেই তো টেষ্ট পরীক্ষা...... এলাউ-ট্যালাউ..."

খানিক মাথা চুল্‌কাইয়া নন্দ বলে, "সে তো খুবই ভাল হয় স্যর, তবে মামাবাবু লিখেছিলেন তাঁর ওখান থেকে একবার ঘুরে আস্‌তে ..মামীমা অনেক দিন দেখেন নি আমাকে ..সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলেটি মারা গেছে..."

মুরলী বাবু সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "আহা!"

—"আজ্ঞে, এই পূজোর চার দিন মাত্র থাক্‌ব; তার পরেই চলে আসা যাবে—আসতেই হবে, অঙ্কটায় বড় কাঁচা আছি..." বলিয়া নন্দলাল আবার যেন অঙ্কশাস্ত্রের জন্য গভীর চিন্তায় মাথা চুলকাইতে লাগিল। মুরলী বাবু চলিয়া গেলেন; তখন সে হাসিয়াই লুটোপুটি।

ট্যারা সুরেশ শুধাইল,—"কি রে ক্ষেপ্‌লি নাকি?"

—"হ্যাঁ, আর দেরী নেই, সাম্‌নে থেকে পালা, নইলে কাম্‌ড়ে দেব তোকে!"

ঝরিয়ায় পৌঁছিয়া কিন্তু নন্দর সকল স্ফূর্ত্তি যেন নিবু-নিবু হইয়া গেল। বেশ ছিল সেই অজয় নদীর তীর আর সেই খড়ো-ঘরের হোষ্টেল। সেখানে প্রচুর শস্য, অসংখ্য গাছপালা,—অবারিত শ্যামল মাঠ। কত শত ফুল, কত পাখী, কত মধুর শব্দ—মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মনোহর মিতালি। সমীপেই জলধারার অশ্রান্ত কল্লোল, জেলে-ডিঙ্গির ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ, আর মাঝির দীর্ঘ সুরের গান। নদীতে কি আনন্দেই না নন্দ সাঁতার কাটিত, আর সকল ছেলের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিত,

গাছের ডাল হইতে ঝপাং করিয়া লাফাইয়াও পড়িত। আর এখানে চারিদিকে শুধু কয়লার ধোঁয়া আর আগুন, উঁচুনীচু রুক্ষ প্রান্তর, আর খনির গর্ত্ত ;—না আছে একটা দীঘি, না আছে পাখী ; আছে শুধু অসংখ্য সাপ, যাহারা কামড়াইলে আর মানুষ বাঁচে না।

নন্দর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। তার মা-বাপ নাই, মামা-ই খরচ চালান। গেল বছর সে সুরেশদের গাঁয়ে গিয়া পূজাবাড়ীতে বেশ আমোদ করিয়াছিল; এবার মামার হুকুম, শরীর সারাইবার জন্য এইখানে থাকিতে হইবে, আর নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মহা ফ্যাসাদ আর কি !

স্থানটি একটি কোলিয়ারী। নন্দর মামীমা সম্প্রতি বাপের বাড়ী রাঁচি গিয়াছেন, আসিবেন লক্ষ্মীপূজার পর। প্রকাণ্ড বাসায় এখন আছেন শুধু নন্দর বড় মামা—যিনি কোলিয়ারীর ম্যানেজার, আর ছোট মামা—যাঁর ভুঁড়ি অতি প্রশস্ত কিন্তু মগজ অতি সঙ্কীর্ণ—যিনি বার দুই সেকেণ্ড-ক্লাস্ ম্যানেজারশিপ্ পরীক্ষায় ফেল করিয়া তৃতীয় বারের জন্য ভুঁড়ি-পণ চেষ্টা করিতেছেন। আর আছে গোটা দুই সাঁওতাল চাকর, আর একজন বিশালবপু হাজারিবাগ জিলার খোট্টা রাঁধুনী বামুন, যার হিন্দী বাৎ বুঝিতে নন্দর গা দিয়া ঘাম ঝরে।

কয়েকটা দিন বেশ কাটিল খনিতে নামিয়া, নানা প্রকার অদ্ভুত কাজকর্ম্ম দেখিয়া, প্রেতাকৃতি মাল্‌কাটাদের নৈপুণ্যে মনে মনে বিস্মিত হইয়া। তার পর এখন যে আর দিন কাটিতে চাহে না ! কতক্ষণ আর জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করা যায় ? আইভ্যান্-হো-র গল্পটা সাত বার পড়িলে কি আর ছাই তার কোন রস পাওয়া যায় ?

দিনগুলি যখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, নন্দ যখন ভাবিতে লাগিল ইহার চেয়ে মুরলী বাবুর কাছে অঙ্ক কষাই ভাল ছিল, ঠিক সেই সময়ে ঘর খুঁজিয়া সে আবিষ্কার করিল তাহার মামাবাবুর পাস্-নেওয়া বন্দুকটি।

(২)

বন্দুক ত' পাওয়া গেল, কিন্তু শিকার কোথায় ? মনে কর, নিকটেই এক

প্রকাণ্ড বিল, সেখানে অসংখ্য বুনো-হাঁস আর চখা-চখী—দূর হইতে দাও টিপিয়া বন্দুকের ঘোড়াটা, অম্‌নি গুড়ুম্ করিয়া এক কর্ণ-পটহ-বিদারক ভীষণ আওয়াজ ; ছুটিয়া গেলেই দেখিতে পাইবে গোটা দুই আহত পাখী ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় চিঁ-চিঁ করিতেছে।

কিন্তু হায়, মনে করিলেই ত' আর প্রকাণ্ড বিল রাতারাতি সৃষ্টি হইয়া যায় না ! এবং বন্দুকের ঘোড়া টেপাও অত সহজ নয়। নন্দ ছোট মামার কাছে দু' এক দিন প্র্যাক্‌টিস্ করিল। তিনি ওজনে মাত্র আড়াই মণ, কোমরে কাপড় থাকে না বলিয়া বেল্ট্ পরেন। নন্দ দুইবার বন্দুক ছুঁড়িতে গিয়া যখন নিজেই আছাড় খাইল, তখন তাহার মাথার চাঁদিতে পড়িল ছোট মামার একটি ছোট্ট চাপড়, যাহার মোলায়েম স্পর্শে নন্দ তিন হাত ছিট্‌কাইয়া গিয়া এমন কদর্য্য ভাবে আছাড় খাইল, এবং এমন করুণ ভাবে তাকাইল যে ছোট মামা হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতই মনোহর।

অতএব নন্দ মাঠে গিয়া একাকী নিজেই প্র্যাক্‌টিস্ করিতে লাগিল। ফলে, কে একজন আসিয়া বলে তাহার মশারি ফুটা হইয়াছে, কেহ বলে তার ছেলেটার বাঁ কান ঘেঁষিয়া গুলি গিয়াছে, আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাহার মৃত ছাগশিশুটি বড় মামার পায়ের তলায় ফেলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল।

বড় মামা ধমক দিয়া শাসাইলেন, এবং স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে ফের যদি তিনি ভাগ্নের হাতে বন্দুক দেখেন ত নির্ঘাত তাহাকে সেই দিনই হোষ্টেলে ফেরৎ পাঠাইবেন। নন্দ মনে মনে ভাবিল,—"আমি ত' তা হ'লে বাঁচি।"

নন্দর মন ক্রমেই দমিয়া যায়। আর যেন এক দণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা করে না। কেবল ছোট মামার রাঁধা মুর্গী-মাংস আর পাঁড়েজীর রাঁধা ঘৃত-সিক্ত রুটির যা একটু মায়া ! নহিলে সে এত কাল কবেই প্রস্থান করিত।

হঠাৎ এক দিন মন বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। বড় মামা সন্ধ্যার সময় খনি হইতে ফিরিয়া বলিলেন,—"ওহে, তোমরা আজ একটু সাবধানে থেক, এক দল পাঞ্জাবী ডাকাত এ অঞ্চলে বড্ড উপদ্রব কর্‌ছে, কাল জিয়ালগোড়া কোলিয়ারীর

ম্যানেজারের বাড়ীতে লুট-পাট করেছে। ঐ বন্দুকটা না হয় আজ মাথার শিয়রে রেখ ; আমার একটা রিভলবার আছে।”

ছোট মামার মুখ শুকাইল, কিন্তু নন্দ মনে মনে উৎসাহিত হইয়া ভাবিল,—যাক্ আজ তবে সত্যিই একটা শিকারের মত শিকার পাওয়া গেছে। সে চিরকালই দুর্দ্ধর্ষ, ভয়-ডর নাই। ওঃ, কি মজাই না হইবে যদি সে একটা ডাকাতকে গুলি মারিয়া কুপোকাৎ করিতে পারে!

মামাবাবু বাহিরের দিকে একটা বড় ঘরে শয়ন করেন। আর অন্দরের দিকে লম্বা ঘরখানিতে শোয় নন্দ ও ছোটমামা। বারান্দার পরে উঠান, তার ওপিঠে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও ঠাকুর-চাকরদের দুইটা ছোট কুঠুরী।

রাত্রি তখন বোধ করি বারোটা। চারি দিক্ নিঃঝুম। দূরে শুধু এক রাশ কোক্-কয়লার ধোঁয়া আর মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। বাহিরে যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল আব্‌ছা জ্যোৎস্না, এখানে-সেখানে গর্ত্ত-মুখে লিফ্‌টের যন্ত্রটা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। সহসা নন্দর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাহিরে কিসের মস্ মস্ শব্দ—ঠিক যেন কে পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতেছে।

তড়াক্ করিয়া নন্দ উঠিয়া বসে। বন্দুকটা হাতে বেশ চাপিয়া বাগাইয়া ধরে। তার পর ছোটমামাকে চিম্‌টি কাটিয়া জাগাইয়া দেয়। তিনি ‘উঃ’ বলিয়া চীৎকার করিতেই নন্দ বাঁ হাতে তাঁর মুখ চাপিয়া ধরে। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে,—“চোর এসেছে, চুপ!” আরও কত কি ইসারা করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

বাহিরে সেই মস্ মস্ শব্দ। সেই সাবধান গতি। ছোটমামার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া ওঠে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে। মুখে রা নাই—অথচ যেন বলিতে চান,—“ওহে বাপু, আর যাই কর, দরজা খুলিও না—বরং চাদর মুড়ি দিয়া গভীর নিদ্রার ভাণ কর—আপনি বাঁচিলে বাপের নাম!”

নন্দ ধীরে—অতি ধীরে উঠিয়া দুয়ারের খিল খুলিল। ছোটমামার মুখে কাতর অস্ফুট ধ্বনি, তিনি উঠিয়া নন্দর একটা ঠ্যাং টানিয়া ধরিলেন। সে পড়িতে

পড়িতে উঠিয়া নিজেকে মুক্ত করিল। আস্তে আস্তে বলিল,—“আপনি আমার পেছনে থাকুন, ভয় নেই, আজ ডাকাতের নিকুচি করেছে…বন্দুকের কাছে ইয়াকি নয়।”

তার পর অতি সন্তর্পণে দরজা একটু ফাঁক করিয়া নন্দ দেখিল,—সত্যই বাহিরে একজন ভীষণাকৃতি বিশাল-বপু লোক অতি সাবধানে হাঁটিতেছে, এক-একবার পাঁড়েজীর ঘরের জানালায় উঁকিও মারিতেছে, মনে হইল। নন্দ বেশ করিয়া তাগ্ করিল। বন্দুকের নল দরজার ফাঁকে কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিল। তার পর দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া দিল ঘোড়াটা টিপিয়া। গুড়ুম!!

অমনি—“বাপা হো” শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকাত-পুঙ্গব এক লাফে একেবারে পাঁড়েজীর ঘরের ভিতর, আর দুড়ুম করিয়া খিল বন্ধ।

নন্দ তখন “চোর, চোর” শব্দে ভীষণ চীৎকার করিয়া বাড়ী মাৎ করিয়াছে, এবং বিদ্যুদ্বেগে দৌড়িয়া আসিয়া পাঁড়েজীর ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়াই বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ডাকাত ধরা পড়িয়াছে।

ওদিকে বড়মামা আলুথালু বেশে চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বাহিরে আসিয়াছেন। ভৃত্যেরা জাগিয়া প্রত্যেকে ছয় ফুট লম্বা লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিয়াছে। আশ-পাশের দুই-চারি জনও জুটিয়াছে—কেবল ছোটমামা তাঁহার বৃহৎ ভুঁড়ি লইয়া খাটিয়ার তলায় আড়ে-কাঠে শুইয়া হাঁপাইতেছেন। সকলের মুখেই বিস্ময় ও প্রশ্ন।

নন্দ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে ডাকাতকে সে ঐ ঘরে বন্দী করিয়াছে… বাছাধনের পলাইবার আর পন্থা নাই।

মামাবাবু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন,—“সত্যি!”

নন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“হ্যাঁ,” এবং বন্দুকটা আরও বাগাইয়া ধরিল।

অতঃপর মহা সমস্যা—কে শিকল খুলিবে? রামধনিয়ার সাহস বেশী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তাহারই উপর ভার পড়িল। সে বেচারা বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে শিকল খুলিল। কিন্তু ডাকাত নিশ্চয়ই সহজে দুয়ার খুলিবে না।

অগত্যা নন্দ উঁচাইয়া ধরিল বন্দুক, আর মামাবাবু উদ্যত করিলেন রিভলবার। দুয়ারে পড়িল দমাদ্দম্ লাথি।

চোর হয়ত তখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়া সহসা 'হড়াম্' শব্দে খিল খুলিয়া দিল।

সকলে হুড়মুড় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। একেবারে চক্ষুস্থির! ডাকাতের চিহ্ন নাই। শুধু পাঁড়েজী শুষ্কমুখে গালে হাত দিয়া সচকিত ভয়ার্ত্ত নেত্রে বসিয়া আছে। ঘর আলোতে, লোকে, লাঠিতে ভরিয়া গেছে।

বড়মামা শুধাইলেন—"কেয়া হুয়া পাঁড়েজী ?"

ক্ষীণকণ্ঠে যাহা উত্তর হইল তাহার অর্থ,—"এক জোড়া নতুন জুতো কিনেছি, কাল মেলায় যাব, তাই অভ্যেস করছিলাম···আর কখন সময় হবে বাবু—"

মামাবাবু মুখ বাঁকাইয়া শুধু বলিলেন,—"কচু পোড়া খাও !"

নন্দর দুই চক্ষু ছানাবড়া হইয়া গেছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করিয়া সে দেখিল যেন ফাঁসি-কাঠের দড়িটা এক আঙ্গুলের জন্য তাহার গলা হইতে ফস্কাইয়া গেল।

মহেঞ্জোদাড়ো

(শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ)

তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করি 'বল ত তাজমহল কোথায়', তাহা হইলে তোমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, 'তা আর জানি না ? আগ্রায়'। কিন্তু যদি আবার জিজ্ঞাসা করি 'আচ্ছা বল ত মহেঞ্জোদাড়ো কোথায় ?' তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই যে উত্তর দিতে পারিবে না এ কথাও নিশ্চয়। অথচ ভারতবর্ষের লোক হইয়া তাজমহল কোথায় না জানা যেমন লজ্জার কথা, মহেঞ্জোদাড়ো কোথায় এবং কি, সেটা না জানা তার চেয়ে কম লজ্জার কথা নয়। যাহা হউক, ভবিষ্যতে তোমাদের যাহাতে কেহ মহেঞ্জোদাড়ো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

মহেঞ্জোদাড়ো বর্ত্তমান সিন্ধু প্রদেশে লারকোনা জেলার অন্তর্গত একটা জায়গা—লারকোনা সহর হইতে পঁচিশ মাইল, এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের ডোক্রী ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে। বাংলা হইতে এত দূরে ছোট্ট একটু জায়গা লইয়া কেন আমাদের এমন মাথাব্যথা তাহা বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু গোড়াকার কথা বলা দরকার। তোমরা জান যে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম অনার্য্যেরা থাকিত—তাহাদের বংশধর ভাবে এখনও ভারতবর্ষের নানা জায়গায়—সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, নাগা প্রভৃতি জাতিগুলি ছড়াইয়া আছে। তার পর ভারতের বাহির হইতে দ্রাবিড়জাতি উত্তরপশ্চিম গিরি-পথ দিয়া ভারতবর্ষে ঢুকিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়; তাহাদের বংশধরগণই এখন মাদ্রাজী নামে পরিচিত। ইহাদের পর বাহির হইতে আর্য্যগণ আসিয়া অনার্য্য ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক জায়গা দখল করিয়া বসে। এরা খুব সভ্য ছিল ও ইহারাই বৈদিক সাহিত্য লিখিয়া গিয়াছে। আস্তে আস্তে ভারতবর্ষে ইহারা অনেক রাজ্য স্থাপন করে। এই সব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের সভ্যতা খুব পুরানো। কিন্তু কত পুরানো তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এক দল পণ্ডিত আছেন যাঁহারা সমসাময়িক লিখিত বিবরণ ছাড়া আর কিছুই ইতিহাসের মালমশলা বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলিলেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোকের যুগ হইতে ধরিতে হইবে, কারণ তার আগের কোন লিখিত বিবরণ নাই। তারও আগে নিতান্তই যাইতে হইলে অশোকের ঠাকুর দাদা চন্দ্রগুপ্তের যুগে যাওয়া যাইতে পারে, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের ঐতিহাসিকগণ কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার বেশী আর নয়। তখন আর এক দল পণ্ডিত মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কেন, আমাদের চারিটী বেদ তো আরও অনেক পুরানো! সেখান হইতে আমাদের দেশের সভ্যতার আরম্ভ ধরিতে ক্ষতি কি? আগের দলের পণ্ডিতেরা বলিলেন, কে জানে বাপু বেদ কখন রচনা হইয়াছিল? তাহার তারিখ সম্বন্ধে কোন 'পাথুরে' প্রমাণ থাকে তো লইয়া আইস, নতুবা চুপ করিয়া থাক। পাথুরে প্রমাণ তো আর পুরানো নাই, কাজেই দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতেরা কেবল মাথাই চুলকাইতে থাকিলেন। ইহা হইতে প্রমাণ করা হইল

যে আমাদের দেশের সভ্যতা প্রাচীন হইলেও মিশর, সুমের, অসুর, বাবিলন ও হখামানিষীয় সভ্যতার মত পুরানো নয়; সেই জন্য প্রাচীনতার দিক্ দিয়া এই সব সভ্যতা আমাদের দেশের সভ্যতার উপর সব সময় টেক্কা মারিবে। এই রকম যখন অবস্থা, তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিয়া পুরাতন ধারণাগুলিকে একেবারে ওলট্‌পালট্‌ করিয়া দিল এবং জগতের সম্মুখে প্রচার করিল যে ভারতীয় সভ্যতা অপর কোন জাতির সভ্যতার চেয়েই কম প্রাচীন নয়—তা সে জাতি মিসরীয়ই হউক বা ব্যাবিলোনিয়ানই হউক বা অপর কোন জাতিই হউক।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সনের কথা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়োতে একটী বৌদ্ধ স্তূপ খনন করিতে গিয়াছেন। স্তূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটীর নীচে পুরানো আমলের এক সহরের সন্ধান মিলিয়া গেল আর সেই সহরের ভিতর অন্যান্য জিনিষের মধ্যে পাওয়া গেল কতগুলি সীলমোহর। এই রকম সীলমোহর অনেক কাল আগে পাঞ্জাবে মণ্টগোমেরী জেলার অন্তর্গত হরপ্পা নামে একটী জায়গাতেও পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে সেগুলির তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু রাখালদাসের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া জিনিষগুলির, বিশেষ করিয়া এই সীলমোহরগুলির সহিত উর, কিস্ প্রভৃতি জায়গাতে পাওয়া সুমেরীয় সভ্যতার জিনিষগুলির খুব মিল রহিয়াছে। এই ভাবে বিচার করিয়া তিনি মত প্রকাশ করিলেন, মহেঞ্জোদাড়োতে যে সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে তাহা খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগেকার ব্যাপার। এই কথায় প্রত্নতত্ত্বমহলে একটা দারুণ হৈ চৈ

পড়িয়া গেল—প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে সে রকম হৈ চৈ পৃথিবীতে ইহার আগে খুব কমই পড়িয়াছে। কিন্তু রাখালদাসের যুক্তি অকাট্য, তাঁহার কথা পণ্ডিতদের মানিতেই হইল। তখন আরও উৎসাহের সহিত এই খনন-কার্য্য আরম্ভ হইল। ম্যাকে বলিয়া একজন পণ্ডিত ইতিপূর্ব্বে কিস্ খুঁড়িয়াছিলেন, তাঁহাকেও আনা হইল মহেঞ্জোদাড়ো খুঁড়িবার জন্য। এখনও এই জায়গা খোঁড়া হইতেছে, আর যতই খোঁড়া হইতেছে ততই বোঝা যাইতেছে যে এমন একটী সহর সে আমলে তুনিয়াতে কোথাও ছিল না। মহেঞ্জোদাড়ো এক সময়ে ছিল সিন্ধুনদের তীরে; সেইজন্য এই সভ্যতাকে এখন সিন্ধু সভ্যতা বলা হইতেছে। কিন্তু এই সভ্যতা যে কেবল মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পাতেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, সিন্ধু প্রদেশের আরও অনেক জায়গাতেও যে এই সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাও সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে আরও অনেক পুরানো জায়গা খুঁড়িবার পর। এই সব জায়গাও খুঁড়িয়াছেন বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার। তুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিতই যে এই সভ্যতা আবিষ্কার করিয়াছেন এ কথা শুনিলে কি তোমাদের বুক ফুলিয়া ওঠে না? ননীগোপালের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঠিক করা হইয়াছিল যে সিন্ধুসভ্যতা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫০—২৭৫০তে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু ননীগোপাল প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সভ্যতার আরম্ভ আরও অনেক পূর্ব্বে এবং শেষও হইয়াছিল আরও অনেক পরে।

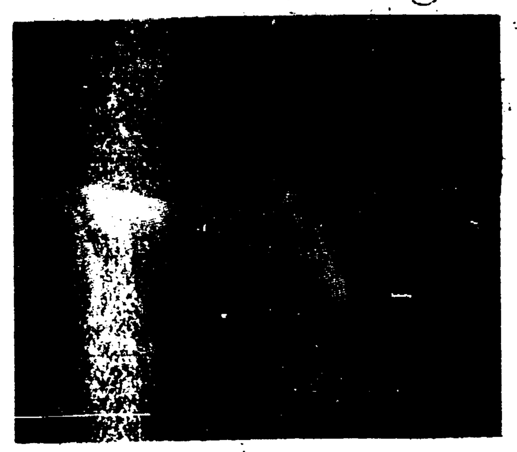
মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া সীলমোহর

মহেঞ্জোদাড়ো সহরটি ছিল খুব বড়; সভ্য লোকেদের ব্যবহারে যে যে জিনিষ লাগিতে পারে তাহার প্রায় সমস্তই এখানে পাওয়া গিয়াছে—বড় বড় বাড়ীর ধ্বংস, চওড়া চওড়া রাস্তার চিহ্ন, বড় বড় চৌবাচ্চা, প্রকাণ্ড স্নানের ঘর, মাটীর তৈরী আসবাবপত্র, মাটীর, পাথরের ও ধাতুর তৈরী নানা রকম মূর্ত্তি, পাথরের আসবাব ও সীলমোহর, হাড়ের তৈরী রকমারি জিনিষ, সোনা, রূপা ও মাটী দিয়া গড়া সুন্দর সুন্দর গহনা, আরও কত কি।

বাড়ীর ধ্বংস যে সব পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে কি করিয়া এমন সুন্দর সুন্দর বাড়ী অত পুরানো যুগে তৈরী করিত! বাড়ীগুলি বড় বড়, গাঁথুনি ইটের, আর সব বাড়ীতেই দরজা, জানালা, সিঁড়ি, ছাদ এমন কি নর্দ্দমা ও জল যোগাইবার নল প্রভৃতি বসান ছিল। কেবল একতালা নয়, দোতালা তেতালা পর্য্যন্ত বাড়ীতে লোকেরা বসবাস করিত; প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীতেই স্নানের জন্য রাখা হইত একটা স্বতন্ত্র ঘর। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা বেশ সৌখীন ছিল।

মহেঞ্জোদাড়োতে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার করিবার জন্য যে স্নানের ঘর ছিল তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ (সিনেমাতেও হয় তো দেখিয়াছ) যে আজকাল ইয়োরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সহরে স্নান করিবার জন্য বড় বড় স্নানের ঘর করা হয়; এই সব ঘরে একটী করিয়া

মহেঞ্জোদাড়োর সাধারণ স্নানাগার

পুকুর থাকে—সিমেণ্ট কিংবা ভাল পাথর দিয়া তৈরী—আর তার চারি দিকে থাকে কাপড়-চোপড় ছাড়িবার জন্য বড় বড় ঘর। এই পুকুরগুলির জল ইচ্ছা করিলে কমান ও বাড়ান, ঠাণ্ডা ও গরম করা চলে। বড় বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা এখানে সাঁতার কাটিয়া ও স্নান করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই রকম স্নানের ঘর প্রাচীন কালে রোমে ছিল। এগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় public bath। মহেঞ্জোদাড়োতে যে একটী মস্ত বড় স্নানের চৌবাচ্চা পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক এই রকমের। এটী

লম্বাতে ৩৯ ফিট, চওড়াতে ২৩ ফিট ও গভীরতায় ৮ ফিট। ভিতরে নামিবার জন্য সিঁড়িও ছিল। এই চৌবাচ্চার উপরটা ছিল ঢাকা, চারি পাশ ঘেরা, আর চারিদিকে ছিল বড় বড় হল-ঘর যেখানে স্নানের পর লোকেরা কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইত। এখন অবশ্য এটি রহিয়াছে ভাঙ্গাচূরা অবস্থায় কিন্তু এটা যখন ব্যবহার করা হইত তখন গোটা দুনিয়ায় ইহার আর দ্বিতীয় যুড়ি ছিল না। এই স্নানের ঘর হইতেই পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিয়াছেন সেই সুপ্রাচীন যুগে মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা কি পরিমাণ সভ্য ছিল।

ঘর-বাড়ীর অবস্থা তো শুনিলে, এখন তোমাদের নিশ্চয়ই জানিতে কৌতূহল হইতেছে, এই সুসভ্য লোকগুলির আহার্য্য ছিল কি! মহেঞ্জোদাড়ো খোঁড়ার ফলে তাহাও জানা গিয়াছে—গম, যব, গোরু ভেড়া, শূয়োর, কচ্ছপ, এবং মুরগীর মাংস ছিল তাহাদের খাদ্য। আরও কোন কোন জিনিষ হয় তো ছিল, তবে সে সম্বন্ধে ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এ রকম একটা সভ্য জাত যে পশুপালন করিতে জানিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সোনা রূপা, তামা, টিন, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও যে তাহারা জানিত তাহাও প্রমাণ হইয়া গেছে—মাটী খুঁড়িবার সময় এই সব ধাতু দিয়া গড়া নানা রকমের জিনিষ বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে অনেক দূর দূর দেশে যাইত। কি করিয়া ইহা বোঝা যায় বলিতেছি, শোন। ধর, সোনার তৈরী জিনিষ—সোনা সিন্ধু প্রদেশের কোন জায়গাতেই পাওয়া যায় না; তবে এই সোনা আসিল কোথা হইতে? আসিতে পারে অবশ্য অনেক জায়গা হইতেই, কিন্তু যে সব সোনার জিনিষ মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গিয়াছে সে সোনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কেবল মহীশূররাজ্যে কোলার-স্বর্ণখনিতেই তাহা পাওয়া যায়, অন্য কোন খনিতে নয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে দাক্ষিণাত্যে যাইত। দাক্ষিণাত্য ছাড়া অন্যান্য জায়গায়ও যে তাহাদের যাতায়াত ছিল সে প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এখানকার মাটী খুঁড়িয়া সোনার যে সব জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে

গহনাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি অধিবাসীদের বিশেষ সৌখীনত্বের পরিচায়ক। সোনার মত রূপা দিয়াও গহনা তৈরী করা হইত; তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ তৈরী হইত। সীসার তৈরী জিনিষ খুব বেশী পাওয়া যায় নাই, তবে তামার ব্যবহার ছিল খুব বেশী। অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, ছুরি, ছোরা, বল্লম, গহনা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিষই গড়া হইত তামায়। শুধু টিন দিয়া তৈরী কোন জিনিষ মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া যায় নাই বটে, তবে টিনের সহিত তামা মিশাইয়া অর্থাৎ ব্রোঞ্জ দিয়া তাহারা অনেক রকম জিনিষ গড়িত দেখা গিয়াছে। ব্রোঞ্জের তৈরী এক নর্ত্তকীর মূর্ত্তি এখানে পাওয়া গিয়াছে—এমন সুন্দর মূর্ত্তি সে যুগে খুবই বিরল।

মহেঞ্জোদাড়ো খুঁড়িয়া কতগুলি চরকাও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় তূলা হইতে কাপড় বুনিয়া সেই কাপড় তাহারা পরিত। শীত কালে আবার পরিত পশমের পোষাক-আসাক। সভ্যজাতির যে যে জিনিস থাকা দরকার তাহার সবই প্রায় মহেঞ্জোদাড়োতে ছিল।

এই বার তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে দু' চার কথা বলা যাক্। গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে তাহারা মূর্ত্তির পূজা করিত। মহেঞ্জোদাড়োতে এক প্রকার নারী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—ইহার দেহের উপর ভাগে কোন রকম বস্ত্র নাই কিন্তু নীচের দিকে রহিয়াছে। এই রকম নারী মূর্ত্তি যে খালি মহেঞ্জোদাড়োতেই পাওয়া গিয়াছে তা নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই পুরানো কালের এই ধরণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সকলে অনুমান করেন যে পৃথিবীর যে সব জায়গাতে এই ধরণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেই সব জায়গাতে এই রকম মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করা হইত। ভারতবর্ষে যে শক্তিপূজার প্রচলন হইয়াছে তাহার আরম্ভ বোধ হয় এই সময় হইতেই। এই রকম মূর্ত্তি ছাড়া শিবের মূর্ত্তির মত একটী দেব-মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া মনে হয় সে সময়ে বোধ হয় শিবপূজার মত এক রকম পূজা প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া অনেকগুলি সীলে গাছ পূজার জিনিষ-রূপে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—বোধ হয় গাছকেও পূজা করা হইত। গাছ-পূজা আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। গাছ ছাড়া জল এবং কোন কোন জীবজন্তও

পূজা পাইত—যেমন হিন্দুরা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীকে পূজা করে, শিব, দুর্গা ও মনসার বাহনরূপে বৃষ, সিংহ, সর্প প্রভৃতি পূজা পায়।

মহেঞ্জোদাড়োতে যে সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পের জিনিষগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার। এইগুলির আবিষ্কার হওয়াতে ভারতীয় ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা একেবারে বদ্‌লাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। এগুলি আবিষ্কার হওয়ার আগে সকলের ধারণা ছিল যে মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্য অপেক্ষা পুরানো ভাস্কর্য্য ভারতবর্ষে বুঝি আর নাই। কিন্তু এখন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে মহেঞ্জোদাড়োর যুগ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায় নাই। মহেঞ্জোদাড়োতে পাথরের, মাটীর ও ধাতুর তৈরী অনেক রকম মূর্ত্তিই পাওয়া গিয়াছে। এগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় সে সময়ে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য-শিল্প কি রকম উন্নত ছিল। মানুষ এবং ইতর জীবজন্তু দু'য়েরই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—কোনটা পাথরে খোদাই, কোনটা বা মাটীতে গড়া। মানুষের মূর্ত্তি গড়িতে মহেঞ্জোদাড়োর শিল্পীরা যে কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব—সেই পুরাতন যুগে এতটা কৌশল অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারিত কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি খুব বেশী পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মাটীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে প্রচুর। এই মাটীর মূর্ত্তিগুলি যে কী সুন্দর তাহা না দেখিলে বুঝাইয়া বলা শক্ত। জীব-জন্তুর মূর্ত্তি গড়িতেও মহেঞ্জোদাড়োর শিল্পীরা কম ওস্তাদ ছিল না। একটা সীলের উপর একটী বৃষ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (৪৯৯ পৃষ্ঠার ছবিতে সীলমোহরটি দেখ)—চার পাঁচ হাজার বৎসরের পুরানো মূর্ত্তি, কিন্তু আজিও বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে সকলে এটির দিকে তাকাইয়া থাকে, এমনই অপূর্ব্ব শিল্প! মহেঞ্জোদাড়ো সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে প্রকাণ্ড বই লেখা হইয়াছে তাহার মলাটে এটা দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু মহেঞ্জোদাড়োতে যে সব জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে ইতিহাসের দিক্ দিয়া সব চেয়ে মূল্যবান্ হইতেছে সীলমোহরগুলি। এই রকম একটী সীলমোহরে উপরে বর্ণিত বৃষের মূর্ত্তিটি রহিয়াছে। ছবিটার দিকে তাকাইলে দেখা যায় বৃষের ঠিক উপরে পাঁচটি চিহ্ন আছে। পণ্ডিতেরা সকলে একবাক্যে স্বীকার

করিয়াছেন যে এটা নাকি সে যুগের লিপি। প্রত্যেকটি সীলমোহরেই এই রকম চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে যে কি লেখা রহিয়াছে তাহা এখনও কেহ পড়িতে পারেন নাই। পৃথিবীর অনেক নাম-করা পণ্ডিত এইগুলি পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এখনও কেহই পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সীলগুলি আবিষ্কার হওয়াতে ভারতবর্ষীয় লিপির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা একেবারে বাতিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বলিতেন, মোটামুটী ভাবে অশোকের অনুশাসনের লিপিই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন লিপি। এখন বোঝা যাইতেছে সে ধারণা একেবারেই ভুল। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে না পারিলেও এ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে অশোকের অনুশাসনের ব্রাহ্মী লিপি ইহা হইতেই উৎপন্ন। যাহা হউক, এগুলির পাঠোদ্ধার যেদিন হইবে সেদিন যে মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানিতে পারা যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বড় হইয়া এই লিপিগুলি পড়িতে পার তবে যে জগৎজোড়া নাম কিনিবে তা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। বড় হইলে কেউ কেউ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিও।

মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সহিত মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে—সাদৃশ্যটা এত বেশী যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সুমেরের সহিত মহেঞ্জোদাড়োর যাতায়াত সম্বন্ধ ছিল। ভারতবর্ষ কোন কালেই নিজের দেশে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসিত না। ভারতবর্ষের লোকেরা নিজেদের দেশের বাহিরে গিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিত, ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, আরও কত কি করিত। এই ভারতবর্ষেরই লোকেরা জলপথ দিয়া সিংহল, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি এবং স্থলপথ দিয়া মধ্যএশিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপান প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিল। এই উদ্যমের গোড়াপত্তন যে হইয়াছিল মহেঞ্জোদাড়োর যুগে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৮

ফটোরহস্য

চিনির কারখানায় সেদিন যে আধ-পোড়া, বাঁধান মোটা খাতাখানার সন্ধান মিলিয়াছিল তারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি প্রসন্নমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন। তাঁর হাতে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাস—অত বড় শক্তিশালী লেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। তারই সাহায্যে মাঝে মাঝে কি যেন তিনি দেখিতেছিলেন, এবং ভাবে মনে হয় দেখিয়া খুসীই হইতেছিলেন। টেবিলের উপর ঠিকানা লেখা, টিকেট-আঁটা একখানা খাম ডাকে যাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। শিরোনামায় দেখা যাইতেছে দুর্গাপ্রসন্নের নাম।

অমৃত আসিয়া সকালবেলার ডাক টেবিলের উপর রাখিয়া গেল; হুকা-কাশি তখন খাতাখানা পাশে সরাইয়া সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেন। দু'খানা চিঠি পড়ার পর তৃতীয় খানায় আসিতেই তাঁর মুখে কিনা জানি না—কেননা সে মুখে জোয়ার-ভাঁটার খেলা বিশেষ দেখা যায় না—মনে রীতিমত ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি দস্তুরমত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া থাকিয়া সন্দেহের কালো ছায়া তাঁর চোখের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল, অন্যমনস্ক-ভাবে হাতের লেন্সখানা দোলাইতে দোলাইতে তিনি নিজের মনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ধড়মড়াইয়া চেয়ারের উপর একেবারে সোজা হইয়া তিনি বসিলেন। এইমাত্র ডাকে যে চিঠিখানা আসিয়াছে মুখ-খোলা অবস্থায় তার খামখানা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, সেটি তিনি হাতে তুলিয়া নানা ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সংশয়ের যে পর্দ্দাটা এতক্ষণ চোখের সামনে ঝুলিতেছিল হঠাৎ সেটি অনেকখানি স্বচ্ছ হইয়া আসিল, মনে মনে একটু হাসিয়া তিনি ভিতর হইতে দরজার খিলটি আঁটিয়া দিলেন।

যে ঘরটিতে বসিয়া হুকা-কাশি এতক্ষণ কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন, তাহারই সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত আর একটা যে ছোট্ট কুঠুরী ছিল, সাধারণের চোখে ধরা পড়িবার তার কোনই উপায় ছিল না। বড় ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া তিনি এইবার সেই ছোট্ট কুঠুরীটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া তাঁর আর কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ। মিনিট পাঁচ সাত পরে তিনি বাহির হইলেন, রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া দেওয়ালের উপরকার একটা ইলেক্‌ট্রিকের বোতাম টিপিয়া ধরিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরদের ঘরের কলিং বেল বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই হুকা-কাশি বলিলেন, "আমার স্নানের জল ঠিক কর, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। এর ভেতর যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো তাঁকে বলে দেবে সন্ধ্যার আগে আমার বাড়ী ফেরবার সম্ভাবনা নেই, ইচ্ছা করলে তিনি নাম-ঠিকানা রেখে যেতে পারেন, বুঝলে ?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, হুকা-কাশি ইঙ্গিতে তাকে থামিতে বলিলেন, তার পর একটু ভাবিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া এক খণ্ড কাগজের উপর পেন্সিলে খস্ খস্ করিয়া কয়েকটা কথা লিখিয়া ফেলিলেন। তার পর কাগজখানা খামে মুড়িয়া চাকরের হাতে দিয়া কহিলেন "অমৃতকে বল্‌বে বারটার ভেতর রণজিৎ বাবুকে যেন এটা দিয়ে আসে।"

বেলা আন্দাজ দু'টার সময় শ্রীপুর ষ্টেশনে একখানা ডাউন্ ষ্টিমার আসিয়া থামিল ; বহু লোকজন এবং মালপত্র নামিয়া পড়িল, আর সেই সঙ্গে নামিলেন হুকা-কাশি। আজ ছুটির দিন নয়, আপিস-আদালত, কলকারখানা, সমস্তই খোলা, কাজেই এই ভর' দুপুরে দ্বারকানাথের বাড়ী গেলে হয় তো সেই অসুস্থ ভদ্রলোকটি ছাড়া আর কারোই সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হুকা-কাশি সোজা চিনির কলের দিকেই রওনা হইলেন। কারখানার দরওয়ানটা হুকা-কাশিকে ইতিপূর্ব্বে আরও দু'একবার দেখিয়াছে, এবং এ ভদ্র-লোকটি কে সে সম্বন্ধে তার খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও ইনি যে একজন

বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তা জানিতে তার বাকী ছিল না। সে সাম্‌নে আসিয়া প্রকাণ্ড একটা সেলাম জানাইয়া কহিল, "আইয়ে হুজাউর, ছোট বাবু ঔর সন্তোষ বাবু আপিস্-কামরামে হ্যায় ; খবর ভেজেঙ্গে ?"

হুকা-কাশির নির্দ্দেশ অনুযায়ী খবর 'ভেজা' হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সন্তোষ ও সলিল আসিয়া পরম আপ্যায়নের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করিল। নিয়মিত শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ হইলে প্রথমেই আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করিল সন্তোষ, কহিল,—"এখানে আসবার আগে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি ? আজ সকালেই আপনার কথা উনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন।"

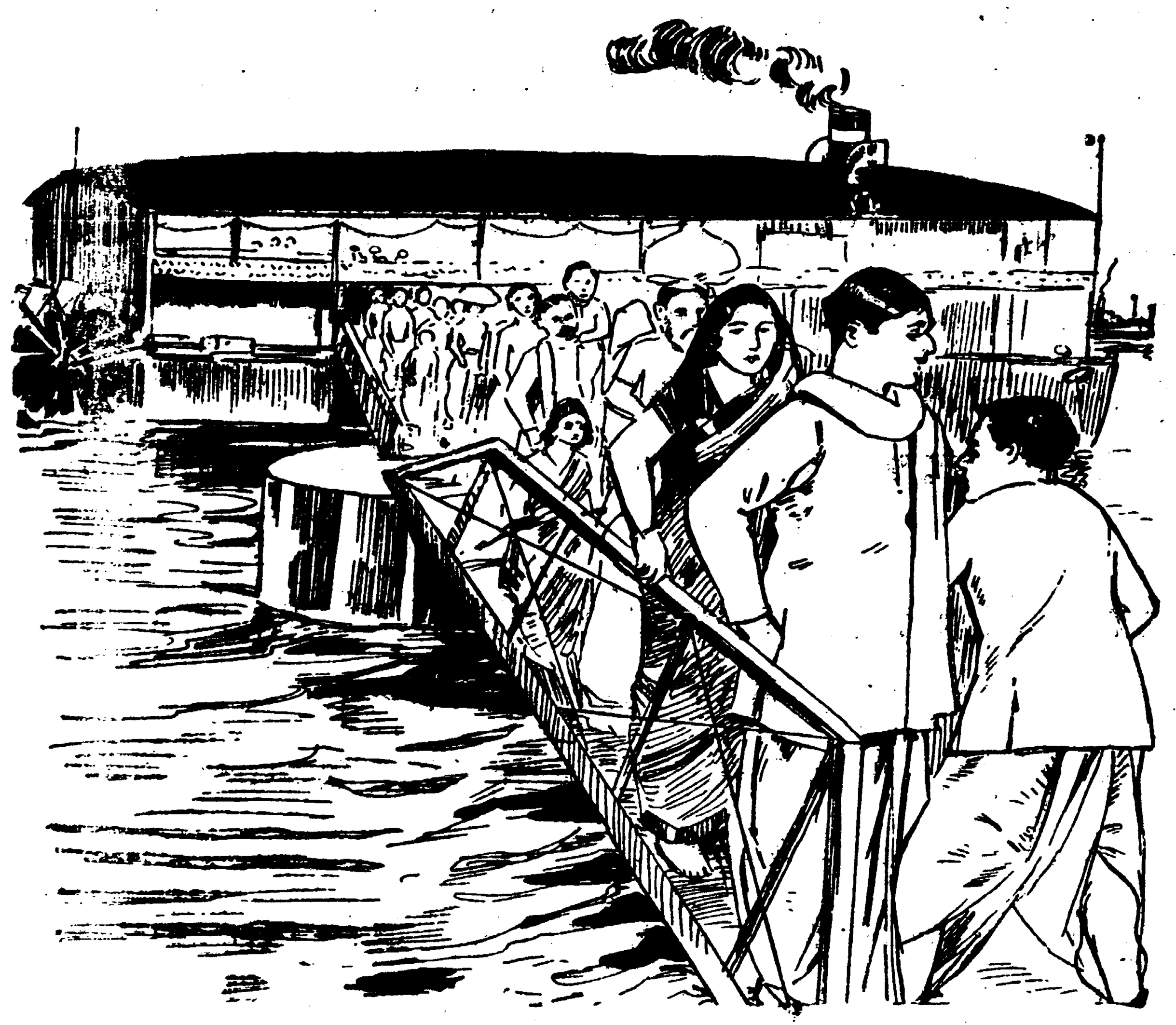

বহু লোকজন নামিয়া পড়িল।

"কি বল্‌ছিলেন ?" হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

"না তেমন কিছু নয়—এই অহিভূষণ বাবুর খোঁজ খবর কিছু পাওয়া গেল কিনা, সোনার-হরিণের কিনারা কতটা কি হল, এই সব"।

কথা বলিতে বলিতে সকলে ততক্ষণে আপিস-কক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হুকা-কাশি চেয়ারে বসিয়া নতমুখে নিজের দুই চোখের উপর বার কতক হাত বুলাইলেন, তার পর মন স্থির করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "দেখুন সন্তোষ বাবু,

কর্ত্তাকে এখন কিছু বল্‌বার দরকার নেই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা অহিভূষণ বাবুকে এ জীবনে আর দেখ্‌তে পাওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের খুবই কম।”

“য়্যাঁ! বলেন কি, গুণ্ডারা তাঁকে মেরে ফেলেছে?” আতঙ্কে সন্তোষ একেবারে শিহরিয়া উঠিল। সলিলের মুখ দিয়া কোন শব্দই বাহির হইল না, সে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে হুকা-কাশির মুখের পানে চাহিয়া রহিল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসে জড়িত সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি!

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, “অবিশ্যি জোর করে কিছুই বলা যায় না, তবে চোদ্দ আনা সম্ভাবনাই হচ্ছে তাঁকে আর ফিরে না পাবার, এবং সেজন্যেই আপনারা প্রস্তুত থাক্‌বেন। তবে আমার অনুরোধ, এ খবরটা দ্বারিক বাবুকে এখন দেবেন না, তাঁর শরীর অসুস্থ, হয় তো মনে হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে বস্‌তে পারেন।”

সন্তোষ মলিন-মুখে নতশিরে চেয়ারের উপর ঠায় বসিয়া রহিল, কিন্তু সলিল ক্রমাগত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, মুখে তখন তার একটা অসহ্য অস্বস্তির ভাব। অহিভূষণ চৌধুরী লোভে পড়িয়া নিজেই দ্বারকানাথের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে, না অপর কেউ বাগে পাইয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী যন্ত্রের মত তাকে চালাইয়াছে সে সমস্ত খবর এখনও গভীর রহস্যে আবৃত; কিন্তু দোষ যদি তার থাকিয়াও থাকে তবুও যে লোক্‌টা এত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া চিনির কারখানাটি দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, তার মৃত্যুতে শ্রীপুরে বোধ করি কেহই খুসী হইতে পারিত না।

হুকা-কাশি আড়চোখে দু’জনারই মুখের ভাব লক্ষ্য করিলেন, তার পর কহিলেন, “যাক্ ওর জন্যে মন খারাপ করে কি আর করবেন, হবার যা তা তো হয়েইছে। যে জন্যে আজ আমার শ্রীপুরে আসা তা এখনো বলা হয় নি। সেদিন এখানে বসে একটা হিসাবের খাতা আমি দেখ্‌তে চেয়েছিলাম, মনে আছে? আর এক বার সে খাতাটার দরকার পড়েছে—দু’এক দিনের জন্যে সেটা আমায় এক বার দিতে পারবেন?”

সন্তোষ বলিল, “এক দিন কেন, যত দিন খুশী তত দিনই রাখ্‌তে পারেন। পরশু থেকে আমাদের নতুন খাতা খোলা হয়েছে—ও পুরানো খাতার দরকার আর রোজ রোজ পড়বে না।”

“তা হলে তো ভালই হ’ল” বলিয়া এক টিপ নস্যি নেওয়ার উদ্দেশ্যে হুকা-কাশি জামার পকেটে হাত দিলেন। হাত দিয়াই কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন—বিশেষ ব্যস্ত ভাবে জামায় যে কয়টা পকেট ছিল পর পর সবগুলি হাতড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুখ তাঁর বিবর্ণ, পাণ্ডুর হইয়া গেল।

সন্তোষ এবং সলিলের বিস্ময়ের যেন আর অবধি রহিল না। হুকা-কাশি চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে সুরু করিয়াছেন দেখিয়া সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল “অমন ব্যস্ত ভাবে কি খুঁজ্‌ছেন মিষ্টার হুকা-কাশি, কোন কিছু হারিয়েছে নাকি?”

“হ্যাঃ; অথচ কি করে হারাল তা আমার বুদ্ধির অগম্য।”

“কী সে জিনিষটা?”

“ছোট্ট একখানা ফটো।”

“আপনি ঠিক জানেন, আপনার পকেটেই সেটা ছিল?”

“সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, সন্তোষ বাবু! আপনাদের কারখানায় ঢোক্‌বার মুখেই আমি এক টিপ নস্যি নিই—নস্যির কৌটো বার কর্‌বার সময়ও স্পষ্ট টের পেয়েছি ওটা আমার পকেটেই রয়েছে। অথচ এইটুকু পথ আসবার ভেতর কি, ক’রে সেটা উড়ে গেল ভেবে পাচ্ছি না! কারখানার চার ধারটা সবাইকে একবারটি খুঁজে দেখতে বলুন না, যদি পকেট থেকে ফটোটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে—আমি নিজেও সঙ্গে যাচ্ছি। অবিশ্যি দামের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সে জিনিষটা কিছুই নয়, কিন্তু তবুও ওটা হারিয়ে গেলে আমার কী যে ক্ষতি তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই। কোয়াটার সাইজের ফটো, পেছনে রবার ষ্ট্যাম্পে ছাপ মারা আছে—K. P. C.”

তৎক্ষণাৎ কারখানায় যতগুলি লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইল, সবাইকে

সঙ্গে লইয়া সন্তোষ এবং সলিল ফটকের সম্মুখ হইতে সুরু করিয়া গোটা কম্পাউণ্ডটা খুঁজিতে আরম্ভ করিল; হুকা-কাশিও সমস্তটাক্ষণ সেই সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন, উদ্বেগের আজ আর তাঁর সীমা নাই। কিন্তু কোন ফলই দর্শিল না, পূরা দেড়টি ঘণ্টা ধরিয়া সমস্তটা মাঠ চষাই কেবল সার হইল। হুকা-কাশি বড়ই মুষড়াইয়া পড়িলেন। অথচ সন্ধ্যার পর কলিকাতায় বহু কাজ পড়িয়া, শীঘ্রই ফেরা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নাই। সলিলকে উদ্দেশ করিয়া তাই তিনি বলিলেন, "এঁরা বরং আর একটু খুঁজে দেখুন—ভরসা খুবই কম, তবু যদি সন্ধান মিলে যায়! আপনি আমায় সঙ্গে করে একবারটি দ্বারিক বাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই। ফির্‌তি ষ্টিমারের সময় হয়ে এল।"

আন্দাজ প্রায় সাতটা, সাড়ে সাতটার সময় হুকা-কাশি কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। অমৃতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন খবর আছে?"

"এজ্ঞে আধ ঘণ্টাটাক আগে শিরীষপুর না কোত্থেকে যেন ফোনে একবার ডেকেছিল।"

"শিরীষপুর! ও বুঝেছি শ্রীপুর! ফোন করেছিল? কি বল্লে?" পরম আগ্রহের সঙ্গে হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এজ্ঞে আমায় কিছু বলেন নি, কেবল শুধোলেন, বাবু ফিরেছেন? আমি বল্লুম তেনার ফির্‌তে দেরী হবেন, নাগাদ আটটা সাড়ে আটটায় ফের ডেকে দেখবেন।"

"বেশ করেছ" বলিয়া হুকা-কাশি বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। আজ সারা দিনে ক্লান্তি নিতান্ত কম হয় নাই, জামা-কাপড় ছাড়িয়া একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ইজি-চেয়ারের উপর দেহটা তিনি এলাইয়া দিলেন বটে কিন্তু মন তার সম্পূর্ণ ভাবেই পড়িয়া রহিল টেলিফোনটার দিকে। একটু পরেই ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, হুকা-কাশি তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলিয়া বলিলেন "হ্যালো! কে, সলিল বাবু? ব্যাপার কি? আমি চলে আসবার পর ফটোটা খুঁজে পেয়েছেন!

বাঁচালেন, একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালেন। কোথায় পেলেন? ফটকের বাইরে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়টার ভেতরে? দেখুন দেখি কি আশ্চর্য্য, কতবার আমরা গেটটার আশ-পাশ দিয়েই ঘুরে বেরিয়েছি! হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন কালই; একজন বিশ্বাসী লোকের হাতে পাঠাবেন কিন্তু। আপনি নিজেই দিয়ে যাবেন? তা হলে তো আর কথাই নেই। আচ্ছা নমস্কার?"

রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াই হুকা-কাশি উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "অমৃত! অমৃত!"

অমৃত সাড়া দিয়া নিকটে আসিতেই তিনি কহিলেন "রণজিৎ বাবুর কাছে গেছলে?" স্বরে ব্যস্ততা আছে বটে কিন্তু চিন্তার লেশ মাত্র নাই, আছে কেবল প্রচুর উৎসাহ।

"এজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কাল সক্কালেই আসবেন বলে দিয়েচেন।"

"ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর, রুটী হ'তে আর কত দেরী।"

(ক্রমশঃ)

"নিঝুম নিশুত রাতে—"

(লেখক ও শিল্পী—শ্রীসত্যগোপাল সরকার)

"নিঝুম নিশুত রাতে
একা শুয়ে তেতালাতে
খালি খালি ক্ষিদে পায় কেন রে!"*
খেয়েছি তো দশটায়
মনে হয় তবু হায়,
পেটে কিছু পড়ে নাই যেন রে!

ঠিক কথা তবে ভাই,
বেশী কিছু খাই নাই,
বরং খেয়েছি কম, সত্যি।
সাক্ষী তো মেজ খুড়ী,
লুচি ছিল গোটা কুড়ি,
বেশী নয় আর এক রত্তি।

* উদ্ধৃত অংশটুকু স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের বিখ্যাত হাসির বই "হ য ব র ল" হইতে লওয়া।

ঝোল ছিল এক বাটি,
রেঁধেছিল পরিপাটি,
এখনো র'য়েছে হাতে গন্ধ !
ছিল ডাল, দম, ভাজা,
আট্‌টি রসাল' খাজা,—
—দেশ থেকে এনেছিল নন্দ।

ছিল না বিশেষ ক্ষিদে,
তবুও খুড়ীর জিদে
পায়েস একটি বাটি খেয়েছি;
এক ঘটি জল খেয়ে,
হাত ধুয়ে, পান চেয়ে
আজ মোটে গোটা চার পেয়েছি।

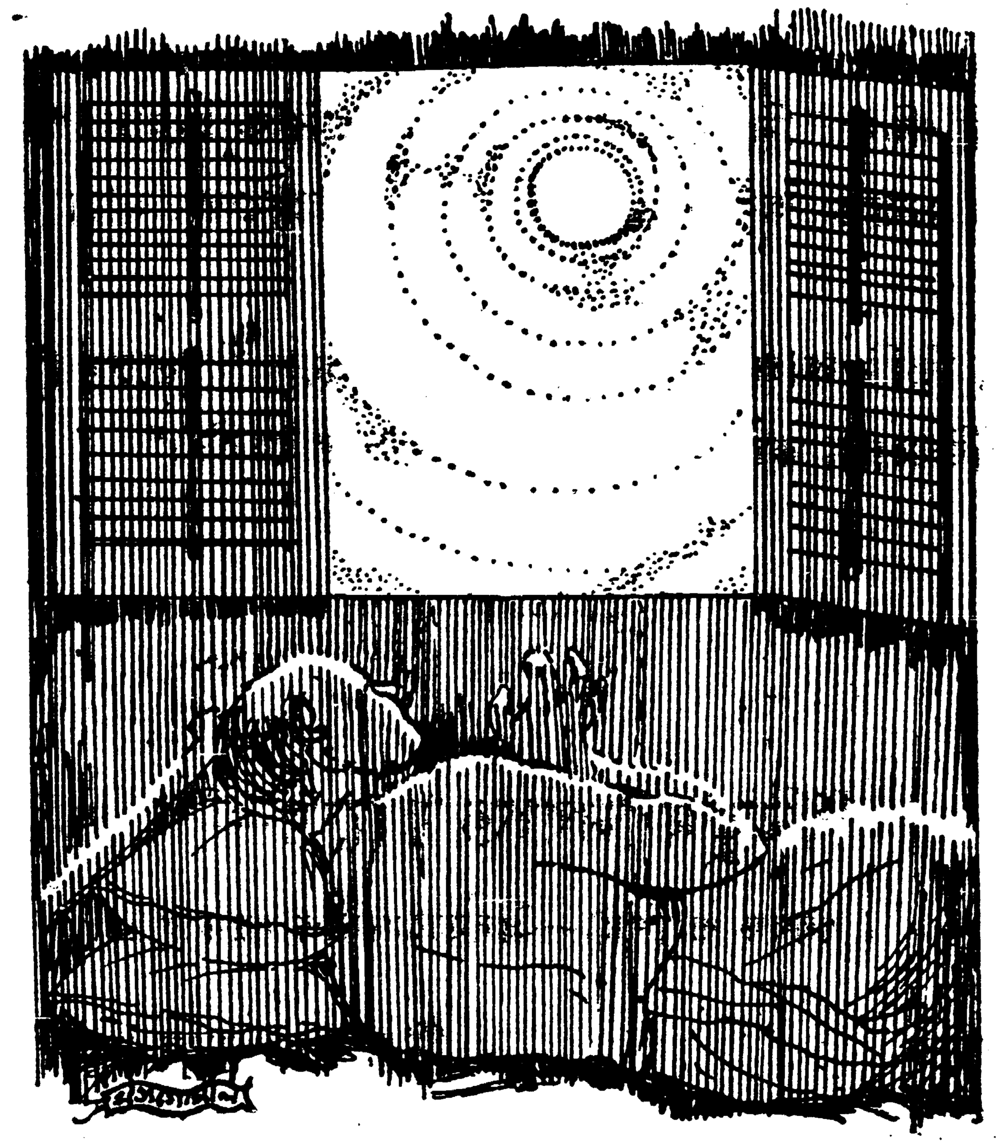

সেই ক'টি গালে ঠেসে,
তেতালাতে উঠে এসে
সটান প'ড়েছি শুয়ে যখনি,—
জানালাটা ছিল খোলা—
যেমনি চোখটি তোলা
চাঁদটাকে দেখা গেল তখনি।

পূর্ণিমা—অমা নেই,
চাঁদটাকে দেখ্‌তেই
মনে হ'ল সে সময়ে হায় রে,—
আকাশটা রস, আর
দেখা যায় মাঝে তার
গোল্লা সে চাঁদ ভাসে তায় রে!

ভাবনাটা মগজেতে
ঢুকে, চায় নাকো যেতে,
মুশ্‌কিল হ'ল ভারি ভাই রে !
যদিও পেলেই খাব,
তেতালাতে কোথা পাবো ?—
ভাবনায় চোখে ঘুম নাই রে।

কোথায় আরাম ক'রে
ঘুমোবো রাতটি ভ'রে
তা' নয়—বিপদে কত ফেল্‌ল,
পেয়ে মোরে অসহায়
এত রাতে তেতালায়—
ক্ষিদের কবলে মোরে ঠেল্‌ল !

হ'য়েছে অনেক রাত,
সবাই ঘুমেতে কাত,
তেতালাতে আমি শুধু জাগ্‌ছি,
নিরুপায় এত খণে
সত্যিই মনে মনে
চোখের উপরে আমি রাগ্‌ছি।

সে যে বড় বিদ্‌ঘুটে
কোঁ কোঁ ক'রে ডেকে উঠে
আচম্‌কা ব'ল্‌ছে কি যেন রে !
হাঁক ছাড়ে বীরদাপে,
জানি নাকো কোন্ পাপে,
দশা মোর হ'ল আজ হেন রে !

বড়দের স্মরণশক্তি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

কার্ত্তিক মাস—শীত পড় পড়। সাড়ে পাঁচটার সময়েই সন্ধ্যা হইয়া যায়. তার পরই কোথা হইতে দার্জ্জিলীং-ফগের মত রাশি রাশি ধোঁয়া ভাসিয়া আসে—চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সাম্‌নের জিনিষও ভাল করিয়া দেখা যায় না।

এ হেন এক সন্ধ্যায় অরুণচন্দ্র তার মেজমামার সঙ্গে সওদা করিয়া ফিরিতেছিল। কলিকাতার সহরে—বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে আজকাল খাঁটী দুধের আমদানী হইয়াছে। গোয়ালারা সকালে-সন্ধ্যায় গরু-বাছুর সঙ্গে করিয়া ভদ্রলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁদের চোখের সম্মুখে দুধ দোহাইয়া দেয়। ফলে, সকালে-সন্ধ্যায় ছোট ছোট রাস্তাগুলি দিয়া একটু সাবধানে হাঁটিতে হয়। এই

সাবধানে হাঁটিবার কথা অরুণের খেয়াল ছিল না ; হঠাৎ তার মনে হইল—ধোঁয়ার ভিতর দিয়া কাল কাল কয়েকটি মূর্ত্তি ছুটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ কিছু মনে হইলে যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল—অরুণের চোখের সম্মুখে যে ধোঁয়া ছিল তা' আরও ঘনীভূত হইল। পরক্ষণেই সে ধোঁয়া ভেদ করিয়া, অরুণ দেখিল, এক বিরাট্ ভাগলপুরী ষাঁড় তদনুযায়ী দুই বিরাট্ শিং বাগাইয়া তার মুখের কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। অরুণ বিদ্যুৎ-গতিতে দু' পা পিছাইয়া গিয়া সে শিং দু'টি ধরিয়া ফেলিল, তার পর তারস্বরে সাহায্যের জন্য চীৎকার যুড়িয়া দিল। অরুণের চীৎকারে ভীত হইয়া সেই ভাগলপুরী ষাঁড়টিও গর্জ্জন করিতে সুরু করিল।

দুই কান দুই হাত দিয়া ধরিয়া···

কিন্তু অরুণ যা দেখিল অরুণের মেজমামা ঠিক তা' দেখিলেন না। ভাগলপুরী ষাঁড়টি তাঁর কাছে ছোট একটি বাছুর রূপে প্রতিভাত হইল। তিনি দেখিলেন অরুণ সেই বাছুরটির দুই কান দুই হাত দিয়া ধরিয়া তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর বাছুরটিও বিনা দোষে কানমলা খাইয়া হাম্বা হাম্বা করিয়া প্রতিবাদ জানাইতেছে। মেজমামা কাছে আসিয়া অরুণের হাত হইতে তাকে মুক্তি দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অরুণ বলিল, "ভাগ্যিস্ শিং দু'টো ধরে ফেলেছিলাম, নইলে—" এইবার মেজমামা কথা কহিলেন—ঠিক কথা নয়, শব্দ করিলেন—সে শব্দ এক বিরাট্ অট্টহাস্যের। হাসি যেন আর থামিতেই চায় না। তার পর অনেকক্ষণ পরে একটু দম লইয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি যেটিকে বৃষাবতার বলে মনে করেছ সেটি একটি ক্ষুদ্র গো-বৎস। কাজেই তার শিং থাকতে পারে না—কাজেই তুমি যা ধরেছিলে তা' শিং নয়—কাজেই সেটা শিংএর কাছাকাছি অন্য কোনও প্রত্যঙ্গ—কাজেই সেটাকে আমি বাছুরের কান ব'লে অভিহিত করতে চাই।" অরুণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "স্পষ্ট দেখলাম শিং, আর হয়ে গেল কান! অত বড় একটা ষাঁড়, হয়ে গেল বাছুর! আমার তো আর তোমার মত মাইনাস্ ফোর চশমার পাওয়ার নয়!" মেজমামা আর জবাব দিলেন না, শুধু আর একবার অট্টরবে হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াই মেজমামা ঘটনাটি সাড়ম্বরে প্রচার করিয়া দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীর টিকটিকিটাও জানিয়া গেল—আজ শ্রীমান্ অরুণ একটা বাছুরকে ষাঁড় মনে করিয়া তার কান দু'টি ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে। ফলে মণ্টু, ঘণ্টু, নণ্টু, ঝণ্টু, সণ্টু প্রভৃতি অরুণের সমবয়স্ক বালকবৃন্দ মহা পুলকিত হইয়া উঠিল। মণ্টু তো ব্যাপারটা লইয়া একটা কবিতাই বানাইয়া ফেলিল—

অরুণ দাদা, কাণ্ডটা কি কর্‌লে হে!
ষণ্ড ভেবে কর্ণ কাহার ধর্‌লে হে?
শিং কি কভু অমন ধারা নরম হয়?
ষাঁড়ের মেজাজ আরেকটু যে গরম হয়!
বাছুর এল কান দু'টো তার দুলিয়ে,
তা'তেই তোমার বুদ্ধি গেল গুলিয়ে!

শুনিয়া দাদু শুদ্ধ মুখ টিপিয়া হাসিলেন, আর সকলের তো কথাই নাই।

অরুণ কিন্তু মণ্টুর উপর চটিল না। ঘণ্টু, ঝণ্টু, নণ্টু—সবাইকেই সে ক্ষমা করিয়া ফেলিল, তার রাগ পড়িল শুধু মেজমামার উপর।

কী ভীষণ লোক এই মেজমামাটি! বয়সের তো গাছ-পাথর নাই, দু'দিন

দাড়ি না কামাইলেই মুখখানা কদম ফুল হইয়া যায়—অথচ শিং ভাঙ্গিয়া তিনি দিব্যি বাছুরের দলে মিশিতে আসিয়াছেন! (তর্কের খাতিরে অরুণ নিজেকেও বাছুরের সঙ্গে তুলিত করিয়া ফেলিল।) শুধু কি আজ? অরুণ ভাবিয়া দেখিল, সুবিধা পাইলেই মেজমামা তার উপরে এই ধরণের অত্যাচার করেন। এই তো সেদিন—তারা যখন 'চন্দ্রগুপ্ত' প্লে করিল তখন মেজমামা কি কাণ্ডটাই না করিলেন! তিন-চার ঘণ্টা খাটিয়া বারান্দায় বিছানার চাদর সেফ্‌টিপিন্ দিয়া আটকাইয়া তারা কী চমৎকার ড্রপ্‌সীন্ তৈরী করিয়াছিল! প্লে আরম্ভ হইবার আগে তারা কত বার সেটা টানিয়া দেখিয়াছে—কোথাও কোন খুঁৎ নাই। শুধু হঠাৎ কোথায় একটুখানি গোলমাল হইয়া প্লে আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িতেই ড্রপ্‌সীন্‌টা কেমন করিয়া আটকাইয়া যায়। অভিনেতাদের মধ্যে অরুণই ছিল মাথায় সব চেয়ে লম্বা, কাজেই বাধ্য হইয়া তা'কেই বাহিরে আসিয়া হাত দিয়া সীন্‌টা তুলিয়া দিতে হয়। সে সময়ে তার পরনে আলেক্‌জাণ্ডারের পোষাক ছিল, মাথায়ও হেল্‌মেট্ ছিল—তাড়াতাড়িতে সেগুলি আর খুলিয়া আসিতে মনে ছিল না। কিন্তু মেজমামা কোথায় একটু সহানুভূতি দেখাইবেন তা না—"এ কি, আলেক্‌জাণ্ডার নিজে এসে পর্দ্দা টান্‌ছে! তার চাকর-বাকর নেই?"—ইত্যাদি ভাষায় এমন ভাবে অপ্রস্তুত করিতে লাগিলেন যে পা জ্বলিয়া যাইতে চায়। শুধু এইটুকুই নয়, তার পর আর এক কাণ্ড! থিয়েটার আরম্ভ হইয়াছে, আলেক্‌জাণ্ডার ওরফে অরুণ গলাটাকে যতটা সম্ভব আবেগ-কম্পিত করিয়া সবে মাত্র বলিতে আরম্ভ করিয়াছে— "সত্য সেলুকাস্, কী বি-ইচিত্র এই দে-শ"—এমন সময় হঠাৎ ফটাস্ করিয়া তার কোমর-বন্ধ অর্থাৎ নেকড়ার বেল্ট্‌টি ছিঁড়িয়া গেল। তা' এতে আর অরুণের কি দোষ বল? বেল্টের কাপড় তো আর সে নিজে হাতে করিয়া বুনে নাই! কাপড় পচা হইলে তার আর কি করিবার আছে? তা' ছাড়া চব্বিশ ইঞ্চি পেটকে বাইশ ইঞ্চি বেল্ট্ দিয়া জড়াইলেই যে এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিতে পারে তাও সে পূর্ব্বে আশঙ্কা করে নাই। যাই হোক্, এ ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই তা'কে বুদ্ধিমানের মত—অর্থাৎ এক হাত দিয়া পেটটা চাপিয়া ধরিয়া—প্লে করিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাই দেখিয়া তার প্রহরী পণ্ড অমন করিয়া হাসিবে কেন? সম্রাটের সম্মুখে সামান্য

একটা প্রহরীর এ কি আস্পর্দ্ধা। অরুণ তাই রাগের মাথায় পণ্ডর গালে একটা চড় মারিয়া ফেলিয়াছিল; বেশী জোরে মারে নাই, (অরুণ পরে নির্জ্জন ঘরে তার নিজের গালে ঠিক ঐ ভাবে চড় মারিয়া দেখিয়াছে তা'তে একটুও ব্যথা লাগে না।) কিন্তু মেজমামার আদরের পণ্ড এটা যে ষ্টেজ সে কথা, এটা যে বিংশ শতাব্দীর ঘটনা নয় সে কথা এবং সে যে প্রহরী সে কথা, অর্থাৎ স্থান, কাল এবং পাত্র বেমালুম ভুলিয়া গিয়া ভ্যাঁক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অমনি মেজমামা লাফাইয়া দর্শকদের চেয়ার হইতে একেবারে ষ্টেজের মধ্যে। তার পর স্বয়ং আলেক্‌জাণ্ডারের ঘাড় ধরিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "ওকে মার্‌লি যে বড়?"

এই ভাবে অমন সুন্দর প্লে-টা তো মাটী হইলই, তা ছাড়া পাড়ার যে সব লোকেরা থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁদের সম্মুখে অরুণ আর লজ্জায় কয়েক দিন বাহির হইতেই পারিল না। ছুটীতে কোথায় আমোদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে তা' না এ ভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকা—শুধু ঐ মেজমামার জন্য।

তাই অরুণ ঠিক করিয়াছে মেজমামাকে সে বয়কট্ করিবে এবং শুধু বয়কট্ করা নয়, অন্য দিক্ দিয়াও নানা ভাবে এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। অরুণ প্ল্যান্ আঁটিতে লাগিল।

কিন্তু কি ভাবে প্রতিশোধ লওয়া যায়? মেজমামা অত্যন্ত নস্যি-খোর। 'খোর' বলিতে মনে করিও না তিনি মুখ দিয়া নস্যি খান। নস্যি তিনি নাক দিয়াই টানেন, তবে তার পরিমাণ খুব বেশী হয় এবং সে নস্যি খুব ঘন ঘন প্রয়োগ করিতে হয়। ভাত না পাইলে তাঁর যা কষ্ট হয় নস্যি না পাইলে কষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। অরুণ ঠিক করিল এই নস্যির সাহায্যেই সে মেজমামাকে প্রথম ঘায়েল করিবে। সুযোগও মিলিল। চায়ের মজ্‌লিসে যখন মেজমামা আবিসিনিয়ার যুদ্ধ লইয়া মেসোমহাশয়ের সঙ্গে তুমুল তর্ক করিতেছিলেন সেই ফাঁকে সে চুপি চুপি মেজমামার ঘরে গিয়া টেবিলের উপর হইতে তাঁর হাতীর দাঁতের নস্যাধারটি সরাইয়া ফেলিল।

কিন্তু তার পরেই অরুণ একটা মস্ত ভুল করিয়া ফেলিল। এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই অতি যত্নে গোপন করিয়া রাখে কিন্তু

অরুণ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কথাটা ছেলেমহলে চুপি চুপি জানাইয়া দিল—অবশ্য প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল কেহ মেজমামাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিবে না। তার পর অরুণ একটু সতুদের বাড়ী গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখে বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড! মেজমামা অস্থির ভাবে সারা বাড়ী টহল দিয়া ফিরিতেছেন। অরুণ বুঝিল যথা সময়ে নস্যাধারের খোঁজ পড়িয়াছে।

তার পর একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল, অরুণ পূর্ব্বে এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। মেজমামা সহসা নগদ দুই পয়সা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন—যে নস্যাধারের সন্ধান দিতে পারিবে উক্ত মূল্যবান্ পদার্থ দুইটি তারই করায়ত্ত হইবে। এইবার মণ্টু, ঘণ্টু, নণ্টু প্রভৃতিকে সামলাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িল—এ লোভ দমন করা কি সহজ কথা? না হয় একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়া ফেলিয়াছে। অরুণ চক্ষে রাজ্যের মিনতি ভরিয়া সকলের কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাণীর কিছু দিন যাবৎ পুতুলের জন্য এক ছড়া পুঁতির মালা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, সে এই সুযোগ হেলায় হারাইতে রাজী হইল না, সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পরক্ষণেই মেজমামার মোটা মোটা কালো কালো আঙ্গুলগুলি অক্টোপাসের মত অরুণের কানের সঙ্গে জড়াইয়া গেল; লজ্জায়, অপমানে, রাগে রাঙ্গা হইয়া অরুণ আলমারীর পিছন হইতে নস্যির কৌটা বাহির করিয়া দিল।

কিন্তু অরুণ দমিল না। সে ঠিক করিল আবার মেজমামার একটা জিনিষ সরাইতে হইবে, কিন্তু এবার আর কাহাকেও জানান হইবে না—জ্যাকি কুকুরটাকেও না। স্নানের আগে মেজমামা টুথ্‌পেষ্ট্‌ দিয়া ভাল করিয়া দাঁত মাজেন। অরুণ দেখিল আপাততঃ এই টুথ্‌পেষ্ট্‌-হরণই তার দিক্ হইতে বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার এবং মেজমামার দিক্ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়।

আধ ঘণ্টা পরে মেজমামা স্নান করিতে নামিলেন এবং টুথ্‌পেষ্টেরও খোঁজ পড়িল। অরুণ কিছুক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিল। কিন্তু খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখে অবাক্ কাণ্ড, মেজমামা তো চেঁচামিচি করিতেছেন না! ব্যাপার কি? ব্যাপার একটু পরেই বুঝা গেল। মেজমামার হাতে অরুণের নিজের

টুথ্‌পেষ্ট—যা সে জন্মদিনে নসুদা'র কাছ হইতে উপহার পাইয়াছিল এবং যেটিকে সে এত দিন অতি সযত্নে, প্রগাঢ় মিতব্যয়িতা সহকারে খরচ করিয়া আসিতেছিল। মেজমামা এক 'রাম' টিপুনিতেই তার অর্দ্ধেক টিউব খালি করিয়া ফেলিয়াছেন। অরুণকে দেখিয়া তিনি একটু মৃদু হাস্য করিলেন, তার পর পেষ্টটা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "নে।"

বার বার পরাজিত হইয়া অরুণ প্রায় ক্ষেপিয়া গেল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদের চিলে-কোঠায় বসিয়া বসিয়া সে আবার নানা রকম ফন্দী আঁটিতে লাগিল। একবার ভাবিল, বিকালে মেজমামার চায়ের মধ্যে অলক্ষ্যে বেশ করিয়া নূন ঢালিয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হইবে না বোধ হয়। মেজমামা এক চুমুক দিয়াই সে চা ফেলিয়া দিবেন, মামীমা আবার ভাল চা করিয়া দিবেন। আচ্ছা, মেজমামার বালিশের নীচে খানিকটা চিনি ছড়াইয়া রাখিলে কেমন হয়? মেজমামা তো এখনই দিবানিদ্রা দিতে আসিবেন, আর সেই সময়ে চিনির লোভে জমায়েৎ পিঁপড়ে-বৃন্দের কটাস্ কটাস্ কামড়! সে মন্দ হইবে না—মেজমামার মোটা শরীর ফুলিয়া আরও মোটা হইবে। কিন্তু এর চেয়েও ভাল কোন উপায় পাওয়া যায় না? উপায় তো আছে বিস্তর—কিন্তু বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলির জ্বালায় কি কিছু করিবার যো আছে? অরুণ ভাবিয়া দেখিল, ভাল করিয়া কাজ সাফাই করিতে হইলে মণ্টু, নণ্টু, ঘণ্টু প্রভৃতিকে হাত করিতে হইবে। মেজমামার বিরুদ্ধে জোর "প্রোপাগাণ্ডা" চালাইতে হইবে—মেজমামার বিরুদ্ধে ওদের সকলকার মন বিষাক্ত করিয়া দিতে হইবে। তবে যদি কাজ হয়। মনে মনে এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অরুণ নীচে নামিয়া আসিল।

কিন্তু নীচে আসিয়াই যে নিদারুণ সংবাদ কানে আসিল তা'তে অরুণ আর একটু হইলেই প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। মেজমামা নাকি আজ বিকালে ছেলেদের সবাইকে বায়োস্কোপ্ দেখাইবেন ঠিক করিয়াছেন।

অরুণ প্রথমটা একেবারে বিহ্বল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। এরূপ ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, একেবারে অভাবিত। যে মেজমামাকে সে ইতিপূর্ব্বে বায়োস্কোপ্ দেখাইবার জন্য হাজারো বার অনুনয়, বিনয় এবং খোসামোদ করিয়াও

এক চুল টলাইতে পারে নাই, আজ তিনি কিনা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সবাইকে বায়োস্কোপে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন! আর ঠিক বাছিয়া বাছিয়া এই দিনেই অরুণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছে! একটা দিন আগে তো কই মেজমামার মনে এ সদিচ্ছা জাগে নাই! অরুণ বুঝিল, মেজমামা তার চাইতে অনেক বেশী ঘুঘু। সে সারাদিন মাথা খুঁড়িয়াও মেজমামাকে জব্দ করিবার একটা ভালমত উপায় ঠিক করিতে পারিল না, আর মেজমামা কেমন সহজেই অরুণকে ঘাল করিয়া দিলেন!

অরুণ নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কি হয় একটা দিন বায়স্কোপ্ না দেখিলে? বায়স্কোপ্ তো তার কাছে নতুন জিনিষ নয়? কত বার তো দেখিয়াছে। কিন্তু বুঝাইলেই কি মন বুঝিতে চায়? মনের উপর তো তার হাত নাই!

বেলা তিনটার সময় মেজমামা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আমি একটু পরেই একবার বেরুব, ছেলেপিলেগণ, তোমরা ঠিক ৫টা ২৮ মিনিটের মধ্যে জলযোগ এবং পোষাকযোগ সমাধান ক'রে প্রস্তুত থাক্‌বে। আমি এসে "রে" বল্‌লেই যেন তোমরা মার্চ্চ্ সুরু করতে পার, "ডি" বল্‌বার যেন আর দরকার হয় না।"

পাঁচ মিনিট নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাইয়া অরুণ একখানি কাগজে লিখিল, "সম্মানসূচক সন্ধি করিতে আমি রাজী আছি।" তার পর চুপি চুপি নেবুকে ডাকিয়া সেটি মেজমামার ঘরে পাঠাইয়া দিল। একটু পরেই নেবু ফিরিয়া আসিল, অরুণের প্রস্তাবের উপর মেজমামা লাল পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছেন, "আমি রাজী নহি। অসম্মানসূচক সন্ধিতে স্বীকৃত থাকিলে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।" অরুণ গুম্ হইয়া রহিল।

পাঁচটা বাজিতেই মণ্টু, নণ্টু, জলখাবারের জন্য হৈ-চৈ লাগাইয়া দিল। সণ্টু, ঝণ্টু বাক্স খুলিয়া শার্ট্, পাঞ্জাবী বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘণ্টু একটু ইংরাজীতে কথা বলিতে ভালবাসে; সে সবাইকে তাড়া লাগাইতে লাগিল—"রিড্ দি ক্লথ্—কাপড় পর, সুন্ দি গো উইল্ বি—শীগ্‌গিরই যাওয়া হবে!" অরুণ করুণচক্ষে তাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। হায়রে, নিজের বোকামীর জন্যই তার আজ এ অবস্থা—নহিলে সেও তো আজ ঐ দলের মধ্যে থাকিয়া হৈ-হৈ করিতে পারিত।

পাঁচটা বাজিয়া পনের মিনিট, মেজমামা এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। অরুণ মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ভগবান্, আর গোটা চল্লিশেক মিনিট; মেজমামা যেন তার মধ্যে আসিয়া না পৌঁছান। সব ছোঁড়ার মুখ যেন হাঁড়ী হইয়া যায়। হে ভগবান্, ওদের বায়োস্কোপ্ দেখা যেন আজ বন্ধ হয়।" ঘড়ির কাঁটা চলিতে লাগিল, অরুণের মনেও সঙ্গে সঙ্গে পুলকের সঞ্চার হইতে লাগিল।

পাঁচটা কুড়ি। মেজমামা এখনও আসেন নাই।

পাঁচটা পঁচিশ। মেজমামা এখনও আসেন নাই।

পাঁচটা ছাব্বিশ। মেজমামা এখনও আসেন নাই। অরুণ ভক্ত প্রহ্লাদের মত ডাকিতে লাগিল, "হে ভগবান্, হে হরি, হে মধুসূদন, হে দীনবন্ধু!"

পাঁচটা সাতাশ। মেজমামা এখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না। মণ্টু-ঝণ্টুর দল উৎকণ্ঠিত চিত্তে বাহিরের বারান্দায় ঝুঁকিয়া আছে। অরুণের বুকের ভিতরটা আধ আনন্দ আধ-ভয়ে দপ্ দপ্ করিতেছে।

পাঁচটা সাড়ে সাতাশ মিনিট। হঠাৎ সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্ত্তেই মেজমামার উচ্চকণ্ঠ (অরুণের মনে হইল এ যেন আদ্দিস্ আবাবায় ইটালীয় কামানের গর্জ্জন) শোনা গেল, "আণ্ডা-বাচ্চারা তৈরী হয়েছিস্?" তার পর অরুণকে সাম্‌নে দেখিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, "এখনও কাপড় পরিস্ নি! আমি না বলে গেলাম পাঁচটা আটাশের যেন এক সেকেণ্ড্‌ও ওদিকে না যায়! শীগ্‌গির কাপড় পর্; যা—যা—যা-আ বল্‌ছি। ঘণ্টু, ঝণ্টু! কোথায় গেলি রে?"

অরুণের মাথার ভিতর তালগোল পাকাইয়া গিয়াছিল। মেজমামার আর এক ধমক খাইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া আলনা হইতে একটা শার্ট্ টানিয়া মাথায় ঢুকাইয়া দিল। তার পর অভিভূত ভাবটা কাটিলে লক্ষ্য করিল—দল বাঁধিয়া আর সকলের সঙ্গে সেও সিনেমা-হাউসের সামনে আসিয়া হাজির হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা এইবার অরুণের বোধগম্য হইল। মেজমামা সকাল বেলার সমস্ত ঘটনা বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছেন। বড়দের স্মরণশক্তিই এই রকম। আবার এই স্মরণশক্তি লইয়াই মেজমামা এম্-এতে ফার্ষ্ট্ হইয়াছিলেন! ছোঃ।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

সব চাইতে চালাক কে?

(শ্রীরুবী চট্টোপাধ্যায়)

এক গাঁয়ে থাকৃত তিন বন্ধু। তিন জনেই ভয়ানক চালাক।

তিন বন্ধু—খেদো, যেধো আর সেধো—অনেক যুক্তি পরামর্শ ক'রে ঠিক করূল যে তারা লাহিড়ীদের পুকুরে মাছ ধরৃতে যাবে আর যে সকলের আগে মাছ ধরূবে অন্য দু'জনের তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকৃবে।

যেই কথা সেই কাজ। তিন বন্ধুতে ছিপ ফেলে বকধাম্মিকের মত বস্‌ল। কিন্তু 'ওই যা, ছেড়ে গেল'—'আর একটু হ'লে ধরেছিলাম রে'—ইত্যাদি কথা ছাড়া আর কিছু কারো মুখ থেকে বেরুল না।

সন্ধ্যে হ'তে ছিপ গুটিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। বাড়ী এসে সেধো তার স্ত্রীকে বল্‌ল,—'দেখ, আজ ভারী এক মজা হ'য়েছে'।—

'সে ত' বুঝলাম, কিন্তু কথাটা কি?

—'কথা ছিল যে, আজকে যার ছিপে প্রথমে মাছ উঠবে তার বাড়ীতে অন্য দু'জনের নিমন্ত্রণ থাকৃবে। কিন্তু যেদো আর মেধোটা এমনি চালাক যে তাদের ছিপে মাছ খাচ্ছে অথচ তোলবার নামটি নেই।'

—'তুমি বুঝি বোকৃচন্দরের মত মাছ খাওয়া মাত্রই টেনে তুললে?'

—'আরে রামচন্দ্রঃ। সে আর বল্‌তে, ওদের ছিপে তবু মাছ খাচ্ছিল; কিন্তু আমি যে ছিপে বঁড়শিই দিই নি, তবে মাছ খাবে কি কচুপোড়া?'

বীরেন বাবুর বিমান-বার্ত্তা

[ব-এর বাহার]

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে)

বীরেন বাবু বিখ্যাত বিমানবীর, বয়স বাইশ বৎসর। বাঙ্গালীর বদনোজ্জ্বল বিষয়ে বীরেন বাবু বড়ই ব্যস্ত। বীরেন বাবুর বন্ধু বটুক বাবু বাংলার বিখ্যাত বণিক্। বীরেন বাবু-বটুক বাবু বিমানারোহণে বিদেশ বেড়াতে বেরুলেন। বিমানারোহণেই বিলাত, বেলজিয়ম্, বেলুচিস্থান, ব্রহ্মদেশ বেড়িয়ে বহু বৎসর বাদে বজবজে বিমান বসালেন। বাড়ীতে বালকদের বাক্যচ্ছলে বীরেন বাবু বিদেশবার্ত্তাও বল্‌লেন।

ছোটদের চিত্রশালা

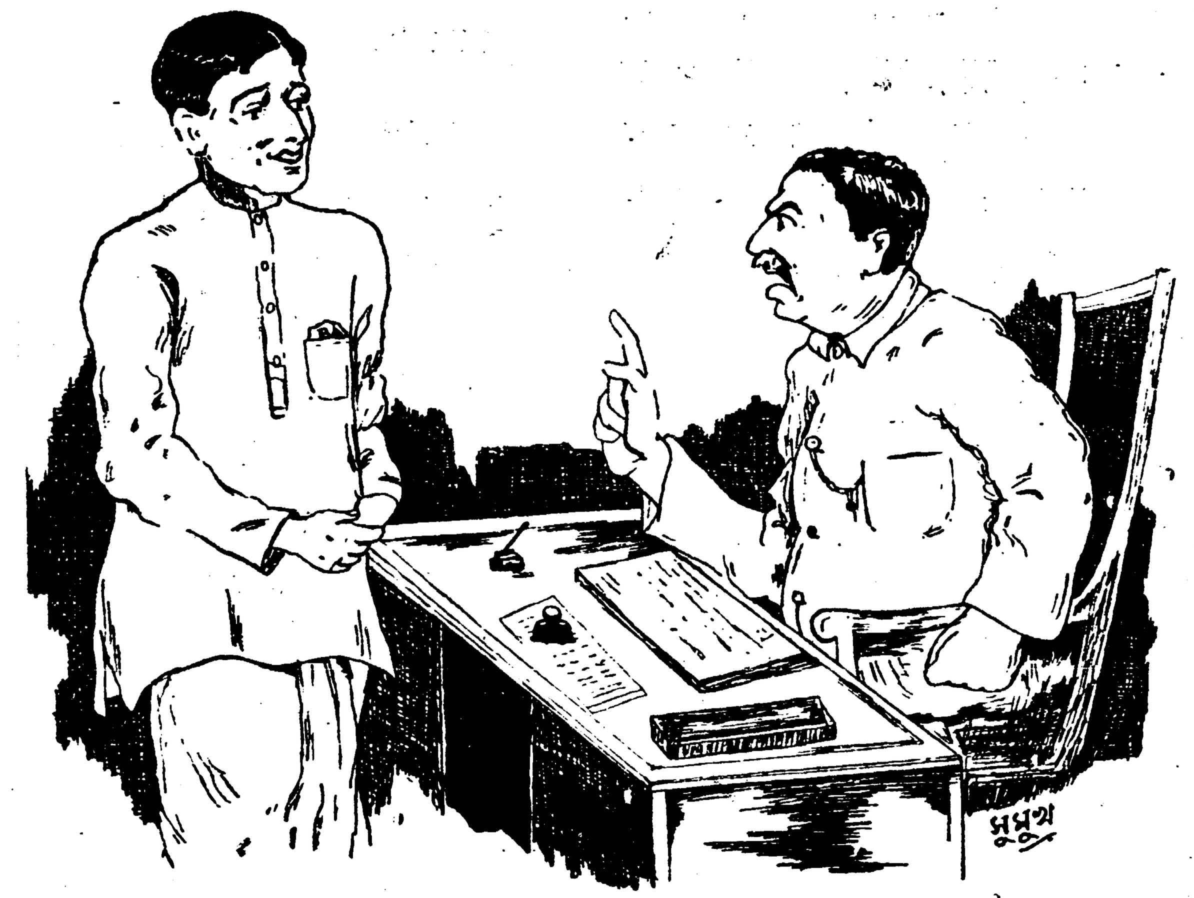

উমেদার

শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ মিত্র

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। প্রতি বারের মত এবারেও অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা আমাদিগকে ও রামধনুর অন্যান্য গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে তাঁদের বিজয়ার অভিনন্দন জানাইয়াছেন। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তরফ হইতে আমরা তাঁদেরও প্রতি-অভিনন্দন জানাইতেছি।

রামধনু ছাপা প্রায় শেষ হইবার মুখে এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে—প্রাতঃস্মরণীয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই, বাংলার বিরাট্ শক্তিমান্ পুরুষ ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চির দিনের জন্য চক্ষু বুজিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথের গায়ের জোর একটা প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁর জীবন একটা অনুপ্রেরণার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শুধু গায়ের জোরের জন্যই যে জিতেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ ছিলেন তা নয়, শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তিনি আজীবন বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা ছাড়া যে কোন জাতই প্রকৃত মহত্ত্ব পাইতে পারে না তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই সারা জীবন শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শিক্ষা-প্রচারের কাজে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি তো পূর্ণ ভাবেই হইয়াছে, ব্যক্তিগত ভাবেও রামধনু-সম্পাদক আত্মীয়-বিয়োগের মতই শোক পাইয়াছেন।

* * *

ইটালিয়ান্ ও আবিসিনিয়ান্দের মধ্যে দারুণ লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল—লড়াইএর পূর্ব্বাভাস তোমাদের আগেই দেওয়া হইয়াছিল। আবিসিনিয়ান্রা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন পণ করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে, এমন কি মেয়েরা শুদ্ধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ওদিকে ইটালিয়ান্রাও বিরাট্ আয়োজন লইয়া নামিয়াছে,—আধুনিক বড় বড় কামান, ট্যাঙ্ক, বোমাবর্ষণকারী এরোপ্লেন্ কিছুরই তাদের অভাব নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় ইটালিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে—এবং এজন্য সকলে মিলিয়া তাকে কি শাস্তি দেওয়া হইবে (বয়কট প্রভৃতি) তারও মীমাংসা শেষ হইয়াছে।

যুদ্ধের সঠিক খবর সব সময়ে পাওয়া যাইতেছে না—তবে এটা ঠিক যে প্রায় প্রত্যহই হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাইতেছে। বিরোধ মিটাইবার জন্য এখনও ফ্রান্স একটা শেষ চেষ্টা করিতেছে।

—রাঃ সঃ

* * *

লণ্ডনের এক হোটেলে কাপড় ছাড়ার ঘরের যে দরওয়ান তাকে কোন বেতন ত' দিতে হয়ই না, উল্টে সেই বরং হোটেলের কর্ত্তাকে বছরে প্রায় ১৫০০০ টাকা সেলামী দেয়। এই টাকা দেওয়ার পরও সে রাজার হালে থাকে। তার উপার্জ্জন হয় কোথা থেকে জান? যাঁরা কাপড় ছেড়ে যান তাঁদের বকসিস্ থেকে। এক ভদ্রলোক হিসেব করে দেখেছেন যে পোষাক-ঘর থেকে তাঁর হাট্ মুক্ত করার জন্য বক্‌সিসের নামে তাঁকে বছরে প্রায় ১৫০ টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হয়। এক আমেরিকান্ ভদ্রলোক একবার ওয়েটারকে বকসিস্ দেন ৩৫০০ টাকা—কারণ তিনি নাকি খানা খেতে-খেতেই ৭ লক্ষ টাকা রোজগারের বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন।

* * *

'গেজেট' কথাটা তোমরা আজকাল খুব

শোন কিন্তু এ কথাটা কোথা থেকে এসেছে জান কি? হয় ইটালির ভেনিস থেকে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে। 'গেজেটা' হচ্ছে ইটালীর এক রকম মুদ্রা। এ যুগের প্রথম খবরের কাগজ বের তার দাম ছিল এক গেজেটা। সেই থেকে খবরের কাগজকেই বলা হ'ত 'গেজেট'।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আরাম

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ম্মলকুমার দাস (ক্লার্ক ষ্ট্রীট্); সত্যচরণ দত্ত (ভবানীপুর); দিলীপকুমার রায় (কলিকাতা); জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); সলিল, নিতাই, রেণুকা প্রভৃতি (কলিকাতা); সিমুলিয়া এম্, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (দেবীসহর); ভূপেন্দ্রনাথ, ডলি, বুচি (ঢাকা); ভারতলক্ষ্মী মুখার্জ্জি (ঢাকা); মনোরঞ্জন সেন (কোধলা); শৈলেশ, অনিল, নিখিল (জলপাইগুড়ি); নিরু, প্রভা, বিভা; সুখু (জলপাইগুড়ি); রাজেশ্বর মজুমদার (কাজিরপাগলা); কল্যাণ, অজিত, অসিত প্রভৃতি (রাঁচী); জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কালিয়ারি); নিখিল চৌধুরী (রাজসাহী); অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াগাছা); ভূপেন্দ্র, শশাঙ্কশেখর (বেহালা); মণি, খোকন, মীরু প্রভৃতি (নর্থ লক্ষ্মীপুর); রাণী, ছোড়দা, জয়ন্ত (লালমণির হাট); বীণাপাণি সমিতির সভ্যগণ (বাঁকুড়া); নবকুমার, সুধীর, অবনী (কালনা); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); মনুজেন্দ্র ও ভাস্কর রায়চৌধুরী (বেনারস); মাতৃমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (দশার্ত্তা); শিবানী দিদি, কল্যাণী, সীতা (ডিব্রুগড়); অমরনাথ, ইন্দু (টাকী); তপন, বাচ্চু (রেঙ্গুন); মৃণাল, চিন্ময়, মৃন্ময় প্রভৃতি (রঙ্গপুর); সুশীল, সোনা, মাণিক প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); আবদুস, যতীন (কুমিল্লা); সুরমা, প্রতিমা, বেলা প্রভৃতি (পাতিহাল); রেণুকা, অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরৈল); রণেন্দ্র, শোভা, বিভা প্রভৃতি (ধুবড়ী); বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ (যশোহর); রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র, শৌরেন্দ্র প্রভৃতি (মধুবাণী); ধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ দাদা (জলপাইগুড়ি); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, লতিকা, রেণুকা প্রভৃতি (মাধিপুরা); রুবী চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর, মঞ্জু প্রভৃতি (ভাগলপুর); আর্য্য, শান্তি, মেন্তু প্রভৃতি (মজঃফরপুর); নীলিমা দেবী, শুভেন্দু, মনোতোষ প্রভৃতি (মধুপুর); পবিত্রকুমার রায় (ফরেষ্ট বাংলো—জলপাইগুড়ি); দীনেশ চক্রবর্ত্তী (গজারিয়া—দুর্গাবাড়ী); শান্তি, মায়া, ডলি; ছবি, বেলা, গুটু মামা প্রভৃতি (নিউ দিল্লী); শৈলেশ, অজিত, সন্তোষ প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা); রবি, পারুল, ফটিক (কুড়িগ্রাম); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (গিরিডি);

নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট); অজিতকুমার সান্যাল (পাবনা); কালিদাস, দেবীদাস, মধু প্রভৃতি (শিলং); নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অতুলকুমার (শিলং); বাড়ুযোডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (আমলানগর); পাঁচুগোপাল ও কৃষ্ণদাস (নওয়াপাড়া); প্রহ্লাদচন্দ্র, অমিল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি (মধুতটী)।

নূতন ধাঁধা

নীচের টুকরোগুলো একটা চিঠির অংশ। চিঠিখানা আমাদের ছোট খুকী ছিঁড়ে দশ টুকরো ক'রে ফেলেছে—কেউ পড়বার আগেই। তোমরা পাঠোদ্ধার ক'রে দিতে পারবে কি? নির্ভুল ভাবে পড়া চাই।

(১)
দের
তুমি
ইয়া সন্ধ্যার
সিবে না
ব

(২)
আ
খিত হই
আছ। এখা
মাসীমা

(৩)
রাত্রে আমা
রহিল
ল

(৪)
দি
ইতি

(৫)
বাড়ীতে তো
ছোটখো
পূ

(৬)
আশা
নে সকলে ভা
র প্রণাম

(৭)
ত্যন্ত
কুশলে
ল আছে
ও
কমল।

(৮)
ভাই সুধীর,
আজ
নিমন্ত্রণ
ভোম্বলকে
অবশ্য
তুঃ

(৯)
মার
কা ও
কেবই অতি
আসিলে অ
করি

(১০)
কে আমা

পাহাড়ের প্রাণ
(পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত ছবি)

৮ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ { ১১শ সংখ্যা

জামরুল-বন ডাকে আমায়

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

জামরুল-বন ডাকে আমায়—
জামরুল-বন ডাকে,
মাঠের পথে যাবার বেলা
দুধ-পুকুরের বাঁকে।

আষাঢ়-ভোরে ওর আকাশে
কাজল কালো মেঘ সে ভাসে;
শরৎ-সাঁঝে রঙের পরী
মায়ার ছবি আঁকে ;

রামধনু—

পাহাড়ের প্রাণ
(পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত ছবি)

৮ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ { ১১শ সংখ্যা

জামরুল-বন ডাকে আমায়

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

জামরুল-বন ডাকে আমায়—
জামরুল-বন ডাকে,
মাঠের পথে যাবার বেলা
দুধ-পুকুরের বাঁকে।

আষাঢ়-ভোরে ওর আকাশে
কাজল কালো মেঘ সে ভাসে,
শরৎ-সাঁঝে রঙের পরী
মায়ার ছবি আঁকে;

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

হাওয়ার দোলা জামরুল-বন
ডাকে আমায় ডাকে।

শাখায় শাখায় উছলে পড়ে
সবুজ স্নেহখানি,
পাখীর নীড়ে বাজ্‌ছে ধীরে
সুরের দেশের বাণী;

শিউরে-ওঠা ফুলে ফুলে
বাতাস চলে দুলে দুলে,
আলো-ছায়ায় মৌমাছিদের
চল্‌ছে কানাকানি;
শাখায় শাখায় মেল্‌ছে পাখা
বনের সবুজ-রাণী।

দূর আকাশের গহন নীলে
মেলে নয়ন দুটী—
জামরুল-বন, মন কি তোমার
পেয়েছে আজ ছুটী?

মাটীর থেকে বেরিয়ে এলে
সবুজ পাখা আলোয় মেলে,
দোদুল-শাখায় ঝড়ের হাওয়া
খেল্‌ছে লুটোপুটি;
আলো-ঝরা ভুবন মাঝে
তোমার আজি ছুটী।

লালুর বরাত

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র)

তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে; ডোবার ধারে বাঁশবনের মাথায় সূর্য্য নামে নামে। লালু উঠোনের এক কোণে ছেঁচতলার ছায়ায় বসে বেলের আঠা দিয়ে খবরের কাগজের ঘুড়ির প্রকাণ্ড লেজ তৈরী করছিল। লেজ না হ'লে ঘুড়ি উড়তেই চায় না; কেবল নেমে পড়ে।

তার খুড়োমশায় ডাক্‌লেন—"নেলো!"

লালু তাড়াতাড়ি কাগজে আঙ্গুলের আঠা মুছ্‌তে মুছ্‌তে উত্তর দিলে—"যাই—" তার পর ছুটে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

খুড়োমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি কর্‌ছ?"

লালু নখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে চুপ্‌ করে রইল। খুড়ীমা ঘরের কোণে মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই কর্‌ছিলেন। লালুর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন। বল্‌লেন,—"কি আবার করবে? যা করে—"

খুড়োমশায় চোখ পাকিয়ে বল্‌লেন—"আবার ঘুড়ি? সেদিন যে তোমাকে বারণ করে দিয়েছি, আর ঘুড়ি উড়িও না। মনে নেই, তারাচাঁদ ডাক্তারের ছেলে পচার সঙ্গে মারামারির কথা?"

লালু ঘাড় নেড়ে জানালে—"হাঁ"।

"তবে যে আবার ঘুড়ি ওড়াচ্ছ?"

"ঘুড়ি ওড়াই নি; তৈরী করছিলাম—"

তার উত্তর শুনে খুড়ীমা হেসে ফেল্‌লেন; খুড়োমশায় আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। চাদরখানা গলায় তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লেন—"আজ তোমাকে হাটে যেতে হবে; আমি পার্‌ব না। আমার এখনই কাছারী যাওয়ার দরকার। কি আন্‌তে হবে তোমার কাকীমার কাছ থেকে শুনে, টাকা নিয়ে রওনা হও—" বলে তিনি ঘরের কোণ থেকে হারিকেন-লণ্ঠন ও ছাতা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে

নীচে নামলেন। তার পর উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"দেরী ক'র না ; এই বেলা যাও। না হ'লে ফিরতে রাত হবে—" বলেই তিনি বেরিয়ে ধানের গোলার পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেলেন।

দূর থেকে একবার তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বোধ হয় বেগুন ও লঙ্কা ক্ষেতে গরু ঢুকেছিল ; তাড়িয়ে দিলেন। লালুর মনে পড়্‌ল, বাগানের হুড়কোটা কাল সে ভেঙে ফেলেছে। চাকর নিতাই এখনও একটা নতুন হুড়কো তৈরী করে নি। ভাগ্যে খুড়োমশায় জানেন না, কার কাজ। নিতাইকে সে একটা পয়সা দেবে বলে, ব্যাপারটা চেপে রেখেছে।

খুড়ীমা বল্‌লেন—"নে রে ছোঁড়া! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যেতে হবে না?" বলে তিনি কাঁথা ফেলে উঠ্‌লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বল্‌লেন—"আজ তোর মাসী আস্‌বে জানিস্ না?"

"মাসীমা আস্‌বে! কখন?"

"সন্ধ্যেবেলা। তারা আজ সকালে রওনা হয়েছে। নৌকোয় আস্‌তে সারাদিনই ত' কেটে যায়। যা জামা গায়ে দিয়ে আয়—"

মাসীমা লালুকে সেবার যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। লালু বল্‌লে—"ওঃ, কেয়া মজা!"

সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে বাঁশের আল্‌না থেকে তার জামাটা পেড়ে গায়ে দিলে। কোমর আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

খুড়ীমা রান্নাঘর থেকে খালুইটা এনে উঠোনে রেখে আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বার করে বল্‌লেন—"এই নে। বেশ ভাল দেখে একটা মাছ আন্‌বি। আর ঐ সঙ্গে দু'পণ পান, আধ সের সুপুরী, চার পয়সার খয়ের। আর যদি পাস্ ত' সের খানেক আলু কিনিস্—"

"এত সব আন্‌ব কিসে?"

"কেন, অত বড় খালুইটাতে ধরবে না? তবে ঐ ছোট খালুইটাও নে।"

লালু খুড়ীমার হাত থেকে টাকাটা নিলে। খুড়ীমা বল্‌লেন—"টাকাটা কাপড়ের খুঁটে বেশ ক'রে বেঁধে পেটের সঙ্গে গুঁজে রাখ্।"

"ভয় নেই, হারাবে না।" বলে লালু খালুই দুটো হাতে তুলতেই মনে পড়্‌ল, তার ঘুড়ি, লাটাই, ঘুড়ির লেজ, কাগজ, আধখানা কাঁচা বেল, হেঁসোখানা ছেঁচতলায় পড়ে আছে। হেঁসো দিয়ে সে কাগজ কাট্‌ছিল। সে খালুই দুটো মাটিতে রেখে তার জিনিষগুলো ঢেঁকীঘরের কোণে রেখে এল। তার পর ছুটে এসে খালুই দুটো হাতে তুলে তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

গাঁ থেকে ফকীরগঞ্জের হাট দেড় ক্রোশ ; মাঝে একটা নদী। সপ্তাহে দু দিন হাট বসে—বৃহস্পতি ও রবিবারে। সেদিন রবিবার। আধ ক্রোশের মাথায় খেয়াঘাট। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার ধরে ক্রোশটাক গেলেই হাট। দূর থেকে হাটের ধারের বড় বটগাছটা দেখা যায়। নদী পার হ'তে হ'তে হাটের ঘাটের নৌকোগুলোও চোখে পড়ে। হাটের ওধারেও একটা খেয়া আছে। সেটা দিয়ে হাট কাছে হয়। কিন্তু এপারে হাঁটতে হয় ঠিক ওপারের সমান।

লালু চলেছে। জোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জন কয়েক জোলা তার সঙ্গী হ'ল। তারাও হাটে যাচ্ছে। কেউ নিয়েছে এক মোট নতুন গামছা, কেউ নিয়েছে সূতো, কেউ নিয়েছে চাদর। একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো লালুবাবু, হাটে যাবে না কি?"

"হুঁ—"

"তা একা যে! নিতাই কৈ?"

"জানি নে—"

জোলাটা তাদের নিজেদের মধ্যে একজনকে ডেকে বল্‌লে—"বুঝ্‌লে গো চাচা, মাধববাবু মরার পর ছেলেটারও হাল হয়েছে।"

"ছাড়ান দে রে ভাই। ভদ্দর লোকের কথা—"

জোলাপাড়ার পর প্রকাণ্ড ধানক্ষেত। আলে আলে যেতে হয়। ক্ষেত পার হলেই খেয়াঘাট ; ঘাটের ওপর পাটনীর ঘর। তার সাম্‌নে একখানা নৌকোর ভাঙা ছই, কতকগুলো ছোট ছোট বাঁশ একটা গলুই পড়ে আছে।

লালু ক্ষেত পার হয়ে সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে, খেয়া ওপার থেকে রওনা হয়েছে। জন কয়েক হাটুরে বেসাতি নামিয়ে বসে গল্প করছিল।

লালু তাদের কাছে না ব'সে ভাঙা ছইটার ওপর গিয়ে বস্‌ল। খেয়া ভিড়তে এখনও কিছু দেরী। তার পর খেয়া ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে সে পাড় দিয়ে নীচে নেমে সকলের আগে গিয়ে খেয়ায় উঠ্‌ল। হাটের বেলা; দেরী করা চল্‌ল না। যাত্রী নিয়ে তখনি খেয়া ছাড়্‌ল।

খেয়া চলেছে; এদিক্‌-ওদিক্‌ দিয়ে ডিঙি ও ব্যাপারীদের দু-একখানা বজ্‌রা বা পান্‌সী যাওয়া-আসা করছে।

লালু বসেছিল ধারে পা ঝুলিয়ে। পাটনী বল্‌লে—"সরে বস বাবু। হাতে দড়ি দেবে না কি? ঐ টানে একবার পড়লে নিয়ে যাবে সেই মহেশপুরের ঘাটে।"

কিন্তু লালু পাটনীর কথায় কান দিলে না। পায়ের নীচ দিয়ে নদীর স্রোত যাচ্ছে, দেখে তার বড় আনন্দ।

পাটনীর ভাই সকলের কাছে পারানির পয়সা আদায় করছে। কেউ বলছে, "কাল দেব"; কেউ বলছে, "ফিরতি বেলা"; কেউ কেউ ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করছে। লালুর কাছে এসে সে পয়সা চাইতেই পাটনী বল্‌লে—"বোস মশায়ের ভাইয়ের বেটা—" পাটনীর ভাই লালুর কাছে আর পয়সা চাইলে না।

লালু তার পাশের লোকটার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে। নদী কোথা থেকে আসে, পাহাড় কি রকম, ষ্টীমার কেমন ক'রে চলে, উড়োজাহাজের কথাও বলতে আরম্ভ করলে। তার অনর্গল বক্তৃতায় পেছন থেকে একটা লোক বলে উঠ্‌ল—"তুমি উকীল হবে বাবু।"

শুনে লালুর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তার বক্তৃতা থামে না, লোকগুলো কিন্তু তার কথায় আর কান দিলে না।

খেয়া পারে পৌঁছল, কিন্তু টানে ঘাটে ভিড়তে পারল না; ভাটিতে কিছু দূর চলে গেল। জায়গাটায় উঁচু পাড়। তার গায়ে গেঁও শালিখের বাসা। যাত্রীদেরই একজন দাঁড়ে বস্‌ল। নৌকো উজিয়ে গিয়ে ঘাটে লাগ্‌ল।

তখনও লগি পোঁতা হয় নি। লালু লাফ দিয়ে ডাঙায় নামতেই নৌকোর ওপর থেকে কে যেন বল্‌লে—"ওরকম করে নেম না হে। হাত-পা ভাঙবে—"

লালু ফিরে দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত শশধর বাবু। সে জিভ কেটে পাড় দিয়ে তাড়াতাড়ি তীরে উঠে হাটের পথ ধরে চল্‌ল।

সামনে এক পাল গরু ও ছাগল হাটের দিকে চলেছে। তাদের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। সে পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে তাদের ছাড়িয়ে গেল।

লাফ দিয়ে ডাঙায়···

ঐ যে ফকীরগঞ্জের হাটের বটগাছ দেখা যায়। পথ দিয়ে নানা রকম লোক যাওয়া-আসা করছে। কেউ বেসাতি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ সওদা নিয়ে ফিরছে, কেউ সওদা করতে চলেছে।

হাটটা লালুর চেনা; সে অনেক বার হাটে এসেছে। হাটের মুখেই সার্কাস্ হচ্ছিল; এক পয়সার খেলা। ছোট তাঁবু। কয়েকটী মুসলমান তার বাইরে দাঁড়িয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে চীৎকার করে বল্‌ছে—"ভানুমতীর খেলা—এক পয়সা—চলে এস।"

তাদের একজন একটা টুপীর ভেতর থেকে মুঠো মুঠো কুচো কাগজ চিবোচ্ছে, আর বলছে—"নাস্তা, নাস্তা"—বলেই মুখের ভেতর থেকে একটা কাগজের ভেঁপু বার করছে।

লালুর ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল, সে এক পয়সা দিয়ে ভেতরে যায়। এক টাকা ত' আছে। সে ট্যাঁকে হাত দিয়ে টাকাটা বার করতে গিয়েই চমকে

উঠ্‌ল। টাকা কোথায় গেল? এ ট্যাঁকে কি? না, এ ট্যাঁকেও ত' নেই। পকেটে রেখেছে কি? সে তাড়াতাড়ি তিনটে পকেটই হাতড়ে দেখ্‌লে। না, নেই ত! তার বেশ মনে হচ্ছে, কাকীমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে ট্যাঁকে গুঁজলে। ট্যাঁকেই রেখেছিল; ট্যাঁক ছাড়া সে কোথাও রাখে নি। সে আবার ট্যাঁক দু'টো ও সেই সঙ্গে জামার পকেট তিনটে খুঁজলে।

ভয়ে তার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কি দিয়ে সে হাট করবে? খুড়োমশায় শুন্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না। বল্‌বেন—"একটা টাকা রোজগার করতে ক' ফোঁটা রক্ত জল হয় জান?" টাকাটা সে কোথায় পাবে? পথে পড়ে গেছে কি? পড়লেও ত পাওয়া যাবে না। তার চোখে জল এল। সে খালুই শুদ্ধ হাত দু-খানা পিছনে দিয়ে টাকাটা পথের চারধারে খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে চল্‌ল।

পথে কেবল ধূলো, গোবর ও শুকনো কাঁটা-নটের গাছ। সাদা জিনিষ চোখে পড়লেই তার বুকটা নেচে উঠে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে, শামুকের ভাঙা খোলা! তার বুকটা আবার দমে যায়। একটা টাকা সে কোথায় পাবে? কি করে টাকাটা হারাল? নিশ্চয়ই পথে কোথাও পড়ে গেছে। খুড়োমশায় বলবেন—"তুমি অসাবধানী।" তার পরই বেত পড়বে। তার জন্যে একখানা বেত আছে। আবার তার চোখে জল এল। কি করবে সে? সে ত' ইচ্ছে ক'রে হারায় নি। তবুও তার কথা—চট্ করে মনে পড়্‌ল, মাসীমা ত' এবারও যাবার সময় তাকে একটা টাকা দিয়ে যাবেন। এখন যদি একটা টাকা ধার পায় ত' সেই টাকা দিয়ে ধার শোধ দেবে।

সে ঘাড় তুল্‌তেই দেখে তার সামনে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি খুঁজ্‌ছ? হাটে যাও নি?"

লালু ঢোঁক গিয়ে বল্‌লে—"না স্যার। আমার টাকাটা—"

"হারিয়েছ? হারাবারই কথা। তোমার মত চঞ্চলমতি বালকেরাই অসাবধানী হয়। সম্ভবতঃ সেই খেয়াঘাটেই তোমার টাকাটি হারিয়ে থাকবে। কোথায় রেখেছিলে?

"ট্যাঁকে—"

"না; পকেটে। পকেটে টাকা রাখলেই হারায়। সেই যখন লাফিয়েছিলে, তখনই পড়ে গেছে। দেখ, তোমার দোষেই এ রকম ক্ষতি হ'ল। বাড়ীতে কতখানি অসুবিধার কারণ হবে বুঝতে পারছ?"

লালুর চোখ দু'টো ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। বল্‌লে—"স্যর, আমাকে একটা টাকা ধার দেন; কাল স্কুলে শোধ দেব।"

পণ্ডিত মশায় প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন। তার পর বল্‌লেন—"দেখ, আমি দিতে পারি। তবে কিনা, টাকাটি আমার নয়। তোমারই খুড়ো মশায়ের টাকা। আমি কাল কলকাতা যাব। তিনি একটি ওষুধ কিন্‌তে আমায় কয়েকটি টাকা দিয়েছেন। আমি তাই থেকে তোমায় দিচ্ছি"—বল্‌তে বল্‌তে তিনি পেটের ওপরের কোঁচাটা খুললেন। তার খুঁটে বাঁধা একখানি ময়লা রুমাল। রুমালের খুঁটে একখানি পাঁচ টাকার নোট, কয়েকটি টাকা ও রেজ্‌গি বাঁধা ছিল। তিনি তাই থেকে একটি টাকা বার করে বল্‌লেন—"দেখো বাবা, আমাকে অপদস্থ ক'র না।"

টাকাটা নিতে লালুর বুক কেঁপে উঠ্‌ল। তার খুড়ো মশায়ের টাকা! কিন্তু সে ত' দিয়ে দেবে। মাসীমার কাছ থেকে আজ রাতের বেলায়ই চাইবে। মাসীমা তাকে ভালবাসেন; সেবার সঙ্গেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে টাকাটা হাতে নিয়ে বল্‌লে—"স্যর, টাকাটা আমি ঠিক কাল দেব। কিন্তু আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, খুড়ো মশায়কে বল্‌বেন না।"

"সে বিবেচনা করা যাবে। আজ যে শিক্ষা লাভ করলে, কখনও ভুলো না। সর্ব্বদা ধীর ও সাবধানী হবে।"

"হ্যাঁ স্যর" বলেই লালু হাটের দিকে ছুটল। কিন্তু লালু মনে আর স্ফূর্তি পেল না।

মস্ত হাট। কোথাও কাপড়-গামছা-সুতো, কোথাও মাছ, কোথাও মুড়ী-চিঁড়ে-গুড়-বাতাসা-জিলাপী, কোথাও মাদুর-চাটাই-টিন-চিটেগুড় বিক্রী হচ্ছে। তরি-তরকারীও এসেছে নানা রকম। হাটের ধারে ধারে দোকান-পসার—পান-

মশলাপাতি, টিনের ছোট আয়না-ঘুন্‌সী-কাঁকই—এমনিতর নানা জিনিষের। ওদিকে গোহাটা; তার এধারে কতকগুলো গরুর গাড়ী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোথাও মুরগী ও ছাগলের হাট বসেছে। কোথাও ভিখারীর দল নানান্ সুরে চীৎকার করছে। কোথাও বা ব্যাপারীতে ব্যাপারীতে এক গাছা খালি বস্তা নিয়ে তুমুল বচসা। চার ধারে ঠেলাঠেলি, চীৎকার, গোলমাল। লালু খালুই ছুটো হাতে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তার খালুই ভর্ত্তি সওদা। মাছটা বেশ বড়; ওজনে সের ছুই হবে। খুড়ীমা যা যা বলেছিলেন, সবই সে কিনেছে। কিনেও বেঁচেছে সাড়ে তেরো পয়সা।

সে একবার ভাব্‌লে, পয়সাগুলো পণ্ডিত মশায়কে ফেরৎ দিই। তার পরই মনে পড়্‌ল, খুড়ীমার কাছে হিসেব দেবার সময় ধরা পড়্‌বে। সে টাকা হারানোর কথা কাউকে বল্‌বে না, এক মাসীমা ছাড়া।

হাটের বাইরে এসে পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে খালুই ছুটো ছু'হাতে তুলে সে ফিরে চল্‌ল।

বেলা পড়ে এসেছে; নদীর জলে কালো ছায়া। মাথার ওপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে। পাড়ের গায়ে গাঙ-শালিখেরা কিচিরমিচির করছে। অনেকেই হাট থেকে ফিরছিল। সাম্‌নে একখানা খালি গরুর গাড়ী ধূলো উড়িয়ে যাচ্ছিল। খালুই ছু'টো ভারী; লালু একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীখানার পেছনে খালুই ছুটো রেখে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চল্‌ল। গাড়োয়ানের খেয়াল নেই; সে তার পেছনে যে লোকটা বসেছিল, তার সঙ্গে গল্পে মশ্‌গুল্। গত বছর কোন্ কোন্ গাঁয়ে সে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল; কত টাকা রোজগার করেছিল, তাই নিয়ে আলোচনা করছে।

চল্‌তে চল্‌তে খেয়াঘাট দেখা গেল। ছু'-চার জন নৌকোয় বসেছে; কেউ কেউ উঠ্‌ছে। এবার লালুর ভয় হ'ল। যদি মাসীমা না আসে? সে যত ঠাকুর-দেবতার নাম জান্‌ত সকলকে মনে মনে ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

খেয়া ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় সে গিয়ে খেয়ায় উঠ্‌ল। এবার সে চুপ-চাপ

বসে আছে। খেয়াটাতেও যাত্রী ও বস্তা, হাঁড়ী, মাছ, পান প্রভৃতি জিনিষপত্রে ঠাসাঠাসি। একজন ছু'টো পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। পাঁঠা ছুটো মাঝে মাঝে "ম্যা - ম্যা" করছে।

খেয়া যত কূলের কাছে আসে, লালুর ততই ভয় করে। কিন্তু ঐ যে একখানা ডিঙি খেয়াঘাটের এধারে কূলে বাঁধা! মাঝিরা রান্নার যোগাড় করছে। একজন মসলা বাঁট্‌ছে। ঐ ডিঙিতেই বোধ হয়—এক বার সে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বে।

খেয়া আবার অঘাটায় গিয়ে পড়্‌ল। দাঁড় টেনে ডিঙির পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাটনী জিজ্ঞাসা করলে—"কোথাকার ডিঙি গো?"

মাঝি উত্তর দিলে—"কালীডাঙার।"

"যাবে কোথা?"

"মহেশপুর।"

"ওঃ—?"

"মহেশপুর।"

"এখানে যে?"

"সওয়ারী ছিল।"

লালুর মন আনন্দে নাচ্‌ছে—মাসীমা এসেছে! পণ্ডিত মশায়ের টাকা সে কাল ইস্কুলে গিয়েই দিয়ে দেবে।

তখন সন্ধ্যা লাগে লাগে। খুড়ো মশায় আসেন নি। তিনি আস্‌বেন রাত্রে। লালু বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই দেখে সাম্‌নে খুড়ীমা। তিনি তাঁকে দেখে বলে উঠ্‌লেন—"কি রে! বাড়ী এলি যে?"

লালুর বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। সে খালুই ছু'টো মাটিতে নামালে।

খুড়ীমা বল্‌লেন—"এ সব কিন্‌লি কি দিয়ে?"

লালু অবাক্ হয়ে গেল। তার টাকা হারানোর কথা খুড়ীমা জান্‌লেন কি করে? পণ্ডিতমশায় ত' ফেরেন নি। সে আসবার সময় তাঁকে শ্রীনিবাস সা'র দোকানে বসে তামাক খেতে দেখে এসেছে। বল্‌লে—"টাকা দিয়ে!"

"টাকা পেলি কোথায়?"

"তুমি দিয়েছিলে—"

"আমি ত' দিয়েছিলাম। তুই নিয়েছিলি?"

"হঁ্যা।"

"ফের মিছে কথা?"

গোলমাল শুনে মাসীমা সেখানে এলেন। তাঁর কোলে একটা মোটা-সোটা ছেলে। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে?"

লালু মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তাঁকে যেন একটু অচেনা ঠেক্‌ছে। যেন ঠিক সেই মাসীমা নন্‌। মাসীমা এর আগে যখন এসেছিলেন তখন খোকা হয় নি।

খুড়ীমা বল্‌লেন—"আমি ওঁকে বাজারের টাকা দিয়েছি, উনি টাকাটি ঐ ছেঁচতলায় রেখে ঘুড়ি-লাটাই ঘরে তুলে খালুই নিয়ে হাটে গেছেন। টাকা পেলি কোথায় বল্‌?"

"সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে ধার করেছি।"

মাসীমা বল্‌লেন—"ও বাবা! সেই নেলো এমন হয়েছে?"

খুড়ীমা বল্‌লেন—"দেখ্‌লে ত'? দাঁড়াও আসুন আজ!" বল্‌তে বল্‌তে খুড়ীমা খালুই ছু'টো হাতে তুলে নিলেন।

লালু চট্‌ ক'রে তার খুড়ীমার পায়ের ওপর পড়ে বল্‌লে—"তোমার পায়ে পড়ি কাকীমা, তুমি কাকাকে ব'ল না। আমি এবার থেকে খুব সাবধানী হব।"

"আচ্ছা, ছাড়্‌, পা ছাড়্‌। মনে থাকে যেন।"

লালু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"থাক্‌বে"।

মাসীমা বল্‌লেন—"ছোঁড়া এতও জানে—"

খুড়ীমা এ-কথার কোন জবাব দিলেন না; জিজ্ঞাসা করলেন—"কত ফিরেছে?"

"সাড়ে তেরো পয়সা।"

"কাল টাকাটা ইস্কুলে গিয়ে পণ্ডিত মশায়কে ফেরৎ দিবি। বাকী পয়সাগুলো তোর মাসীর হাতে দে।"

লালুর বুকের ভার সব নেমে গেল। তার মনে পড়্‌ল, মাসীমাকে প্রণাম করা হয় নি। সে ঢিপ্‌ করে তার মাসীমার পায়ে প্রণাম করতেই মাসীমা বল্‌লেন—"হয়েছে—হয়েছে। তোর সুবুদ্ধি হোক্‌।"

মাসীমার আশীর্ব্বাদটা খচ্‌ করে লালুর বুকে বিঁধ্‌ল। কেউ তাকে ভালবাসে না?

যা হোক্‌, সন্ধ্যা ও পরের সকালটা মাসীমার ছেলেকে নিয়ে তার বেশ আনন্দেই কাট্‌ল। খুড়ীমা খুড়োমশায়ের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করেন নি।

মাসীমা সেই দিন বিকেলেই চলে যাবেন; ইস্কুলে যাবার সময় লালু বার বার করে বল্‌লে—"মাসীমা, আমি না ফিরলে যেও না!"

মাসীমা এই অনুরোধের উত্তরে শুধু একটু হাস্‌লেন। খুড়ীমা তাকে টাকাটা চুপি চুপি দিয়ে বল্‌লেন—"নিয়ে যা।"

লালু লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে চলে গেল। আজ বিকেলে সে মাসীমার কাছে একটা টাকা পাবে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে দেখে, নিতাই মাসীমাদের বিছানা ও ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। মাসীমা ও মেসোমশায় বার বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খুড়োমশায় ও খুড়ীমা।

মাসীমা লালুকে বল্‌লেন—"তুই আর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে কি কর্‌বি?" বল্‌তে বল্‌তে আঁচলের গেরো খুল্‌তে লাগ্‌লেন।

লালু আনন্দে মাসীমা ও মেসোমশায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাসীমা বল্‌লেন—"এই নে!"

লালু দেখ্‌লে, ছু'টো পয়সা! সে ছুটে ভেতরে চলে গেল। মাসীমা চীৎকার ক'রে বল্‌ছেন, "নিয়ে যারে, নিয়ে যা—লজ্জা হয়েছে! আচ্ছা, দিদি তুমিই ওর পয়সা ছু'টো রাখ।"

লালুর ছু' চোখে জল। সে ঘরে গিয়ে বইগুলো কেরোসিন কাঠের শেল্‌ফের ওপর রেখে, ঢেঁকিশালায় গিয়ে তার ঘুড়িটা পেড়ে নিয়ে, তার ল্যেজটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগ্‌ল।

তার পর একবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লে—শেষ বেলার রৌদ্রমাখানো ধানক্ষেতের আল দিয়ে ঐ মাসীমারা নদীর দিকে চলেছেন।

লোহা-লক্কড়ের মুল্লুকে

(শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, বি-এস্‌-সি)

নাম পড়েই তোমরা হয়তো গালে হাত দিয়ে ভাবতে ব'সে যাবে—'লোহা-লক্কড়ের আবার মুল্লুক থাকতে পারে কিনা ?' নয় তো বাড়ীর মাষ্টার মশায়ের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কিংবা নিজেই গম্ভীর চালে পৃথিবীর ম্যাপ্‌ খুলে বস্‌বে। কিন্তু অত ভাবনার কারণ নাই—যে মুল্লুকটির কথা তোমাদের শোনাব সেটি উড়িষ্যার মধ্যে সিংভূম জেলার একটী নাম-করা সহর—জামসেদপুর।

সেবার পূজোর ছুটীতে আমি আর আমার এক বন্ধু সেই জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার যা কিছু স্মৃতি মনে আছে তাই তোমাদের কাছে বল্‌ছি।

জামসেদপুরের কথা মনে পড়লেই প্রথমে বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ পার্শি ধনী জামসেদজী টাটার কথাই মনে হয়। তোমরা অনেকেই হয়তো বিশ্ববিখ্যাত টাটা কোম্পানীর লোহা ও ইস্পাতের কারখানার নাম শুনে থাক্‌বে। ইনিই এই কারখানার 'প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। জামসেদজী অবশ্য এখন আর বেঁচে নেই, তাঁর নাতি জাহাঙ্গীর দোরাবজী টাটারও মৃত্যু হয়েছে, তবে তাঁরাই এখন এ কারখানার বড় অংশীদার।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই কারখানার আশ-পাশে যে সব টাউন ও অন্য সব কারখানা গ'ড়ে উঠেছে সবাইকে নিয়ে প্রতিষ্ঠাতার নামে নাম করা হয়েছে—জামসেদপুর বা টাটানগর। এখন জামসেদপুরের আশ-পাশে প্রায় সমস্ত জায়গাই টাটা কোম্পানীর নিজস্ব জায়গা। এর দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে সাত মাইল আর প্রস্থ প্রায় চার মাইল।

টাটানগর ষ্টেশন থেকে দু'-তিনটী রাস্তা বেরিয়ে গেছে। একটী চাইবাসার দিকে, অন্যটী জামসেদপুরেরই একটী বড় টাউন, বিষ্ণুপুরের দিকে ; তৃতীয়টী অন্য সব টাউন—বার্ম্মা মাইন্‌স্‌, গোলমুড়ি, সাকচির দিকে চলে গিয়েছে। বার্ম্মা মাইন্সের রাস্তায় বেরুলেই প্রথমে বাঁ দিকে চোখে পড়ে টাটা কোম্পানীর বিশ্ববিখ্যাত লোহা ও ইস্পাত তৈরীর কারখানা। এই কারখানাটী লম্বায় ১ মাইল এবং চওড়ায় আধ মাইল টাক হবে। টাটা কোম্পানীর নোয়ামুণ্ডি নামে এক জায়গায় 'লোহার পাথরের' (ore) খুব বড় খনি আছে। সেখান থেকে প্রত্যেক দিন গাড়ী বোঝাই ক'রে হাজার হাজার মণ পাথর আসছে আর পাথরের সঙ্গে কয়লার গুঁড়ো এবং অন্যান্য মশলা মিশিয়ে বড় বড় চুল্লীতে (Blast furnaceএ) ক'রে গলিয়ে লোহা বানান হচ্ছে।

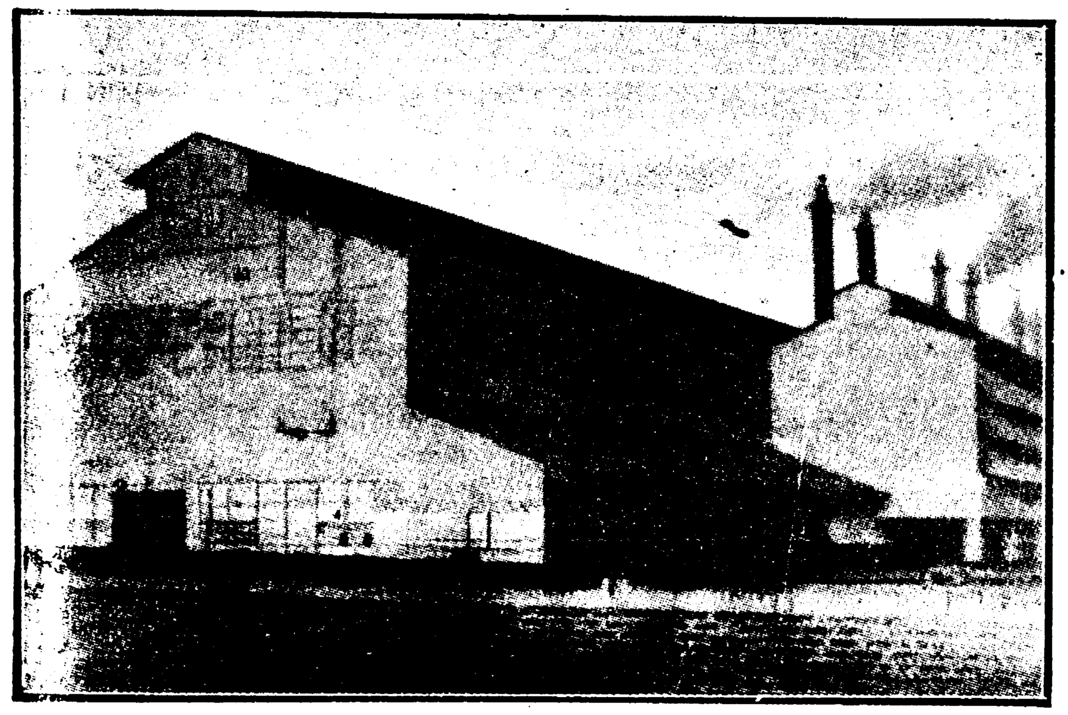

টিন্‌ প্লেট্‌ কোম্পানীর কারখানার দৃশ্য

ঐ লোহা আবার অন্য চুল্লীতে নিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হচ্ছে। কারখানায় সারা দিন রাত অনবরত কাজ করা হচ্ছে। তিন দল লোক, প্রত্যেক দলই ৮ ঘণ্টা ক'রে কাজ কর্‌ছে। সারা দিন রাতের মধ্যে কাজ বন্ধ হয় না, চুল্লীর আগুন কখনও নেভে না। কারণ একবার নিভ্‌লে মুহূর্ত্তে হাজার হাজার টাকার চুল্লী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। চুল্লীর আগুনের শিখা সারা রাত সেখানকার আকাশকে আলো ক'রে রাখে। সে আলো রাত্রে ৩০।৪০ মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। প্রত্যেক দিন এই কারখানায় হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈরী হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছোট-বড় নানা রকম 'মেশিনে' ও 'মিলে' নানা রকম কড়ি, বড়গা, রেল লাইন, কলকব্জার অংশ (Parts), করগেটেড্‌ টিন প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে।

শুধু এই কারখানা থেকেই সমস্ত জামসেদপুর সহরের বাড়ী-ঘর ও অন্য সব কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সে সব কথা অন্য সময়ে বলবার ইচ্ছে রইল। এই কারখানাটী পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় ও সমস্ত ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

তার পর ডান দিকের রাস্তায় আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলেই আরও দুটী ছোট কারখানা সামনে পড়ে। এই পথটী বার্ম্মা মাইন্‌স্ টাউনের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। প্রথম কারখানাটী একজন মারোয়াড়ীর পরিচালিত নিজের কারখানা, নাম—টাটা ফাউন্‌ড্রী কোম্পানী। টাটার জায়গায় বসেছে ব'লে টাটা কোম্পানীর কাছ থেকেই লোহা আনতে হয়। এখানে লোহা গলিয়ে, ছাঁচে ফেলে নানা রকম যন্ত্রপাতি, কল্‌কব্জা ও রেলের লাইনের সরঞ্জাম তৈরী হচ্ছে।

দ্বিতীয় কারখানাটী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় নানা রকম তামার মোটা ও সরু বিদ্যুতের তার (Cables) প্রস্তুতের কারখানা। নাম—কেব্‌ল কোম্পানী অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্‌।

বলতে ভুলে গেছি, প্রত্যেক কারখানারই নিজের নিজের কর্ম্মচারীদের থাকবার বাসা ও বাংলো বাড়ী এবং কুলী-মজুরদের জন্য থাকবার বস্তি আছে।

ওখান থেকে বরাবর সাম্‌নের রাস্তায় এগিয়ে গেলেই আর একটী বড় কারখানা (অবশ্য টাটা কোম্পানীর মত বড় নয়)—টিন্‌ প্লেট কোম্পানী অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্‌। এখানেও লোহা, ইস্পাতের অনেক রকম পাত, কলকব্জা, কেনেস্তারার টিন প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। এদেরও টাটার কারখানা থেকে লোহা ও ইস্পাত কিনে আনতে হয়। টাটার কারখানা ও রেল ষ্টেশনে মাল নেওয়া-আনার জন্য এদের কারখানার সঙ্গে রেলের যোগাযোগ আছে। টিন্‌ প্লেট কোম্পানীর পেছনে টাটার কারখানার আর এক বিস্ময়জনক কীর্ত্তি আছে। পাহাড় কেটে দুই দিকে প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধ দিয়ে একটী জলের চৌবাচ্চা বানান হয়েছে। সেটা মাটীর নীচ থেকে জল উঠে সব সময়েই ভর্ত্তি থাকে। বৃষ্টি নামলে জল বাঁধ থেকে উপচে পড়তে থাকে আর তখন একটী বড় জলপ্রপাতের মত দেখায়। ঐ জল টিন প্লেট কারখানায় সরবরাহ করা হয়ে

থাকে। এই বাঁধকে "গোলমুড়ি-ভ্যালী-ড্যাম" বলে। জামসেদপুর টাউনের প্রধান এঞ্জিনীয়ার টেম্পল সাহেবই এই বাঁধ তৈরীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। গোলমুড়ি সহরের ওভারসিয়ার মিঃ এ, টি, মুখার্জ্জি এবং মিঃ এস্, ঘোষও এর সাহায্যকারী ছিলেন। এটা তৈরী করতে কয়েক লাখ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

টিন প্লেটের পূবদিকের রাস্তা দিয়ে প্রায় এক মাইল তফাতে উঁচু জায়গার উপরে আরও দুটী কারখানা আছে। প্রথমটী ইন্দ্র সিং নামে একজন পাঞ্জাবী দ্বারা পরিচালিত—'ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্'। এখানেও নানা রকম লোহা-লক্কড়ের জি নি ষ তৈরী হচ্ছে। কারখানাটি খোলবার দিন কয়েক পরে ইন্দ্র সিংএর ছোট ছেলে একটী কলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল। হঠাৎ এক খণ্ড জ্বলন্ত লোহা তার শরীরে ঢুকে যাওয়ায় সে তখনই মারা পড়ে। কিন্তু অতেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই বরং পূর্ণ বেগে কাজ চালিয়েছিলেন। কুসংস্কারাপন্ন লোক হলে হয়তো অপয়া বলে সেদিনই কারখানা বন্ধ করে দিত। এই কারখানাটী ইন্দ্র সিংএর নিজের। এখানেও টাটা কোম্পানী থেকে লোহা আর ইস্পাত আসে। দ্বিতীয় কারখানাটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর এঞ্জিন, গাড়ী মেরামত করার ও তাদের কলকব্জা তৈরীর বড় কারখানা। কারখানাটী কয়েক বছর বন্ধ ছিল। কর্ম্মচারীদের খালি বাড়ীগুলি পড়ে আছে। দেখলে খুব দুঃখ হয়। কিছু দিন যাবৎ কারখানা আবার খুলেছে। ঐ কারখানার পাশেই ইন্দ্র সিংএর নিজের অন্য আর একটী লোহা-লক্কড়ের "মনিফিট

গোলমুড়ি ভ্যালী ড্যাম। এক পাশে পাথরের বাঁধ দেখা যাচ্ছে; ঘরটি পাম্প্‌-হাউস্‌; পেছনে টিন্‌ প্লেট্‌ কারখানা ও কোয়াটার্স্‌।

ওয়ার্কস্" নামে কারখানা আছে। সেটাও অল্প কিছু দিন হ'ল খুলেছে। এত দিন বন্ধ ছিল।

টিন প্লেট কারখানার পাশেই জামসেদপুরের আর একটা ছোট টাউন "গোলমুড়ি"। এর উত্তর দিকে টাটা কোম্পানীর পরিচালনায় আর একটী কারখানা আছে। এখানে কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের জন্য কাস্তে, কোদাল, দা প্রভৃতি নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। এর নাম—"এগ্রিকো"। 'এগ্রিকো'রও নিজের কর্ম্মচারী এবং মজুরদের জন্য বাসা আছে। এখানেও টাটার কারখানা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এই সব কল-কারখানা ছাড়াও জামসেদপুরে দেখবার অনেক জিনিষ আছে—যেমন কালীবাড়ী, সুবর্ণরেখা নদী, এরোড্রোম, ডেইরী ফার্ম্ম, জলের কারখানা, টিসকে ইন্‌স্‌টিটিউট, টেক্‌নিক্যাল স্কুল ইত্যাদি। বিষ্ণুপুর, সাকচি, বার্ম্মা মাইনস্‌, গোলমুড়ি, যুগসলাই প্রভৃতি জামসেদপুরের অন্য সব ছোট ছোট সহর। টাটার কারখানার জন্যই ধরতে গেলে সমস্ত সহর ক'টী গ'ড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। সমস্ত সহরের মোট লোকসংখ্যা প্রায় আশী হাজার, তার মধ্যে কেবল কুড়ি হাজারই টাটার কারখানায় কাজ করে। ভেবে দেখ কারখানাটী কত বড়। টাটার কারখানার নিজস্ব প্রত্যেক টাউনেই একটী ক'রে হাসপাতাল ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ক'রে ডাক্তার আছে। বিষ্ণুপুরে একটী প্রধান হাসপাতাল আছে। এই সব হাসপাতাল থেকে টাটার কারখানার কর্ম্মচারী ও মজুরেরা বিনা পয়সায় ব্যবস্থা ও ওষুধ পাচ্ছে। প্রত্যেক সহরেই একটী করে স্কুল আছে। টাটা কোম্পানীর নিজেদের কারখানা পাহারার জন্য নিজেদের টাউন পুলিশ আছে। টাটার বনবিভাগের অফিস ও পুলিশ আশ-পাশের পাহাড়ে মাঝে মাঝে ক্যাম্প করেছে। টাটানগরের বাসিন্দারা অধিকাংশই পাঞ্জাব, বাংলা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইএর লোক।

জামসেদপুরের নর্দ্দার্ণ টাউনে টেম্পল সাহেবের আর এক কীর্ত্তি আছে—একটা খেলবার মাঠকে চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল দু-এক জায়গায় টিকেট-ঘর ও 'গেট' আছে। এর নাম "টেম্পল্‌ গ্রাউণ্ড"।

এখন এত বড় একটা টাউনে জলের বন্দোবস্তের কথা বলা যাক্‌। সমস্ত সহরের জল সরাবরাহ করা হচ্ছে নিকটবর্ত্তী সুবর্ণরেখা নদী থেকে। সেখানে প্রকাণ্ড একটা পাম্পিং ষ্টেশন আছে। সাধারণ কাজের জন্য ঐ নদীর জলই পাম্প্‌ ক'রে সহরের নানা যায়গায়, বাড়ীতে ও কারখানায় আনা হয়। কিন্তু খাবার জল পরিষ্কারের জন্য প্রত্যেক সহরেই একটী ক'রে জল পরিশোধক যন্ত্র (filtration plant) আছে। নদীর জল বরাবর পাম্প্‌ ক'রে এই সব প্ল্যাণ্ট্‌এ আনার বন্দোবস্ত রয়েছে, আর এখানে সে জল ফিটকারী দিয়ে পরিষ্কার ক'রে তাতে ক্লোরিনের জল মিশিয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় ফের দ্বিতীয় বার পাম্প্‌ ক'রে সহরের নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

টেম্পল্‌ গ্রাউণ্ড্‌—পেছনে দেওয়াল এবং পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

জামসেদপুর সহরটী চারদিকেই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এর আকাশ সব সময়েই ধোঁয়ায় ভরা। সারা দিনরাত অনবরত টাটা ও অন্যান্য কারখানার কল চলার শব্দে দিগ্‌-দিগন্ত মুখরিত হচ্ছে। আর রাতের বেলায় হাজার হাজার বিদ্যুতের আলো দেখলে মনে হয় দীপালীর আমোদ লেগে গেছে।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পার্‌ছ যে একটী সহরে ৭।৮টা লোহা-লক্কড়ের কারখানা থাকলে তাকে লোহা-লক্কড়ের মুল্লুক বলা ভুল হবে না।*

* ফটোগুলি সমস্তই লেখকের তোলা।

অনুপান

(শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

বিকেল থেকে হঠাৎ এমনি বৃষ্টি নাম্‌ল যে নেন্তু বাবুর মাষ্টার মশাই সন্ধ্যায় আর পড়াতে আসতে পারলেন না,—"রেনি-ডে" নিয়ে বস্‌লেন। সুতরাং নেন্তুর সে-সন্ধ্যায় "হলিডে" আর মারে কে? সোজা দাদামশায়ের ঘরে গিয়ে নেন্তু বল্‌লে—"দাদু, একটা গল্প বলুন না"?

দাদামশাই বাদ্‌লা পেয়ে আফিমের মাত্রাটা একটু বেশী রকম চড়িয়ে নেশায় ব'সে ব'সে ঝিমোচ্ছিলেন, নেন্তুর সাড়া পেয়ে চ'ম্‌কে উঠে বল্‌লেন—"ছেই ছেই"। তার পর ভাল ক'রে তাকিয়ে বল্‌লেন—"ওঃ তুই? আমি বলি ভুলোটা বুঝি ঘরে এল। গল্প শুনবি? আচ্ছা শোন্।

"এক ছিল রাজা আর তা'র ছিল তিন……"

"ব্যস্ ব্যস্! রক্ষে করুন! রাজা, রাণী, পরী ও সবে কাজ নেই। অন্য গল্প বলুন।"

"আচ্ছা, তবে শোন্। এক শাঁকচুন্নির এখন নিউমোনিয়া হ'য়ে বড্ড…"

"এখান থেকে উঠিয়ে তবে ছাড়লেন দাদু। এসব গল্প কি আজকাল চলে? চলুতো আপনাদের টাইমে, এখন স্রেফ্ অচল, বুঝলেন?

"তবে এখন তোর ফরমায়েস মত গল্প ভিয়েন করি, তুই দাদা, সেই ফাঁকে কল্কেটা একবার পাল্টে নিয়ে আয় ভাই"। বলে দাদা মশায় আফিমের নেশায় বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

কল্কেটা সেজে গড়গড়ার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নেন্তু বল্‌লে—"কৈ…"

"এই যে বলি দাদা"। দাদা মশায় গড়গড়ায় বার কতক টান দিয়ে বল্‌লেন—"সে বহু দিনের কথা। প্রায় বছর সত্তরেক তো হবেই; মানে, তোর দিদিমাকে…"

"বিয়ে করেন;—এই তো? ও আমি দিদিমার মুখে একশ' বার

আর আপনার মুখে হাজার বার শুনেছি। সেকালের সব ভাল ছিল, একালের সব খারাপ। সেকালের আপনারা এক-একজন দানব বিশেষ ছিলেন, লোহার কড়াই হজম করতেন…জল দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতেন। আর একালের আমাদের পেটে গজখানেক ক'রে পিলে…এ আমার আর শুনে কাজ নেই। আপনি ঝিমুতে ঝিমুতে দেয়ালা করুন, আমি চল্‌লাম।" নেন্তু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

"ওরে, বিয়ের কথা নয়, শোন্—শোন্…"

নেন্তু খাটের ওপর উঠে ফের আড় হ'য়ে পড়্‌ল। দাদু ব'লতে লাগলেন:

"যেবার তোর দিদিমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ঠিক সেইবার এই ঘটনা হয় কিনা, তাই বলছিলাম। তখন আমার বয়স—কত আর? বারো কি তেরো হবে। তখন আমাদের এই গাঁয়ে এক কবিরাজ থাকতেন। এখন কায়েতপাড়ার দিকে নদীর যেখানে ভাঙ্গন ভাঙ্গছে ঠিক ঐ রকম জায়গাতে ভরত কবিরাজের ভিটে ছিল।

নেন্তু বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"বাবাঃ, যে বন, ঐখানে লোকে বাস করত কি ক'রে?"

"তখন কি আর বন-জঙ্গল ছিল! দস্তুরমত একটা পাড়া ছিল—সেনপাড়া। তার পর শোন্—

"ভরত কবিরাজের মতন অত বড় নাড়ী-জ্ঞানী বিচক্ষণ কবিরাজ এদিকে আর সে সময়ে ছিল না। কিন্তু লোকটা ছিল ভয়ানক একগুঁয়ে আর তিরিক্ষে মেজাজের। রোগী দেখে যদি বুঝতেন সে আর বাঁচবে না, রোগীর সাম্‌নেই তা'র গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিয়ে চ'লে আসতেন; "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" নীতিবাক্যের ছায়া মাড়ান তাঁর ঠিকুজী-কুষ্ঠীতে ছিল না। আবার তাঁর আর এক গুণ ছিল, ডাক্তার-বদ্যি দেখার পর যদি কোন রোগীকে দেখবার ডাক পড়্‌ত, তিনি কিছুতেই সেখানে যেতেন না—মাথা খুঁড়ে মরলেও না।

"এক দিন কথায় কথায় ফস্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলেছিলাম—'আচ্ছা ভরত জ্যেঠা, আপনি এ রকম রোগীর চিকিৎসা করেন না কেন? আগে ডাকে নি ব'লে কি আপনার অপমান বোধ হয়?'

"আমায় তিনি খুব ভালবাসতেন। আমার কথায় তিনি ব'লেছিলেন,—'আরে পাগ্‌লা, তা' নয়। একটা শ্লোক শোন্—

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি।

অর্থাৎ বুঝলি কিনা, ব্যাপার যাই হো'ক আয়ু থাকলে তবেই বাঁচবে। যাঁরা চিকিৎসা ক'রে গেলেন তাঁরাও তো চিকিৎসক!' "

নেস্তু বল্‌লে—"বাঃ আচ্ছা তো! যিনি আগে চিকিৎসা ক'রছিলেন তাঁর বুঝি আর ভুল-চুক্ হ'তে নেই···সেকেলে লোক কিনা।"

দাদু গড়গড়ায় গোটাকতক টান দিয়ে বল্‌লেন—"যত দোষ সব সেকেলেদের। 'আজকেলেদের' আর কোন দোষ-ঘাট নেই। যাক্, শোন্ আসল ব্যাপারটা"—

দাদু ব'লে যেতে লাগলেন :

"সে দিনের কথা আমি যেন একেবারে চোখের ওপর দেখছি। শীতকাল, ভোর বেলায় আচ্ছা ক'রে সর্ব্বাঙ্গে গায়ের কাপড় জড়িয়ে দেড় সেরা আন্দাজ এক ঘটি নিয়ে গফুর মিঞার কাছে খেজুর-রস আনতে চ'লেছি। দেখি, অত ভোরেও ভরত জ্যেঠা স্নান সেরে স্তোত্র পাঠ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঠাকুর পূজোর ফুল তুলছেন। আমাকে দেখে বল্‌লেন—'কে রে নরহরি নাকি? কোথায়?'

"বল্‌লাম—'রস আন্‌তে যাচ্ছি'।

"এক মুখ হেসে বল্‌লেন—'বেশ বেশ, যে সময়ের যে-জিনিষ পাবি দেদার খাবি, কোন অসুখ ক'র্‌বে না'।

"ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরছি, ভরত জ্যেঠার বাড়ীর কাছ বরাবর আসতেই তাঁর বাজখাঁই গলা কানে গেল। চীৎকার ক'রে কা'কে বল্‌ছেন—'দেশ বিদেশের বিস্তর ডাক্তার-কবিরাজ আনিয়েছ তো বাপু। সেক্ষেত্রেও তোমার বাবুর ব্যায়রামের যখন কিছু হ'ল না, তখন আমি তো আর গিয়ে···কি ব'লে···'শিবের বাবা' তো নই যে গেলেই তিনি আরাম হবেন!'

"এ যে "আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি"র সরল ব্যাখ্যা করছেন! কিন্তু কা'কে? সটান বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

"দেখি রাবণগড়ের জমীদার রামনারায়ণ বাবুর সদর-নায়েব ষষ্ঠী ঘোষ দাঁড়িয়ে। জমীদারের খুব অসুখ, এখন যান তখন যান এ রকম অবস্থা আগেই শুনেছিলাম। বুঝলাম জ্যেঠার ডাক পড়েছে।

"ভরত জ্যেঠার রকম-সকম দেখে ঘোষ মশায় বেশ যেন একটু ঘাবড়ে গেছেন ব'লে বোধ হ'ল। কেঁউ-মেঁউ ক'রে বল্‌লেন—'আজ্ঞে গুপ্তিপাড়া থেকে লম্বোদর কোবরেজ মশায় এসেও রোগের কিছুই সুরাহা করতে পারলেন না; তিনিই আপনাকে যেতে বিশেষ ক'রে অনুরোধ জানিয়েছেন।'

লম্বোদর কবিরাজ ভরত জ্যেঠার সহপাঠী ছিলেন। লম্বোদরের নাম শুনে ভরত জ্যেঠা যেতে রাজী হ'লেন। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'আমার ওষুধের পোঁটলাটা ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবি?'

"আমি বল্‌লাম—'হ্যাঁ'।

" 'তবে যা, বাড়ী থেকে চট্ ক'রে ভাত খেয়ে আয়।'

"তিন লাফে রাস্তায় প'ড়ে বাড়ীর দিকে ছুট্‌লাম।

"আমাদের এখান থেকে রাবণগড় ক্রোশ দুই আন্দাজ হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রাবণগড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেউড়ীতে ষষ্ঠী ঘোষ আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের নিয়ে অন্দরমহলে রোগীর ঘর অবধি পৌঁছে দিল।

"ভরত জ্যেঠা ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রোগীকে বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে দেখলেন। তার পর ধীরে ধীরে রোগীর খাটের ওপর গিয়ে বসে হাতের নাড়ী চেপে ধরলেন।

"বাস্‌রে, সে কি নাড়ী দেখা! হাতের, পায়ের, কপালের পর্য্যন্ত। শেষে বুকের ওপর নিজের কান রেখে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগলেন। আর আমি লক্ষ্মণের ফল সেই ওষুধের পোঁটলা ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে।

"ঘণ্টাখানেক ধরে রোগীকে পরীক্ষা ক'রে আমাকে বল্‌লেন—'এই নরহরি, তুই দাঁড়া, আমি অনুপান সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসছি'। ভরত জ্যেঠার চোখের

দিকে তাকিয়ে দেখি জবাফুলের মত লাল টক্ টক্ করছে। আমি ঘাড় নেড়ে শুধু বল্‌লাম—'আচ্ছা'।

"মিনিট দশেক পরে ভিজে গামছা জড়িয়ে কি কতকগুলো শেকড় সমেত লতা নিয়ে জ্যেঠা রোগীর পাশে গিয়ে বসলেন। তার পরে ধীরে ধীরে রোগীর গায়ের বালাপোষ কোমর পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গামছা খুলে সেই লতা দিয়ে সপাসপ্ করে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন।

ব্যস্! 'বাবা রে মা'রে' বলে রোগী খাট ছেড়ে সুস্থ লোকের মত এক লাফে ঘর ছেড়ে দৌড়! তাকিয়ে দেখি জ্যেঠার হাতে এক ঝাড় জল-বিছুটী।"

নেন্তু হাঁ ক'রে শুনছিল, সে বল্‌লে—"এ আপনার গাঁজাখুরি গল্প। অত বড় রোগ জল-বিছুটীর মার খেয়ে সেরে গেল? বাজে কথা।"

দাদু বল্‌লেন—"আসলে জমীদারের রোগই হয় নি তা' আবার সারবে কি"!

"রোগ হয় নি! তবে এমন রোগের ভাণ ক'রে লাভ?"

"সেকেলে জমীদারের খেয়াল। খেয়াল হ'য়েছিল একজন ভাল চিকিৎসক তাঁর নিজের জমীদারিতে এনে বসানো। তাই অমনি ক'রে ডাক্তার-কোবরেজদের পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন। সবাই রাশি রাশি ওষুধ খাইয়েছে। কিন্তু আসল রোগ কেউ ধরতে পারে নি। ফাঁকি চল্‌ল না কেবল ভরত জ্যেঠার কাছে; ধরে ফেল্লেন।"

"তার পর কি হ'ল?"

"তার পর আর কি! জমীদার নিজে এসেছিলেন টাকাকড়ি দিতে কিন্তু ভরত জ্যেঠা পায়ের খড়ম খুলে রামনারায়ণ বাবুকে এমন তাড়া ক'রেছিলেন যে, তিনি আর এ মুখো হন্ নি। জ্যেঠা মরে গেলে তাঁর নাম ক'রে নদীর একটা ঘাট জমীদার মশাই বাঁধিয়ে দেন। যা, আর একবার কল্কেটা সেজে নিয়ে আয়"।

নেন্তু বল্‌লে—"আর আমি সাজতে পারছি না"; ব'লে খাবার খেতে বেরিয়ে গেল।

"বটে? পার হ'য়ে পাটনি ইয়ে? আচ্ছা, আবার কোন দিন গল্প শুনতে এস, বল্‌ব ভাল ক'রে"।

ব্যঞ্জন

[ক প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণক্রমে]

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

কি-কি খেতে কে-কে রাজি?
কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা, কাবাব, কাট্‌লেট্, ক্রোকে, কাঁজি।

গ-এ গোটা সিদ্ধ, গ্রিল্ ও ঘণ্ট—
চচ্চড়ি, চপ্-এ—তুষিও কণ্ঠ;
ছেঁচ্‌ড়া, ছেঁচ্‌কি ও ছোঁকা—
ছাড়িস্ নে কেউ বোকা!

ঝ-এ ঝাল, ঝোল্, ঝুরিভাজা আর
ট-এ টক্ রাঁধে নানান্ প্রকার;
ডাল্ ও ডাল্‌না মেলা,
ঢ-এ খালি ঢোক্-গেলা।

দোর্মা, দই-মাছ আর দই-বড়া,
ধ-এ হয় ধোঁকা যতনেতে গড়া;
পেঁয়াজি, Patty ও Pie *
পোচ্‌টিও প-এ পাই।

ব-এতে বেগুনি, বড়া—আছে জানা,
ভ-এ ভাতেসিদ্ধ আর ভাজা নানা;

* পেটি বা পাই লিখিলে অর্থ বোঝা যায় না বলিয়া ইংরেজি বানানে দিলাম।

ডালে ও মাছের মুড়ায়,
মুড়ি-ঘণ্টে জিভ জুড়ায়।

রোষ্ট্ ও রায়তা রাঁধা হয় র-এ,
লালসার কিছু পেলাম না ল-এ;
স-এতে স্থকৃত, স্থপ,
সাঙ্গ হয়েছে—চুপ্!

ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জন আর নাই ত,
ষ্টিউ যে রাঁধি নি, তাই ত!
স্বরেতে কেবল সম্বল—
অম্‌লেট্ আর অম্বল।

অতিবুদ্ধি

(শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাশগুপ্ত)

রবিবার। রামধনুর সম্পাদক মশাই অফিসে বসে বসে অসমাপ্ত ভাদ্র মাসের রামধনুর জন্য চিন্তা কর্‌ছেন। মধ্যে মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি। টেবিলের সাম্‌নের ঘড়িতে নয়টা বাজ্‌ল। পিয়ন এসে চিঠিপত্র সব রেখে গেল। তিনি এক-একখানি ক'রে খাম খুল্‌ছেন, তার পর একটু চোখ বুলিয়েই বাঁ দিকের ঝুড়িটিতে তা ফেলে দিচ্ছেন। মুখ থেকে তাঁর মুহুর্ম্মুহু বার হচ্ছে 'যত সব বাজে, রাবিশ্'।

হঠাৎ সম্পাদক মশায়ের মুখে আশার আলো ফুটে উঠ্‌ল। একখানা বড় খামের ভেতরে ক'রে একটা গল্প এসেছে—তার নাম 'সিংহের কবলে', লেখক

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। লেখাটা তাঁর খুব পছন্দ হ'ল, অসমাপ্ত ভাদ্র সংখ্যার জন্য তিনি সেটাই মনোনীত কর্‌লেন।

যথা সময়ে ভাদ্র সংখ্যা কাগজ ছেপে বার হ'ল; সতীশ বাবুর 'সিংহের কবলে' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের খুব ভাল লেগেছে। তাদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র রোজই এত বেশী করে আসছে যে 'চিঠিপত্র' বিভাগে সে সবগুলো কি করে ছাপ্‌বেন ভেবেই তিনি অস্থির।

সেদিন চিঠির সংখ্যা অন্যান্য দিনের চাইতে কিছু বেশী—হঠাৎ যে খামখানা প্রথম হাতে উঠ্‌ল সেইটে ছিঁড়েই সম্পাদক পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটে উঠ্‌ল। চিঠিখানা এই রকম—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে আপনার পত্রিকায় অপরের চুরি করা লেখা এখনও বাহির হয়। শ্রীযুক্ত সতীশ রায়ের লেখা "সিংহের কবলে" আপনার পত্রিকায় বাহির হইয়াছে কিন্তু উহা আগেই ১৩২০ সালের মাঘ মাসের 'ভাইবোন' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। যদি সন্দেহ হয় ত' আপনি দেখিতে পারেন। সতীশ বাবুর এরূপ কাজ আমি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি। এরূপ চুরি করিয়া নাম কিনিবার কি প্রয়োজন কিছুই বুঝি না।

ইতি—

শ্রীঅমলা চৌধুরী।

তৎক্ষণাৎ অমলা দেবীর পত্র সহ সতীশ বাবুর কৈফিয়ৎ তলব করা হ'ল। তদুত্তরে সম্পাদক মশায়ের কাছে উত্তর এল—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

অমলা দেবীর পত্র পাইয়া সুখীই হইলাম। কারণ আমি পূর্ব্বে "ভাইবোন" পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। ভাইবোনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাল এবং মাসের নাম দেওয়া থাকে না। সেইজন্য পুরাতন পত্রিকাগুলি একত্রে বাঁধিতে দিবার সময় অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা পাইলাম না। হঠাৎ মাথায় চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি

TIGHT BINDING

খুলিয়া গেল—অমলা দেবীর গল্পটা কপি করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আজ জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম যে সেটা ১৩২০ সালের মাঘ মাসের ‘ভাইবোন’।

—ইতি শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।*

একালকার চিকিৎসা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাদের ভূপেন বাবু সেকালের বড় ভক্ত। সেকালের সব কিছুই ভাল, একালের সব কিছুই খারাপ—এই মহাবাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার গুরুভার তিনি স্বেচ্ছায় মাথায় লইয়াছেন। সেদিন আমাদেরই বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি আমাদের কানাইকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন।

কানাই নিজে একালকার ছেলে, কাজেই ভূপেন বাবুর কথা সে চট্ করিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইল না। সে তর্ক করিল, তার পর একালকার সুখ-সুবিধার প্রচলিত উদাহরণগুলি পর পর ঝাড়িয়া যাইতে লাগিল,—যথা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ওয়ারলেস্, এরোপ্লেন, ইলেক্‌ট্রিসিটি, মোটর, কল-কারখানা ইত্যাদি। শুনিয়া ভূপেন বাবু, দমিয়া যাওয়া দূরের কথা, একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন,; ধমক দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁঃ, কল-কারখানা, মোটরের গুণের কথা আর ব’ল না—শান্তি ব’লে কিছু পৃথিবীতে থাকতে দিল না। আজ অমুক কলে ওর ঠ্যাং কাটা যাচ্ছে, কাল ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে ওর মুণ্ডু তাল পাকিয়ে যাচ্ছে! আর মোটরে তো কলিশন্ লেগেই আছে—যাও না, মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে একবার দেখে এস।” একটু যুৎ করিয়া বসিয়া ভূপেন বাবু আবার বলিয়া চলিলেন, “হ্যাঁ, তার পর ব্যারাম-পীড়ার কথাই ধর না? দশ বছরের ছেলেটারও আজকাল চশমা না আঁটলে চলে না! আর নিত্যি কত রকম ব্যারাম যে বেরুচ্ছে তার আর হিসেব নেই—আমরা তো বোধ হয় কোন দিন এ সবের নামও শুনি নি—বেরিবেরি,

* সতীশ বাবু খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে রামধনুর আর কোনও গ্রাহক যেন তাঁর অনুকরণ না করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ। —রাঃ সঃ

ব্লাড্ প্রেসার, এপিডেমিক্ ড্রপ্‌সি,—বাপ্‌স্! উচ্চারণ করতেও কষ্ট হয়।” কানাই থতমত খাইয়া গেল, সহসা জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু জবাব দিবার অনেক কিছু ছিল। বাস্তবিক একালে কি শুধু নতুন ব্যারামেরই আমদানী হইতেছে, ব্যারাম দূর করিবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই? তা’ ছাড়া এ সব ব্যারাম যে পৃথিবীতে ছিল না তাই বা কে বলিবে? ডাক্তারেরা সে ব্যারাম ধরিতে পারেন নাই—সে ব্যারাম চিনিতে পারেন নাই, তাই সে ব্যারামের কথা কেউ জানিত না। এখন ডাক্তারেরা তাকে চিনিয়াছেন, তার নামকরণ করিয়াছেন, আর ভূপেন বাবু জাতীয় লোকেরা মার-মুখো হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

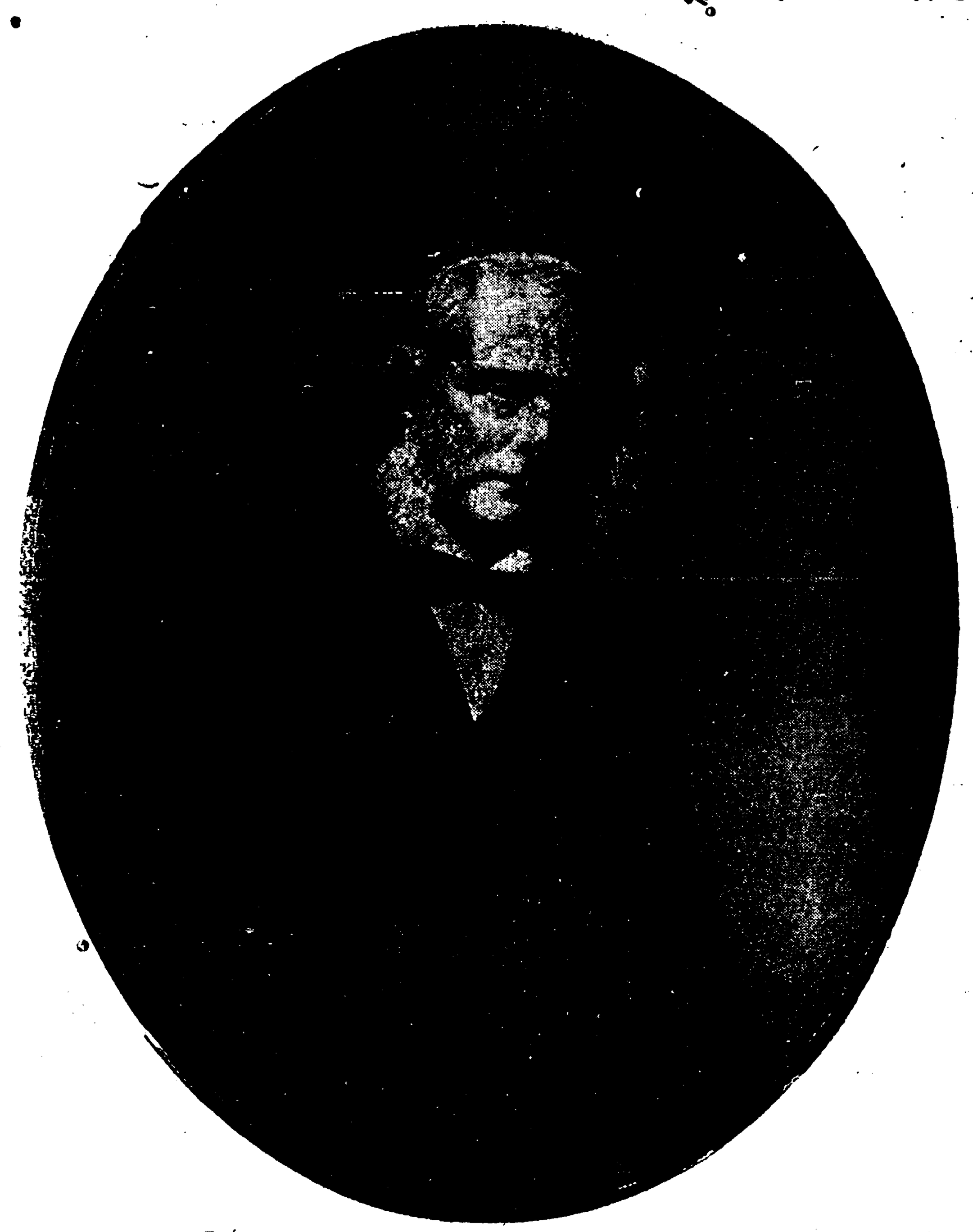

যোসেফ্ লিষ্টার। অস্ত্রোপচারের সময়ে যন্ত্রপাতি শোধন করিয়া লইবার পথ দেখাইয়া ইনি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছেন।

কিন্তু বাস্তবিক এই সব রোগ আবিষ্কার করিতে আধুনিক ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকেরা কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছেন! এক-একটা রোগের কারণ বাহির করিবার জন্য, রোগের জীবাণু চিনিবার জন্য, কত বৈজ্ঞানিক গোটা জীবনটাই কাটাইয়া দিয়াছেন—কত বৈজ্ঞানিক জীবন বিপন্ন করিয়াছেন—কেউ কেউ প্রাণও হারাইয়াছেন। তার পর রোগের প্রতিকারের জন্য? অস্ত্র-

চিকিৎসার কি উন্নতিটাই না হইয়াছে! শরীরের ভিতরকার শিরা সরাইয়া; শিরা যোড়া দিয়া, এক জায়গার শিরা আর এক জায়গায় চালাইয়া, নতুন চামড়া বসাইয়া, নতুন হাড় বসাইয়া, শরীরের ভিতরকার নানা অকেজো যন্ত্র তুলিয়া তার জায়গায় নকল যন্ত্র বসাইয়া, নকল পাকস্থলী করিয়া, রবারের নাড়ী তৈরী করিয়া—কত অঘটনই না ঘটান হইতেছে! এ সবই একালের ব্যাপার। যোসেফ্ লিষ্টার, ডাক্তার ক্যারেল প্রভৃতি একালেরই লোক।

তার পর রোগের পরিচর্য্যা। তার উন্নতিটাই কি কম হইয়াছে? আজকালকার বিলাতের বড় বড় হাসপাতালগুলি দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। রোগীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত রকমারি কাণ্ড যে সেখানে করা হইতেছে তার আর কি বলিব! চিকিৎসার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, রোগীর চিত্তবিনোদনের জন্য সেখানে যে সব ব্যবস্থা আছে তা' তোমরা কল্পনাও করিতে পারিবে না। মনের প্রফুল্লতা রোগ সারাইবার একটা বড় উপায়। এই প্রফুল্লতা আনিবার জন্য যত রকম আধুনিক ব্যাপার—আধুনিক কলকব্জা; যন্ত্রপাতি রাখা সম্ভব সব সেখানে রাখা হইতেছে।

ডাক্তার আলেক্সিস্ ক্যারেল্। অস্ত্র-চিকিৎসায় এঁর যুড়িদার পৃথিবীতে খুব কমই আছেন।

বিশেষ বিশেষ রোগে রোগীর পরিচর্য্যার জন্য কত নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে! সেগুলির জন্য পৃথক্ করিয়া নতুন ধরণের হাসপাতাল তৈরী হইতেছে। সেও একটা দেখিবার জিনিষ। আমাদের দেশে হাসপাতালের ব্যবস্থা এখনও তেমন উঁচুদরের হয় নাই—যা আছে তারও সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবুও কোন কোন রোগের জন্য বিশেষ বিশেষ হাসপাতাল আমাদের দেশেও হইয়াছে—

যেমন ধর, রাঁচীতে উন্মাদ রোগের হাসপাতাল, কসৌলিতে, কলিকাতায়, শিলংএ জলাতঙ্ক প্রভৃতি রোগের হাসপাতাল, যাদবপুরে যক্ষ্মা রোগের হাসপাতাল, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রম। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে 'বোধনা' নাম দিয়া জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্যও এই রকম একটি আশ্রম খোলা হইয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপ, আমেরিকার এই সব বিশেষ ব্যারামের হাসপাতালের সঙ্গে এগুলির তুলনা হয় না।

এ সব ব্যাপারে আমেরিকার লোকেরাই বোধ হয় সব চেয়ে অগ্রগণ্য। আমেরিকার দু'-একটা এই ধরণের হাসপাতালের বিবরণ দিতেছি। সাধারণ রোগের হাসপাতালের কথা সুবিধা হইলে আর এক দিন বলা যাইবে।

মস্ত সহর নিউইয়র্ক্। তারই এক অংশে ফর্টিসেকেণ্ড্ ষ্ট্রীটের উপর এমনি ধরণের এক বিরাট্ হাসপাতাল। সাধারণ ব্যারাম-পীড়া—জ্বরজারি, টাইফয়েড্, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির রোগীর জন্য এ হাসপাতালে কোন ব্যবস্থা নাই, এখানে যে সব রোগী আসে তাদের অধিকাংশই নেহাৎ ছেলেমানুষ। তাদের কারও বা জন্মাবধি পায়ের হাড় অস্বাভাবিক রকম বাঁকা, কারও বা একেবারে ভাঙ্গা, কারও বা মেরুদণ্ড এমন বাঁকা যে কখনও সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে না—কারও কোমরে দোষ, কারও কাঁধে বা হাতে। যত রকম শারীরিক খুঁত মানুষের হইতে পারে সব রকমের রোগী এখানে চিকিৎসা করিতে আসে এবং প্রায় সকলেই স্বাভাবিক চেহারা লইয়া ফিরিয়া যায়। এই সব রোগ অধিকাংশই জন্মাবধি হয়—কারও কারও পরেও হয়।

এই হাসপাতালের ব্যবস্থা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়—রোগীর সুখ-সুবিধার জন্য কত রকম ব্যবস্থা যে সেখানে করা হইয়াছে তার আর হিসাব নাই। অনেক সময়ে চিকিৎসা শেষ হইতে বেশ কিছু দিন সময় লাগে। শিশু রোগীদের জীবনের ঐ মূল্যবান্ সময়টুকু যাহাতে না নষ্ট হয় তার জন্যই বা কত না ব্যবস্থা! চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দস্তুরমত ক্লাস্ করিয়া তাদের লেখাপড়াও শেখান হয়; আর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও যে প্রচুর থাকে তা' বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

এই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিবার জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং বিরাট্ বিরাট্ কলকব্জার ব্যবস্থা আছে তা তোমরা ধারণা করিতে পারিবে না। কত রকমে মাথা খাটাইয়া, দীর্ঘ দিন গবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা সে সব আবিষ্কার করিয়াছেন। হাড় কাটিয়া, যোড়াতাড়া লাগাইয়া, হাড়ের গায়ে জ্যান্ত 'টিস্যু' যুড়িয়া, কত অদ্ভুত উপায়ে এই সব অস্ত্রোপচার করা হয়। সঙ্গের ছবি দু'খানা দেখিলেই ব্যাপারটা একটু আন্দাজ করিতে পারিবে। ১নং ছবিতে দেখ একটি ছোট ছেলের পায়ের হাড় কী ভীষণ রকম বাঁকা!—জন্ম হইতেই এর, এই রকম ছিল, এ জীবনে যে বেচারা কোন দিন সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারিবে তা' কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এই হাসপাতালের ডাক্তারেরা ছেলেটির পায়ে গোটা কয়েক অস্ত্রোপচার করিয়া কি কাণ্ড করিয়াছেন তা ২নং ছবিতে দেখ। ছেলেটি এখন তোমার-আমার মতই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ—কোনও খুঁত নাই।

১নং ছবি—অস্ত্রোপচারের আগে

২নং ছবি—অস্ত্রোপচারের পরে

শুধু অস্ত্রোপচার করিয়াই যে এখানে চিকিৎসা করা হয় তা' নয়, ওষুধ-বিষুধ, ইন্‌জেক্‌শন্ সবই প্রয়োজন মত প্রয়োগ করা হয়। আবার নতুন ধরণের চিকিৎসাও চলে। শরীরের যে অংশ অপুষ্ট, 'প্ল্যাষ্টার অব্ প্যারিস্' দিয়া তার ছাঁচ লইয়া তার পর তার সাহায্যে ধাতুর প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করিয়া সেই অপুষ্ট অংশের অভাব মোচন করা হয়।

শরীরের যে সব মাংসপেশী অব্যবহারের ফলে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে রোগীদের নানা ভাবে ব্যায়াম করাইয়া সেগুলি আবার কাজের করা হয়। তোমরা

হয়তো ভাবিতেছ, যে চলিতে পারে না, নড়িতে পারে না, সে আবার কেমন করিয়া ব্যায়াম করিবে? কিন্তু এখানকার ডাক্তারেরা এর জন্য যে অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছেন তা' যেমন অভাবিতপূর্ব্ব তেমনি বিস্ময়জনক। তোমরা যখন নদীতে কিংবা পুকুরে স্নান কর তখন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ, শরীর যতক্ষণ জলের নীচে থাকে ততক্ষণ তার ওজন জলের উপরে তার যে ওজন তার চাইতে অনেক কম মনে হয়—ঠিক যতটা জলের জায়গা শরীর দখল করে ততটা জলের যা ওজন ততখানি কম। বিজ্ঞানের এটা একটা গোড়াকার নিয়ম। জলের তলা হইতে কোন জিনিষ টানিয়া তুলিবার সময়েও এটা লক্ষ্য করা যায়। জলের ভিতর জিনিষটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার কোন ওজন আছে বলিয়াই মনে হয় না, কিন্তু যেই খানিকটা জলের উপর উঠিল অমনি রীতিমত ভারী বলিয়া বোধ হইতে থাকে। বিজ্ঞানের এই মোটা নিয়মটাই ডাক্তারেরা এখানে কাজে খাটাইয়াছেন। হাসপাতালের ভিতর তাঁরা একটা চৌবাচ্চা তৈরী করিয়াছেন। প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা—ছোটখাট একটা পুকুর বলিলেই চলে। এই চৌবাচ্চার জল প্রথমে ফিল্‌টার করিয়া আল্‌ট্রাভায়োলেট্ আলো দিয়া বিশোধন করা হয়। জল ইচ্ছামত গরম-ঠাণ্ডা করারও ব্যবস্থা থাকে। তার পর রোগীকে এই পুকুরের (বা চৌবাচ্চার) মধ্যে নামাইয়া নানা ভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে শেখান হয়। (ডুবিবার মত জল পুকুরে থাকে না।) ডাঙ্গার উপরে যে রোগী হাত-পা নাড়িতে পারে না জলের ভিতরে গিয়া সে সহজেই হাত-পা নাড়িতে এবং ক্রমে ক্রমে রীতিমত কঠিন কঠিন ব্যায়াম করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ভাবে তার মাংসপেশীগুলিও ব্যবহারের ফলে ক্রমে ক্রমে সরল হয় এবং শেষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কার্য্যক্ষম হইয়া

বিকলাঙ্গ শিশুকে জলের ভিতরে ব্যায়াম করিতে শেখান হইতেছে।

দাঁড়ায়। তখন রোগী ডাঙ্গায় উঠিয়াও সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারে। এই ভাবে কত রোগীর—কত শিশুর ব্যর্থ জীবন যে এই হাসপাতালের কর্ত্তারা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া দিতেছেন তার হিসাব দেওয়া যায় না।

আর একটি হাসপাতালের কথা শোন। এটি অবশ্য নিউইয়র্কে নয়, এটি আছে ক্লীভ্ল্যাণ্ড্ সহরে। বহুমূত্র, এনিমিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ রোগের জন্য এই হাসপাতালটি তৈরী করা হইয়াছে।

হাসপাতালটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এর চেহারা। নীচের ছবিতে যে বিরাট্ বল্টি দেখিতেছ, এটিই এই হাসপাতাল। হাসপাতালটি আগাগোড়া ইস্পাতে তৈরী, উপরটা এলুমিনিয়াম-পেন্ট্ দিয়া রং করা; হঠাৎ দেখিলে রূপার তৈরী বলিয়া ভুল হয়। বাড়ীটির ব্যাস ৬৪ ফুট—উচুতেও পাঁচতলা। ভাবিয়া দেখ, কী বিরাট্ কাণ্ড-কারখানা! এই হাসপাতালটি তৈরী করিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

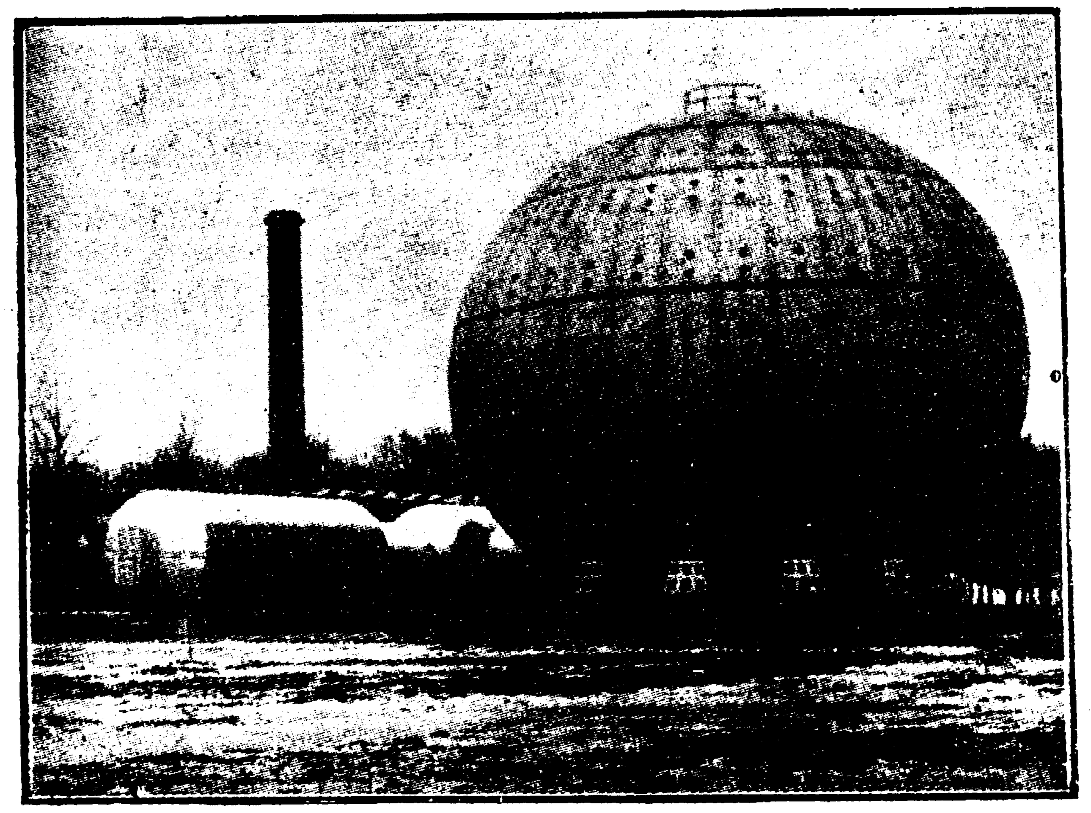

বলের মত অদ্ভুত চেহারার হাসপাতাল

হাসপাতালের এই অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া তোমরা হয়তো হাসিতেছ কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য নাকি এই রকম বলের মত বাড়ীর তুলনা হয় না। হাসপাতালের

ভিতরের ব্যবস্থাও অতিরিক্ত রকম আধুনিক। রোগীদের আরামের জন্য প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে আছে।

এই হাসপাতালে যে চিকিৎসা হয় তার মধ্যে একটা মস্ত বিশেষত্ব আছে। হাসপাতালে ঢুকিতে হয় একটা লম্বা পাশ-বালিশের মত আকৃতির ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়া। এই ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়া আবার কৃত্রিম উপায়ে দারুণ চাপের বাতাস ছাড়িবারও ব্যবস্থা করা আছে। রোগীদের চিকিৎসা হয় এই কৃত্রিম চাপ-দেওয়া বাতাসের সাহায্যে—অবশ্য সেই সঙ্গে অন্য ওষুধপত্রও ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা হয়তো এক মাস-দু'মাস ধরিয়া চলে, তার মধ্যে দিন পাঁচেক রোগীকে সর্ব্বক্ষণ এই কৃত্রিম চাপযুক্ত বাতাসের মধ্যে রাখা হয়। প্রথম প্রথম অবশ্য রোগীর এই অদ্ভুত চিকিৎসায় আনন্দের চাইতে আতঙ্কটাই হয় বেশী কিন্তু কিছু পরেই সে ভাব কাটিয়া যায় আর উপকার হয় অদ্ভুত রকম।

এই অদ্ভুত হাসপাতালে কৃত্রিম চাপের বাতাসের মধ্যে ওষুধপত্র, খাবার-দাবার ঠিকমত রাখাও এক কঠিন ব্যাপার। সে সব করা হয় বৈদ্যুতিক উপায়ে।

ছেলেরা হাসপাতালের সম্মুখে সূর্য্যালোক সেবন করিতে করিতে পড়াশুনা করিতেছে।

সূর্য্যের আলো আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সূর্য্যের আলোর মধ্যে থাকে আল্ট্রাভায়োলেট্ রশ্মি—সেগুলি শরীরের হাড়ের পুষ্টির জন্য অত্যন্ত দরকারী, শরীর বৃদ্ধির জন্যও। তা' ছাড়া আরও নানা রকম ব্যারামে সূর্য্যের আলো আশ্চর্য্য রকম উপকার দেয়। সূর্য্যের আলো দিয়া চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর নানা

অঞ্চলে তাই আজকাল পৃথক্ পৃথক্ হাসপাতাল হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের অনেক জায়গায় এই রকম হাসপাতাল আছে। রোগীরা সেখানে খালি গায়ে, যতটা সম্ভব স্বল্প পরিচ্ছদে খোলা জায়গায় বিশুদ্ধ সূর্য্যালোক সেবন করে। হাসপাতালগুলিও এ ভাবে তৈরী যাহাতে সূর্য্যের আলো খুব বেশী করিয়া সেখানে ঢুকিতে পারে। এই ধরণের সূর্য্যালোক সেবনের হাসপাতাল নিউইয়র্কের কাছেও আছে। ছবিতে দেখ, এক দল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এই রকম এক হাসপাতালের সম্মুখে খালি গায়ে সূর্য্যালোক সেবন করিতে করিতে কেমন পড়াশুনা করিতেছে!

ভূপেন বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে বলিও, এ সবই কিন্তু একালের ব্যাপার।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

৯

ভগ্ননীড়

পরদিনকার ঘটনা। বেলা সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেছে, নক্ষত্রবেগে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া জগন্নাথ ঘাটের সম্মুখে খশ্-শ্-শ্ শব্দে একেবারে নিশ্চল হইয়া থামিয়া পড়িল। গাড়ীখানা আসিতেছিল এমনই দুরন্তবেগে, এবং ড্রাইভার ব্রেক্-চাপিয়া ধরিয়াছিল এমনই অতর্কিতে যে ভিতরে যে একটি মাত্র আরোহী ছিল কোন গতিকে ড্রাইভারের ঘাড়ের উপর হুড়্মুড় খাইয়া পড়িতে পড়িতে অতি কষ্টে আপনাকে সে সামলাইয়া লইল। কিন্তু সেদিকে তখন তার দৃক্‌পাতও নাই,—সমস্ত শরীরে তার কী এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা, চোখে শিকারী শ্যেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রয়োজন পড়িলে, এবং সম্ভব হইলে সে যেন ডানা মেলিয়া আরো আরো দুর্ব্বার বেগে শূন্যের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেও প্রস্তুত। আরোহীটি আমাদের রণজিৎ।

গাড়ীখানা যেখানে আসিয়া হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গেল ঠিক তারই সম্মুখে ছিল আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। ছয় জন লোক—তারা সকলেই রণজিতের অপরিচিত—তখন সবেমাত্র সেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কুলীর মাথায় লাটবহর চাপাইয়া, টিকেট-ঘরের দিকে রওনা হইতেছে।

এ ক'বছর ধরিয়া হুকা-কাশির সাক্‌রেদি করার ফলেই কিনা জানি না, রণজিতের চোখ আজকাল অসম্ভব রকম খুলিয়া গিয়াছে। সামনের ও লোক কয়টি যে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেদের ভোল সম্পূর্ণরূপেই বদ্‌লাইয়া ফেলার চেষ্টা পাইয়াছে এ তথ্যটুকু বোধ করি উপস্থিত আর সকলের কাছেই লুকানো ছিল, ছিল না কেবল রণজিতের অভ্যস্ত চোখের কাছে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া সে ওই সন্দেহভাজন লোক কয়টিকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিল কিন্তু এক বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল ঠিক তার সম্মুখেই। ষ্টিমার ষ্টেশনের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তখন মেরামতের কাজ চলিতেছিল; যাত্রীদের টিকেট-ঘরের দিকে আগাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল অল্প-পরিসর একটা সাময়িক ফটকের ভিতর দিয়া। অল্প জায়গায় বেশী লোক জড় হইলে যে বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় সেইটুকুর সুযোগ নিয়া এক পকেটমারের বাছা যাত্রীদের পকেটের অনাবশ্যক ভার লাঘবের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পারে নাই, এক অতি চতুর লোক হাতিয়ার সমেত তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়াছে। তার পর সে এক কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড! দেখিতে দেখিতে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল আর শ্রাবণের ধারার মত অনবরত চড়-চাপড় বর্ষিতে সুরু হইল পকেটমার-নন্দনের মাথার উপর, পিঠের উপর। রাস্তা দিয়া অনেক পথচারী লোক নিজের নিজের কাজে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তাদের জ্ঞান-পিপাসা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, আসল ব্যাপারটির সম্বন্ধে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তারাও এক সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভীড় জমাইয়াছে। রণজিৎ অস্থির হইয়া উঠিল, এ সব ব্যাপারে তার এখন আদৌ উৎসাহ নাই—সে চায় কোন রকমে ভীড় কাটাইয়া লোক কয়টির পিছন লইতে। কিন্তু সাম্‌নের ব্যূহ ভেদ করা তখন স্বয়ং নেপোলিয়ানেরও অসাধ্য, সে তো কোন্ ছার! তার বুক ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সুরু করিল কেবল ঘামাইতে।

রণজিতের মনের বর্ত্তমান অবস্থা পাঠক-পাঠিকারা হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারিবেন না, যদি না গোড়ার দিকের কয়েকটা ঘটনা এই সময়ে তাঁদের বলিয়া দিই। শ্রীপুর রওনা হইয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হুকা-কাশি অমৃতের মারফৎ রণজিৎকে যে একটা জরুরী খবর পাঠাইয়াছিলেন, পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে; তার পর শ্রীপুর হইতে ফিরিয়াই বেহারাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথা সময়ে রণজিৎকে তার চিঠি দেওয়া হইয়াছিল কিনা। জবাবে অমৃত যা বলিয়াছিল তার মর্ম্মার্থ এই যে আজ সকালেই রণজিৎ তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিবে। রণজিৎ তার কথামত বাস্তবিকই ভোরবেলায় হুকা-কাশির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল; হুকা-কাশি তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া কহিলেন, "সুরযমল নগরচাঁদের লেন কোথায় আপনি জানেন রণজিৎ বাবু?"

"না তো!"

"আমারও ঠিক জানা নেই, তবে নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। বোধ হয় মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্-বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্—ওই সব অঞ্চলেরই কাছাকাছি। ডিরেক্টারীটা দেখ্‌লেই জান্‌তে পারব। আমাদের দরকার—নম্বরের বাড়ীটা।"

"কেন? সোনার হরিণ কি সেখানে নাকি?" রণজিৎ সোৎকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

"কতকটা সেইরকমের আঁচ পাচ্ছি বটে, তবে খাঁটি জবাব নির্ভর করছে একটা ভৌতিক-কাণ্ডের সত্যাসত্যের ওপর। যতক্ষণ সেটি না সঠিক জান্‌তে পারছি ততক্ষণ হাঁ না কিছুই জোর গলায় বলা চলে না রণজিৎ বাবু! ও ব্যাপারটার মীমাংসা করাই হচ্ছে এখন আমার প্রথম কর্ত্তব্য আর তারই জন্যে দিন কয়েক এখন আমায় খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। অথচ যে আভাসটুকু পাওয়া গেছে তার সুযোগ না নেওয়াও মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কথাগুলো বড়ই হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে, না? কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যখন একে একে খুলে বল্‌ব তখন দেখবেন, হেঁয়ালীর নামগন্ধও এতে নাই—জলের মত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি ও বাড়ীটার ত্রিসীমানায়ও আমি জীবনে কখনো ঘেঁসি নি, তবু যত দূর মনে হয় ছ'জনের বেশী লোক বোধ করি ওখানে নেই। সেই লোক ছ'টির গতিবিধির ওপর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এ টুকুর জন্যে আপনার ওপর আমি নির্ভর কর্‌তে পার্‌ব কি রণজিৎ বাবু? একটা কথা কিন্তু গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার—কাজটা বড়ই বিপজ্জনক। ওদের নজর পূর্ণভাবে এড়িয়ে প্রতিটি পদে আপনাকে চল্‌তে হবে, যাতে করে সন্দেহের বাষ্পটুকুও আপনার ওপর পড়তে না পারে। বাস্তবিকই সন্দেহ ওদের জেগে উঠলে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা মারাত্মক রকমের ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে। ও খুনেগুলো কিছুতেই পিছ্‌পা নয়—মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই ওদের বরাবরকার অভ্যাস, দরকার পড়লেই নির্ব্বিচারে আপনার বুকে ওরা ছুরি বসিয়ে দেবে, হাত তাতে এতটুকুও কাঁপবে না ওদের। এ সত্যিসত্যিই আগুন নিয়ে খেলা, মনে যথার্থ ভরসা না পেলে আমি কিছুতেই এ ব্যাপারে নাম্‌বার জন্য আপনাকে অনুরোধ কর্‌তে পারি না।"

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিল, কহিল, "বিপদের নাম শুনে অম্‌নি আমায় আঁৎকে উঠ্‌তে কি কখনো দেখেছেন নাকি মিষ্টার হুকা-কাশি? পদ্মরাগ-উদ্ধারের সময় সেই মোটর রেসের কথা আপনার মনে পড়ে? খুব বেশী ভীরুতার পরিচয় কি তখন পেয়েছিলেন?"

হুকা-কাশি লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "না না না, সে ভাবে তো কথাটা আমি বলি নি রণজিৎ বাবু, কেন আমায় মিছে লজ্জা দিচ্ছেন? এই বে-পরোয়া দস্যুগুলোর সঙ্গে লাগ্‌তে হলে খুব সাবধানী হয়ে চল্‌তে হয় এই কথাটা বলাই আমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল, নইলে সাহসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চল্‌তে পারে এমন

লোক তো আজ পর্য্যন্ত এতটা বয়সেও কই আমার চোখে পড়্‌ল না!...যাক্‌, এদিক্‌কার ভার অন্ততঃ আপনার ওপর দিয়ে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমার সঙ্গে আসুন, একটা জরুরী জিনিষ আপনাকে দেখাবার আছে" বলিয়া হুকা-কাশি রণজিতের হাত ধরিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই গুপ্ত কুঠরীটুকুর মধ্যে ঢুকিলেন। তার পর বাহির করিলেন কন্যাকার সেই ফটোটি।

মিনিট পাঁচেক পরে দু'জনাই হাসি-হাসি মুখে বাহির হইয়া আসিলেন, রণজিৎকেই যেন একটু বেশী মাত্রায় উৎফুল্ল দেখা গেল; ডিরেক্টরী হইতে সুরযমল নগরচাঁদ লেন্‌টি কোথায় জানিয়া লইয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে বিদায় লইল। ওই লেনের উদ্দেশ্যে এখনই তাকে রওয়ানা হইতে হইবে।

গলিটি কোন্ অঞ্চলে ডাইরেক্টরী হইতে সে বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, অল্পক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই সেটির সন্ধান মিলিল। তার পর এক এক করিয়া নম্বর গুণিতে গুণিতে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীখানার সম্মুখে আসিয়াই কিন্তু সে শুধু স্তব্ধ নয়,—হতভম্ব, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। যে দৃশ্য দেখিতে পাইল সেজন্য একেবারেই সে প্রস্তুত ছিল না, তা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। দুয়ারে একখানা সিডান বডির ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, তার ছাদের উপর ষ্ট্র্যাপে বাঁধা বিছানা ও গুটিকয়েক সুটকেস্—এক কথায় বিদেশযাত্রার যাবতীয় সরঞ্জাম। ইতিপূর্ব্বেই তিনজন আরোহী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া ছিল, রণজিতের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও তিনজন আসিয়া জুটিল, এবং পরক্ষণেই সকলকে কুক্ষিগত করিয়া সেই বিশাল যন্ত্রদানবটা রাস্তাঘাট কাঁপাইয়া সগর্জ্জনে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রণজিৎ কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দেখিল তারই চোখের সম্মুখ দিয়া পাখী নীড় ভাঙ্গিয়া পালাইতেছে।

একবার ভাবিল, 'চোর-চোর' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সে চীৎকার দিয়া ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই হুকা-কাশির কথা মনে পড়িয়া গেল; তিনি কহিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া হাঁ-না বলার সময় এখনও আসে নাই। অযথা চীৎকার দিয়া শেষে কি নিজেই সে বিপদে পড়িবে? আর তা ছাড়া আরও একটা বিষয় ভাবিবার আছে—ক্ষুরধারবুদ্ধি হুকা-কাশি জাল ছড়াইয়া এখন সযত্নে সেটিকে নিজের দিকে গুটাইতেছেন; এমন সময় আনাড়ির মত একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিলে হয়তো সে জাল ফাঁসিয়া যাইবে, গভীর জলের মাছগুলি আবার গভীর জলেই আশ্রয় লইবে, লোকচক্ষুর সম্মুখে তাদের বাহির করিবার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকিবে না।

মানুষের সৌভাগ্য বলিয়া যে একটা কথা আছে আর্খছার হয়তো সেটার সহিত পরিচয় ঘটে না, তবে একেবারেই যে ঘটে না এমন কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেননা তা হইলে ও শব্দটার সৃষ্টি হইবে কেন? ও বস্তুটির কল্পনাও যখন আমরা করিতে পারিতেছি না এমনই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তেই হয়তো তার সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল। রণজিতের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল ঠিক এই

রকমেরই একটা শুভমুহূর্ত্ত—সে দেখিতে পাইল খালি গাড়ী লইয়া এক শিখ ড্রাইভার তার পাশ কাটাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পলকের মধ্যে রণজিৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল—এ লোক কয়টি কোথায় গা-ঢাকা দিবার মৎলব করিতেছে সে তা বাহির করিবেই, তাতে যত বড়ই না কেন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ট্যাক্সিখানা থামাইয়া চালককে সে কহিল, "উই যে সিডান্ গাড়ীটা মোড় বেঁকছে

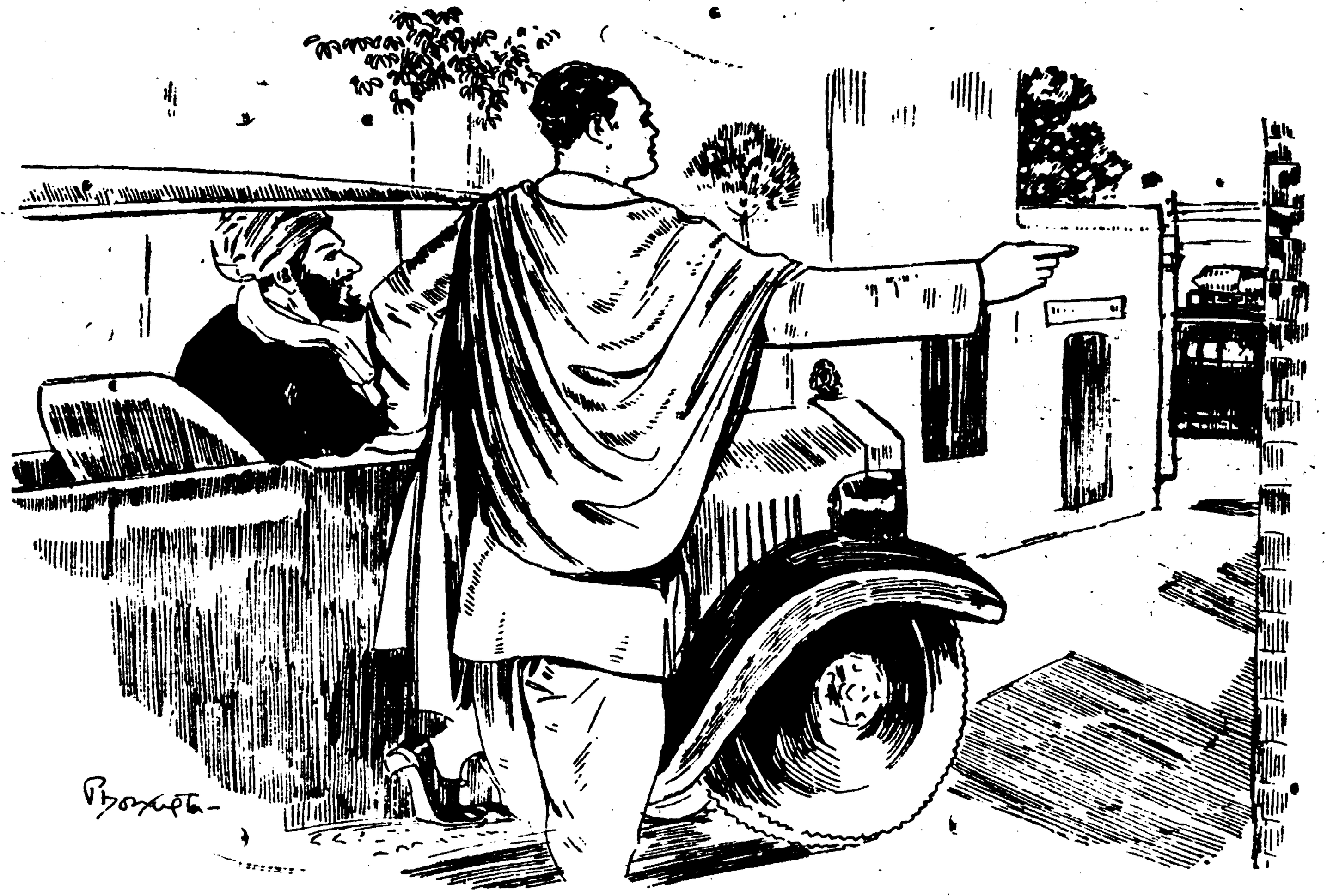

উই যে সিডান্ গাড়ীটা মোড় বেঁকছে···

দেখ্ছ, ওখানা যেখানে থাম্‌বে, আমাকেও সেখানে নামিয়ে দিতে হবে; যদি পার, ভাড়া তো মিলবেই উপরন্তু একটা মোটা রকমের বক্‌শিস্‌ও দেব। কি বল, পারবে?"

"উঠিয়ে তো বাবুসাব" বলিয়া শিখ ড্রাইভার বিদ্যুৎগতিতে ট্যাক্সি ছুটাইয়া দিল।

১০

হাণ্টারপর্ব্ব

অল্প একটু পরেই বীটের কনেষ্টবল আসিল, পকেট-মার প্রভুকে গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে চলিল; 'তামাসা' শেষ হইয়া গেছে, অধিকাংশ লোকই তাই যেমন হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, তেমনি আবার নিমেষে হাওয়াতেই মিলাইয়া গেল। বাদ রহিল কেবল কয়েকজন অপূর্ব্ব

অধ্যবসায়ী, তারা থানা পর্য্যন্ত হাটিয়া গিয়া নিঃশেষে সমস্তখানি রস আহরণ করিবে, তবে নিরস্ত হইবে।

সম্মুখের রাস্তা ফাঁকা হইয়া যাওয়ায় এতক্ষণে রণজিৎ আবার অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। তাড়াতাড়ি খানিকটা পথ আগাইয়া গিয়া সে দেখে তার সন্দেহের পাত্র সেই লোক কয়টি টিকেট-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তমনে টিকেট কিনিতেছে। আগে হইতেই সে ঠিক করিয়াছিল, যতটা সম্ভব ইহাদের সহিত সে ব্যবধান রাখিয়া চলিবে, কিছুতেই নিজের উপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়িতে দিবে না। বাছিয়া বাছিয়া সে তাই এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে অনায়াসেই সে ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে পারে অথচ তার সম্বন্ধে কাহারও অহেতুক কৌতূহল না জন্মে।

যে লোকটা অপর সকলের মুখপাত্র হইয়া টিকেট কিনিতেছিল সে টাকার জন্য জামার পকেটে হাত দিল—রণজিৎ সযত্নে লক্ষ্য করিল সে কত টাকা বাহির করিতেছে। ছয়খানি টিকেট সে খরিদ করিল, রং দেখিয়া রণজিৎ বুঝিতে পারিল কোন শ্রেণীর টিকেট সেগুলি। এ লাইনে মাঝে মাঝে যাতায়াত সে করিয়াছে, কোন্ শ্রেণীতে কি হারে ভাড়া দিতে হয় তা সে জানে। মনে মনে হিসাব করিয়া সে ঠাহর করিল, টিকেট ক'খানা হুগলী অথবা তারই আশ-পাশের কোন ষ্টেশনের হইবে। ষ্টিমার ছাড়িবারও বড় বেশী দেরী নাই, এবার তাকেও টিকেট কাটিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু উহাদের সহিত একই ষ্টেশনে ষ্টিমারে উঠিয়া আবার একই ষ্টেশনে নামাটা কি যুক্তিযুক্ত হইবে? বোধ হয় না। এ লোক কয়টির মন এখন স্বভাবতঃই কিছু সন্দিগ্ধ; ওরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখিলে তার উপর সন্দেহের রেখাপাত না হওয়া অসম্ভব। তার চেয়ে ট্রেনে কয়েকটা ষ্টেশন পার হইয়া মাঝামাঝি কোন জায়গায়—যেমন উত্তরপাড়ায়—ষ্টিমার ধরিলেই বোধ হয় ভাল হয়। উহারা এখনও তাহাকে লক্ষ্য করে নাই বেশ বোঝা যাইতেছে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রণজিৎ হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ মাঝ পথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সাশ্চর্য্যে সে দেখিল, সন্দেহভাজন লোক কয়টার গতিবিধি সে একাই কেবল লক্ষ্য করিতেছে না, আরও কে একজন পরম ঔৎসুক্যের সহিত ওই দিকেই তাকাইয়া আছে। ঔৎসুক্য তার প্রবল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চেয়েও প্রবল বোধ হয়, তার নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গোপন রাখিবার প্রচেষ্টা। একটি মুহূর্ত্তের তরেও সে সুস্থির নাই, অনবরত আশপাশে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিতেছে; সর্ব্বদাই ভয় পাছে কেউ তাকে দেখিয়া ফেলে। লোকটি আধাবয়সী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা কিছু গোলগাল হইয়া উঠিয়াছে, রণজিতের ক্রমাগতই মনে পড়িতে লাগিল ইতিপূর্ব্বে আরও কোথায় সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

সামনা দিয়া এক ভদ্রলোক একখানা ই. আই. আর-এর টাইমটেব্‌ল দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, রণজিৎ সহসা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল "ওটা কি ই. আই. আরের টাইমটেব্‌ল্‌ নাকি মশাই? উত্তোরপাড়ার গাড়ী ক'টায় ছাড়বে যদি একবার দয়া করে দেখে বলতেন!"

প্রৌঢ়বয়সী যে লোকটা আড়ালে দাঁড়াইয়া টিকেট ঘরের পানে তাকাইয়াছিল এতক্ষণ সে রণজিৎকে লক্ষ্য করে নাই—এইবার গলার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এদিকে তাকাইল। সঙ্গে সঙ্গেই সাপের গায়ে পা দিলে লোকে যে ভাবে শিহরিয়া উঠে ঠিক সেই ভাবে চমকাইয়া সে কয়েক পা পিছাইয়া গেল। ব্যাপারটা রণজিতের নজরে আসে নাই, নহিলে এ দৃশ্য দেখিবার পর সে আর টাইম্‌-টেব্‌লের পাতা উল্‌টাইত কিনা সন্দেহ। রণজিতের প্রতি দু' চোখের নজর আবদ্ধ রাখিয়া সে একটু একটু পা টিপিতে টিপিতে শেষটায় একেবারেই সরিয়া পড়িল; টাইম্‌-টেবলের পৃষ্ঠা হইতে রণজিৎ যখন চোখ উঠাইয়াছে ততক্ষণে সে আর সে তল্লাটের ধারে-পাশেও নাই।

অল্প একটু বাদেই পর পর দুইবার বাঁশী বাজাইয়া ষ্টিমারখানা দুলিয়া উঠিল—ছাড়িবার সময় হইয়াছে। রণজিৎ আড়াল হইতে দেখিতে পাইল, লোক ছয়টি দোতালার ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যেই কি সব আলোচনা করিতেছে।

ষ্টিমার ছাড়িবার পর হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে সে সবেমাত্র জেটি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় উঠিয়াছে এমন সময় দেখা গেল সেই রাস্তারই উপর মাত্র দুই-তিন শ' গজ দূরে এক তুমুল হৈ হৈ কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ঢুকিবার মুখে যে ভীড় জমিয়াছিল এখনকার ভীড়ের তুলনায় সে কিছুই নয়। রণজিতের মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল—সৃষ্টিছাড়া সহর এই কলিকাতা, লোকগুলির খাইয়া-দাইয়া বোধ হয় আর কাজ নাই, চব্বিশ ঘণ্টা হুজুগেই মাতিয়া আছে। একটু আগাইতেই সে শুনিতে পাইল ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলিতেছে, "বাহাদুর ছেলে কিন্তু বাবা বল্‌তেই হবে! কলকাতার রাস্তা, হর্‌দম্‌ লোকজন, গাড়ীঘোড়ায় ভর্ত্তি, তারই মধ্যে দিব্যিসে হাণ্টার চালিয়ে গেল—স্রাক্‌, স্রাক্‌, স্রাক! কেউ ধরবার ফুরসুৎ পেলে না. য়্যাঃ? ঝ্‌ড়াকসে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল! অপর একজন বলিল, "বেঁচে আছে তো লোকটা? কিছুই বিচিত্র নয় মশাই—চোখে, মুখে, কপালে যে ভাবে হাণ্টারের বাড়িগুলো মেরেছে!" ভীড়ের সম্মুখ হইতে আর একজন পিছন ফিরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে সুবোধ, ইদিকে আয়, ইদিকে আয় একবারটি! ইনি আমাদের অশনি বাবু, অশনি মিত্তির!" অশনি মিত্তির? রণজিৎ সচকিত হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, বটেই তো তাই! একটু আগে সে তো অশনিকান্তকেই টিকেটঘরের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছে—চিনি চিনি করিয়াও সে তখন তাহাকে

চিনিতে পারে নাই। কলিকাতায় রণজিৎ যেমন অনেক লোকের কাছে পরিচিত, অশনিকান্তও ঠিক অতটা না হইলেও, অনেকটা সেই রকমই বটে। দু'হাতে ভীড় ঠেলিয়া রণজিৎ সামনের দিকে আগাইতে লাগিল; কাছে গিয়া দেখে বাস্তবিকই অশনিকান্ত অচৈতন্য অবস্থায় ধূলার উপর লুটাইতেছে, হাণ্টারের লম্বা লম্বা লাল দাগগুলি তার মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকমের বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে। রণজিতের মনে হইল সে যেন এক রহস্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে; কি জন্যই বা অশনিকান্ত ষ্টিমার-ষ্টেশনে অমন ভাবে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর কে-ই বা দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় তার উপর এই অকথ্য অত্যাচার করিয়া পালাইল, তার বিন্দুবিসর্গও সে আঁচিতে পারিল না।

কিন্তু ভগবান্‌ সেদিন আরও অনেকখানি বিস্ময় তার জন্য জমা রাখিয়াছিলেন। ট্রেনের সময় বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া রণজিৎ বেশীক্ষণ অশনিকান্তের কাছে ব্যয় করিতে পারিল না, চট্‌পট্‌ তাকে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিতে হইল। যথা সময়ে উত্তরপাড়াতেও সে আসিয়া পৌঁছিল, এবং প্রায় যথা সময়েই ষ্টিমারখানাও ঘাটে আসিয়া দর্শন দিল। কোন রকম বাহ্য আড়ম্বর না দেখাইয়া নিতান্ত নিরীহ গোবেচারী যাত্রীর মত ধীরে ধীরে সে ষ্টিমারে উঠিল বটে, কিন্তু কোথায় সে লোকগুলি? তন্নতন্ন করিয়া সারা ষ্টিমার খোঁজা সত্ত্বেও ছ'জন ত দূরের কথা, একজনেরও কোন চিহ্ন মিলিল না। অথচ এ কথা ধ্রুব সত্য যে একটি বারের তরেও তাদের কেউ রণজিৎকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং তাকে এড়াইবার জন্যই যে আগের কোন ষ্টেশনে তারা নামিয়া গিয়াছে এ কথা রণজিৎ কি ভাবে বিশ্বাস করিবে? তবে কি কোন অদৃশ্য শক্তি যাদুমন্ত্রে তাদের উড়াইয়া লইল? কে এই রহস্যের সমাধান করিয়া দিবে?

(ক্রমশঃ)

রং-তামাসা

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

মা—"হ্যাঁরে পাজি ছেলে, তুই রাতদিন অত কাঁদিস্‌ কেন রে?"

খোকা—"আমি কাঁদলেই যে চুপ করাবার জন্যে আমাকে তুমি কিছু না কিছু খেতে দাও।"

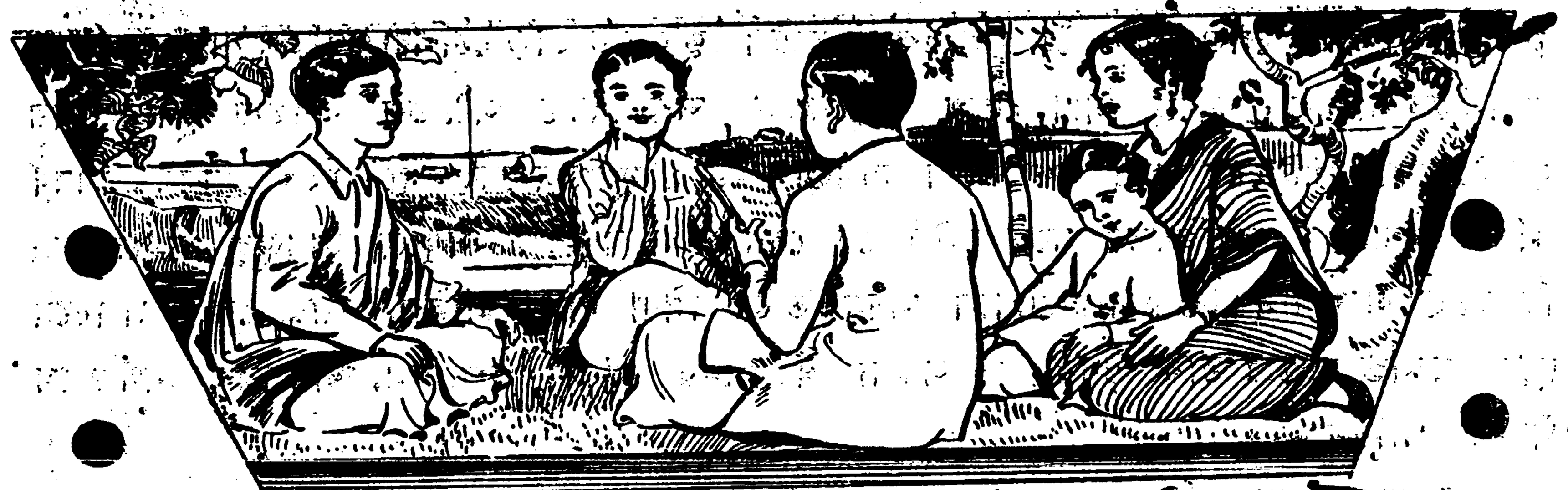

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ছেলেবেলার গান

(শ্রীরামপ্রসাদ সিং)

বল্ না মাগো, ছেলেবেলার গান ;
বাদলা রাতে যে গান গেয়ে
ঘুমের পরী আস্ত ধেয়ে,
যে গান শুনে জুড়িয়ে যেত প্রাণ।

দিনের শেষে আঁধার যবে আসে,
আঙিনার ঐ তুলসী-তলে
জোছ্না মাখা ফুলের দলে
ছোটবেলার স্বপন-আলো ভাসে।

শুনেছিলাম রাজপুত্রের কথা ;
তেপান্তরের মাঠের পারে
স্বপ্নে-ছাওয়া নদীর ধারে
জাগিয়েছিল গভীর ব্যাকুলতা।

বল্ না মাগো, ঘুম-পাড়ানি গান ;
দুপুর বেলা কাজের শেষে
দোলায় বসে তোমার পাশে,
যে গান শুনে ভাঙ্ত অভিমান।

আকিয়াবের পথে

(কুমারী জ্যোৎস্না নাহা)

আকিয়াব ব্রহ্মদেশের একটি বন্দর। ১৯২৮ সনে একবার আমি, সেজদি' ও আমার ছোড়দা' এই কয়জনে আকিয়াবে গিয়েছিলুম। আমার সেই ভ্রমণ-কাহিনীই আজ তোমাদের শোনাব।

আমাদের জাহাজ বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর "চান্টালা" চট্টগ্রাম থেকে রওনা হ'ল। এই জাহাজখানি প্রায় ৩০০ ফুটের উপরে লম্বা এবং প্রায় ১২০০ যাত্রী বহন করতে পারে। ছোড়দা'র পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমরা কেবিনের যাত্রীর ডেকেই বিছানা পেতে বসলুম। চট্টগ্রামের জেটী থেকে বেলা প্রায় ৪॥০টায় জাহাজ ছেড়ে দিল ; কর্ণফুলী নদী পার হ'য়ে জাহাজ বঙ্গোপসাগরে পড়তেই সূর্য্যিমামা ডুবুডুবু হ'লেন। জাহাজ থেকে সেই সূর্য্যাস্তের দৃশ্য অতি মনোরম। এবার জাহাজ বেশ জোরে চল্‌তে আরম্ভ করল, খোঁজ নিয়ে জানলুম জাহাজ ঘণ্টায় ১২ মাইল চল্‌ছে। খানিক পরেই দেখলুম মিটমিটে চাঁদ উঠেছে এবং আমাদের বাঁ দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এই শৈলমালার মাঝেই মহেষখালী (কক্সবাজার) দ্বীপে আদিনাথ তীর্থ। পুরাণের মতে এখানে নাকি সতীর একটা অঙ্গ পড়েছিল। এই স্থানটী পূর্ব্ববঙ্গের একটী স্বাস্থ্য-নিকেতন। তার পরই কুতুবদিয়ার লাইট্ হাউস (বাতিঘর) দেখ্‌তে পেলুম ; এই বাতির সাহায্যে রাত্রিকালে জাহাজ চালাতে সুবিধা হয়।

রাত্রি প্রায় ৮টা। এবার আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন। ভয়ানক বৃষ্টি ও তুফান সুরু হ'ল। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জাহাজের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে চল্‌ছে। শুনেছিলুম এই সময়টাতেই (জুন, জুলাই মাসে) সমুদ্র ভীষণ প্রকৃতি ধারণ করে, এবার তা চোখে দেখ্‌তে লাগলুম। যাত্রীদের মুখে হরি, শ্রীমধুসূদন, আল্লা, ইত্যাদি জপমালার মত লেগে রইল। হঠাৎ আমার মনে জাহাজখানা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা হ'ল, আমি বেরিয়ে পড়লুম। অভ্যাস না থাকলে এ সময়ে জাহাজে ঠিক ভাবে হেঁটে চলা দায়। কত দূর গিয়েই দেখি দ্বিতীয় নরককুণ্ড, শতকরা ৯০ জন যাত্রীরই পেটের ভাত বেরিয়ে পড়ছে। ক্রমাগতঃ বমনের 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দে এবং

দুর্গন্ধে আমারও যেন নাড়ী-ভুড়ি বের হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'ল, তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে এলুম। সেজদি' ইতিমধ্যেই মাথা ছেড়ে দিয়ে পড়েছেন। এই সময়ে জাহাজের বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু সেখানে এলেন, আমরা কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন। সেজদি'কে বল্লেন তাঁর 'সী-সিক্‌নেস্' হয়েছে। আমাদের কাগজি নেবুর রস খেতে ব'লে দিলেন। আমরাও তাই করলুম। ডাক্তার বাবু সেজদি'র জন্য কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু সে রাতে আর তাঁকে মাথা তুলতে হ'ল না। আমাদের ছোড়দা' সমুদ্র ভ্রমণে অভ্যস্ত; তাই তাঁকে কোন বেগ পেতে হ'ল না। তিনি আমাদের জন্য নানাবিধ খাবার যোগাড় করলেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা জুটল না। রাত্রিটা এ ভাবেই কাট্‌ল, পর দিন বেলা ১১টায় আমরা আকিয়াবের বাতিঘর দেখলুম। এই বাতিঘরটা সমুদ্রের ভিতরকার একটা ছোট পাহাড়ে দ্বীপের উপর তৈরী। দ্বীপটির নাম 'স্যাভেজ আইল্যাণ্ড' (বর্ব্বর দ্বীপ)। স্থানটী অতি মনোরম। পরে আমরা আকিয়াব থেকে ষ্টীমলঞ্চে করে একবার এখানে 'পিক্‌নিক্‌-এ (বনভোজনে) এসেছিলুম। বেলা ১১॥০টায় আকিয়াবের জেটীতে জাহাজ লাগ্‌ল। আমরা পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম থেকে তার করেছিলুম তাই আমাদের নেবার জন্য লোক হাজির ছিল।

আকিয়াব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা। সাজাহান-পুত্র সুজা পলায়ন করে এখানেই এসেছিলেন। পূব দিকে পাহাড় আর দক্ষিণে সমুদ্র থাকায় এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। আকিয়াব সহরটী বঙ্গোপসাগরের ঠিক উপরে। ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখান থেকে চাউল রপ্তানি হয়ে থাকে। এখানকার আদিম অধিবাসীরা আরাকানী বলে পরিচিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তবে এদের কথিত ভাষা মার্জ্জিত ব্রহ্মভাষা নয়। এদের মেয়েরা স্বাধীন এবং বড়ই বিলাসপ্রিয়। তবে এরা বেশ উন্নত, এদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই জনই লেখাপড়া জানে।

সন্দেশ

গত মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৫ সনে) 'লুসিটানিয়া' নামে একখানা বড় জাহাজ জার্ম্মানরা ডুবাইয়া দিয়াছিল। এই জাহাজের সঙ্গে প্রায় ১২০০ যাত্রীও প্রাণ হারায়। কাজেই সেই সময় এই জাহাজ ডুবি হইয়া পৃথিবীময় খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি 'অফির' নামে আর একখানি অনুসন্ধানকারী জাহাজ জলের তলায় সেই লুসিটানিয়ার ধ্বংসাবশেষ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।

* * *

পাবনা জেলার রাজারামবাড়ী গ্রামে দলু পরামাণিক নামে একটি লোক আছে, তার বয়স

এখন ১২১ বছর—অর্থাৎ ১২২১ সালে তার জন্ম হয়। ইতিমধ্যে তার দাঁত দুইবার পড়িয়া গিয়া আবার নতুন করিয়া উঠিতেছে। শরীরও তার বেশ সুস্থ। তার একটি ভাই ও একটি বোন্ এখনও জীবিত। ভাইটির বয়সও নেহাৎ কম নয়—১১২ বছর। দলু পরামাণিকের ছেলের বয়স এখন ৭৩ বছর।

* * *

নলহাটীতে একটি দশ বছর বয়সের সাপুড়ে ছেলের কথা শোনা গিয়াছে। সে দস্তুরমত যাকে বলে 'সাপের-বিষ-প্রুফ' অর্থাৎ সাপের বিষে তার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। সাপে কামড়াইলেই সে ক্ষতস্থানে তার নিজের মুখের লালা লাগাইয়া দেয়, ফলে বিষের ক্রিয়া একদম বন্ধ হইয়া যায়। ছেলেটিকে বহুবার সাপে কামড়াইয়াছে। একবার এক গোক্ষুর সাপের কামড়ে সে মাটীতে অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়ে। তার আত্মীয়-স্বজন তখন তার মুখের লালা লইয়া ক্ষতে লাগাইয়া দেয়। ফলে পরক্ষণেই সে সুস্থ হইয়া উঠে।

* * *

গ্রীস্ দেশে আবার নতুন করিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে ঠিক হইয়াছে। দেশের লোকেরা ভোট দিয়া জানাইয়াছে—তারা রাজাই চায়, গণতন্ত্র চায় না। ভোটের ফল হইয়াছিল এই রকম—রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ৪৯২০০০ ভোট; গণতন্ত্র বজায় রাখিবার পক্ষে ৩২৪৫২ ভোট। গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ্ দেশে ফিরিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন।

* * *

কয়েক দিন আগে লাহোরের শেখপুরা হইতে একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপারের সংবাদ আসিয়াছে। সেখানে একটি ষাঁড় আর একটি কুকুরে ভারী ভাব ছিল। দুইটিকে প্রায় সব সময়েই একত্র দেখা যাইত। ইতিমধ্যে এক দিন একজন লোক ঐ কুকুরটাকে মারিয়া ফেলে। ষাঁড়টি গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া কয়েক দিন অনাহারে কুকুরটার মৃতদেহের পাশে পড়িয়া থাকে। তার পর হঠাৎ তার মানুষের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। সে তখন পাগলের মত মানুষ দেখিলেই তাকে আক্রমণ করিতে থাকে। ষাঁড়ের হাতে একজন লোক এই ভাবে মারা যায় আর কয়েক জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। ষাঁড়টিকে বহু চেষ্টা করিয়াও ধরিতে না পারায় অবশেষে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

* * *

নদীর চেয়ে সমুদ্রের ঢেউ অনেক বড়, কিন্তু তা' যে সময় বিশেষে কত বড় হইতে পারে তা ধারণা করাও কঠিন। বিখ্যাত 'লেভায়াথান্' জাহাজ একবার আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে একটা ঢেউএর মুখে পড়িয়াছিল; সে ঢেউটি ছিল স্বাভাবিক অবস্থার জলের উপর হইতে ২৪০ ফুট্ উঁচু।

* * *

ইটালি-য়্যাবিসিনিয়ার যুদ্ধ এখনও পূরা দমে চলিতেছে। ইটালিয়ান্‌রা য়্যাবিসিনিয়ার অনেক জায়গা দখল করিয়াছে, তবে কোন কোন জায়গায় পরাজিতও হইয়াছে। য়্যাবিসিনিয়ার সম্রাটের জামাই রাস গুস্‌গা তাঁর বহু অনুচর সহ ইটালিয়ান্‌দের দলে যোগ দিয়াছেন। য়্যাবিসিনিয়ার সম্রাট্ ঘোষণা করিয়াছেন—যে তাঁর দেশদ্রোহী জামাইএর মাথা আনিয়া দিতে

পারিবে তাকে ১২০০০ পাউণ্ড (দেড় লক্ষ টাকার উপর) পুরস্কার দিবেন। রাঃ সঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত টেক্সাস প্রদেশে মাটীর নীচে থেকে শিলাকৃতি একটা ডিম পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন ডিমটার বয়স লক্ষ বছরের উপর। এই ডিমটী এক অতিকায় জীবের। এ জীবের ডিম ও হাড় গোবি মরুভূমিতেও (চীন দেশে) পাওয়া গেছে।

গ্রেট বৃটেনে পনরো বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় চাকরীও করে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় থিয়েটার বোধ হয় নিউইয়র্ক সহরের 'সেঞ্চুরি থিয়েটার'। বসবার আসন এখানে অগণিত বল্লেই চলে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা যুড়লে এই রকম হবে—

ভাই সুধীর,

আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল তুমি ছোটখোকা ও ভোম্বলকে লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অতি অবশ্য আসিবে। না আসিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আশা করি কুশলে আছ। এখানে সকলে ভাল আছে। মাসীমাকে আমার প্রণাম দিও।

ইতি কমল

উত্তরদাতাদের নাম

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্লার্ক ষ্ট্রীট্) ; ডলি, তুলতুল, মঞ্জু (ভবানীপুর) ; জগদীশচরণ বক্সী (করকেন্দ কলিয়ারী) ; শান্তি, সতু, নকু (শ্রীরামপুর) ; অধীররঞ্জন দে, ভোলা প্রভৃতি (চুঁচুড়া) ; নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট্) ; মৃত্যুলানন্দ দাশগুপ্ত (গিরিডি); নির্ম্মলকুমার দাস (ক্লার্ক ষ্ট্রীট্) ; রমাপ্রসাদ মিত্র (ভবানীপুর) ; অনিল, বিমান, গণেশ প্রভৃতি (রাঁচি); বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী, সুষমা, সবিতা প্রভৃতি (মালদহ) ; অনিল, শেফালী, [illegible] প্রভৃতি

(পুরুলিয়া) ; জব্‌জিলন বেগম (দিনাজপুর) ; পাঁচুগোপাল, কৃষ্ণদাস ও কালী (শ্যামনগর) ; [illegible] সান্যাল (পাবনা) ; সরস্বতী পুস্তকাগারের সভ্যবৃন্দ (যশোহর) ; কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল প্রভৃতি (ইটালি—কলিকাতা) ; অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর) ; অনিলকুমার দাস, সুধীরকুমার দাস (ভবানীপুর) ; ভারতলক্ষ্মী দেবী (ঢাকা) ; দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা) ; শৈলেশ দাস, অজিত, তুলু (মাথাভাঙ্গা) ; রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র প্রভৃতি (রংপুর) ; যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা) ; সনৎ, অনিল, ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি (জিয়াগঞ্জ) ; গৌরী ও মাধুরী দত্ত (রাঁচি) ; লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (পুরী) ; অবিনাশ ও অন্নপূর্ণা বয়েন (ভীমেশ্বরীবাজার) ; প্রশান্ত, প্রতীত, প্রতাপ প্রভৃতি (সীতারামপুর) ; নবকুমার, সুধীর, সুনীল (কালনা) ; কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ, কৃষ্ণা দেবী (শিলং) ; চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী (জামালপুর) ; অনিল, অজিত, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি (চুঁচুড়া) ; লতিকা, রেণুকা, গোপা (রাজসাহী) ; সুজাতা সেনগুপ্তা, চিত্রা (বাগবাজার) ; রণেন, গুণেন, সুকুমার (ভবানীপুর) ; বিশ্বজিৎ রায় (কালীঘাট) ; পূর্ণেন্দুকুমার দাশ (হবিগঞ্জ) ; অশোককুমার গুপ্ত (ঢাকা) ; রামপ্রসাদ সিং (বেহালা) ; কালীপদ, হরিসাধন, জ্ঞানেন্দ্র (ব্যানার্জ্জিডাঙ্গা) ; শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা) ; বিপদভঞ্জন, জানকীনাথ (হবিগঞ্জ) ; মায়া, গীতা, ধীরা প্রভৃতি (ফয়জাবাদ) ; জ্যোতিকণা বসু (ঢাকা) ; সতু, রাতু ও দেবব্রত সেন (গোয়ালপাড়া) ; ছায়া দেবী (রতনপুর) ; শান্তি, বিলু, মীরা ; রমা (বারুইপুর) ; দিলীপকুমার রায় (কলিকাতা) ; শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি, বুলি, ময়না (জামসেদপুর) ; অমিতাভ দাশগুপ্ত (গোহাটী) ; জ্যোতির্ম্ময় বসু (কলিকাতা) ; রামেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর) ; মনোতোষ রায় (ভবানীপুর) ; অনিমেষচন্দ্র দাশগুপ্ত (কুমিল্লা) ; শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা) ; রুবী চাটার্জ্জি, লীলা, মঞ্জু প্রভৃতি (ভাগলপুর) ; গোপাল, মনু, লালু (জ্যোৎশ্রীরাম) ; অমিয়, অমিতাভ, অশোক প্রভৃতি (বেতিয়া) ; সুপ্রভা, সাবিত্রী, প্রতিভা প্রভৃতি (কানপুর), প্রতিভা দেবী (মঙ্গলদহ) ; বিবেকানন্দ শিশুপাঠ্য লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (বরাহনগর) ; সুনীপ, নীতিপ, রেবা প্রভৃতি (কলিকাতা) ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি-পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (শালিখা) ; আভা, অরুণ, বিমান (হাসনাবাদ) ; চিন্ময়, মৃন্ময়, পীযূষ প্রভৃতি (রংপুর) ; বীণা, রমেন, রথীন (ধুবড়ী) ; সরস্বতী দেবী (হাজারিবাগ) ; বিমলা ও শতদল দে (ডিহিরি-অন্-শোন) ; রবীন, বীরেন, অমিয় প্রভৃতি (দিনাজপুর) ; যমুনা, নদীয়া, অজিত প্রভৃতি (বড়রা) ; সুধীর ও অধীরচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি) ; মীরা, স্বদেশ, মিলি প্রভৃতি ; রবীন্দ্রনাথ দে (মধুবাণী) ; কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (সিমলা) ; পুণ্যব্রত, পূর্ণিমা, কানু (ধুবড়ি) ; রবীন্দ্র, লতিকা, বেণুকা প্রভৃতি (মাধিপুরা) ; ছবিরাণী রায় (নিউদিল্লী) ; অরুণ গোস্বামী, অশ্বিনী, অমিয় প্রভৃতি (বাণীগ্রাম) ; অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরাইল) ; শৈলেশ, অনিল নিখিল (জলপাইগুড়ি) ; নিরু, প্রভা, বিভা (জলপাইগুড়ি);

নরেন্দ্রনাথ ও অতুল দাশগুপ্ত (শিলং) ; নিখিল চৌধুরী, মনীষী ঘটক (জলপাইগুড়ি) ; আর্য্য, কাকাবাবু, কাকামণি প্রভৃতি (মজঃফরপুর) ; অমিয়া, খোকন, ঝড়ু প্রভৃতি (নাম্নার) ; সুজনকুমার ও চিন্ময়ী দাস (কলিকাতা) ; কাজিরপাগলা স্কুলের দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (কাজিরপাগলা) ; বসন্তকুমার কর (ঢাকা) ; বেন্দা ছত্রসত্ত্ব (যশোহর) ; প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ) ; তড়িৎ, নিধু, মঞ্জু (ভবানীপুর) ; সুষমা, প্রতিমা, নীলিমা (পাঁতিহাল) ; অরুণ ও অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাজসাহী) ; বখতিয়ার হোসেন (কলিকাতা) ; রমা, উমা, দুর্গা প্রভৃতি (হাজারীবাগ) ; পাঁচুগোপাল ও কৃষ্ণদাস সরকার (নওয়াপাড়া) , শান্তিময়ী, মাস্তি, কটু প্রভৃতি (সীতামাঢ়ি) ; দাদা, তারাদা, হীরেন প্রভৃতি (ভবানীপুর) ; ধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি) ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড) ; কর্পোরেশন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রগণ (ভূকৈলাস রোড) , শ্রীমানবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) ।

নূতন প্রাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এমন এক-একটা শব্দ দিয়া পূরাইতে হইবে যাহা সোজা ভাবে পড়িলে যা হয়, উল্টা দিক্ দিয়া পড়িলেও ঠিক তাই হয়। যেমন ধর 'সহিস'। (সবগুলির উত্তর পাঠাইতে হইবে।)

—— হইতে এল —— যুবক,
কেমনে —— তার প্রাণে কত সখ !

ফুটেছে —— ফুল গন্ধ ছুটিয়াছে ;
কোথায় —— লাগে এ ধনের কাছে ?

——পায় না বাধা চাহি যত দূর,
থরে থরে উঠিয়াছে —— আঙ্গুর।

—— ঘষিয়া খোকা আঁকিতেছে ছবি,
—— হয়েছে ভাল, আর বাজে সবি।

হিপ্পোর স্বর্গ

৮ম বর্ষ } পৌষ, ১৩৪২ { ১২শ সংখ্যা

মোটরের হর্ণ্

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী)

দৈত্যপুরীতে ভাই, মোটরের হর্ণ্ বাজে
সন্ধ্যা-সকাল।
সাপের মতন সব আঁকা-বাঁকা রাস্তায়
হর্ণ্ বাজে, হর্ণ্ বাজে সন্ধ্যা-সকাল।

বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলে সারে সার,
রজনী পরেছে হার উল্কার—
ঘন তিমিরের মাঝে আলেয়ার আলো সম
হর্ণ্ বাজে, হর্ণ্ বাজে সন্ধ্যা-সকাল।

বিজলীর আলো নয়, যূঁইফুল ফুটে আছে
সারে সার,
মোটরের হর্ণ্ নয়, ময়ূর ডাকিছে কোথা'
বারে বার।
অন্ধ নগরী যেন ঘন বন,
অসীম রহস্য-নিমগন
বর্ষণ-উদ্বেল তরু-পল্লবে যেন
মূর্চ্ছিত সেতারের সব তার।

বে-দন্তবাগীশের বিবরে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

আসামের বিখ্যাত কাঠের ব্যবসাদার হর্ষবর্দ্ধন এবং গোবর্দ্ধন কল্‌কাতায় বেড়াতে এসেছে সে খবর তোমরা জান। এই তাদের প্রথম কল্‌কাতায় আসা, কাজেই কয়েক দিনে কল্‌কাতার যা যা দেখবার তা তারা ভাল করেই দেখে নিচ্ছে।

সেদিনও সাজ-সজ্জা ক'রে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্য বার হয়। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে গোবর্দ্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—"কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনও বেরুলো না তো!"

"বেরুবে বই কি, সবুর কর্। না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে। তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে পাঁচতালার কথা বল্‌তে পারি না!"

"পাঁচতালা মোটর বোধ হয় নেই।"

"কল্‌কাতায় কি আছে আর কি নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতন খুড়ো এই কথা বলে,—বুঝলি?"

"ধুত্তোর তোমার সনাতন খুড়ো!"

"আরে, এত অধীর হচ্ছিস্ কেন? যদি তিনতালা মোটর এ বেলা নাই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।"

"পড়ে যাই যদি?"

"দূর্, পড়্‌ব কেন? আমি কখনো পড়ি? তবে ধড়াম্‌তলার কাছটায় একটু সাবধান হ'তে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়্‌বই বা কেন্? মাথার ওপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখ্‌ছিস্ না?"

"দেখ্‌ছি তো!"

"কেন বল্ দেখি? ধরবার জন্য। পড়বার মুখেই তার ধ'রে ফেল্‌বি, ব্যস্।"

সত্যিই তো—যত দূর দৃষ্টি যায় গোবর্দ্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন্ চলে গেছে আর তারই নীচে দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো ভীষণ শব্দে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা দুনিয়ায় দুর্ল্লভ। "তবে চল দাদা, একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক্। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে?"

"একটু দাঁড়া।" পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্দ্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। "দোকানটা এ রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক্ তো!"

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হয়। "বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখ্‌লে পিলে চম্‌কায়। এটা কিসের দোকান হ্যা?"

এক জন সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্দ্ধনের কথার জবাব দেন—"আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমিই ডেন্টিষ্ট্।"

"গোব্‌রা, তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?"

"তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের ওপর তো বরাত দেওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ, তুলেই ফেল্। পরের উপর নির্ভর করা ভালো নয়। তা কতক্ষণ লাগ্‌বে একটা দাঁত তুল্‌তে?"

ডেন্টিষ্ট্ বলেন—"কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরও পাবেন না।"

"কত মজুরি?"

"মজুরি কি মশাই, ফিস্ বলুন!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস্‌ফিস্ করেই বলি। দিতে হবে কত?"

"দশ টাকা আমাদের চার্জ্জ্।"

"বলেন কি মশাই? এক মিনিটের কাজের জন্য দ—শ টাকা! আপনি কি ডাকাত? চলে আয় গোব্‌রা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়, আর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।"

গোব্‌রাও অবাক্ হয়—"সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ দশ টাকা রোজগার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে! সহুরে ঠক্ দাদা, পালাই চল এখান থেকে। আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও না; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত নয়, আধখানা দাঁত!"

হর্ষবর্দ্ধন রুষ্ট হয়ে ওঠেন—"আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই কিন্তু ঠক্‌তে রাজি নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দু' শ' টাকা নাও দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ এক পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের। হুঁ।"

মেজাজ আর ধরণ-ধারণেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাতছাড়া করা ঠিক না; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্য দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক্। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তা হ'লেই তো আর ঠকা হবে না।

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—"দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান মনে করেন, না হয় দু'জনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জ্জে।"

হর্ষবর্দ্ধনকেই দলের পাণ্ডা বিবেচনা করে ডেন্টিষ্ট্ তাঁকেই হাত করার মৎলব করলেন—"দেখুন, বাজার মন্দা, কম্‌পিটিশন্ খুব কীন্, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট্ তো কমাতে পারি নে। বরং আপনার একটা দাঁত না হয় অম্‌নি তুলে দিতে রাজি আছি। এর চেয়ে আর কি কন্‌সেশন্ আশা করেন বলুন?"

হর্ষবর্দ্ধন অবাক্ হন—"একেবারে অমনি?"

"একেবারে।"

"পোকায় না খেলেও?"

"ক্ষতি কি?"

হর্ষবর্দ্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। "মশাই, আমরা কল্‌কাতায় এসেছি, টাকা খরচ কর্‌ব এ কথাও সত্যি, কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ করে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অম্‌নি হ'লেও না।"

গোব্‌রা বলে—"হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল্ হ'তে পারে কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।"

হর্ষবর্দ্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—"আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা নই আমরা। আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।"

গোব্‌রা সানাইয়ের কাজ করে—"হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা কিন্তু গলায় ছুরি বসাই না।"

এতক্ষণে ডেন্টিষ্ট্ কথা বলার ফুরসৎ পান—"আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশী বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।" তিনি গোবর্দ্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্দ্ধন চটে যান—"তা' সাঁড়াশীই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেল্‌ব এত ছেলেমানুষ পান নি আমাদের।"

গোব্‌রা দাদার কথায় সায় দেয়—"আর হাতুড়িই বসান!"

ডেন্টিষ্ট্ যেন এতক্ষণে আলো দেখ্তে পান—"ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা না হয়, এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তা' হ'লে তো হবে?" তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্দ্ধন খুসি হয়ে ওঠেন; "হ্যাঁ, তা হ'লে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন এতে নারাজ হবে কে? কি বলিস্ গোব্রা?"

গোব্রাও উৎসাহিত হয়—"হু ঘণ্টা ধ'রে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন্—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জান্তেও পেলাম না, বুঝ্তেও পেলাম না—সে কি কথা?"

ডেন্টিষ্ট্ গোব্রাকে নির্দ্দেশ করেন—"নিন্, বসে পড়ুন তো ঐ চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট ক'রে বল্লেই পারতেন প্রথমে। এত বকাবাক হ'ত না। দেখে নেবেন আপনি, এমন ভাবে এত আস্তে একটু একটু ক'রে তুল্ব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াশুদ্ধ লোক টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুল্ছে বটে!"

গোবর্দ্ধনের ভারী আনন্দ হয়—"হুঁ, যেন পোকারাও টের পায়। ভারী বজ্জাত ব্যাটারা, ভারী যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে।" সে জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

হর্ষবর্দ্ধনের হাসি ধরে না—"এই তো চাই। দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জান্তে পাবে না—সে কি কথা! পাড়াশুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষের দাঁতের মত দাঁত তোলা হচ্ছে। নইলে দাঁত তুলে লাভ কি? কথায় বলে, হাতীকা বাৎ, মরদ্কা দাঁত!"

ডেন্টিষ্ট্ বাধা দেন্—"উঁহু, ভুল হ'ল কথাটা। মরদ্কা বাৎ হাতীকা—"

হর্ষবর্দ্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—"তুইই হয়। হাতীকা বাৎ তো শোনেন নি? কি ক'রে শুন্বেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি—দিনরাত শুন্তে পাই।"

ডেন্টিষ্টের চোখ কপালে ওঠে—"কেন, সেখানে কি হাতীর দাঁত হয় না?"

"হয় না তা কি বলেছি?" হর্ষবর্দ্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, "কথাটার মানে

হ'ল এই যে হাতীর আওয়াজ যেমন জোরালো তেম্নি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কাম্ড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখ্লে ঘাব্ড়ায়—তাতেই খতম্; নির্ঘাৎ! কি ব্যামো রে গোব্রা?"

গোব্রা মাথা চুল্কাতে থাকে—"কি হাইডো না ফাইডো—"

"হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরেজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা?" হর্ষবর্দ্ধন আরো বিশদ ক'রে দেন, "বুঝলেন মশাই, দাঁতই হ'ল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত—তার পরেই হাত।"

গোব্রা নিজের গবেষণা যোগ করে—"ও দুটো কাজে না লাগ্লে তার পরেই পা—পালাবার জন্য।"

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্য হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের ওপর গরম হয়ে ওঠেন—"তা ব'লে পা অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বল্তে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।"

পাছে দু' ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্র-বলের পরিচয় দিতে সুরু ক'রে দেয় সেই ভয়ে ডেন্টিষ্ট্ তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—"বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগ্বে দাঁতটা তুল্তে।"

গোব্রা বলে—"এখন কি করে হবে? এখন তো এক ঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট্ সময় নেই আমাদের। সহর দেখ্তে বেরুচ্ছি এখন। সন্ধ্যার পরে হবে, কি বল দাদা?"

"সেই ভালো। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্ত্তটা খুঁজে রাখিস্। দাঁতটা সেই গর্ত্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।"

"কি হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠ্বে? এ তো দুধে-দাঁত নয়!" গোব্রা সন্দেহ প্রকাশ করে।

"এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠ্বে? আরে, কর্ম্মফল যাবে কোথায়?"

"তা' হ'লে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা।"

"যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু ক'রে দিবি—মন্দ কি?" ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্দ্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত ক'রে হর্ষবর্দ্ধন অগ্রসর হন। "আচ্ছা, আসি তা' হ'লে ডেন্‌সিষ্ট্ মশায়! কি দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার! কোন সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে।"

"হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেন্‌টিস্ মেন্‌টিস্ কখনো বাঙালীর নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে, সাঁড়াশীর দরকার হয় না। ডেন্‌সিটিষ্ট্—বাব্বাঃ! কী নাম!"

অতিথিরা অন্তর্হিত হ'লে ডেন্‌টিষ্ট্ দু'বার কাঁধের ঝাঁকি দেন—"কোথাকার আম্‌দানি কে জানে! দুটি চীজ্। বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে আর ফিরবে ব'লে বোধ হয় না। না ফিরুক্, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা।"

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইন্‌বোর্ড্ ঝুলতে দেখা যায়:

"দাঁতই হ'ল মানুষের প্রধান অস্ত্র!
নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ।
আমরা দাঁত বাঁধাই!"

ততক্ষণে দু'ভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছে। হর্ষবর্দ্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—"নাঃ, আর আশা নেই! বেশী তালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা যাক্। সেটাও তো একটা চাপ্‌বার জিনিস।"

গোব্‌রার মোটরে চাপা সখ, সে নিরুৎসাহিত হয়—"দূর্! ঘোড়ার গাড়ীতে আবার মানুষে চাপে!"

হর্ষবর্দ্ধন উত্তেজিত হ'ন—"কেন চাপ্‌বে না? ঘোড়ায় চাপে তো ঘোড়ার গাড়ী! তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক্ আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিসে চাপ্‌তে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ী কি গাড়ী না? আমি ডাক্‌ছি ঐ গাড়ীটাকে—এই কচুয়ান্, কচুয়ান্!"

ক্যোচ্‌ম্যান্ গাড়ী এনে হাজির করে। "কোথায় যেতে হবে বাবু?"

গোবর্দ্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—"গাড়ী তো নয়, চার চাকার পিঁজ্‌রে!"

হর্ষবর্দ্ধন ততক্ষণে ক্যোচ্‌ম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—"বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে! কোন্ নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?"

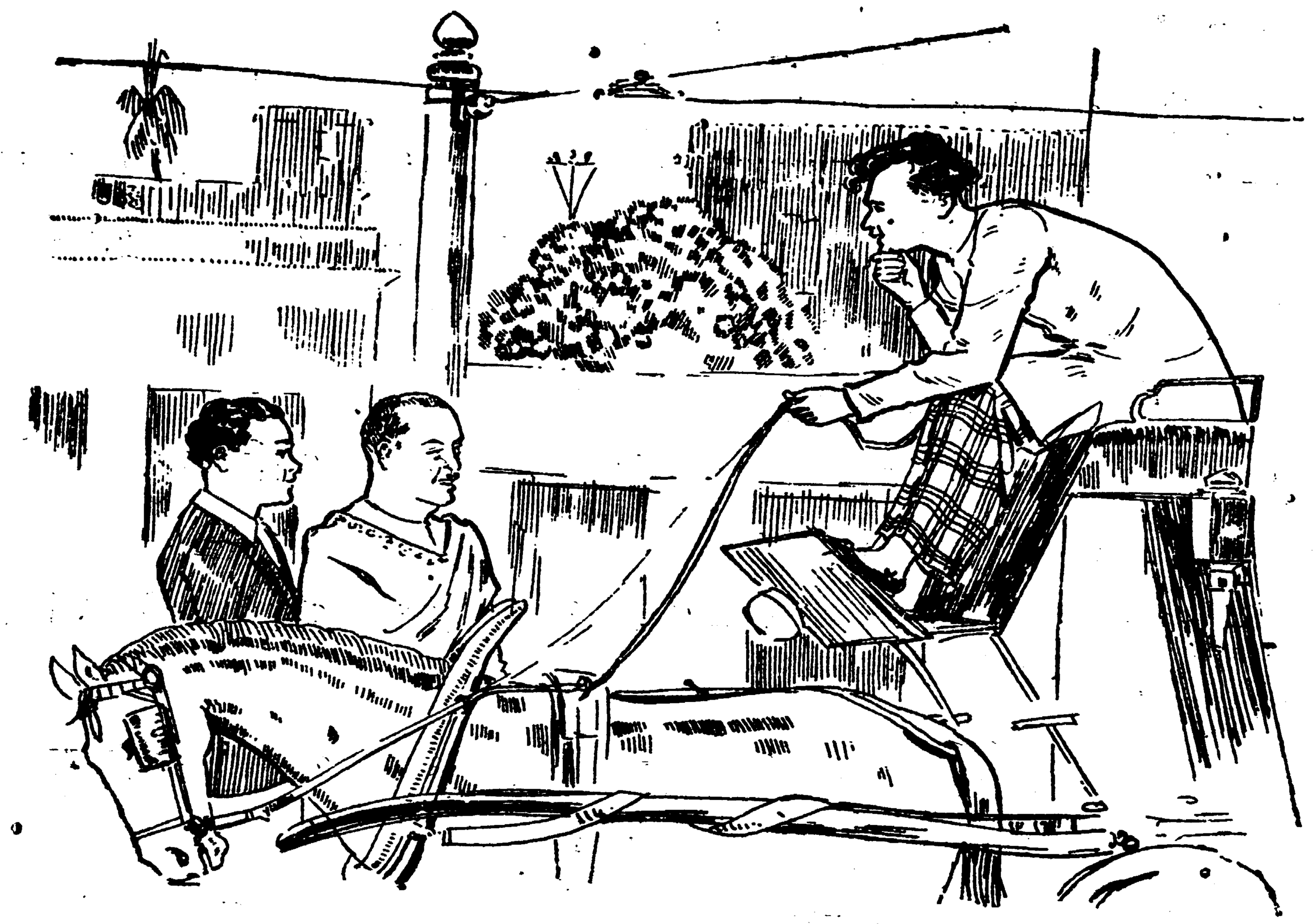

"নাপিত নয়, সেলুনের ছাঁট্।"

"নাপিত নয়, সেলুনের ছাঁট্।"

"চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁট্‌ছে! কালে কালে হ'ল কি? তা কোথায় কিন্‌তে মেলে এই সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তা' হ'লে।"

"কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।"

"দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হাল্‌চালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল আমাদের, আমরা তোমার মত ক'রে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকুশিস্ বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোব্‌রা, একখানা

নোট্ ওকে। নাও, আগাম নাও।" গাড়ীতে চেপে হর্ষবর্দ্ধনের ফূর্ত্তি হয়, "ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করেছিলাম ব'লেই তো চুল ছাঁটার দোকান জান্‌লাম! কখন কিসে কার থেকে কি উপকার হয় কেউ বল্‌তে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁট্‌লে পাড়াগেঁয়ে ব'লে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।"

গোবর্দ্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

"তা' ছাড়া কলকাতায় এলাম তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে! আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হাল্‌চালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক্ হবে ভাব্ তো।"

তবু গোবর্দ্ধন সাড়া দেয় না।

"সারা কলকাতা তো মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মত ক'রে নিয়ে যাই।"

গোবর্দ্ধন এবার জবাব দেয়—"কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় ক'রে নিয়ে গেছ্‌ল?"

হর্ষবর্দ্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান কিন্তু বাধা পড়ে, ক্যোচ্‌ম্যান গাড়ীর দরজা খুলে ডাকে—"নামুন বাবু, এসে পড়েছি।"

হর্ষবর্দ্ধনের চোখ কপালে ওঠে—"সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ী চাপ্‌লাম না, এর মধ্যেই এসে পড়লাম?"

গোবর্দ্ধন বলে, "কড়্‌কড়ে দশটা টাকা দিয়েছি!"

ক্যোচ্‌ম্যান্ জবাব দেয়—"যেখানে যেতে বল্লেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয় ঐ দেখুন দেকানের সাইনবোর্ট্।"

দুই ভাই গাড়ীর দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়,—সত্যিই অবিশ্বাসের কারণ নেই, 'সাইন্‌বোর্টে' স্পষ্ট বড় বড় হরফে লেখা—

"এখানে উত্তম রূপে চুল ছাঁটা আড় দারি কমানো হয়।"

হর্ষবর্দ্ধন তবু ইতস্ততঃ করেন—"এত শীগ্‌গির এল? তোমার গাড়ী যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখ্‌ছি! গাড়ী চাপ্‌লাম তা টেরই পেলাম না!"

গোব্‌রাও নাম্‌তে রাজি হয় না—"তোমার কি বাবু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!"

ক্যোচ্‌ম্যান্ বলে—"তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু আলিপুর গেলে একটা মুস্কিল আছে।"

"কি? কি মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?" দুই ভাই যুগপৎ প্রশ্ন করে।

"সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়।" ক্যোচ্‌ম্যান্ একটু মুচ্‌কি হাসে।

গোব্‌রা বলে—"কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? কার য়্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আস্‌তে জানি।"

হর্ষবর্দ্ধন অধিকতর সমীচীন হন—"উঁহু, দরকার নেই গিয়ে। জায়গাটা বোধ হয় খারাপ, প্রাণের ভয় টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেমে পড়্ গোব্‌রা।" তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্ত্তী করেন, গোব্‌রা পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়।

গাড়ী চলে গেলে গোব্‌রা আকাশ্ থেকে পড়ে—"আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ী! কাল থেকে দু'শ' বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাব্‌ছি নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে? তখন তো জানি নি এইই সেলুন!"

হর্ষবর্দ্ধন চম্‌কে ওঠেন, "বলিস্ কি?" তিনি ঘুরে দাঁড়ান। "তাই তো! ঐ যে ও ফুটপাথে আমাদের বাড়ী! আর ঐ পাশে সেই ডেসিন্‌টিষ্টের দোকান!"

এমন সময়ে একটি বছর পনের'র ফুট্‌ফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্দ্ধন তাকে চিন্‌তে পারে—"তোমাকে যেন দেখেছি, তুমি আমাদের পাশের বাড়ীর না?"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—"কোন্ বাড়ী আপনাদের?"

"ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে দেয়ালে—" ভুল ধর্‌তে পেরে হর্ষবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ শুধ্‌রে নেন,—"উঁহু, আমার নয়, কিঙ্‌কঙের ছবি, সাঁটা রয়েছে আমাদের দেয়ালে।"

"দেখেছি। আর ঐ বাড়ীটা আমাদের।" ছেলেটা দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দ্দেশ করে, "ডেনটিষ্ট আমার বাবা।"

"য়্যাঁ, বল কি? হাঁ কর তো। এ কি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে রয়েছে! একটাও তোলেন নি তো!" হর্ষবর্দ্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্দ্ধন বলে—"তোমার বাবা বোধ হয় তোমাকে ভালোবাসেন না!"

"তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধ হয়?" হর্ষবর্দ্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটা ঘোরতর প্রতিবাদ করে—"বাঃ, তা কেন? কখনই না।"

গোবরার কৌতূহল হয়—"টেনে দেখতে দেবে?"

"এই যে আমি নিজে টানছি, দেখুন না।" ছেলেটি প্রাণপণ বলে দু' হাতে দু' পাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্দ্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—"উঁহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দু'পাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই। তুমি ডেণ্টিষ্টের ছেলে, তোমার কখনো আসল দাঁত হয়?"

গোবরা বলে—"সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?"

"দাড়ি কামাতে গেছলাম।"

"এইটুকু ছেলে—তোমার দাড়ি কই!" বিস্ময়ে হর্ষবর্দ্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়ি-হীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে—"দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাষ্টার মশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হ'ল।"

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকে। অবশেষে গোবর্দ্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—"কি রকম বুঝলে দাদা, কলকাতার হালচাল?"

হর্ষবর্দ্ধন মাথা চুলকাতে থাকেন—"তাই ত!"

"এ বাড়ীর লোকের দাড়ি না গজাতেই সামনের বাড়ীর লোক সেলুন খুলে বসে গেছে! আজব সহর দাদা, কি বল?"

হর্ষবর্দ্ধন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন—"চল, সেলুনে ঢুকি।"

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"

(অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি)

উপরে সংস্কৃত লেখা দেখিয়া তোমরা যেন ঘাবড়াইয়া যাইও না। এটা উপনিষদের একটা কথা। তৈত্তিরীয়োপনিষদে এই মহাবাক্যটি আছে: "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ তদ্‌ব্রতং"। অর্থাৎ অন্নকে নিন্দা করিবে না। এবং অন্নকে নিন্দা না করাই একটি ব্রত হওয়া উচিত।

ঠিক এমনি ধারা আর একটা কথা মনুসংহিতায়ও আছে। কানে একটু খটমট লাগিলেও কথাটা বড় মূল্যবান্, তাই এখানে তুলিয়া দিতেছি। অবশ্য তোমাদের মানেও বলিয়া দিতেছি:

লেখক—অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥
পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥

অর্থাৎ অন্নকে দেখিয়া উহার পূজা করা উচিত; উহাকে নিন্দা না করিয়া খাওয়া উচিত। অন্নকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে, প্রসন্ন হইবে, এবং উহা আমাদের নিত্য প্রাপ্তি হউক এইরূপ প্রার্থনা করিবে। পূজিত অন্ন বল ও বীর্য্য দান করে। অপূজিত অন্ন ভুক্ত হইলে বল ও বীর্য্য নাশ করে।

কিছু কাল হইল 'কুইয়ে' নামে ফরাসী দেশের এক মস্ত পণ্ডিত ঠিক এই রকমই একটা মত প্রচার করিয়াছেন।

একই বাড়ীর তিন-চারটি ছেলের মধ্যে যারা যত বেশী মাত্রায় পিট্‌পিটে—'এ খাবারটা ভাল নয়, আমি এটা খেতে পারি নে, ওটা আমার ভাল লাগে না,

ওটায় আমার ঘেন্না করে'—এই রকম খাইবার সময়ে নানা ফৈজৎ করে তারা প্রায়ই রোগা হয়। যারা প্রসন্ন ভাবে সাপটিয়া খায় তাদের শরীর সহজেই পুষ্ট হইয়া থাকে।

অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ছেলের ভিন্ন ভিন্ন রকম স্বভাব থাকে। কিন্তু ঠিকমত শিখাইতে পারিলে এই স্বভাবেরও পরিরর্ত্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ ছেলেদের যদি মনে সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া যায় যে যে কোন খাবারই খাওয়া যাক্, প্রসন্ন ভাবে এবং আনন্দিত মনে তা খাওয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার এবং পুষ্টিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। কারণ এমন ছেলে খুব কমই আছে যে সুস্থ ও সবল হইতে না চায়।

কুইয়ে বলেন এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন নিম্নলিখিত উপায়ে সহজেই হইতে পারে। যে ছেলেটি ঐরূপ খুঁৎখুঁতে তাকে ভাত খাইবার সময়ে রোজ পাঁচ-ছ'বার করিয়া খুব তাড়াতাড়ি এই মন্ত্রটি বলিতে হইবে,—"এই খাদ্যের দ্বারা আমার পরম উপকার হইবে"। সে এই মন্ত্রের শক্তির কথা মানুক আর নাই মানুক, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই উহার ফল দেখা যাইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা খুঁৎখুতে আছ তাহারা এই ভাবে কিছু দিন চেষ্টা করিবে।

সকলের অবস্থা সমান হয় না; কিংবা একই অবস্থার লোকের নিত্যকার খাবারের যোগাযোগ সুবিধা মত ঘটিয়া উঠে না। অতএব যাহা না পাইলাম তাহার জন্য খুঁৎখুঁৎ না করিয়া যাহা পাইলাম উহাকেই প্রসন্ন ভাবে খাইলে পরম উপকার পাওয়া যায়।

খাদ্যের আস্বাদের উপর মনের প্রভাব কি রকম সে সম্বন্ধে নীচের পরীক্ষাটি করিতে পার। চারটি মুড়ি কিংবা রুটী লইয়া উহার সহিত অন্য কিছু যোগ না দিয়া উহা বেশ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু এই ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ চিবাইতে থাক; কিছুক্ষণের মধ্যে দেখিবে যে উহার আস্বাদ বেশ মিষ্ট হইয়াছে। ঠিক ঐরূপ ভাবে আনাজ, শাক, পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি খাদ্য চিবাইতে থাকিলে উহার ভিতরে যে একটা ভাল স্বাদ আছে তাহা বেশ বোধগম্য হয়।

আহার-যন্ত্রের উপর মনের প্রভাবের নিম্নলিখিত পরীক্ষাটা কিছু গুরুতর,

তোমরা যেন ইহা কাহারও উপর প্রয়োগ করিও না। কোনও লোককে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া যদি তাহাকে খবর দেওয়া যায় যে তরকারীর মধ্যে একটা কেঁচো পড়িয়াছিল তাহা হইলে লোকটি হয়ত বমি করিবে, এমন কি তাহার পেটের পীড়াও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ফরাসীরা ব্যাঙ খায় তাহা তোমরা জান, কিন্তু অনেক ইংরাজ ব্যাঙ খাইবার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে। একবার এক ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে একটা নতুন জিনিষ ইংরাজ ভদ্রলোকটির বড় ভাল লাগিল, তিনি জিনিষটি কয়েক বার চাহিয়া লইয়া খাইলেন। খাওয়া-দাঁওয়ার পরেও ইংরাজ বন্ধুটি সেই সুস্বাদু জিনিষটির কথা ভুলিতে পারিলেন না, শেষটায় তিনি কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া বন্ধুকে জিনিষটার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ফরাসী বন্ধু বলিলেন, "হ্যাঁ, ও তো ভাল লাগবেই, ওটা হচ্ছে ব্যাঙের মাংস।" ইংরাজ বন্ধুর জিভের স্বাদ কোথায় মিলাইয়া গেল, ব্যাঙের নাম শুনিয়াই তিনি একেবারে বমি করিয়া ফেলিলেন।

সন্তুষ্টচিত্তে খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে আমাদের খাদ্যের যে সব দৈন্য তাহা অনেকাংশে দূর হইতে পারে—সাধারণ ডাল, ভাত, শাক পাতাতেই শরীর পুষ্ট হইবে। অবশ্য মাছ, মাংস, দুধ পাইলে তো কথাই নাই।

নরবলি

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

নরবলি হচ্ছে তার নাম।

নিশ্চয়ই তোমরা অবাক্ হ'য়ে গিয়েছ,—নয় কি? কিন্তু চা থেকে ধোঁয়া ওঠা যে রকম সত্যি, ক্ষিদের সময় বকুনি খেলে রাগ হওয়াটা যে রকম সত্যি, দুপুর দু'টোর সময় রোদে পুড়ে মোহনবাগানের খেলা দেখ্তে গিয়ে টিকেট্ না

পেলে চুল ছেঁড়ার ইচ্ছেটা যেমন সত্যি, এটাও ঠিক্ তেম্নি, কিংবা আরও বেশী সত্যি।

সে আজ বহু দিন আগেকার কথা। বিকেল বেলায় কাকীমার কাছ থেকে একটা পয়সা নিয়ে চুপি চুপি আলু-কাব্লি কিনে খাচ্ছি। সবে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে ওঠায় মশ্লা দেওয়া আলুর কুচি সত্যিই বড় উপাদেয় লাগ্ছিল। জিভে ছিল জল, আর বুকে ছিল ভয়—পাছে বাড়ীর কেউ দেখে ফেলে।

এমন সময় একটা ছেলে চাকা চালাতে চালাতে এসে হঠাৎ আমার সাম্নে দাঁড়াল। সে খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে আমাকে বেশ ভাল করে দেখে নিল—একটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ কর্বার আগে স্কুলের হেড্-পণ্ডিতমশাই যেমন করে আমাদের দিকে চাইতেন। তার পর বলা নেই, কওয়া নেই, ছেলেটা হঠাৎ আরও খানিক এগিয়ে এসে বল্ল, "এই, দে বল্ছি, দে দে।" চোখ তার হ'য়ে উঠ্ল রক্তবর্ণ।

বল্লাম, "ইস্! যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ এসেছেন! দেব না তোকে, তুই কর্বি কি?"

চাকা চালাবার লাঠিটা শূন্যে বার কতক নাচিয়ে সে বল্ল, "দিবি নি? আচ্ছা, আজ রাতেই আমি তোদের বাড়ীর সব্বাইকে জ্যান্ত নরবলি দেব; তখন মজা বুঝ্বি।"

সেই থেকেই সে আমাদের পাড়ায় 'নরবলি' নামেই পরিচিত।

ওই ঘটনার পরের দিন। দুপুর বেলায় নীচের বৈঠকখানার টেবিলের ওপর বসে 'সামার-ভেকেশানে'র তিন শ' অঙ্কের টাস্ক্-সমাধানে মন দিয়েছি, এমন সময় সেই মহাপ্রভুর আবার আবির্ভাব হ'ল। বল্লাম, "কি রে নরবলি, আমাদের বলি দিবি না?"

কিন্তু আশ্চর্য্য! সে রাগ কর্ল্ না মোটেও, বরঞ্চ নিতান্ত গায়ে পড়েই আলাপ কর্তে এল।

দিন বেশ কাট্ছিল। হঠাৎ এক দিন ঠাকু'মা'র সোনার চশমাটা রহস্য-জনক ভাবে উধাও হ'য়ে গেল। চারদিকেই পড়্ল খোঁজাখুঁজি। বিকেলের দিকে আমরা যখন চশমার আশা একেবারে ছেড়ে দিতে বসেছি তখন আমাদেরই

পাড়ার একটি ছেলে 'নরবলি'র কান ধরে নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবে টান্তে টান্তে হাজির কর্ল। তার মুখেই শুন্লাম যে কালীঘাটের কোন্ এক গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে সে ঠাকু'মার চশমাটা পরে নিতান্ত বিজ্ঞের মতই বাঁদর নাচ দেখ্ছিল।

সেই থেকেই তার আমাদের বাড়ীতে আসার স্রোতে ভাঁটা পড়্ল।

বছর ছ'-সাত বেমালুম চলে গিয়েছে। নরবলিরা আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ায় তার কথা আমরা এক রকম ভুল্তে চলেছি। হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যের মুখে তাকে দেখ্লাম একটা দোতালা বাসের ওপর থেকে। মনে হ'ল সে বোধ হয় আরও বেঁটে হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে। মাথায় মস্ত বড় দুশ্চিন্তা—সময় কাটান যায় কি করে। জান্তাম সময় কাটানোর পক্ষে নরবলির মুখের এঞ্জিন যথেষ্ট কার্য্যকারী। তাই একটুও দেরী না করে বাস্ থেকে নেমে পড়্লাম।

জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখ্লাম। কিছু বল্বার আগেই নিতান্ত আচম্কা শুন্লাম, "ইউ সিলিয়াস্ গুজ্, ডু ওয়াক্ উইথ্ ইওর আইজ্ শাট্?"

তার পর যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করেই সে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল। আমাকে দেখে একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে নিতান্ত সহজ সুরেই সে আমাকে বল্ল, "এক্স্কিউজ্ মি, আপনি সন্তুদা! তাই বলুন! আমি ভেবেছিলুম বুঝি বা কেউ বাজে-ক্লাস্এর হবে, তালকাণার মত চ'লে আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে।"

বল্লাম, "এ রকম ইংরিজি শিখ্লি কবে থেকে?"

"কেন?" সে উত্তর দিল, "একদিন চৌরঙ্গী দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ এক ব্যাটা সায়েবের সঙ্গে লাগ্ল গিয়ে আমার ধাক্কা। সেই ত' আমাকে চোখ পাকিয়ে ঐ সব কথা বল্ল।"

ফের্বার সময় তাকে বলে এলাম সুবিধে মত সে যেন আমাদের বাড়ী যায়। ভাব্লাম এত দিনে হয় ত' তার 'সেই গুণটা' চলে গিয়েছে।

পরের পয়সায় রেস্তোরাঁয় বেদম চপ্-কাট্লেট্ খাওয়ায় পেটের ভেতরকার নাড়িভুঁড়িগুলো সার্জ্জেন্টের তাড়াপ্রাপ্ত জনতার মত হ'য়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ! দুপুর

বেলা। বিছানার ওপর নিতান্ত নির্জ্জীবের মত পড়ে আছি। বোধ হয় একটুখানি তন্দ্রাও এসেছে। এমন সময় শুন্‌লাম, "হ্যাল্লো সন্তুদা! ব্যাপার কি?"

পাশ ফিরে শুয়ে 'ব্যাপারের' গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বল্‌লাম, "ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। আমায় এখন বিরক্ত করিস্ নি বল্‌ছি: ভয়ানক শরীর খারাপ।"

"শরীর খারাপ? সে যেন আকাশ থেকে পড়্‌ল। "বিরক্ত করা—সার্টেন্‌লি নট্, কিন্তু আপনার হয়েছে কি?"

"পেটের অসুখ। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নি—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দু'-চার্‌টে বড়ি ছাড়া।"

"ওঃ, তা হ'লে আর ভাবনা নেই।" সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস টান্‌লে। "হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এমন একটা কেপাসিটি আছে যে একটা বড়িতেই সব রকম অসুখ সেরে যেতে পারে।" সে তার বিরক্ত না করার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চল্‌ল। "জানেন, আমার ছোট কাকা 'ফ্রি'তে হোমিও-প্যাথিক ট্রিট্‌মেণ্ট্ করেন। তাঁর হাতে যে সমস্ত রোগী এসেছে কেউ বিশেষ কষ্ট পায় নি।"

মনে মনে বল্‌লাম, 'হুঁ, বোধ হয় কষ্ট পাবার আগেই তাদের ইহলীলা সংবরণ কর্‌তে হয়'। কিন্তু প্রকাশ্যে বল্‌লাম, "ওঃ, তা হ'লে তাঁর হাত-যশ আছে বল্‌তে হ'বে!"

উৎসাহ পেয়ে এক গাল হেসে সে বল্‌ল, "ঠিকই বলেছেন আপনি, তাঁর বেশ হাত-যশ আছে।"

মুখে এল বলি, "উত্তরাধিকার-সূত্রে তাই বুঝি সেটা তুমি পেয়েছ?" প্রকাশ্যে বল্‌লাম, "হ্যাঁ রে নরবলি, এত দিন তোর দেখা পাই নি কেন রে? তুই ছিলি কোথায়?"

নিতান্ত বে-পরোয়া চালে সে উত্তর কর্‌ল, "এক জায়গাতেই কি আর পার্মানেণ্ট্ হ'য়ে বসেছিলাম? কত দেশ-বিদেশ থেকে বেরিয়ে এলাম। জানেন সন্তুদা, একবার কিন্তু ভারী মজা হয়েছিল—"

চোখ বুজে নিতান্ত নির্লিপ্তের মত পড়ে রইলাম। কিন্তু কানে ত' আর

আঙুল দিয়ে থাক্‌তে পারি না। তাই তার কথাগুলো খানিক খানিক কানে যেতে লাগ্‌ল—

"...সেবার বিহার আর্থ-কোয়েকের চাঁদা তুল্‌তে কোথায় যেন গিয়েছিলাম। ফের্‌বার দিন দারুণ ভীড়। প্রত্যেক থার্ড্-ক্লাস কামরার দরজার কাছে লোকগুলো ঠেসাঠেসি করে জমাট মেরে গিয়েছে—ঠিক একেবারে কুল্‌পির মত। (মনে মনে ভাব্‌লাম কবি কালিদাস ত' নরবলির উপমার কাছে একেবারে খোকা।) হঠাৎ গাড়ীটা একটু দুলে উঠ্‌ল; আমি আর উপায় না দেখে এক লাফে একেবারে গার্ডের কাম্‌রায়।

"আমাকে রাণিং ট্রেনে জাম্প্ করে উঠ্‌তে দেখে গার্ড্ ব্যাটা ত' খুব প্লিজ্‌ড্! 'ক্লেভার বয়, ব্রেভ্ বয়' ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে সে ত' আমার পিঠ চাপ্‌ড়াতে সুরু করে দিল! সে ব্যাটার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু সন্তুদা, কথায় কথায় তার কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায়ের জন্যে যেই সে কথা পাড়্‌লাম অম্‌নি সে খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বলে, যারা চাঁদা তোলে তাদের ভেতর সাড়ে পনেরো আনাই না কি জোচ্চোর। আমার রক্ত মাথায় চড়ে গেল, এক কথায় দু'কথায় একেবারে হাতা-হাতি। আমি বাছাধনের গলায় এক 'নাগ-পাশ' প্যাঁচ কষে দিলাম। 'নাগপাশ' প্যাঁচ কি জানেন তো? গলাটাকে এন্‌সার্ক্‌ল করে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের ওপর প্রেসার দেওয়া। ব্যাটা তখন ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়্‌ছে। কনুইয়ের ওপর তখন দিলাম ঝেড়ে এক 'শক্তিশেল'। শক্তিশেল কাকে বলে জানেন বোধ হয়? সাডন্ শক্ দিয়ে নার্ভ্‌কে ইনার্ট্ করে একটা টেম্পোরারী প্যারালিসিসে নিয়ে আসা—"

তার গল্পের ভেতরকার উঁচুদরের গঞ্জিকার ধূম আমি আর বর্‌দাস্ত কর্‌তে পার্‌লাম না। সটান দাঁড়িয়ে উঠে তাকে বল্‌লাম, "এই, তুই বোস্, আমার নীচে একটু কায আছে।"

সে হঠাৎ কি রকম একটু বে-মানান ধরণের উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌ল, "তা বেশ, বেশ, আপনি কায সারুন গে, আমি বস্‌ছি।"

বাইরে বেরিয়ে আমি সোজা ঠাকু'মার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত আমার মাথায় ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ল—টেবিলের ওপর

আমার নতুন কেনা ভ্যাকুয়াম্-ফিলার্ পার্কার-পেন্টা পড়ে রয়েছে যে! আর মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা নয়। ঝাঁ ঝাঁ করে দু'-তিন্টে করে সিঁড়ি এক সঙ্গে টপ্কে ওপরে এলাম। কিন্তু যেটুকু আমার দেরী হয়েছিল তাই নরবলির "হাত্-যশের" পক্ষে যথেষ্ট। যা ভেবেছিলাম তাই, টেবিলের ওপর একখানা চিঠি পড়ে আছে—আমারই কলমে লেখা। হাতের কাছে সুবিধে মত অন্য কোনও কাগজ দেখ্তে না পেয়ে, কিংবা দেখ্তে পেয়েও তা মহাপ্রভুর মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি আমার সখের অটোগ্রাফ্ খাতার একটা পাতায় রবিবাবুর নামের ঠিক পরেই তাঁর হাতের লেখার অপূর্ব্ব মুক্তা ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন! যথাবিহিত নমস্কার, সম্মান ইত্যাদি বাদ দিলে চিঠিটা দাঁড়ায় এই রকম :

সন্তুদা',

আমার একটা 'পেন্'এর খুব দরকার। তাই আপনারটা নিয়ে চল্লাম। আপনাকে বলে আপনার মতটা নিয়ে যাওয়া হ'ল না, সেজন্য সত্যিই দুঃখিত। আশা করি আপনি এতে কিছু মনে করবেন না। আজ বিকেলের ট্রেনেই আমি চলেছি রংপুর। আবার কবে দেখা হ'বে ঈশ্বর জানেন।

ইতি—আপনাদের 'নরবলি'।

* * * *

'অটোগ্রাফ্' খাতায় লেখা তার চিঠি ও নাম-সইটা আজও আমি বিশেষ যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি। ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষ কিনা সে!

শীতের পোষাক

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

দেখিতে দেখিতে আবার শীত আসিয়া পড়িল। শীতে নানান্ অসুবিধা। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটা কবিতায় তার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন; যথা—শীতকালে পাখী গান করে না, ফুল ফোটে না, মলয় বাতাস বয় না—

"পাখী বলে আমি চলিলাম,
ফুল বলে আমি ফুটিব না,
মলয় কহিয়া গেল কানে কানে
বনে বনে আমি ছুটিব না।"

ইত্যাদি আরও অনেক। কবি অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত শীতকে খুব এক চোট ধমকাইয়া দিয়াছেন, এখানে আসিবার যে তার কোনও দরকার ছিল না তা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং অতঃপর তাকে তার একমাত্র উপযুক্ত জায়গা উত্তর দেশে গিয়া নিরিবিলি দিন কাটাইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

কিন্তু শীত ঋতু নিতান্তই বেরসিক। অত বড় একজন বিশ্ব-বিখ্যাত কবির কথাও সে শোনে নাই—বছরের পর বছর ঠিক একই সময়ে সে আসিয়া দেখা দিতেছে; সুতরাং মানুষকেই বাধ্য হইয়া তার সঙ্গে 'মোলাকাৎ' করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইতেছে। ব্যবস্থা বলিতে পাখীর গান আর ফুল ফুটাইবার ব্যবস্থার কথা আমি বলিতেছি না, ও সবের জন্য পৃথিবীতে খুব কম লোকই মাথা ঘামায়—লোকের ভাবনা শীতের উপযুক্ত জামা-কাপড় লইয়া।

জন্তু-জানোয়ারদের কিন্তু এ সব হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। শীতের সঙ্গে যুঝিবার উপযুক্ত জামা-কাপড় ভগবান্ই তাদের গায়ে দিয়া দিয়াছেন, তাদের গায়ের বড় বড় লোম শীতের হাত হইতে তাদের রক্ষা করে। বরঞ্চ মানুষকেই তাদের কাছ হইতে পোষাক ধার করিয়া কাজ চালাইতে হয়।

শীতের পোষাকের জন্য পশমই সব চেয়ে সুবিধার। সূতার জামা খুব মোটা করিয়া করিলেও বেশী শীতের মধ্যে তেমন কাজে আসে না। অবশ্য তূলার তৈরী লেপ না হইলে রাত্রে আমাদের আরাম হয় না, কিন্তু তূলা ভিতরে-দেওয়া জামা তেমন সুবিধার নয়। দেখিতে সুন্দর তো নয়ই, তা ছাড়া, তেমন শীতের সঙ্গে যুঝিতে হইলে সেগুলি এত পুরু করিতে হয় যে তা' গায়ে চাপাইয়া চলা-ফেরা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তার পর একবার ময়লা হইলে আর ধোয়াইবার উপায় নাই। কাজেই এদিক্ দিয়া তূলার চেয়ে পশম অনেক সুবিধার। তা' ছাড়া আর একটা কথা। কতকগুলি জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়া উত্তাপ খুব চট্ করিয়া

ঢুকিতে কিংবা বাহির হইতে পারে না। পশম এই ধরণের জিনিষ—সেই জন্যই পশমকে বলা হয় গরম কাপড়। শীতের দিনে আমাদের নিত্য ব্যবহারের বেশীর ভাগ কাপড়ই—যেমন ধর শাল, আলোয়ান, ফ্লানেলের শার্ট, সোয়েটার, পুল্-ওভার, গরম কোট্, আল্‌ষ্টার—সবই এই পশম দিয়া তৈরী।

এখন, কথা হইতেছে এত পশম আসে কোথা হইতে? ভেড়ার লোম দিয়া পশম হয় তা' তোমরা সবাই জান। সমস্ত পৃথিবীর শীত নিবারণ করিতে পারে এত ভেড়া পাওয়া যায় কোথায়? সূতার বেলা এ সব ভাবনা নাই—কারণ সূতার তূলা পাওয়া যায় গাছ হইতে। ঠিকমত চাষ করিতে পারিলেই যত খুসী তূলা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভেড়ার লোম না হইলেও লোকের চলে না, কাজেই মানুষকে বাধ্য হইয়া ভেড়ারও "চাষ"—অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে বলে "মেষপালন"—করিতে হয়। এক-একটা ভেড়া অনেক বার লোম দিতে পারে। একবার লোম বড় হইলে তা' কাটিয়া লওয়া হয়; কিছুদিন পরে আবার সেই ভেড়ার গায়ে লোম গজায়, আবার সে লোম কাটা হয়। এমনি করিয়া এক-একটা ভেড়া বার বার বহু পরিমাণ পশম যোগাইতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার একটি ভেড়ার খামার

পৃথিবীর নানা জায়গায় ভেড়া পোষা হয়। আমাদের দেশে কাশ্মীরের ভেড়ার লোম খুব নাম-করা। কাশ্মীরী পশমে তৈরী শাল-আলোয়ানের মত জিনিষ পৃথিবীতে বেশী হয় না। তিব্বতী ভেড়াও অনেক পশম যোগায় কিন্তু

আসল পশমের আড্ডা দেখিতে হইলে তোমাকে যাইতে হইবে অষ্ট্রেলিয়ায়। এখানে যে সব কাণ্ড হয় তাকে সত্যি সত্যিই "পশমের চাষ" বলা যাইতে পারে। ক্ষেতের ফসলের মতই সে পশমের পরিমাণ হয় অফুরন্ত। এই পশমের ব্যবসা করিয়া কত লোক এখানে একেবারে 'লাল' হইয়া গিয়াছে। হইবে নাই বা কেন? দু'-দশটা ভেড়া লইয়া তো তাদের কাজ নয়, এক-এক জন ব্যবসাদার হাজার হাজার ভেড়া পোষে। তাদের এক-একটা খামার পাঁচ—দশ—এমন কি বিশ মাইল লম্বাও হয়। এই সব খামারে ভেড়াকে চরান হয়, নানা রকম ভাবে তাদের যত্ন করা হয়। সব জাতের ভেড়ার লোম সমান হয় না। কোন কোন ভেড়ার লোম বেশ ঘন এবং পুরু হয়, আবার কোন কোনটার লোম চুলের মত পাতলা আর ফাঁক ফাঁক হয়। ভেড়ার লোম যা'তে পরিমাণে এবং গুণে উঁচুদরের হয় তার জন্য এই সব খামারে নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়।

পশমের কলের একটি দৃশ্য—লোমের জট ছাড়ান হইতেছে।

তার পর এত ভেড়ার লোম ছাঁটাই করাও এক কঠিন ব্যাপার। শুধু ছাঁটাই করা নয়, লোম সংগ্রহ করার পরেও অনেক কাজ আছে। লোমের সঙ্গে যে সব আঠা, তেল, ময়লা লাগিয়া থাকে সেগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। ধোয়ার পর শুকাইতে হয়, জট ছাড়াইতে হয়, আঁচড়াইতে হয়, তার পর সে পশম সূতার মত করিয়া পাকাইতে হয়। এত বড় খামারে এ সমস্তই খুব বিরাট্ ব্যাপার। অধিকাংশ জায়গায়ই এ সব কলে করা হয়। কলে ধোয়া, মোছা, জট ছাড়ান, আঁচড়ান, সূতা পাকান—সবই হয়। এ সবের জন্য বিরাট্ বিরাট্ যন্ত্র

বসান থাকে। ফলে সব ব্যাপারই অসম্ভব রকম তাড়াতাড়ি আর নিখুঁত ভাবে হইয়া থাকে।

সুতা পাকাইবার পরে পশমগুলিকে ইচ্ছামত রং করা যায়। বলা বাহুল্য এও কলের সাহায্যেই হয়। তার পর পশমের কারখানায় লইয়া সে পশম কলে বুনিয়া ইচ্ছামত শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, ফ্লানেল, কোটের কাপড় ইত্যাদি তৈরী হয়। পশমের কারখানা যে ঐ একই জায়গায় থাকিবে তার কোন মানে নাই। পৃথিবীর নানা জায়গায় পশমের কারখানা আছে—আমাদের দেশেও কানপুর প্রভৃতি অনেক জায়গায় আছে।

চমরী জাতীয় গরু—শীতপ্রধান দেশে এদের লোমের ভয়ানক কদর

কিন্তু ভেড়ার লোমের পশমই পৃথিবীতে শীত নিবারণের একমাত্র জিনিষ নয়, আরও নানা রকম জানোয়ারের লোম ও চামড়া শীতের পোষাকের জন্য লোকে ব্যবহার করে। যেমন ধর—চমরী গাই এর লোম, তিব্বতী ছাগলের লোম, উটের লোম, আলপাকার লোম, কোন কোন পাখীর পালক।

যে সব জানোয়ারের লোম কাটিয়া লওয়া যায় সেগুলির লোমই লওয়া হয়, জীবনের কোনও ক্ষতি করা হয় না। কিন্তু যেগুলির শুধু লোম কাটিয়া লওয়া যায় না, চামড়াশুদ্ধ লইতে হয়, সেগুলিকে একেবারেই মারিয়া ফেলিতে হয়। আদিম যুগের মানুষ মাংসের জন্য যে সব জন্তু শিকার করিত তাদেরই চামড়া লইয়া গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করিত। এখনও মেরুর কাছাকাছি দেশে এস্কিমোরা এই ভাবে জন্তু শিকার করিয়া খাওয়া, পরা দুই কাজই চালায়। ভালুকের চামড়া তাদের একটা সাধারণ 'গরম কাপড়'। রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রভৃতি শীতের রাজ্যেও ভালুকের চামড়ার প্রচুর চলন আছে।

যে জানোয়ার যে রকম জল-হাওয়ায় থাকে তার চেহারাও হয় সেই অনুযায়ী। গরমের দেশে যে সব জানোয়ার বাস করে তাদের গায়ে এজন্য কখনও বড় বড় লোম হয় না, যে সব জানোয়ার শীতপ্রধান দেশে থাকে হয় তাদেরই গায়ে। কাজেই শীতের কাপড়ের জন্য চামড়া সংগ্রহ করিতে শিকারীকে দারুণ শীতের মধ্যেও শীতের দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। শীতের মধ্যে বলিতেছি এই জন্য যে শীতকালেই এই সব জানোয়ারের গায়ের লোম ভাল করিয়া গজায়—গ্রীষ্মকালে অনেক সময় ঝরিয়া পড়ে। এই চামড়া সংগ্রহ করিবার জন্য শিকারীরা সময়ে সময়ে যে কি ভীষণ রকম কষ্ট সহ্য করে তা' ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। পৃথিবীর কত অঞ্চল হইতে যে এ চামড়া সংগ্রহ করা হয় তাহারও হিসাব একটি বিস্ময়কর জিনিষ।

এই চামড়ার লোভে শিকারীরা অপকর্ম্মও বড় কম করে না। শীতপ্রধান দেশে বীভার নামে এক রকম খরগোসের মত ছোট ছোট জন্তু আছে। এদের কথা বছর কয়েক আগে একবার রামধনুতে লিখিয়াছিলাম। ভারী বুদ্ধিমান্ জন্তু এগুলি, আর এদের মত ওস্তাদ কারিগর জানোয়ারের রাজ্যে দু'টি মেলা ভার। এই জন্তুগুলির একমাত্র অপরাধ—এদের গায়ের চামড়া বড় সুন্দর। যেমন চমৎকার বাদামী রং তেমনি মোলায়েম, মখমলের মত নরম, পুরু, ঘন লোমে ঢাকা। শুধু শীত নিবারণের পক্ষে নয়, ফ্যাশনের জন্যও এই বীভারের চমড়ার ভয়ানক চাহিদা। এই চামড়ার লোভে শিকারীর দল বীভার মারিয়া মারিয়া আজ এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে শীঘ্রই বোধ হয় এদের বংশ পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে।

বীভার

শীত-কাপড় যোগাইতে যোগাইতে বীভারের মত আরও দু'টি প্রাণীর বংশ লোপ হইবার যোগাড় হইয়াছে। এক নম্বর হইতেছে সামুদ্রিক ভোঁদড়। এদের লোমের রং ধূসর-খয়েরী মিশান, মাঝে মাঝে কালোও হয়। কোন কোনটার আবার আগার দিক্‌টা রূপালি। লোমগুলি এত সুন্দর যে বাজারে অসম্ভব দামে সেগুলি বিক্রী হয়। কাজেই লোভী শিকারীর দল এদেরও যে মারিয়া মারিয়া নিঃশেষ করিয়া আনিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? দুই নম্বর হইতেছে লোমওয়ালা সীল। এদেরও বংশ লোপ পাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

ডাঙ্গা হইতে আট হাজার ফুট্ উপরকার রাজ্যের দারুণ শীতের উপযোগী হাল্কা পালকের পোষাক। বলা বাহুল্য ইনি একজন এরোপ্লেন-চালক।

এ সব ছাড়া আরও অনেক জানোয়ারের চামড়া গরম কাপড়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন ধর লিঙ্ক্‌স্ (বিড়াল জাতীয় জীব), কাঠ-বিড়ালী, ইঁদুর ইত্যাদি। ইঁদুরের চামড়া যে নেহাৎ ফেল্‌না নয় তা গত রুশ-জাপানের যুদ্ধে জাপানীরা দেখাইয়াছিল। চীনে প্লেগ্ দেখা দিল, লোকে ইঁদুর দেখিলেই মারিয়া ফেলে, আর জাপানীরা আসিয়া সস্তা দরে সে ইঁদুর কিনিয়া লইয়া যায়। কেহ বুঝিতে পারে না জাপানীরা এত ইঁদুর দিয়া কি করে। তার পর রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধিতেই সমস্ত ব্যাপার বুঝা গেল। জাপানীরা ইঁদুরের চামড়া দিয়া তাদের সৈন্যদের জন্য কান-ঢাকা টুপি তৈরী করিয়াছে—আর শীত নিবারণের জন্য সে টুপি আশ্চর্য্য রকম কাজ দিতেছে!

মেম-সাহেবদের গলায় শেয়ালের চামড়া তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ।

শেয়ালের চামড়া কিন্তু খুব ফ্যাশনের শীত-কাপড় এবং বেশ দামী জিনিষ। কোন কোন শেয়ালের—বিশেষতঃ 'সিল্‌ভার ফক্স' নামে এক জাতের, শেয়ালের লোমের তো কথাই নাই। এমন চমৎকার লোম নাকি খুব কম জানোয়ারেরই আছে। এ লোম যেমন ঘন, তেমনি নরম, তেমনি পুরু আবার তেমনি সুন্দর। রংও এগুলির অদ্ভুত। কালো, রেশমের মত উজ্জ্বল, আর আগাটা রূপালি। এই জাতের শেয়াল নাকি পৃথিবীতে খুব বেশী নাই তাই এদের লোমের দাম খুব বেশী। কয়েক বছর হইল এক বুদ্ধিমান্ ব্যবসাদার এই শেয়াল পুষিয়া তার লোমের ব্যবসা চালাইবার পথ দেখাইয়াছেন। 'পুষিয়া' অর্থে ভেড়ার মত খামারে রাখিয়া বছর বছর তার লোম কাটিয়া লওয়া নয়—কারণ না মারিলে এদের লোম পাওয়া যায় না; শেয়ালগুলিকে রীতিমত পালন করিয়া, তাদের বাচ্চাগুলি বড় হইলে তাদের যে আবার বাচ্চা হয় তাহারই দুই-একটা মারিয়া এই লোম সংগ্রহ করা হয়। অনেকগুলি শেয়াল থাকায় দু'-একটা মারিলে বেশী গায়ে লাগে না—অবশ্য এই শেয়াল জ্যান্ত এক-এক যোড়ার দাম প্রায় ৫৪০০০ টাকা।

দি হিমাচালিয়ান্ আর্ট্ গ্যালারী

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

আর্ট্ স্কুল থেকে তখনও পাশ করে বার হই নি, তবে হব হব কর্‌ছি। স্কুলের মাষ্টার মশাইরা প্রত্যহই আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন ভাল ভাল সব কথা—কোন একটা জিনিষের হুবহু ফটো এঁকে দিলেই তা আর্ট্ হয় না; কবিতা লিখ্‌বার আগে কবির মনে যেমন প্রেরণা আসা দরকার, ছবি আঁকবার আগেও আর্টিষ্টের মনে চাই তেম্‌নিধারা একটা প্রেরণা ইত্যাদি। কিন্তু থাকি মেসে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ঠাকুরের রান্না খেয়ে কেবল রোস্তারাঁর প্রেরণাই মনে জাগে; যারা আরও একটু ভাবপ্রবণ তাদের কল্পনাটা অবশ্য আরও একটু উপরের ধাপে

ওঠে—চোখের সাম্‌নে কেবল ভাস্‌তে থাকে আস্ত পাঁঠা আর ইল্‌সে মাছ। কাজেই ও দুটো জিনিষ আঁক্‌বার সময়েই শুধু আমাদের তুলির টান অসম্ভব রকম খুলে যায়।

আমাদের বামুন ঠাকুরের "ধৃষ্টদ্যুম্ন' নামটা কিন্তু তার বাপ মায়ের দেওয়া নয়, এমন কি কোন আত্মীয়-বন্ধুরও নয়। তার ওই মহাভারী মহাভারতীয় নামটির জন্য ঋণী সে আমাদেরই এক সুরসিক 'মৈসিক' বন্ধুর কাছে। ব্যাস ঋষির মতে দ্রৌপদীর মত পাকা রাঁধুনী নাকি ভূভারতে আর হয় নি। তফিলে খাবার জিনিষের টান যতই পড়ুক না কেন, ম্যানেজ তিনি ঠিক করে দিতেন। এক কণা শাক দিয়ে অক্ষৌহিণী লোকের পেট ভরান কি সোজা কথা? ভাব্‌তাম্ এই দেব-দুর্ল্লভ গুণটা বুঝি কলিকালে একেবারেই বিরল, কিন্তু কটক জেলার এক গণ্ডগ্রামে আর এক ব্যক্তি যে সেই অলৌকিক শক্তি নিয়ে জন্মেছিল এ কথা কে জান্‌ত? বরাবরই আমরা লক্ষ্য কর্‌তাম, মেসে যে কোন সময়ে যত জন অতিথিই আসুক না কেন, মাছের ঝোলে কখনই কম্‌তি পড়ে না। এ রহস্যের উৎস কোথায় আবিষ্কার কর্‌বার জন্য একদিন সবাই মিলে রান্নাঘরে আড়ি পাত্‌লাম; দেখ্‌লাম বামুন ঠাকুরের হাতের সাম্‌নেই হল্‌দে রংয়ের একখানা ন্যাতা রয়েছে; সেটির সাহায্যে ঠাকুরমশাই প্রয়োজন মত খুন্তি সাফ্ করছেন, কড়ায়ের ময়লা উঠাচ্ছেন, ডালের ডেক্‌চির চার পাশ মুছে দিচ্ছেন, আর মাছের ঝোলের পরিমাণ কম হবার সম্ভাবনা দেখ্‌লেই ন্যাকড়াখানাকে জলসিক্ত করে গামছা নিঙ্‌ড়াবার মত ঝোলের ওপর নিঙ্‌ড়ে দিচ্ছেন। কাছেই পরিষ্কার একটা বাটিতে এক বাটী নির্ম্মল ঝোল আলাদা করে তুলে রাখা হয়েছে; অসময়ে হঠাৎ যদি কোন অতিথির আবির্ভাব হয় তারই জন্য হয়তো এ ব্যবস্থা, কিন্তু অবিনাশের পাপ মন, সে বল্‌লে বামুন ঠাকুরের নিজের জন্যই ও ঝোল আলাদা করে তুলে রেখেছে। এতগুণ দ্রৌপদীতেও সম্ভব ছিল না, এ তারও এক কাঠি ওপরে, অর্থাৎ তার বড় ভাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। রসিকচূড়ামণি কানাই তাই সেদিন থেকে ঠাকুরের নাম রাখ্‌ল ধৃষ্টদ্যুম্ন—তার মতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নাকি দ্রৌপদীর চেয়ে মিনিট কয়েকের বড় ছিল।

নামটা বোধ করি আমাদের ঠাকুরের অতিমাত্রায় পছন্দ হয়েছিল, ক'দিন বাদেই সে আবার তার এক অদ্ভুত গুণের পরিচয় দিল—শুধু অদ্ভুত নয়, একেবারে অত্যদ্ভুত! রাঁধ্‌তে দেওয়া হয়েছিল তাকে সেদিন শুধু মুগের ডাল, খাবার সময় আসনে বসে দেখি প্রত্যেকের পাতে পাতে সে পাকা রুই মাছের কাঁটা দিয়ে রান্না চমৎকার মুগের ডাল পরিবেষণ করে যাচ্ছে। পেটে তখন সবারই অসহ্য খিদে, পরমানন্দে সকলে তাই পাকা রুইয়ের রসাল, নধর কাঁটাগুলো চুষ্‌তে লাগ্‌লাম, কারো মনে একবারটিও প্রশ্ন জাগ্‌ল না যে আজ বাজার থেকে বড় মাছ আনাই হয় নি, তবে ঠাকুর রুইয়ের মোটা মোটা কাঁটাগুলো পেলে কোথা? কিন্তু অবিনাশের পাপ মন, হঠাৎ দেখি সে ওয়াক্ ওয়াক্ কর্‌তে কর্‌তে কয়েক পা উঠে গিয়েই একেবারে একরাশ বমি করে ফেল্‌ল, দুর্জ্জয় রাগের সঙ্গে নাকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "ব্যাটা গাঁজাখোর, উনুনে ডাল চড়িয়ে দিয়ে কল্‌কের খোঁজে গেছ্‌ল, ফুটন্ত ডালের ভেতর ইঁদুর লাফিয়ে পড়েছে তা খেয়ালেই আসে নি! মাছের কাঁটা বলে মেসশুদ্ধু সবাইকে ইঁদুরের হাড় চুষিয়ে ছেড়েছে—আমার পাতে পড়েছে আস্ত লেজটা, দেখ্‌গে—ওয়াক্ ওয়াক্ থুঃ থুঃ!"

পাঠক-পাঠিকারা হয়তো ভাব্‌ছেন, কী সব অবান্তর কথা বলে আমি তাঁদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট কর্‌ছি! আসল গল্প কোথায়, তার তো টিকিও দেখা যাচ্ছে না! যাবে, যাবে, শুধু টিকি নয়, টিকি থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাবেন। তবে গোড়ার এ সব কথাগুলো একটু বলে রাখা ভাল এই জন্য যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঠাকুর এভাবে আমাদের মনে প্রত্যহ নতুন খাবারের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে না তুল্লে ছুটীর দিনে ষ্টোভে করে নিজেরা মাংস রাঁধ্‌বার পরিকল্পনা আমরা কখনই কর্‌তে পার্‌তাম না। আর সে রকম পরিকল্পনা না কর্‌লে সেই বিশেষ রবিবার দিনটিতে মাংস কিন্‌বার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আমি জগুবাজারে কিছুতেই এসে উপস্থিত হ্‌তাম না। আর সেদিন জগুবাজারে না এলে এ গল্প এ জীবনেও যে তাঁদের শোনাতে পারতাম না তা ধ্রুব সত্য। সামান্য ব্যাপার থেকে সুরু করে কত বড় বড় ঘটনা এ পৃথিবীতে তো রোজই ঘট্‌ছে।

মাংস কিনে সবে জগুবাজার থেকে বার হয়েছি এমন সময় এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল; এক সুবিশাল ভুঁড়ি এবং সুগোল দেহের অধিপতি হাঁটতে হাঁটতে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এক রিক্স-ওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করছেন দেখতে পেলাম। অদূর ভবিষ্যতে ওই হিন্দুস্থান-নন্দনটির কি দশা হবে ভেবে শিউরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি দরের বনিবনা হয়ে গেছে, বাবু রিক্সতে চাপতে যাচ্ছেন আর রিক্সওয়ালা তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্ত্ত পরেই খটাস্ করে একটা শব্দ—রিক্সের সম্মুখকার ডাণ্ডাটা

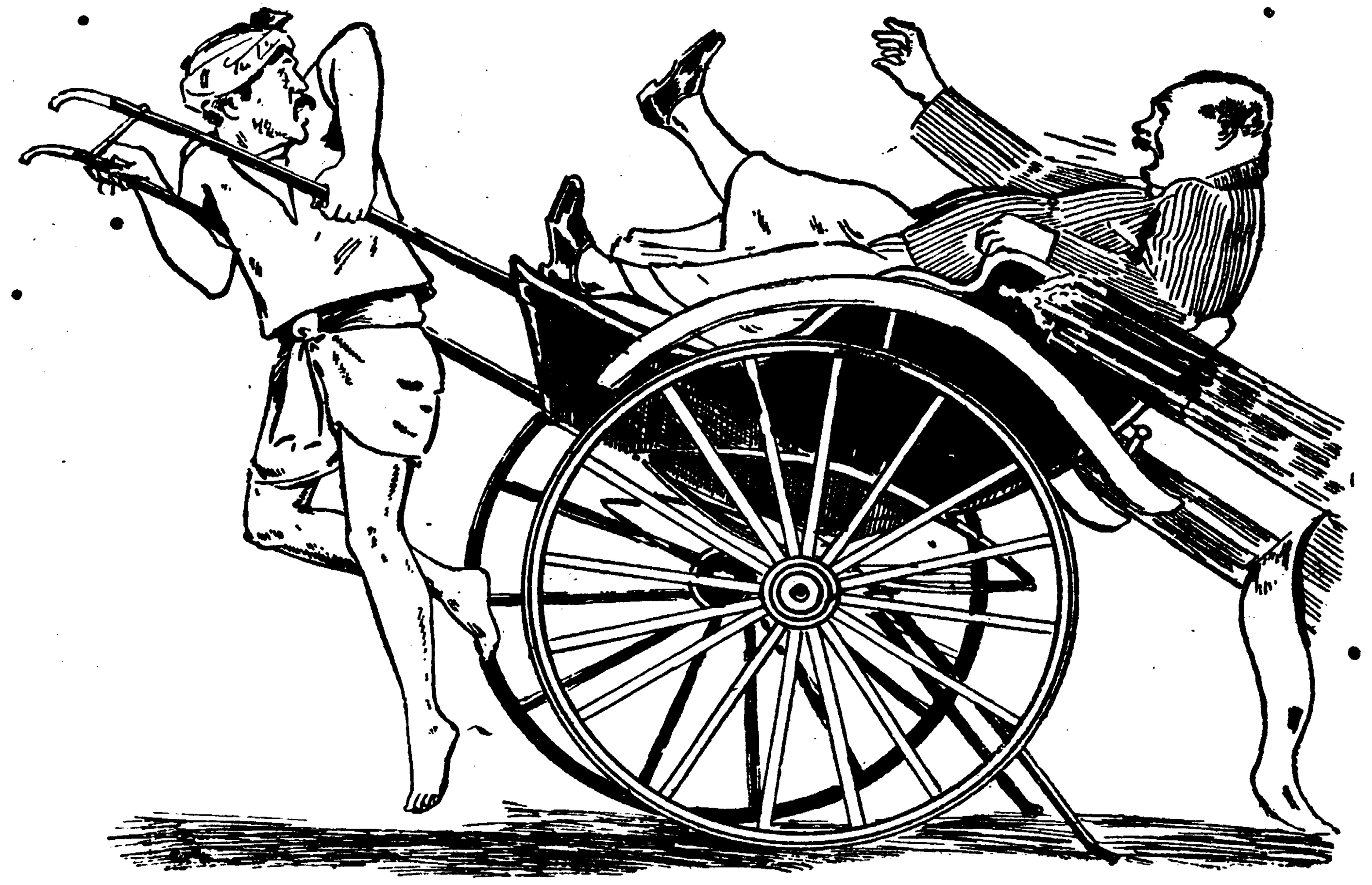

রিক্সওয়ালা মাটী থেকে এক হাত উপরে উঠে পড়ে ঝুলছে

সজোরে রিক্সওয়ালার বগলে আঘাত করল আর পেছনের অংশটা ভুঁয়ে একেবারে মাটীতে মিশে যাবার জো হল। তার পরেই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে যা দেখলাম তা লিখলে অনেকে হয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন, কিন্তু অকপট ভাবে বলছি ব্যাপারটা যথার্থই সত্য—দেখলাম হিন্দুস্থান-তনয়টি মাটী হ'তে এক হাত উপরে উঠে পড়ে ডাণ্ডা ধরে আকুলি-বিকুলি করছে আর ভুঁড়্যধিকারী মশায়ের পিঠটা এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে তার

সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে আমাদের জ্যামিতির মাষ্টার মশাই বলতেন "প্যারালাল্ টু দি গ্রাউণ্ড্।"

কি করব ভাবছি, এমন সময় এক মুখ পান আর এক গাল হাসি নিয়ে পরেশ আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল, বলল "নিজে আর্টিষ্ট হয়ে হিমাচল বাবুর এই দুরবস্থা চোখে দেখছিস্? উনি ঘাল হলে তোদের আর্ট্ সবাইকে বুঝিয়ে দেবে কে? সমালোচনা করবে কে?"

"কী? উনি আর্টের সমালোচক নাকি?"

"ভা—লো! হিমাচল বাবুর নাম শুনিস্ নি?"

"কে, যিনি বৈজ্ঞানিক ভোজ দিয়েছিলেন?"

"আরে না না, এ আর এক হিমাচল বাবু, হিমাচল বল, ছবির মস্ত বড় সমঝদার। অসাধারণ নাকি এঁর কলাজ্ঞান। 'সৌন্দর্য্যম্ বাং' নামে কিছুদিন আগে আর্ট্ সম্বন্ধে যে একখানা মাসিক পত্র বেরিয়েছিল উনিই তো ছিলেন তার সম্পাদক। কাগজটা ভাল চলল না, তাই সেটা উঠিয়ে দিয়ে আজকাল উনি একটা আর্ট্ গ্যালারী খুলেছেন; ভাল ভাল ছবি সেখানে কমিশন সেলে বিক্রী হয়। আজকাল ফি শনিবারে ওঁর দোকানে মজুত ছবিগুলো সম্বন্ধে উনি বক্তৃতা দেন, অনেক লোক শুনতে যায়। 'দি হিমাচালিয়ান্ আর্ট গ্যালারী'র নাম জানিস না? আচ্ছা আর্টিষ্ট তো তুই!"

পরেশের শেষ কথাগুলো আমার কানে ঢুকেও যেন ঢুকতে চাইল না, আমি তখন শুধু হিমাচল বাবুর উঠিয়ে-দেওয়া মাসিক খানার কথাই ভাবছি। সৌন্দর্য্যম্ বাং! একি ভাষা বাবা! প্রকাশ্যে বললাম, "কাগজের নাম সৌন্দর্য্যম্ বাং? কথাটার মানে কিরে?"

পরেশ একটু মুচকি হেসে বলল, "আরে গোড়াতেই কি আর ওনাম ছিল? গোড়াতে ছিল শুধু 'সৌন্দর্য্যম্'; কিন্তু লোকে যখন ভাবতে আরম্ভ করলে 'সৌন্দর্য্যম্ তাং', তখন বাধ্য হয়েই ওঁকে লিখতে হল 'সৌন্দর্য্যম্ বাং'।"

মনে মনে ভাবলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ঠাকুর তো গাঁজার কল্‌কে কাড়ুকে ধার দেয় না, তবে পরেশ এ ধরণের কথা বলছে কেন? পরেশও বোধ করি আমার মনের ভাব

বুঝতে পেরেছিল, বল্‌ল "ভাব্‌ছিস্ বুঝি আমি গাঁজা খেয়ে বাজে বোল ছাড়্‌ছি। তা নয়, ব্যাপারটা—তা হলে বুঝিয়ে বলি শোন। আর্টের একজন যথার্থ বড় সমঝ্‌দার অনেকটা ওই ধরণের একখানা কাগজ বার করেছিলেন বলে হিমাচল বাবুও ওঁর কাগজের নাম রাখ্‌লেন 'সৌন্দর্য্যম্'। কাগজের নাম 'সৌন্দর্য্যম্' শুনে অনেকের মনেই সন্দেহ হতে লাগ্‌ল—কোন্ ভাষার কাগজ এটা! বাংলা ভাষায় আমরা তো আর নামের শেষে অনুস্বর দিই না, ওটা মাদ্রাজীদেরই মনোপলি। আমরা লোকের নাম রাখি রামানুজ, ওরা রাখে রামানুজম্, আমাদের দেশে জায়গার নাম হয় মাঝেরহাট বা বিবিরপট ওদের দেশে হয় ভিজাগাপটম্। কাজেই কারো কারো মনে ধারণা জন্মাল, হয়তো কোন মাদ্রাজীর পরিচালিত তামিল ভাষারই কাগজ ওটা। এক দিন হিমাচল বাবুর কাছে একখানা চিঠি এল—তার শিরোনামায় লেখা 'হিমাচলবলম্, এডিটার, সৌন্দর্য্যম্'। সেই দিনই হিমাচল বাবু কাগজের নাম একটু বদ্‌লে রাখ্‌লেন, 'সৌন্দর্য্যম্ বাং' অর্থাৎ 'সৌন্দর্য্যম্ তাং' নয়—তামিল ভাষায় লেখা নয়, বাংলা ভাষায় লেখা।"

মেসে এসে ঘটনাটা সকলের কাছে প্রকাশ কর্‌লাম; দেখ্‌লাম আমার চেয়ে আর সকলেই পৃথিবীর খবরটা কিছু বেশী রাখে। হিমাচল বলের নাম কারো কাছেই অজানা নয়, তাঁর আর্ট্-গ্যালারী আর শনিবাসরীয় বক্তৃতার কথাও প্রায় সবাই জানে, এবং মনে মনে তাঁর কলাজ্ঞানের প্রশংসাও করে সকলেই। শুধু অবিনাশের পোপ মন, সে নাক সিঁটকে বল্লে, "হুঁঃ, হিমাচালিয়ান্ আর্ট গ্যালারী! নাম হওয়া উচিত ছিল 'হিমাচালিয়াৎ আর্ট্ গ্যালারী' অর্থাৎ কিনা হিমা চালিয়াতের আর্ট্ গ্যালারী। লোকটা পয়লা নম্বরের চালিয়াৎ হে! কলাজ্ঞান না আরো কিছু! আছে কেবল কাঁচকলা জ্ঞান।"

কিন্তু অবিনাশের কথায় আমি আমলই দিলাম না; মনে মনে ভাব্‌লাম, আর্টিষ্ট্ হয়ে বার হবার মুখেই যখন এত বড় একজন বোদ্ধা সমঝ্‌দারের সন্ধান পেয়েছি তখন এ সুযোগ হাতছাড়া করা হবে না কিছুতেই। সময় পেলেই তাঁর কাছে ছুটে যাব, তাঁকে ছবি দেখাব, তাঁর উপদেশ গ্রহণ করব। এ সময় তাঁর

সন্ধান পাওয়া আমার পক্ষে ভগবানের একটা বিশেষ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক দিন তাই অবিনাশের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও অনেকগুলো ছবি বগলে করে দলবল সমেত রওনা হয়ে পড়্‌লাম 'দি হিমাচালিয়ান্ আর্ট গ্যালারী'র উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়েই যে দৃশ্য দেখ্‌লাম তাতে হিমাচল বাবুর উপর আমাদের ভক্তি আর সম্ভ্রম একেবারে দশগুণ বেড়ে গেল। একখানা ছবি নিয়ে এক সাহেব আর্টিষ্টের সঙ্গে তখন তিনি গভীর তত্ত্বের আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সাহেবটি বাংলা জানে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় হিমাচল বাবুর সঙ্গে সে আলাপ কর্‌ছিল, কিন্তু কী সম্ভ্রম তাঁর হিমাচল বাবুর প্রতি! হিমাচল বাবু একখানা চেয়ার দেখিয়ে বার বার বল্‌ছিলেন, "আপনি বসুন্ না! আপনি বসুন্ না!" কিন্তু অত বড় একজন লোকের সাম্‌নে চেয়ারে বস্‌তে তার সরমে বাধ্‌ছিল, যতবারই তিনি বস্‌তে অনুরোধ কর্‌ছেন ততবারই লজ্জায় এবং সম্ভ্রমে তার কান অবধি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ছে। সাহেব পর্য্যন্ত যাঁকে এতখানি শ্রদ্ধা করে তাঁর উপর আমাদের মনের ভাব কি রকম হয়ে উঠ্‌বে পাঠক-পাঠিকারা তা সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

আমাদের ঘরে ঢুক্‌তে দেখে সাহেব আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ল না, ছবির তাড়া গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থানের উপক্রম কর্‌ল। হিমাচল বাবু তাকে কয়েকখানা ছবি রেখে যেতে অনুরোধ কর্‌লেন, কিন্তু "সেগুলির কাম আছে" বলে সব ক'খানা ছবিই বগলদাবা করে সাহেব বার হয়ে গেল; যাবার বেলায় একটা "গুড্ আফ্‌টারনুন্" পর্য্যন্ত বলে গেল না। তার এই শেষের দিকের ব্যবহারটা আমাদের সকলের কাছেই কেমন যেন একটু বেমানান বলে মনে হল।

যা হোক্ আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে আগমনের উদ্দেশ্যটা জানালাম। বলা বাহুল্য, সাহেবের অনুকরণে আমরাও সবাই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হিমাচল বাবু একটু প্রসন্ন হাসি হেসে বল্‌লেন, "কই, ছবিগুলো এনেছেন? ওঃ, এইগুলোই বুঝি; দেখি! প্রথমেই তিনি চোখের সাম্‌নে ধরলেন আমারই আঁকা একখানা ল্যাণ্ডস্‌কেপ্। ছবিখানা খুবই মন দিয়ে এঁকেছিলাম, বন্ধুরা, এমন কি আমাদের প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত ওখানার প্রচুর সুখ্যাতি করেছিলেন। হিমাচল বাবু কিন্তু একবার মাত্র তাকিয়েই ছবিখানার অনেকগুলো খুঁৎ বার করে দিলেন যা আর

কারো চোখেই পড়েনি ; বল্লেন, "আপাতঃদৃষ্টিতে বেশ ভাল বলেই মনে হয় কিন্তু নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে ছবিখানাতে যে প্রাণের স্পন্দন কম তা সহজেই ধরা পড়ে যাবে। অনুপ্রেরণাটা ঠিক আসেনি, তাই প্রাণের সাড়া পাচ্ছি না। যদি একটু হতাশার হুহু ভাবের সঙ্গে কোকিলের কুহু কুহু ভাব এর ভেতর ফোটাতে পার্‌তেন তো দেখ্‌তেন এই ছবিই কেমন প্রাণবন্ত হয়ে দাঁড়াত।" তারপর ছবিখানা আরও একটু দেখে নিয়ে ফের বল্‌লেন, "এই জায়গাটাতে রং ঠিক হয়নি, হওয়া উচিত ছিল খুব গাঢ় কিন্তু ফিকে।"

কথাটা ঠিক বোধগম্য হল না, গাঢ় হলে তা আবার ফিকে হয় কি ভাবে? মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্‌লাম, "আজ্ঞে কি বল্লেন, খুব গাঢ় কিন্তু ফিকে?"

"হ্যাঁ, গাঢ় কিন্তু ফিকে। ব্যাপারটা মোটেও শক্ত নয়, ওটা নির্ভর করে তূলির হ্যাণ্ডেলটাকে ঠিকমত ধরার ওপর। আমাদের আর্টিষ্ট্‌রা প্রায়ই তূলি ঠিক ধর্‌তে জানেন না ; তূলি ধর্‌তে হবে খুব শক্ত করে ঢিলে ভাবে।"

এবার একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম ; এতদিন এত লোকে ছবি আঁক্‌তে শিখিয়েছে অথচ আসল কথাটি কেউই বুঝিয়ে বল্‌তে পারে নি। কী সহজ সরল পন্থা—তূলিটাকে ধর্‌তে হবে খুব শক্ত করে ঢিলে ভাবে! মনে মনে বারকতক আওড়ালাম—খুব শক্ত করে ঢিলে ভাবে। খুব শক্ত করে ঢিলে ভাবে।

এই ধরণের আরো কয়েকটি মহামূল্য উপদেশ গ্রহণ কর্‌বার পর সেদিনকার মত সকলে বিদায় নিলাম। আস্‌বার আগে জানিয়ে এলাম, কালই এসে তাঁর গ্যালারীর জন্য বড় বড় কয়েকখানা ছবি রেখে যাব।

রাস্তায় নেমে পরস্পর বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লাম, নাঃ বাস্তবিকই একজন গুণী লোক বটে। আর তা নইলে সাহেব কখনো অতখানি খাতির করে—কিছুতেই সাম্‌নে চেয়ারে বস্‌তে রাজী হল না!

কিন্তু অবিনাশের বরাবরই পাপ মন, সে বলে উঠ্‌ল, "ব্যাপারটা বুঝেছ তবে ঘেঁচু! সাহেবের বাংলাজ্ঞান আমারই মত, বোধ করি হিমাচল বাবুর ইংরিজীজ্ঞান আরও চমৎকার দেখে বাংলাতেই কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিল। হিমাচল বাবু যতবার চেয়ার দেখিয়ে ওকে 'বসুন না!' বলেছে ও তত বারই মনে করেছে ওকে বুঝি

ওই চেয়ারে বস্‌তে বারণ করা হচ্ছে। যদি শুধু 'বসুন্' বলা হ'ত তা হলে সাহেব কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌ত কিন্তু 'না' যোগ করাতেই যত গণ্ডগোল বেধেছে—ভেবেছে 'বসুন না' মানে 'বস্‌বেন না!' দেখ্‌লি না, রাগে আর অপমানে চেহারাটা কেমন বেগ্‌নে হয়ে উঠ্‌ছিল। যাবার সময় তাইতো একখানা ছবিও রেখে যেতে রাজী হল না, একটা 'গুড্ আফ্‌টারনুন' বলে ভদ্রতা পর্য্যন্ত জানিয়ে গেল না।" সবাই মিলে অবিনাশকে ধম্‌কে থামিয়ে দেওয়া হল।

পর দিন কুলীর মাথায় নানা আকারের বড় বড় খানকতক ছবি চাপিয়ে 'দি হিমাচালিয়ান্ আর্ট্ গ্যালারী'তে এসে হাজির হওয়া গেল। সবগুলি ছবিই এনেছিলাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের—হিমাচল বাবু এক একখানা করে দেখে সেগুলো তুলিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লেন আর অনুগ্রহ করে একথাও জানিয়ে দিলেন যে আস্‌ছে শনিবারের বক্তৃতাতেই এগুলির ব্যাখ্যা তিনি কর্‌বেন। সচরাচর তাঁর শনিবাসরীয় সভাতে যত লোকের আমদানী হয় সেদিন নাকি তার চাইতে অনেক বেশী লোকের আস্‌বার কথা, কেননা অনেক বড় বড় আর্টিষ্ট আর গুণিলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

বক্তৃতার দিন—শনিবার—ক্রমে এসে পড়্‌ল। এ ক'টা দিন আমার কি ভাবে কেটেছে তা বোধ করি এক অন্তর্য্যামীই জানেন। কল্‌কাতার সমস্ত সুধীসমাজের সাম্‌নে আমার ছবির ব্যাখ্যা হবে, আর সে ব্যাখ্যা কর্‌বেন অন্য কেউ নয়, স্বয়ং হিমাচল বাবু!

অবিনাশটার জন্য আমাদের রওনা হতে দেরী হয়ে গেল ; আসরে গিয়ে আমরা যখন পৌঁছেছি ততক্ষণে বক্তৃতা সুরু হয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে একখানা ছবি খাটান, অনেক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে হিমাচল বাবু ছবিখানার নানা জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তার বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, আর সে ব্যাখ্যায় প্রশংসা যেন উপ্‌চে পড়্‌ছে। আহা, কে এ ভাগ্যবান্ শিল্পী!

দীর্ঘ বক্তৃতাটির শেষ ভাগে এসে হিমাচল বাবু বল্‌লেন, "আপনারা শুনে সুখী হবেন, এ ছবিখানি এঁকেছেন এক উদীয়মান শিল্পী ; তাঁর নাম মহীতোষ বসু।

আমার বুকের ভেতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল—

মহীতোষ বসু তো আমার নাম। কিন্তু…কিন্তু ওকি আমার আঁকা ছবি? মনে তো হচ্ছে না; আমার ছবি হলে আমি নিজে কি আর তা চিন্‌তে পার্‌তাম না! সঙ্গের বন্ধুরাও সন্দেহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল—হিমাচল বাবু বোধ হয় ভুল করেছেন। ধীরে ধীরে একটু একটু করে এগিয়ে সবাই গিয়ে ছবির সাম্‌নে উপস্থিত হলাম।

উপস্থিত হয়ে সে কী দেখ্‌লাম! হরি হরি! আমার গা দস্তুর মত ঘামাতে সুরু কর্‌ল, বন্ধুরা হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরেই বোধ হয় চুপ করে রইল। হিমাচল বাবু আমার ছবিখানা উল্‌টো করে দেয়ালে টানিয়েছেন,—যেদিক্‌টা হবে নীচু সেটা গেছে ওপরে আর ওপরের দিক্‌টা এসেছে তলায়। পাঁচ জন সাধারণ লোকের হয়তো মনে হবে এ অবস্থায় ও ছবির মাথামুণ্ডু কিছুই হতে পারে না, কিন্তু হিমাচল বাবু অসাধারণ সমঝ্‌দার কিনা তাই তিনি উল্‌টো ছবিরই নানান্ জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে ভেতরকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন!

অবিনাশ কনুই দিয়ে আমার পেটে এক গুঁতো মেরে বল্লে, "কেমন, কাঁচকলা-জ্ঞানের পরিচয় এবার পেলে তো। আগেই বলেছি লোকটা বাজে, চালিয়াৎ!" ধমক্ দিয়ে বল্‌তে যাচ্ছিলাম, "তোর পাপ মন," কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বার হল না। হিমাচল বাবু তখনো অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে ছবির ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন,।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ

(শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ)

তোমাদের মধ্যে যারা খেলাধূলা ভালবাস তাদের সকলেরই ইচ্ছা হয় বড় বড় খেলোয়াড়দের নাম জান্‌তে। অনেকের নাম তোমরা জান, যেমন—ফুটবলে মোহনবাগানের গোষ্ঠপাল, কুমার, বলাই চাটুয্যে, মনা দত্ত;

মহামেডান স্পোর্টিংএর রসিদ, রহমৎ, ই. বি. আর-এর সামাদ; ক্রিকেটে বাঙ্গালীদের ভেতর কার্ত্তিক বোস, গণেশ বোস, এস্ ব্যানার্জ্জি, আর বাংলার বাইরে নাইডু, উজির আলি, পতৌদি, অমরনাথ, মার্চ্চেণ্ট, অমর সিং, নিসার ইত্যাদি; হকিতে ঝান্সি হিরোজের বিখ্যাত ধ্যান্ চাঁদ্ আর রূপ্‌সিং।

'রণ্‌জী'

আজ আমি তোমাদের কাছে তাঁদের বিষয় বলব যাঁরা খেলার জগতে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের আসন অনেক উপরে রাখতে পেরেছেন বা পেরেছিলেন আর যাঁদের মধ্যে কয়েকজন কেম্‌ব্রিজ্ বা অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্লু" সম্মান প্রাপ্ত হয়েছেন।

এঁদের কথা বল্‌তে গেলে সবচেয়ে আগে আমাদের মনে পড়বে বিখ্যাত ক্রিকেট্‌বীর "রণ্‌জীর" কথা। রণ্‌জী যখন নোয়ানগরের যুবরাজ তখন কেম্‌ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ক্রিকেট্ খেলেন। তখন কেম্‌ব্রিজ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "ব্লু" পাওয়া তেমন সহজ ছিল না। অনেক অধ্যবসায়ের সঙ্গে খেল্‌বার পর রণ্‌জী অবশেষে এই সম্মান পান আর ভারতের বাইরে খেলার জগতে ভারতের নাম প্রতিষ্ঠা কর্‌তে সমর্থ হন। রণ্‌জী আর ইহজগতে নেই কিন্তু তাঁর নাম এখনও সমস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে শ্রদ্ধা আনে। তিনি, তাঁর জীবনের এই সম্মানপ্রাপ্তিটি তাঁর সমস্ত সম্মান-অর্জ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে কর্‌তেন।

রণ্‌জীর পরই আমরা দেখতে পাই খ্যাতনামা টেনিস্‌ খেলোয়াড় এম. স্লিম্‌কে। ইনি পাঞ্জাব-দেশীয়। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও ইনি কেম্‌ব্রিজের "ব্লু" অধিকার করতে পারেন নি সত্য কিন্তু টেনিস্‌-জগতে ইনি নিজেকে একজন বড় খেলোয়াড় হিসাবে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। এখনও ভারতীয় অ-ভারতীয় সকলের কাছে (অবশ্য যাঁরা টেনিস্‌ খেলেন বা খেলা দেখতে ভালবাসেন) এঁর নাম খুবই পরিচিত। সত্য কথা বলতে কি, রণজী, স্লিম্‌ আর ফৈজি ভ্রাতৃদ্বয়ই বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছেন ভারতের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে অগ্রণী।

রণ্‌জীর ভাইপো দলীপসিংজী—অসামান্য ক্রিকেট্‌ খেলোয়াড়, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এর পর যাঁরা "কেম্‌ব্রিজ" বা "অক্সফোর্ড" বিশ্ববিদ্যালয়ে "ব্লু" সম্মান পেয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হ'ল ঃ—

১।	নাওরজী	...	কেম্‌ব্রিজ্‌ টেনিস্‌
২।	রামস্বামী	...	,, ,,
৩।	হাদি	...	,, ,,
৪।	রত্নম্‌	...	,, ,,
৫।	ইউ. কেরামৎ	...	,, ,,
৬।	জগমোহন	...	,, ,,
৭।	চিরঞ্জীব	...	,, ,,
৮।	এ. মদনমোহন	...	,, ,,

৯।	মনোমোহন ভাণ্ডারী	...	কেম্ব্রিজ্‌ টেনিস্‌
১০।	কৃষ্ণপ্রসাদ	...	অক্সফোর্ড টেনিস্‌
১১।	দলীপ সিংজী	...	কেম্‌ব্রিজ্‌ ক্রিকেট্‌
১২।	পতৌদির নবাব	...	অক্সফোর্ড ,, আর হকি
১৩।	জয়পাল সিং	...	অক্সফোর্ড হকি
১৪।	জাহাঙ্গীর খাঁ	...	কেমব্রিজ্‌ ক্রিকেট্‌

যাঁরা "ব্লু" পান নি কিন্তু যাঁদের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন ;—

১। রণবীর সিং—ইনি দিল্লীর খেলোয়াড়। অতি অল্পের জন্য কেম্‌ব্রিজে "ব্লু" পান নি।

২। এইচ্‌. সি. ধাণ্ডা—এখন ইন্দোরের মহারাজের চাক্‌রীতে আছেন। অক্সফোর্ডের হয়ে টেনিস্‌ খেলেছিলেন।

৩। পি. এল. রায়—ইনি ই. বি. রেলওয়েতে একজন অফিসার। ইনি কেম্‌ব্রিজের হয়ে বক্‌সিং করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

৪। সিকন্দর্‌ আলি. বেগ্‌—এখন আই. সি. এস্‌ অফিসার। কেম্‌ব্রিজের হয়ে বক্‌সিং করেছিলেন।

সোনার হরিণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

(১১)

ব্যাণ্ডেলী কাণ্ড

গঙ্গার বিশুদ্ধ 'বায়ু ভক্ষণ' ছাড়া ষ্টিমারে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার কোনই যে সার্থকতা ছিল না রণজিৎ তাহা বুঝিল। লোক কয়টা তার চোখে ধূলা দিয়া একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে, পিছনে এমন একটু সূত্রও রাখিয়া যায় নাই যেটুকু অবলম্বন করিয়া আবার সে তাদের অনুসরণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর কি উপায় থাকিতে

পারে ? কিন্তু দিনটা ছিল রবিবার, রণজিৎ খবর লইয়া জানিল শ্রীরামপুরের আগে আর কোন ষ্টেশনেই সেদিন ষ্টিমার ভিড়িবে না। সেখানে পৌছিতেই বেলা বারটা বাজিয়া যাইবে; আজকালকার মত তখনও বাসের এত ছড়াছড়ি হয় নাই, ওসব অঞ্চল হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হইলে নির্ভর করিতে হইত সাধারণতঃ ট্রেনেরই উপরে। রবিবার দিন শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা পৌছিবার লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বড়ই কম; সকালের দিকে খুব ঘন ঘন কয়েকটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু পৌনে বারটার সময় যে গাড়ীখানা ছাড়িয়া যায় সেখানা না ধরিতে পারিলে অপেক্ষা করিতে হয় বিকাল সেই সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত। পৌনে বারটার ট্রেন ধরা তার পক্ষে অসম্ভব; কাজেই শ্রীরামপুরে নামিলে সন্ধ্যার আগে বাড়ী গিয়া পৌছিবার ভরসা তো নাইই, উপরন্ত সারাদিন হয় অনাহারে আর নয়তো দোকানের কদর্য্য খাবার খাইয়াই কাটাইতে হইবে। আর তা ছাড়া ষ্টেশনে চার পাঁচ ঘণ্টা ঠায় বসিয়া থাকিবার ধৈর্য্যও তার নাই। এদিকে হুগ্‌লী পর্য্যন্ত টিকেট তার করা আছে; হুগ্‌লীঘাট হইতে মাত্র মাইল কয়েক দূরেই তার মামাবাড়ী। সেখানে ভ'র দুপুরে গিয়া উপস্থিত হইলে চর্ব্ব্য-চোষ্য না জুটিলেও সুব্যবস্থা যে একটা হইবেই সেটা ঠিক, যত্ন-আত্তি হইবে সেটা আরও ঠিক। তার মামাবাড়ীর গ্রাম হইতে অল্প কিছু দূর গেলেই প্রকাণ্ড ষ্টেশন ব্যাণ্ডেল জংসন—কলিকাতা ফিরিবার ট্রেন সেখানে প্রচুরই মিলিবে।

রণজিৎ অতর্কিতে মামাবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইবার ফলে নাতিকে দেখিয়া তার বুড়া দাদামশা'য় দাড়িতে কয়বার হাত বুলাইলেন বা গড়গড়ায় কয়টা সুখ-টান দিলেন, দিদিমার কয় পাটি ফোক্‌লা দাঁত বাহির হইয়া পড়িল, পুকুরের কতগুলি মাছ বন্ধুহীন হইল সে সমস্ত খবর অত্যন্ত রসাল হইলেও আমাদের গল্পের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই সে ইতিহাস উহ্য রাখিয়া তার ব্যাণ্ডেল পৌছিবার পর হইতেই আমরা আবার আমাদের গল্প বলা সুরু করিব।

বিরাট্ ষ্টেশন ব্যাণ্ডেল জংসন—অনবরত ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে; ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নানা জায়গার গাড়ী দাঁড়াইয়া। যাত্রীদের বসিবার জন্য রেল কোম্পানী খানিকটা অন্তর অন্তর বেঞ্চি পাতিয়া দিয়াছে, তারই একটার উপর রণজিৎ বসিয়া। কলিকাতার ডাউন গাড়ী আসিবার তখনও কিছু দেরী আছে, বসিয়া বসিয়া সে কেবল আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হুকা-কাশির সহিত তার দেখা হইবে, সে যে বুদ্ধির দাবা খেলায় প্রথম চাল দিতে না দিতেই বিপক্ষদল বাজীমাৎ করিয়া দিয়াছে সে কথা ধরা পড়িয়া যাইবে। মুখে তিনি কোন কথাই বলিবেন না বটে; কিন্তু 'তাঁর দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়া হয়তো একটা অবজ্ঞার চাপা হাসি খেলিয়া যাইবে; সে হাসি যেন তাকে বলিতে থাকিবে, বুঝিয়াছি তোমার কেরামতি,

একশ' গজী ফুটবল্ মাঠটুকুর মধ্যেই তোমার যত লম্ফ-ঝম্ফ, তার বাহিরে গেলেই তুমিও যা পাঁচ বছরের শিশুটিও তাই। এ চিন্তা অসহ্য,—অথচ……

হঠাৎ সজোরে রাশ টানিয়া ধরিলে ঘোড়া যেমন চলিতে চলিতে আচম্‌কা থামিয়া যায়, রণজিতের চিন্তাস্রোতও তেম্‌নি মুহূর্ত্তে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। ওই যে একটু দূরে একটা কুটিল চেহারার লোক কলের কাছে দাঁড়াইয়া কুঁজায় জল ভর্ত্তি করিতেছে ও কে? ও মূর্ত্তি তো রণজিতের অপরিচিত নয়, তার সমস্ত চিন্তার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া এই ধরণের এক ব্যক্তি ক্রমাগত উঁকি মারিতেছে! না না, জগন্নাথঘাটে এ মূর্ত্তির দেখা সে পায় নাই; শুধু জগন্নাথঘাট

কুঁজায় জল ভর্ত্তি করিতেছে

বলিয়া নয়, আজ পর্য্যন্ত চর্ম্মচক্ষে এ মূর্ত্তি কোথাও সে দেখে নাই অথচ তার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত এ চেহারা যে ছেঁকা দিতেছে সে কথাও সত্য।

জামার উপর দিয়াই তাড়াতাড়ি সে ডান দিকের পকেট্‌টা একবার অনুভব করিয়া লইল, তার পরেই উঠিয়া গিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে ও লোকটা তার কার্য্যকলাপ কিছুই দেখিতে না পারে অথচ তার নিজের দৃষ্টি সে দিকেই নিবদ্ধ থাকে। হাওড়ার ষ্টেশনে ইতিপূর্ব্বেই সে একখানা টাইম্‌টেব্‌ল্ সংগ্রহ করিয়াছিল, চট্ করিয়া তাহার যে পাতাখানা হাতে আসিল তাহাই সে খুলিয়া ফেলিয়া আড়চোখে

চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইল। তার পর মুহূর্ত্তের মধ্যে ডান পকেটে হাত দিয়া কি একটা কাগজ সেই খোলা পাতার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া এম্‌নি ভাবে টাইম্‌টেব্‌ল্‌খানা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, যেন সে ট্রেনেরই সময় দেখিতেছে, সে কাগজখানা নয়।

রণজিৎ দেখিতেছিল একখানি ফটো—আজ সকালে হুকা-কাশির বাড়ী হইতে 'য়্যাড্‌ভেঞ্চারে' বাহির হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁর গুপ্ত কুঠুরীটুকুর মধ্যে রণজিৎকে ডাকিয়া লইয়া এই ফটোখানা দিয়াছিলেন; মুখে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই ফটোতে তোলা চেহারার বাস্তব মূর্ত্তি তার চোখে পড়িতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু পড়িলে তাকে বিশেষ সাবধানের সঙ্গে চলিতে হইবে; হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় কোন কাজ যেন সে না করিয়া বসে, কেননা তাহা হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর একটা কথা, ফটোখানা যে তার সঙ্গে রহিয়াছে ঘুণাক্ষরেও সে কথা যেন বাহিরে কারো কাছে প্রকাশ না পায়। সেই অবধি ফটোখানা তার চিন্তার সমস্ত ফাঁক জুড়িয়া রহিয়াছে। হুকা-কাশি কি করিয়া যে এ ছবিখানা করায়ত্ত করিলেন রণজিৎ তা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই, কেননা এই অদ্ভুত শক্তিশালী জাপানী ডিটেক্‌টিভটির প্রত্যেকটি কাজ এমনই জটিল, এমনই হেঁয়ালিতে ভরা যে ইতিপূর্ব্বে অনেক বার সে তার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া কেবল ভোঁতা মুখে ফিরিয়াই আসিয়াছে। সে শুধু এইটুকু বুঝিল যে জলের কুঁজা-হাতে এই লোকটার নাড়ীনক্ষত্র তাকে জানিতেই হইবে এবং সেজন্য যদি পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্য্যন্ত তাকে ছুটিতে হয় তাহাতেও সে প্রস্তুত।

লোকটার কুঁজায় জল ভরা হইয়া গিয়াছিল, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সে নিজের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। এ অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ রাখিতে হইলে ঠিক যতটা তফাতে থাকা দরকার ঠিক ততটা দূর হইতেই রণজিৎ লক্ষ্য করিল সে একখানা থার্ড ক্লাশ কামরায় উঠিতেছে। সে কামরাটা একেবারে নির্জ্জন ছিল না বটে—কোন থার্ড ক্লাশ গাড়ীই একেবারে নির্জ্জন থাকে না—কিন্তু অন্যান্য যাত্রীদের প্রতি নজর করিলে এটা বুঝিতে কারোই কষ্ট হইবার কথা নয় যে তাদের সহিত ওই ক্রূর চেহারার লোকটার কোনই সম্বন্ধ নাই, সে সম্পূর্ণ একা। দেখিয়া রণজিৎ অনেকটা আশ্বস্ত হইল; অবশ্য হুকা-কাশির সতর্কতা সে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিবে, কিন্তু দৈবের ব্যাপার কিছুই বলা যায় না, শক্তির একটা পরীক্ষা যদি নিতান্তই ঘটিয়া যায় তবে একটা মাত্র আক্রমণকারীকে সে অনায়াসেই মাটীতে লুটাইয়া দিতে পারিবে। নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস তার আছে। থার্ড ক্লাশ কামরাটির গায়েই একখানা ইণ্টার ক্লাশের গাড়ী—মধ্যে মাত্র একখানা পাৎলা কাঠের ব্যবধান। রণজিৎ নিকটে গিয়া সানন্দে আরও লক্ষ্য করিল সেই দেওয়ালটির গায়ে তাঁরের জাল দেওয়া জানালার মত ছোট্ট একটু ফাঁকও রহিয়াছে—অর্থাৎ এক গাড়ী হইতে অপর গাড়ীর ভিতর নজর রাখা চলে। 'সৎকার্য্যে সুযোগের অভাব কখনই হয় না'

এই মহা বাক্যটি স্মরণ করিয়া একখানা ইণ্টার ক্লাশের টিকেট কিনিবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বুকিং অফিসের দিকে আগাইয়া গেল।

(১২)

ফটো-রহস্য ঘনীভূত

টিকেট কিনিয়া ইণ্টার ক্লাশ গাড়ীতে ঢুকিতেই রণজিৎ দেখিল কামরাটি খুব ছোট, মাত্র দুখানি বেঞ্চি রহিয়াছে। তার একটা বেঞ্চিতে বছর কুড়ি বাইশের এক সুবেশ যুবক জানালায় ঠেসান দিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে একখানা ছ' পেনি দামের ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। রণজিৎকে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা সে পাশে সরাইয়া রাখিল, তার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার বার রণজিতের আপাদমস্তক দেখিতে সুরু করিল। ট্রেনে একজন নূতন যাত্রীর আবির্ভাব হইলে সকলেই একবার তার দিকে তাকাইয়া দেখে বটে, কিন্তু সে ধরণের অনাসক্ত দৃষ্টি এ নয়, ভিতরে আরও যেন কোন অর্থ আছে বলিয়া রণজিতের মনে হইতে লাগিল। যুবকটি হুঁসিয়ার, তার সঙ্গোপন চাহনী যে রণজিৎ বিশ্লেষণের চোখে দেখিতেছে সে তা বুঝিতে পারিয়া বইখানা আবার চোখের সাম্‌নে খুলিয়া ধরিল। কিন্তু দৃষ্টি তার বইএর অক্ষরের দিকে ছিল না; বইখানা ছিল আবরণ মাত্র তার আড়াল হইতে সে শুধু দেখিতেছিল রণজিৎকেই।

একটু পরে একটা হাই তুলিয়া সে বই বন্ধ করিল, তার পর নাক ঝাড়িবার উপলক্ষ্য করিয়া অন্যদিকের জানালার দিকে আগাইয়া গেল। রণজিৎ লক্ষ্য করিল যাইবার সময় দুই গাড়ীর মধ্যকার জালের জানালাটার ভিতর দিয়া সে একবার উঁকি মারিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের বেঞ্চিতে বসিবার পর সে-ই প্রথম গাড়ীর নীরবতা ভঙ্গ করিল, কহিল, "চাকরটাকে তুলে দিয়েছি পাশের থার্ড ক্লাশ কামরাটাতে; ভেতরের এই জান্‌লাটুকু থাকায় ভারী সুবিধে হয়েছে, মাঝে মাঝে প্রায়ই উঠে গিয়ে তত্ত্বতালাস করতে পাচ্ছি। একেবারে দেশ থেকে সদ্য আম্‌দানী কিনা, বেজায় নার্ভাস্‌।"

রণজিৎ কোন জবাব দিল না, একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক তখন দুরু দুরু করিতেছিল। মনে মনে বলিল, "চাকরকে দেখ্‌তে গেলে, নাকি নিজের সঙ্গী ঠিক আছে কিনা খোঁজ নিয়ে এলে তা তো ঠিক বুঝ্‌ছি না বাপধন! তোমার হাবভাব যেন একটু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে!

যুবক ছ' পেনি দামের যে পাৎলা ইংরাজী নভেলখানা পড়িতেছিল জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সে বেঞ্চির উপরই ফেলিয়া রাখিয়াছিল; হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া বইখানার মলাট উল্‌টাইয়া দিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চকিতে রণজিৎ দেখিতে পাইল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে 'সলিল বোস্‌, শ্রীপুর।' সাধারণ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে

বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না, কেননা আমি যে লোককে চিনি এ পৃথিবীতে তার যে আর দ্বিতীয় কোন পরিচিত বন্ধু থাকিবে না তার কি হেতু আছে? কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিষেরই অর্থ ভিন্ন রকম হইয়া দাঁড়ায়। রণজিৎ যে "দাগী" লোকটির সন্ধানে ফিরিতেছে ঠিক পাশের কামরাটিতেই সে বসিয়া; এ গাড়ীতে ওঠা অবধি যুবক তার দিকে একটু ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে, একবার উঠিয়া গিয়া জানালার পথে সে ও কামরায় উঁকি পর্য্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; এ অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা তার চোখে খুব সাধারণ বলিয়া মনে না হওয়ারই তো কথা। কিন্তু অন্য দিকেও ভাবিবার বিষয় আছে। সোনার হরিণের মালিক স্বয়ং দ্বারকানাথের ছোট ভাই সলিলের একখানি বই এ যুবকের হাতে। যে ফটোখানার উপর নির্ভর করিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট, অজ্ঞাত স্রোতের মুখে আজ সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত, হুকা-কাশির মুখে শুনিয়াছে কাল নাকি সেখানা শ্রীপুরের কারখানায় হারাইয়া গিয়াছিল, সলিলই সেটির উদ্ধার করিয়া আজ প্রাতে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে ছবিখানা সলিলের কাছে অপরিচিত নয়। এমনও তো হইতে পারে যে ফটোটি ফেরৎ দিবার পরই ওই দাগী লোকটা তার নিজের মত সলিলেরও চোখে পড়িয়া গিয়াছে, সলিল নিজে অপারগ হওয়ায় তার কোন সাহসী অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লোকটার পিছনে লাগাইয়া দিয়াছে। য়্যাড্‌ভেঞ্চারের প্রতি নেশা যার আছে তার পক্ষে এ লোভ সম্বরণ করা একটু কষ্টকর বৈকি! বাস্তবিকই এমন একটা কাণ্ড যদি ঘটিয়াই থাকে তবে এ যুবক তার শত্রু না হইয়া বন্ধুই হইয়া দাঁড়াইবে, কেননা দুজনার উদ্দেশ্যই যে এক! এখন প্রকৃত ব্যাপারটা কি, কি করিয়া জানা যায়?

হঠাৎ রণজিতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল; বইখানা বেঞ্চির উপর পড়িয়া ছিল, তাড়াতাড়ি সেখানাকে হাতে তুলিয়া লইয়া সে কহিল, "রেলে সময় কাটাবার জন্য খোরাকটি সংগ্রহ করেছেন ভালই।" কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মলাটের পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া ফেলিল; তার্‌পর সবে যেন এইমাত্রই লেখাটা দেখিতেছে এম্‌নি ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীপুর? শ্রীপুর জায়গাটা কোথায় বলুন তো?"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বড় বড় চোখে যুবক মুহূর্ত্তকাল রণজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তার্ পর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনি জানেন না তা?"

ঠিক এই ধরণের জবাবের জন্য রণজিৎ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, একটু থতমত খাইয়া সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, একটা শ্রীপুর জানি বটে! আচ্ছা এ সলিল বোস্‌টি কে?"

মনে হইল একটা যেন চাপা হাসির রেখা যুবকের ঠোঁটের পাশ দিয়া ক্ষণিক বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, চোখ দু'টিকে একটু মিটি মিটি করিয়া সে কহিল, "সে খবরও তো আপনার অজানা নয় রণজিৎ বাবু!"

রণজিৎ বুঝিল ইহাকে আর ছলনা করা বৃথা, তার সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র ইহার নখদর্পণে, নামটি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত নয়। বলিল, "দ্বারিক বাবুর ভাই সলিল বাবু আর ইনি একই লোক কিনা সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। আপনিও তো দেখ্‌ছি আমার মত সব খবরই রাখেন! দ্বারিক বাবু কেউ হন্ নাকি আপনার?"

বোধ হয় রণজিৎ টের পাইল না, তার এই প্রশ্নে যুবকের মুখ পলকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মাত্র পলকের জন্যই, মনের ভাব গোপন করার শক্তি তার অসাধারণ। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।"

"তবে সলিল বাবু বুঝি আপনার বন্ধু?"

এ প্রসঙ্গটাই যুবকের অত্যন্ত রকমের অস্বস্তিকর, কোন রকমে চাপা পড়িলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। দায় সারা গোছের সে একটা জবাব দিল, "বন্ধু? হ্যাঁ, তা ওই গোছেরই।" তার পরেই বিষয়টা এড়াইবার জন্য সে পাড়িয়া বসিল একেবারে অন্য কথা, কহিল, "বড় কর্ত্তার শরীরের যে রকম গতিক দেখ্‌ছি এ অবস্থায় চিনির কল্ চালিয়ে নেওয়াই তো একটা সমস্যা। সলিল বাবুর সে ক্ষমতা নাই, ব্যবসাবুদ্ধির ওঁর একেবারে। অভাবই সে ছিল মেজ কর্ত্তার।"

"দ্বারিক বাবুর মেজ ভাইএর কথা বল্‌ছেন বুঝি? সেই যিনি আমেরিকায় না কোথায় থাকেন?"

"হ্যাঁ, আট-দশ বছর সেখানেই আছেন বটে। তবে তাঁকে দেশে ফির্‌তে লেখা হয়েছে; বোধ হয় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এসে পড়্‌বেন। ভাল কথা, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট্ কে হল আজকের খবরের কাগজে সে খবর বার হয়েছে কি? আজকের কাগজ দেখ্‌বার সময় পাইনি।" কৌশলে দ্বারিক বাবুর পারিবারিক কথা হইতে যুবক কথার ধারাটাকে একেবারে সাধারণ আলোচনায় আনিয়া ফেলিল।

এই ভাবে এক কথা, দু' কথা হইতে হইতে হু হু করিয়া সময় কাটিয়া চলিল, ক্রমে সন্ধ্যা এবং পরে রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ সমস্তের মধ্যেও রণজিৎ তার আসল কাজে অবহেলা করে নাই, প্রত্যক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই সে কৌশলে লক্ষ্য করিয়াছে তাহার 'মার্কামারা' লোকটি সট্‌কাইয়া পড়িতেছে কিনা।

কিন্তু আজ সারা দিনে অবসাদ এবং উত্তেজনা গিয়াছে প্রচুর, শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ যেন তাঁর মাঝে মাঝে ভারী হইয়া বুজিয়া আসিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ চোখ দুইটি কখন্ যে একেবারে বুজিয়া গেল সে তা টেরই পায় নাই। রাত্রি আন্দাজ দেড়টার সময় সে ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিল, সমস্ত গাড়ীখানা তখন নিঃঝুম অন্ধকার। বিদ্যুৎ-গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সে ইলেক্‌ট্রিক্ সুইচ্‌টা টিপিয়া ধরিল; দেখিল সাম্‌নের বেঞ্চির উপর যুবকের একটি শতরঞ্চ আর

বালিশ পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার নিজের কোন চিহ্নই নাই। উন্মাদের মত রণজিৎ তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াই একেবারে গাড়ীর মেঝের উপরই বসিয়া পড়িল—ফটোখানি তার পকেট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেছে।

(ক্রমশঃ)

ধাঁধার কবিতা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

শেষ চরণে সকল প্রশ্নেরই উত্তর আছে; তাহা বাহির করিতে হইবে।

আসামের কোন্ দ্রব্য সভ্যজন পেয়?
রাজার নিকটে কিবা প্রজাদের দেয়?
উড়িয়া চলিছে কি-গো, পা দু'খানা ভুঁয়ে?
আরামেতে ঘুম হয় কোন্‌খানে শুয়ে?
কি কারণে করে পাপ নানা নারী নর?
তামা গড়া কি বস্তুর বাজারে আদর?
পরগৃহে খাটে কি-বা স্বার্থে আপনার?
চাকর উড়িয়া খাটে লোভে পয়সার!

উত্তরগুলি প্রথমে নিজেরা বাহির কর, তার পর শেষের পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তরের সহিত মিলাইয়া দেখ। আগেই শেষের পৃষ্ঠার উত্তরগুলি দেখিও না যেন!

<u>চিঠিপত্রের সারাংশ</u> ঃ—অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য পুরস্কার-প্রতিযোগিতার রচনা পাঠাইবার শেষ দিন কিছু পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে দিন ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল। এ বৎসরের প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকাই প্রতিযোগিতায় রচনা পাঠাইতে পারিবেন। রাঃ সঃ

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

পউষ-সাঁঝে

(কুমারী সুজাতা গুপ্ত)

(১)

ফুল-কলিরা মুখ ঢেকেছে
আজ্‌কে সাঁঝে রে,
পাতার সেতার থেমে গেছে
গাছের মাঝে রে!
শীত এসেছে শীত,—
দিকে দিকে, শুনি বাজে কাঁপন-ধরা গীত।

(২)

হিম-কুয়াশায় বিশ্বখানি
আজকে ঢাকিছে,
পউষ-সাঁঝে গাছপালা সব
শিউরে কাঁপিছে;
বইছে হিমেল বায়
তার আমেজে আজ্‌কে সাঁঝে প্রাণ্‌টা কেঁপে যায়।

(৩)

কাশ-বন আজ নেয়ে গেছে
তুষার-ধারাতে,
দীঘির জলে শাপ্‌লা কাঁপে
শীতের সাড়াতে;
ঝুম্‌কো তলায় ভাই
আধ-আঁধারে জোনাক্ জ্বলে দেখ্‌ছি বসে তাই।

(৪)

ঝোঁপের ধারে পাতার আড়ে
নানা পাখীর দল
ঠক্-ঠকিয়ে কাঁপ্‌ছে বসে
কোথায় যাবে বল্?
ছেলের দলে আজ
দাওয়ায় বসে জট্‌লা ক'রে কাটায় পউষ-সাঁঝ!

(৫)

ভাটিয়ালী থেমে গেছে
নৌকা-মাঝিদের
বলে "চল্‌রে ত্বরা আজ্‌কে ঘরে
নইলে পাবি টের।"
শুন্‌বি যদি আয়
পউষ-মেয়ে গান গেয়ে যায় সাঁঝের কুয়াশায়।

পিঁপড়ের বুদ্ধি

(কুমারী রুবী চাটার্জ্জি)

আজ তোমাদের পিঁপ্ড়ের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটা সত্য ঘটনার (গল্প নয়) কথা বলব।

পিঁপ্ড়ে, ছোট্ট ছোট্ট পিঁপড়ে, তারা আবার এমন কি বুদ্ধির কাজ কর্‌তে পারে? পারে বৈ কি? শোন—

সকালে উঠেই ছোট বোন লীনার সঙ্গে খেলতে বসে গেলাম। খেলার সরঞ্জাম ছিল চাল, ডাল ইত্যাদি।

হঠাৎ ঝম্ ঝম্ ঝম্—আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমে এল। মার ডাক কানে এল—"ওরে, তোরা ওপরে উঠে আয়—বৃষ্টি পড়ছে।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওপরে উঠে মার কাছে ব'স্‌তে হ'ল।

অনেকক্ষণ হ'ল বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। সকলে নীচে এলাম। হঠাৎ লীনা বলে উঠলে—"দিদি ভাই, দেখ অতগুলো চাল ছিল একটীও নেই কিন্তু, কি হ'ল বল ত?" বল্‌লাম—"কী আর হবে? বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে।"

এতক্ষণে সূয্যিমামা মেঘের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু উঁকি-ঝুঁকি মারলেন। চারিদিকে সামান্য একটু রোদের আভাস পড়েছে।

হঠাৎ দেখলাম এক দল ছোট্ট ছোট্ট পিঁপ্ড়ে তার চেয়েও ছোট্ট ছোট্ট মুখে ক'রে এক একটা সাদা সাদা জিনিষ নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় রাখ্‌ছে—যেখানে সূয্যি মামার দৃষ্টি পড়েছে। মনে করলাম, দেখি গিয়ে ব্যাপারখানা, এত ডিম নিয়ে যাচ্ছে কোথায়! ওমা, গিয়ে দেখি ডিম নয়—সাদা সাদা কি সব জিনিষ হিমালয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে এক জায়গায় উঁচু ক'রে রাখ্‌ছে। তোমরা নিশ্চয় মনে ক'রছ যে এ সব তাদেরই ডিম, কিন্তু এ সব ডিম নয়, আমাদেরই খেলা-ঘরের চাল।

আমাদের বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে চালগুলো বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছিল বলে ওরা সেগুলো রোঁদে শুকোতে দিচ্ছে। কী আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সন্দেশ

চিত্রশালা

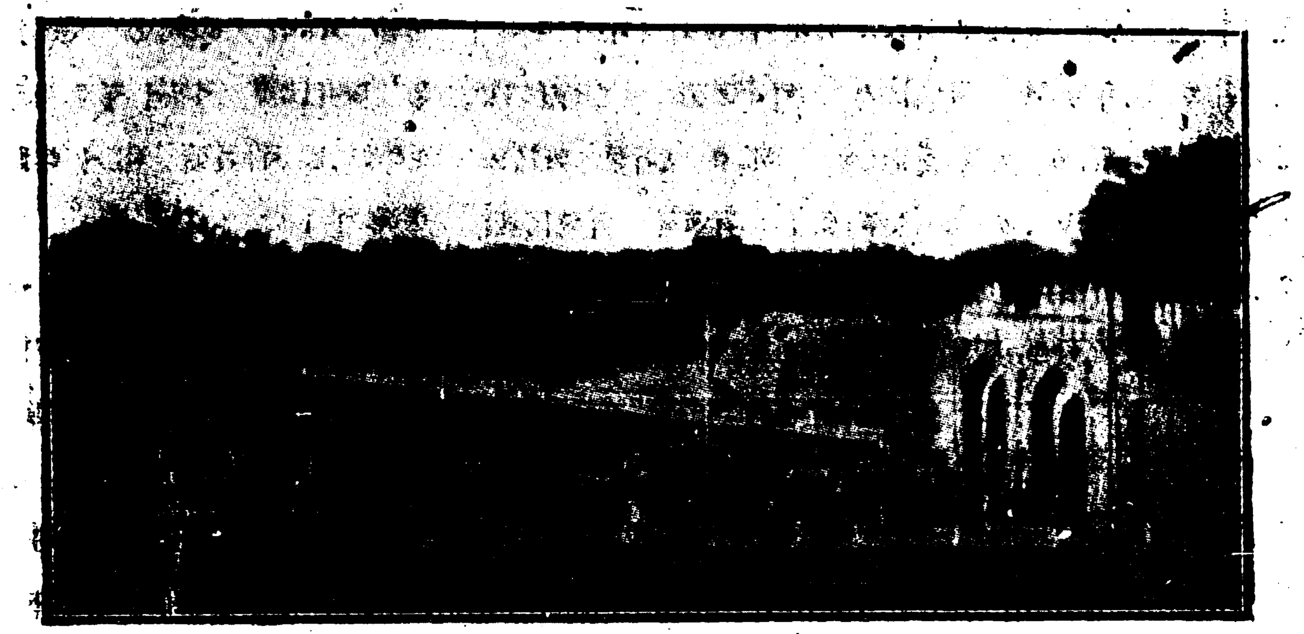

কাশ্মীরী গেট, দিল্লী—আলোকচিত্রগ্রহীতা শ্রীতুহিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা—আলোকচিত্রগ্রহীতা শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র।

কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ক্রিকেট্ ম্যাচ্ শেষ হইয়া গেল—গত বারের মত এবারও মুসলমানরাই চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছেন। এদিকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক ক্রিকেট দল আসিয়াছে, অনেক ঝানু খেলোয়াড় তাতে আছেন, তবে ব্র্যাড্‌ম্যান্ পন্স্‌ফোর্ড্ ইত্যাদি নাই। তাদের সঙ্গে প্রথম টেষ্ট্-ম্যাচে ভারতবর্ষ নয় উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। আরও খেলা হইলে এ বিষয় প্রবন্ধ বাহির করিব।

* * *

এ বছরের নোবেল প্রাইজ বিতরণ হইয়া গেল। সাহিত্য এবং শান্তির জন্য কেউ পুরস্কার পান নাই—পাইয়াছেন রসায়নে (Chemistry), পদার্থবিদ্যায় (Physics) আর চিকিৎসা-শাস্ত্রে। তোমরা জান, মাদাম কুরি রসায়নে দুবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন. এবার আবার তাঁরই মেয়ে এবং জামাই—আইরিন কুরি ও অধ্যাপক জলিয়ট্ একত্রে রসায়নেই ওই পুরস্কার পাইলেন। এভাবে বংশানুক্রমে নোবেল প্রাইজ পাওয়া এই প্রথম। পদার্থ-বিদ্যায় পুরস্কার পাইয়াছেন কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জেম্‌স্ চেড্‌উইক।

মহেঞ্জোদাড়োর কথা তোমরা শুনিয়াছ। সেখানে মাটী খুঁড়িয়া পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী পুরানো কয়েক দানা গম পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি সেগুলি মাটীতে পুঁতিয়া দেওয়ায় চমৎকার গাছ গজাইয়াছে, আর সেই গাছে শস্যও ফলিয়াছে চমৎকার। নতুন গজানো গমের দানাগুলি আজকালকার গমের চেয়ে আকারে অনেক বড়, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু।

* * *

জার্ম্মানীর একটা কবর খুঁড়িয়া বারশ' বছরের পুরানো এক গাছা দাড়ির সন্ধান মিলিয়াছে। কবরের ভিতরকার মৃতদেহটির সমস্ত শরীরই নষ্ট হইয়া গেছে, কিন্তু দাড়িটি আছে ঠিকই।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক হীরার খনি আছে সে খবর বোধ হয় তোমরা রাখ। ওখানকার গভর্ণমেণ্টকে একটা এক্স্-রে যন্ত্র বসাইতে হইয়াছে। কিজন্য জান? না, না, কোন হাস্পাতালের জন্য নয়। ওখানকার অনেক চোর ওই সব খনি হইতে হীরা চুরী করিয়া হয় গিলিয়া ফেলে, আর নয়তো শরীরের কোন জায়গা কাটিয়া তার মধ্যে লুকাইয়া রাখে। কাহারো পেটে কিংবা চাম্ড়ার নীচে হীরা আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যই এই এক্স্-রে যন্ত্র।

* * *

আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় সেদিন দুইটি বিবাহ হইয়া গেল। প্রথম পাত্রটি এই সবে বিলাত হইতে আসিয়াছেন, বয়স দু'বছর। নাম এবং জাতিও শুনিতে চাও? আচ্ছা, বলিতেছি—নাম মিষ্টার সিম্প্, জাতি—শিম্পাঞ্জী।

দ্বিতীয় বিবাহটির পাত্র-পাত্রী খুঁজিতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল, শেষটায় পৃথিবীর দুই মাথা হইতে তাদের আনা হইয়াছে। দু' জনারই বয়স খুব অল্প, দু'শো বছরের বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহারা জাতিতে কচ্ছপ।

* * *

যে সব দেশে পাহাড় না কাটাইলে রাস্তা বানাইবার কিংবা বাড়ী তৈরী করিবার মত সমতল জায়গা পাওয়া যায় না সে সব দেশে নাইট্রোগ্লিসারিণের মত ভয়ানক বিস্ফোরকের চাহিদা খুব বেশী। অথচ এই বিস্ফোরককে এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় লইয়া যাওয়া এক ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ। খুব বেশী মাহিনা দিয়াও এই জিনিষে ভর্ত্তি গাড়ী চালাইবার লোক পাওয়া কঠিন। দুপুর রাত্রি ছাড়া এরকম গাড়ী চালান নিষেধ এবং এই সব গাড়ী আমেরিকার কোনও সহরের সীমানায় ঢুকিতে পারে না। হয়ত একটা বাক্সের গায়ে আর একটার ধাক্কা লাগিল—ব্যস্, ভয়ানক একটা শব্দ আর প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত—গাড়ীর আর কোনও চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই সমস্ত বিপদের জন্য নতুন একরকম বিস্ফোরক আবিষ্কার হইয়াছে। সামান্য ধাক্কা ত দূরের কথা হাতুরী দিয়া পিটিলে, এমন কি দিয়াশলাই দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিলেও ইহা ফাটিবে না। ইহা ফাটাইতে বিশেষ একটা উপায়ের সাহায্য লইতে হইবে—তখন ইহা দিয়া পাহাড় ফাটাইয়া নগরও বসান চলিবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কটক, নবীন, বলিব, জলজ, কনক, নয়ন, সরস, রবার, কতক।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

ডলি, তুলতুল, নেইলা (ভবানীপুর) ; প্রশান্ত, প্রতীত, প্রতাপ প্রভৃতি (সীতারামপুর) ; গোপাল, মনু, লালু (জ্যোৎশ্রীরাম) ; শৈলেশ, অনিল, নিখিল (জলপাইগুড়ি) ; নিরু, প্রভা, বিভা, সুমিত্রা (জলপাইগুড়ি) ; প্রকাশরঞ্জন সরকার (যোড়হাট)।

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে—

দিলীপকুমার ব্যানার্জ্জি, ধীরাজ ব্যানার্জ্জি ও মেজকাকিমা (জলপাইগুড়ি) ; নিখিল চৌধুরী ও মা (জলপাইগুড়ি) ; সুনীলবরণ সান্যাল, মুকুল, অরুণা প্রভৃতি (রংপুর) ; অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর) ; কানাইলাল, অমূল্য ও শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা) ; লতিকা, যূথিকা, সরোজ প্রভৃতি (কলিকাতা) ; নির্ম্মল, বিপদভঞ্জন (রামকৃষ্ণ মিশন, হবিগঞ্জ) ; রামপ্রসাদ সিং (বেহালা) ; চিন্ময়ী দাস ও সুজনকুমার দাস (কলিকাতা), মোহন, কানু, খুসী প্রভৃতি (কলিকাতা) ; কামাখ্যাপ্রসাদ খাঁ, দেবীদাস, প্রশান্ত (শিলং) ; ছায়া দেবী (রতনপুর) ; সুমুথনাথ মিত্র, রাণী, গৌরী প্রভৃতি (দিনাজপুর)।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

পশুপতি সরকার (গোবিন্দপুর) ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড) ; রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র প্রভৃতি (মধুবাণী) ; লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু, শচীন (পুরী) ; তাহিরপুর রাজ এম্, ই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (তাহিরপুর) ; বেলী, শেফালিকা সেন, পূর্ণেন্দু দাশ (হবিগঞ্জ) ; প্রতুল, চামেলী, রেবা (পুরুলিয়া) ; বীরু, শান্তি, মায়া (নিউদিল্লী), ডলি, ছবি, বেলা, গুটুমামা (নিউদিল্লী) ; নবকুমার, সুধীর, অবনী প্রভৃতি (পাবনা) ; কৃষ্ণ, কালী ও পাঁচুগোপাল ঘোষ (খুওয়াপাড়া) ; নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিন ষ্ট্রীট) ; কুমারী যূথিকাসুন্দরী চন্দ (পাটনা)।

এ মাসের ধাঁধার কবিতার উত্তর—চা, কর, উড়িয়া, খাটে, লোভে, পয়সা।

নূতন ধাঁধা

নীচের চিঠিটা একটি খামখেয়ালী ভদ্রলোকের লেখা। তিনি প্রত্যেক কথার মানে তৈয়ারী ক'রে লিখেছেন। বানানের বদলে উচ্চারণ ধ'রে অর্থ করেছেন (যেমন 'সব' মানে 'মৃতদেহ' অর্থাৎ 'শব')। চলিত কথার মানে শুদ্ধ কথায় দিয়েছেন এবং কথাকে ভাগ ক'রে বিভিন্ন ভাগের অর্থও দিয়েছেন। এক একটি কথা একটি '—' চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তোমরা চিঠির অর্থ বের করতে পার কি ?

'অত্যন্ত বেশী সহ্য হয়'

'গিয়াছে যম' 'বছর ছুটিয়া যায়' 'পেষণ করা মশকই' 'পাতায়' 'যাহা স্নান করিয়াছেন,' 'কুঠার' 'শত সময়ে' 'দাম করে যে' 'কাকের ডাক হাতী পাতা' 'ঐ ব্যক্তি' 'ভাত-ভাত' 'মৃতদেহই' 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী' 'গতিহীন' 'হাতী বিদ্যমান'।

'বি লওয়া হইয়াছে'
'তেলেভরা চাকার ভিতরে'

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর ৮ম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ হইতে ৯ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া আগামী বছরের বার্ষিক মূল্য ২।৵০ (ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা ১।৵০) আগামী **২০শে পৌষের** মধ্যে আমাদের মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন ; (কলিকাতার গ্রাহকেরা হাতে টাকা জমা দিতে পারেন।) কারণ ভি, পি, তে পত্রিকা লইলে তাঁহাদের অনর্থক অতিরিক্ত ।/০ ভি, পি মাশুল দিতে হইবে এবং পত্রিকা পাইতেও কিছু দেরী হইবে। আশা করি সকল পুরাতন গ্রাহকই আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন। যদি বিশেষ কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তবে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আগামী **২০শে পৌষের** মধ্যে আমাদের জানান। ঐ তারিখের মধ্যে চাঁদা কিংবা কোনও চিঠি না পাইলে আমরা তাঁহাদের নামের রামধনু ভি, পি, তে পাঠাইব। আশা করি গ্রাহকেরা ভি, পি, ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ১ বি, রসা রোড্, ভবানীপুর (চড়কডাঙ্গার মোড়) ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোংএ 'রামধনু'র একটি শাখা-অফিস্ খোলা হইয়াছে।

নিঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, **রামধনু**
১৬ নং টাউন্‌সেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা।